অসহ্য সাসপেন্স

অদ্রীশ বর্ধন

অসহ্য সাসপেন্স

অদ্রীশ বর্ধন

অসহ্য সাসপেন্স

অদ্রীশ বর্ধন

অসহ্য সাসপেন্স

প্রথম খণ্ড

পত্র ভারতী
৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

ভূ মি কা

এই গ্রন্থে সংকলিত কাহিনীগুলি লিখতে বসে মাথায় ভিড় করে এসেছিল নানা ঘটনা, নানা তথ্য—তাদের কোনটা পেয়েছি বিদেশী বিজ্ঞান পত্রিকায়, কোনটা দৈনিক খবরের কাগজে। কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটেছে বিদেশী কাহিনীতেও। কখনও শুনেছি পুলিশ অফিসারের অভিজ্ঞতা, কখনও পড়েছি ডিটেকটিভ এজেন্সির নিউজ বুলেটিন, কখনও দিল্লি থেকে প্রকাশিত পুলিশ ম্যাগাজিন। পিনকারটন আর এফ. বি. কেসও আমায় সাহায্য করেছে। এভাবেই উপকরণ এসেছে অজস্র উৎস থেকে—এমনকি মানসিক চিকিৎসালয় থেকেও।

বহু বছর ধরে সংগৃহীত এইসব উপাদানকে মনোরঞ্জনী মণিমালায় গেঁথেছি গল্প কারে—আবির্ভাব ঘটিয়েছি অনেক বিচিত্র চরিত্রের।

এই প্রথম তারা সকলে একত্রে সন্নিবেশিত হচ্ছে। প্রথমে ঠিক ছিল, অসহ্য সাসপেন্স 'অখণ্ড' প্রকাশিত হবে। কিন্তু বইয়ের আকার এত সুবিপুল হয়ে উঠল, পাঠকপাঠিকাদের কথা ভেবে দুখণ্ডে প্রকাশ করা হচ্ছে। অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হবে দ্বিতীয় খণ্ড।

আশা রাখি, রহস্যপিপাসু পাঠকরা খুশি হবেন।

জানুয়ারি ২০০১

অদ্রীশ বর্ধন

বিশিষ্ট আইনজীবী

শেখ মুজিবর রহমানকে

সাসপেন্স! রহস্য! থ্রিলার!

দুঃস্বপ্ন

রায়চৌধুরী-দম্পতির বসবার ঘরটি সত্যিই অপরূপ। রীতিমত বিলাসবহুল উপকরণে সুসজ্জিত। নরম মখমল আঁটা সোফা, আয়নার মত চকচকে পালিশ করা নীচু হালফ্যাশানের চেয়ার, ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত শ্বেত প্রস্তরে খোদিত গ্রীক ভাস্কর্যের রম্য নিদর্শন ঘরের আবহাওয়াকেও যেন বিলাস-সৌরভে সুরভিত করে তুলেছে। দেওয়ালে ঝুলছে বহুমূল্য ভেলভেটের পর্দা, পর্দার ওপর সোনালী সুতোর ফুল-লতা-পাতা। ঘরের মেঝেতে পা ডুবে যাওয়া পুরু গালিচা—বাস্তবিকই এ ভবনের সুন্দরী কর্ত্রী-ঠাকরুনের মনোরঞ্জনে সক্ষম অপরূপ এই কক্ষটি। রূপসী স্ত্রীর সকল খেয়াল এবং চাহিদা মেটাতে কুন্তল রায় চৌধুরী কোনদিন বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি—তাঁর বিপুল সম্পদের শেষ কানাকড়িও বোধ করি এ জন্যে ব্যয় করতে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। আর বাস্তবিকই, মনিকা তাঁর জন্যে যে স্বার্থত্যাগ করেছে তার প্রতিদানে কুন্তল রায়চৌধুরী যে তাঁর জন্যে এতটা করবেন এ তো স্বাভাবিক। ভারতবর্ষের মধ্যে নৃত্যশিল্পে, বিশেষতঃ ভারতনাট্যম-নৃত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন মনিকা দেবী, কয়েকটি জনসম্বর্ধিত চিত্রেও পরিচয় দিয়েছেন তাঁর নিপুণ অভিনয়-দক্ষতায়—সুনাম সুযশের শিখরে তিনি উঠে বসেছিলেন, অর্থ তাঁর চরণে যেত গড়িয়ে—এ সবের মোহ ত্যাগ করে কুন্তল রায়চৌধুরীর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে এলেন তাঁর ঘরে ঘরণী হয়ে। যশোজ্জ্বল জীবনের সবকিছু মনিকা দেবী ছেড়ে এসেছেন—সে সব পূরণ করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেন কুন্তল রায়চৌধুরী। এ জন্যে তিনি তাঁর অর্থকে মনে করেন ধূলিসম। কেউ হয়তো মনে করতে পারেন যে তিনি প্রেমের চেয়ে বড় করে দেখেছিলেন মনিকা দেবীর অনিন্দ্য রূপ আর অগাধ খ্যাতিকে। প্রেমের ফাটল তিনি অর্থের প্রলেপ দিয়ে জুড়ে দেওয়ার প্রয়াস পেতেন। কিন্তু তা যারা ভাবেন, তাঁরা ভ্রান্ত। কেননা, একঘর দর্শকের সামনেও তাঁর অকুণ্ঠ ভালবাসার প্রমাণ দিতে তিনি কোন দিন কুণ্ঠিত হননি।

কিন্তু কক্ষটি বাস্তবিকই অপূর্ব। প্রথম দৃষ্টিতেই কক্ষটিকে দেখে মনে হ'বে যেন শিল্পী চোখে স্বপ্নাঞ্জন লেপন করে ঘরটি সজ্জামণ্ডিত করেছেন। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ আবহাওয়ার সাথে পরিচিত হয়ে ওঠার পর কতকগুলো অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকেই উপলব্ধি করবে। ঘরটি নিস্তব্ধ—অত্যন্ত নিস্তব্ধ। পুরু গালিচার ওপরে কোন পদশব্দ শ্রুত হয় না। ঘরের মৃদু নীলাভ আলোর আবহাওয়া কেমন যেন থমথমে হয়ে উঠেছে। মনিকা রায়চৌধুরী এই কক্ষটিতে প্রতিদিন আসতেন, ঘণ্টা দু'চার থাকতেন—কিন্তু যতক্ষণ থাকতেন তিনি, ততটুকু সময় একাকী মগ্ন হয়ে থাকতেন এই অদ্ভুত নৈঃশব্দ্যে এবং এই রহস্যময় ঘরের চারটি দেওয়ালের মধ্যে মনিকা রায়চৌধুরী হয়ে উঠতেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং রীতিমত বিপজ্জনক মহিলা।

বিপজ্জনক—হ্যাঁ একমাত্র এই শব্দটিই প্রয়োগের উপযুক্ত। কোমল মখমলের ওপর অর্ধশায়িতা তাঁর নিখুঁত অবয়ব দেখে সে সন্দেহ কার মধ্যে উপস্থিত হবে? সুগঠিত কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ চিবুকটি দক্ষিণ হস্তের ওপর ন্যস্ত করে তিনি আড় হয়ে শুয়েছিলেন। তাঁর দীঘল কিন্তু ম্লান দুটি চক্ষু, প্রশংসনীয় কিন্তু অনমনীয় দুটি আঁখির দৃষ্টি সম্মুখে

বিস্তৃত—অটল সঙ্কল্পে স্থির সে দৃষ্টি। অবোধ্য শঙ্কার ছায়াবিজরিত, ভয়াবহ সে দৃষ্টি। অনিন্দ্যসুন্দর তাঁর আননটি—শিশুর মত কমনীয়, কিন্তু তবুও তাঁর ঐ পেলব নমনীয়তার নিচে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এক অনির্বচনীয় অথচ সুনিশ্চিত ভাব প্রকাশ, যে প্রকাশভঙ্গি বলে দিচ্ছে তার অন্তরে ক্রীড়া করছে এখন কুটিল চক্রান্তের দানবীয় উল্লাস। লক্ষ্য করা গেছে, এই বিশেষ ক্ষণটিতে কুকুরেও তাঁর কাছ থেকে এসেছে সরে, কোল থেকে অবুঝ শিশুও নেমে পালিয়েছে নিরাপদ দূরত্বে। যুক্তির অতীত এমন অনেক সহজাত ভাবাবেশ মনুষ্যকুলে আছে যা একেবারেই বুদ্ধির অগম্য।

বিশেষ করে এই অপরাহ্নে তিনি বেশ একটু বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তাঁর হাতে একটি লিপিকা, সেটি তিনি বারংবার পড়েছেন এবং পড়তে পড়তে তাঁর টানা টানা নিখুঁত ভুরু দুটি হয়ে উঠেছে ঈষৎ কুঞ্চিত, সরস ওষ্ঠাধর দুটি হয়ে উঠেছে ঈষৎ কঠিন। অকস্মাৎ তিনি চমকিত চক্ষু তুললেন এবং দেহের চিতা সম ভয়াবহতা শঙ্কার ছায়াপাতে কোমল হয়ে উঠল। হাতের ওপর ভর দিয়ে তিনি উঠে বসলেন, দরজার ওপর স্থির হয়ে রইল তাঁর চক্ষু দুটি। নিবিষ্ট মনে তিনি শুনছিলেন—শুনছিলেন এমন কিছু যা তাঁর মনে জাগ্রত করতো আতঙ্ক। মুহূর্তের জন্য তাঁর ভাবব্যঞ্জক মুখের ওপর খেলে গেল একটুকরো সুমিষ্ট হাসি। তারপরেই ভীত চক্ষে তিনি লিপিকাটি দ্রুতহস্তে ব্লাউজের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন। ব্লাউজ থেকে হাত সরিয়ে নেওয়ার পূর্বেই উন্মুক্ত হয়ে গেল দরজা এবং ক্ষিপ্র চরণে কক্ষে প্রবেশ করলেন একটি সুদর্শন যুবক।

কুন্তল রায়চৌধুরী, তাঁর স্বামী! ইনিই সেই পুরুষ যাঁকে তিনি ভালবেসেছিলেন, ইনিই সেই পুরুষ যাঁর জন্য তিনি ভারতব্যাপী যশের মুকুট নিক্ষেপ করেছেন, ইনিই সেই পুরুষ যিনি আজ তাঁর নবীন এবং অভিনব এক অভিজ্ঞতার একমাত্র প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

কুন্তল রায়চৌধুরীর বয়স প্রায় বছর তিরিশ, দাড়ি গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো, বাহুল্যবর্জিত আঁটসাঁট পোশাক সুগঠিত দেহটিকে জড়িয়ে আছে। হাতদুটি বুকের ওপর ভাঁজ করে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি, অপলক চোখে তাকিয়ে রইলেন তাঁর স্ত্রীর সুন্দর মুখপানে। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে তখনও মনিকা রায়চৌধুরী তাঁর স্বামীর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন। নির্বাক এই দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্যে যেন প্রকাশ পেল ভয়ঙ্কর কিছু সম্ভাবনার। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে দৃষ্টির ভাষা দিয়ে প্রশ্ন করলেন এবং প্রত্যেকেই যেন দৃষ্টির মধ্যে দিয়েই খুঁজে পেলেন তার উত্তর। কুন্তল রায়চৌধুরী যেন জিজ্ঞেস করলেন, এ কী করলে তুমি? প্রত্যুত্তরে মনিকা দেবী যেন উত্তর দিলেন, তুমি জেনেছ কতটুকু? অবশেষে সম্মুখে অগ্রসর হলেন কুন্তল রায়চৌধুরী, স্ত্রীর পাশেই মখমলের কুশনের ওপর বসলেন এবং আলগোছে একটি সুগঠিত কান ধরে স্ত্রীর মুখটি নিজের পানে ফেরালেন।

মনি, আমায় তুমি বিষ দিচ্ছো?

আতঙ্কভরা মুখে এবং প্রতিবাদভরা দৃষ্টি নিয়ে মনিকা রায়চৌধুরী স্বামীর স্পর্শ থেকে ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠলেন। এত দারুণ বিচলিত হয়েছিলেন তিনি যে, কথা বলতে পারছিলেন না—চঞ্চল হাত আর অস্থির অবয়বাদির মধ্যে প্রকাশ পেল তাঁর অন্তরের বিস্ময় আর ক্রোধ। কুন্তল রায়চৌধুরী আবার আর একটি প্রশ্ন করলেন এবং এইবার তাঁর কণ্ঠে প্রকাশ পেল নিবিড় আন্তরিকতা।

কিন্তু কেন?

তুমি পাগল হয়েছো! উন্মাদ! রুদ্ধশ্বাসে বললেন মনিকা।

স্বামীর উত্তর তাঁর রক্ত জমিয়ে দিল, অসহায় নৈঃশব্দ্য নিয়ে তিনি স্বামীর মুখপানে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন—তাঁর বিবর্ণ ওষ্ঠাধর দুটি ঈষদোন্মুক্ত এবং গণ্ডদ্বয় রক্তহীন—পকেট থেকে একটি ছোট্ট বোতল বার করে কুন্তল রায়চৌধুরী স্ত্রীর চোখের সামনে ধরলেন।

তোমার জুয়েল-কেস থেকে পেলাম।

দু'বার মনিকা দেবী কথা বলতে গেলেন, দু'বারই হলেন ব্যর্থ। অবশেষে তাঁর আকুঞ্চিত ওষ্ঠাধরের ফাঁক দিয়ে একটির পর একটি শব্দ এল বেরিয়েঃ

তোমাকে বিষ দিইনি।

আবার কুন্তল রায়চৌধুরীর হাত প্রবিষ্ট হলো পকেটে। একটা কাগজ বার করলেন, ভাঁজ খুললেন এবং স্ত্রীর সামনে ধরলেন।

ডাঃ মিত্রের সার্টিফিকেট। বোতলের তরল পদার্থে বার গ্রেন এ্যান্টিমনি আছে। যে কেমিষ্ট এটা বিক্রী করেছে, সে আমার সাক্ষী হবে।

মনিকা রায়চৌধুরীর মুখটি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। বলবার মত আর কিছুই নেই। মারাত্মক ফাঁদে পড়লে অসহায় হিংস্র প্রাণী যেভাবে তাকায়, তিনিও শুধু সেইভাবে রইলেন তাকিয়ে।

ঠিক আছে? জিজ্ঞেস করলেন কুন্তল রায়চৌধুরী।

কোন উত্তর এলো না, কিন্তু মনিকা দেবীর মুখভাব দেখে মনে হোলো তিনি মরিয়া হয়ে উঠেছেন।

কেন? জিজ্ঞেস করলেন কুন্তল—আমি জানতে চাই, কেন? কথা বলতে বলতে তিনি লক্ষ্য করলেন মনিকার ব্লাউজের ফাঁকে লিপিকার একটা কোণ। চক্ষের নিমেষে তিনি সেটা ছিনিয়ে নিলেন। হতাশভাবে চীৎকার করে মনিকা চেষ্টা করলেন লিপিকাটি ফিরে পেতে, কিন্তু একহাতে কুন্তল সেটি ওপরে তুলে ধরলেন এবং অপর হাতে স্ত্রীকে শক্ত করে ধরে লিপির ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলেন।

সোম! বললেন রুদ্ধশ্বাসেঃ এ যে সোম!

লুপ্ত সাহস আবার ফিরে পেলেন মনিকা দেবী। গোপন করার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তাঁর মুখটি কঠিন এবং দৃঢ় হয়ে উঠলো। শাণিত ছুরিকার মত ধারাল হয়ে উঠলো চক্ষুদুটি।

হ্যাঁ, সোম।

মাই গড! শেষকালে সোম।

উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে দ্রুত পায়চারী করতে লাগলেন কুন্তল। অপরেশ সোম! যে পুরুষটির সারাজীবন স্বার্থত্যাগ, সৎসাহস এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষের উপযুক্ত গুণগরিমায় সমুজ্জ্বল, যে পুরুষটিকে তিনি তার অন্তরের স্বর্ণমণ্ডিত আসনে বসিয়েছেন, সেই অপরেশ সোমও শেষে এই নারীর কবলে পড়েছেন এবং এমন স্থানে উপনীত হয়েছেন যে বন্ধুর সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করতেও তিনি সর্বতোভাবে প্রস্তুত। অবিশ্বাস্য, কিন্তু তবুও ঐ লিপিকার আবেগময় মিনতিপূর্ব ভাষায় তাঁর স্ত্রীকে একটি কপর্দকশূন্য পুরুষের সাথে

পলায়ন করার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। অপরেশ সোম—একদিন যার হাতে কুন্তল রায়চৌধুরী হাত মিলিয়েছেন সখ্যের বন্ধনে, নিবিড়তর করেছেন পরিচয়—সেই সোম আজ লিখেছেন এই লিপিকা! কিন্তু পত্রের প্রতিটি শব্দ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে কুন্তলের মৃত্যু অন্ততঃ সোম মোটেই কল্পনা করছেন না। সমস্যার এ পৈশাচিক সমাধান উদ্ভূত হয়েছে একজনের কুটিল মস্তিষ্ক থেকে, যেখানে শয়তানই একমাত্র তার বাসের উপযুক্ত স্থান বলে মনে করে।

লক্ষ জনের মধ্যেও স্বতন্ত্র ছিলেন কুন্তল রায়চৌধুরী। দার্শনিক, চিন্তাশীল পুরুষ, প্রত্যেকের জন্য তাঁর উদার হৃদয়ে সঞ্চিত থাকতো অপার সহানুভূতি। কিন্তু মুহূর্তের জন্য বিষিয়ে উঠলো তার অন্তর। সেই মুহূর্তটিতে তিনি অপরেশ সোম এবং স্ত্রীকে হত্যা করতে পারতেন এবং কর্তব্যনিষ্ঠ দৃঢ়-সঙ্কল্প পুরুষের মত মৃত্যুর সম্মুখীন হতে দ্বিধাবোধ করতেন না। কিন্তু পায়চারী করতে করতে ইতিমধ্যেই যুক্তিস্নিগ্ধ চিন্তাধারায় স্তিমিত হয়ে এল তাঁর মানসিক উগ্রতা। সোমের অপরাধ কি? তাকে দোষ দেবেন কি করে? এই নারীর মোহলীলা তাঁর অজানা নেই। মোহ-বিস্তার শুধু তার অপরূপ দৈহিক সৌন্দর্যের দ্বারা নয়; পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার কৌতূহল জাগ্রত করার এক অসাধারণ ক্ষমতা এর আছে; পুরুষটির অন্তরতম বিবেককে ইনি খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোলেন এবং তিনি যে তাকে উচ্চাশা আর মহান কর্তব্যের দিকে অনুপ্রাণিত করে নিয়ে যাচ্ছেন, এই জাতীয় ধারণা পুরুষটির মনে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারেন। মনিকা দেবীর মোহপাশের মারাত্মক চাতুর্যই হ'লো ঐখানে। কুন্তলের মনে পড়লো নিজের ক্ষেত্রে কিভাবে এ মোহ তাঁকে বেষ্টন করেছিল। মনিকা দেবী, যতদূর কুন্তলের বিশ্বাস, সে সময় বন্ধনহীনই ছিলেন। তারপর তাঁদের বিবাহ হলো সাঙ্গ। কিন্তু ধরা যাক, তিনি বন্ধনহীন ছিলেন না, ধরা যাক তিনি বিবাহবন্ধনে পূর্ব হতেই ছিলেন আবদ্ধ এবং ধরা যাক ঠিক এই ভাবেই তিনি তার চিত্তকে বন্দী করেছিলেন। এরপর কি তিনি তখন ক্ষান্ত হ'তে পারতেন? পারতেন কি অপূর্ব বাসনা নিয়ে দূরে সরে যেতে? কখনই না। অন্তরের সর্বশক্তি নিয়োগ করেও তিনি তা করতে পারবেন না। তাহ'লে যে বন্ধুটি আজ এই একই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, তার ওপর মনকে তিনি কেন তুলবেন বিষিয়ে? অপরেশ সোমের কথা চিন্তা করে অনুকম্পা আর সহানুভূতিতে তার অন্তর পূর্ণ হয়ে গেল।

আর ঐ নারীটি? পাশেই অর্ধশায়িতা এই সেই মোহিনী, হতভাগ্য সুন্দরী নারী—স্বপ্ন তার চূর্ণ, ষড়যন্ত্র তার উদ্ঘাটিত, ভবিষ্যৎ তার অন্ধকার এবং বিপদসঙ্কুল। আর তবুও যে মহিলাটি তাঁকে বিষ প্রয়োগ করতে প্রস্তুত হয়েছে, তার জন্যেও তাঁর চিত্ত হ'লো আর্দ্র। তিনি ওর জীবনেতিহাসের কিছুটা জানেন। তিনি জানেন, ওর চাতুর্য, ওর সৌন্দর্য বাধা কাকে বলে তা জানে না। আর আজ একজন তার পথের প্রতিবন্ধক হয়েছেন, তাই ও উন্মাদের মত নির্মম ষড়যন্ত্রে সে প্রতিবন্ধক দূর করতে হয়েছে বদ্ধপরিকর। অত্যন্ত প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত রাজবংশে কুন্তল রায়চৌধুরীর জন্ম। সারাটা জীবন তিনি শিক্ষা, কৃষ্টি আর শান্ত পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়েছেন। পক্ষান্তরে মনিকা দেবীর সারা জীবনে উদ্দামতা, আলোকউচ্ছ্বাসের উল্লাসে ভরপুর, প্রকৃতির অমোঘ ধর্মানুযায়ী তারা ক্ষণেকের জন্য পরস্পরের প্রতি আকর্ষিত হয়েছেন, কিন্তু স্থায়ী বাঁধন অসম্ভব। এ বিষয়ে তাঁর

চিন্তা করে দেখা উচিত ছিল, উপলব্ধি করা উচিত ছিল এই পরিণামের। তাঁর শিক্ষিত এবং সংযত মস্তিষ্কের ওপর এখন নির্ভর করছে সকল দায়িত্ব। সমস্যাপীড়িত অসহায় নাবালকদের ওপর যেভাবে মনটি অনুকম্পায় ভরে ওঠে, মনিকা দেবীর পরিণামের কথা ভেবে কুন্তলেরও চিত্ত দ্রবীভূত হয়ে উঠল। এতক্ষণ তিনি নীরবে ঘরের মধ্যে পায়চারী করছিলেন, ওষ্ঠ দৃঢ়বদ্ধ, হস্ত দুটি মুষ্টিবদ্ধ—শেষকালে হাতের তালুতে নখের দাগ গেল বসে। এখন তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে মনিকার পাশে বসলেন এবং মনিকার ঠাণ্ডা নিরাসক্ত হাতটি নিজের ওপর তুলে নিলেন। তাঁর মস্তিস্কে একটি চিন্তা হোলো জাগ্রত। সাহস না দুর্বলতা? প্রশ্নটি তার কানে বেজে উঠলো, চোখের সামনে মূর্তি পরিগ্রহ করলো এবং যেন কল্পনার চোখে দেখতে পেলেন যে জগতের সম্মুখে বড় বড় অক্ষরে সেটি প্রকাশিত হয়েছে।

কঠিন দ্বন্দ্ব, কিন্তু জয়ী হলেন তিনি।

মনিকা, আমাদের দুজনের মধ্যে একজনকে পছন্দ করে নিতে হবে তোমাকে। সোম যদি তোমাকে সুখী করতে পারে, তাহলে আমি সরে যাব।

বিবাহ-বিচ্ছেদ? রুদ্ধশ্বাসে মনিকা বললেন।

বিষের বোতলটি বেষ্টন করে ধরল কুন্তলের হাতটিঃ একেও তুমি ভাবতে পার। বললেন তিনি।

কুন্তলের ওপরে চোখ তুললেন মনিকা দেবী। নতুন এক অদ্ভুত প্রভায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চক্ষুদুটি। এ মানুষটি এতদিন তার কাছে ছিল অপরিচিত। সেখানে সংযত, বাস্তবধর্মী, দৃঢ়চিত্ত কুন্তল রায়চৌধুরী অদৃশ্য হয়ে গেছেন। তার স্থলে তিনি যেন দেখতে পেলেন মহাবীর এক শহীদকে, যিনি স্বার্থলেশশূন্য চিত্তধর্মের অমানবিক উচ্চতায় উন্নীত। তীব্র কালকূটের বোতলটি তিনি দুহাতে চেপে ধরলেন।

আমাকে ক্ষমা করো তুমি!

মৃদু হাসলেন কুন্তল ঃ এখনো সেই ছোট্ট খুকিটিই আছ দেখছি।

দু'হাত কুন্তলের দিকে বিস্তার করলেন মনিকা। ঠিক সেই সময়ে দরজায় টোকার শব্দ শোনা গেল এবং ঘরে প্রবেশ করলো একটি পরিচারিকা। এই রহস্যময় কক্ষে যেভাবে প্রত্যেকে করে চলাফেরা, ঠিক সেই রকম অদ্ভুত নিঃশব্দে সে প্রবেশ করল। ট্রের ওপর একটি কার্ড। মনিকা সে দিকে এক লহমা তাকালেন।

অপরেশ সোম! আমি দেখা করবো না।

লাফিয়ে উঠলেন কুন্তল ঃ

অভ্যর্থনা করে নিয়ে এসো। এই মুহূর্তে।

কয়েক মিনিট পরে দীর্ঘ, উন্নতনাসা, প্রশস্ত ললাট একজন যুবাপুরুষ ঘরে প্রবেশ করলেন। স্মিত বদনে প্রফুল্ল ভঙ্গিতে তিনি ঘরে ঢুকলেন। কিন্তু যখন দরজা তার পেছনে হোলো রুদ্ধ এবং সম্মুখের মুখ ক'টির ওপর পরিস্ফুট হ'লো স্বাভাবিক ভাবপ্রকাশ, তখন ধীরে ধীরে তাঁর মুখ থেকে মিলিয়ে গেল হাসির শেষ রেশটুকুও। দু'জনের মুখ পর্যায়ক্রমে দেখে নিলেন। বললেন, মতলব কী?

কুন্তল এবং তাঁর কাঁধের ওপর একটি হাত রাখলেন।

বদ মতলব অন্তত নয়—কুন্তলের জবাব।

বদ মতলব?

আমি সব জানি। কিন্তু আমাদের অবস্থা পাল্‌টাপাল্‌টিভাবে হয়ে গেলে আমিও তাই করতাম।

এক পা পিছিয়ে গেলেন সোম এবং প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে মনিকার দিকে তাকালেন। মনিকা মাথা হেলিয়ে সায় দিলেন, তারপর মনোরম গ্রীবাটি পুনরায় সোজা করলেন।

মৃদু হাসলেন কুন্তলঃ

স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য ফাঁদ পেতেছি বলে শঙ্কার কোন কারণ তোমার নেই। এ বিষয়ে আমাদের খোলাখুলি কথা হয়ে গেছে। শোন অপরেশ, চিরকাল তুমি স্পোর্টস্‌ম্যান। এখানে এই বোতলটা দেখ। কিভাবে এটা এল এখানে, তা নিয়ে চিন্তা করো না। যদি আমাদের মধ্যে একজন এটা পান করে তাহ'লেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মনি, এবার বেছে নাও।

রহস্যময় ঘরটিতে সক্রিয় হয়েছিল আরও একটি রহস্যঘন শক্তি। কক্ষের মধ্যে উপস্থিত ছিল চতুর্থ একটি পুরুষ। যদিও জীবন-নাটকের সঙ্কটম মুহূর্তে তিনটি প্রাণী তার সম্বন্ধে মোটেই চিন্তা করে নি, করবার অবসরও ছিল না। কতক্ষণ ধরে সে সেখানে আছে, কতটুকু সে শুনেছে, কেউ বলতে পারে না। তিনটি প্রাণীর ক্ষুদ্র দল হ'তে বেশ খানিকটা দূরে দেওয়াল-গাত্রে সে গুঁড়ি মেরে বসেছিল। ভয়াবহ সর্পাকৃতি তার গঠন, নীরব এবং দক্ষিণ হস্তের ঈষৎ স্পন্দন ব্যতীত সর্বদেহ-স্থির। একটি চতুষ্কোণাকৃতি বস্তুর অন্তরাল থেকে সে রয়েছে দৃষ্টির অগোচরে এবং একটি কৃষ্ণবস্ত্র এমনভাবে বস্তুটিকে আচ্ছাদিত করেছে যে তারও অবয়বাদি লক্ষ্য করা যায় না। নিবিষ্ট মনে নাটকের প্রতিটি আবেগময় মুহূর্ত সে গভীর আগ্রহে লক্ষ্য করছে, তার মধ্যস্থতা করার সময় প্রায় আসন্ন। কিন্তু অপর প্রাণীত্রয় তার বিষয়ে চিন্তা করলো খুবই অল্প। নিজেদের অভিনীত উদ্বেগ আর শিহরণময় নাটকে তারা এমন গভীরভাবে মগ্ন যে, চক্ষু এড়িয়ে গেল তাদের চেয়েও অধিকতর সক্রিয় একটি শক্তির, যে শক্তি যে কোন মুহূর্তে দৃশ্যের পরিচালনা-ভার তুলে নিতে পারে স্বহস্তে।

প্রস্তাবে প্রস্তুত, অপরেশ? কুন্তল প্রশ্ন করলেন।

দীর্ঘ পুরুষটি মাথা হেলিয়ে সায় দিলেন।

না! না! চীৎকার করে উঠলেন মনিকা।

ছিপি খুলে ফেললেন কুন্তল। পাশের টেবিল থেকে এক প্যাকেট তাস তুলে নিলেন। কার্ড এবং বোতল রইল পাশাপাশি।

মনিকার ওপর আমরা দায়ীত্বটুকু ছেড়ে দিতে পারি না। বললেন তিনি ঃ এস অপরেশ, তিনের মধ্যে একটি বেছে নাও।

অপরেশ টেবিল অভিমুখে অগ্রসর হ'লেন। অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিলেন মৃত্যু-নির্দেশী তাসগুলি। স্ত্রীলোকটি হাতের ওপর ভর দিয়ে সম্মুখে ঝুঁকে পড়লেন এবং উদভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে রইলেন তাকিয়ে।

আর ঠিক এই সময়ে যেন বজ্রপাত হ'লো। আগন্তুক উঠে দাঁড়িয়েছে। বিবর্ণ এবং

গম্ভীর সে।

আচম্বিতে তিনজনেই তার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন। প্রত্যেকে তার দিকে ফেরালেন মুখ। চোখে তাঁদের ব্যগ্র অনুসন্ধিৎসা। আগন্তুক শান্ত, বিষণ্ণভাবে তাঁদের দিকে তাকাল। কর্তৃত্বব্যঞ্জক তার আকৃতি।

একি হ'লো? একসাথে প্রত্যেক শুধোলেন।

রাবিশ! উত্তর দিলে সে রাবিশ! সমস্ত রীলটা আবার আমাদের আগামীকাল তুলতে হ'বে! □

* 'রহস্য-পত্রিকা'য় প্রকাশিত। বৈশাখ ১৩৬৩।

কাঞ্চনপুর-রহস্য

হত্যা সম্বন্ধে সাধারণের আগ্রহ প্রায়ই দেখা যায় ভ্রমাত্মক অথবা আমার মতে, ভ্রান্তির সম্ভাবনা বিশিষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ সেই সামন্ত ঘটিত কাহিনীটাই ধরা যাক। সতের বছর আগে ঘটনাটা ঘটেছিল এবং এখনও সে ঘটনা প্রত্যেকের কাছে যেন গতদিনের স্মৃতি—এখনও জনসাধারণ সে কাহিনী নিয়ে গভীর আগ্রহে আলোচনা করে। তবুও যে কোন দিক দিয়ে বিচার করাই যাক না কেন, কোন মতেই এটাকে প্রথম শ্রেণীর হত্যাপর্যায়ে ফেলা যায় না। ব্যাপারটা ঘটেছিল এই রকম ঃ

ইণ্ডিয়ান কেমিক্যালস্ কোম্পানির স্বত্ত্বাধিকারী মিঃ কে. ডি. সামন্ত জীবন-সঙ্গিনীরূপে পেয়েছিলেন একজন অতি খিটখিটে এবং বদমেজাজী মহিলাকে। কাজেই তাঁর অন্তরের যে গভীর অনুরাগ স্ত্রীর প্রাপ্য ছিল—সেই অনুরাগের সবটুকুই দিলেন তাঁর সুন্দরী টাইপিস্ট মিস সান্যালকে। আর তারপর তিনি মিসেস সামন্তকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করলেন এবং দেহটিকে খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে কয়লার গাদার নিচে সমাধিস্ত করলেন। প্রাথমিক হলেও এই অবধি ব্যাপারটা করলেন তিনি সুন্দরভাবে; আর এরপর যদি মূর্খ মিস্টার সামন্ত আর কুটোটি না নেড়ে চুপচাপ থাকতেন, তাহলে সুখেই সারা জীবনটা কাটিয়ে ইহলোক ত্যাগ করতেন। কিন্তু কিসের তাগিদে জানি না নির্বোধের মত তিনি বাড়ি থেকে উধাও হলেন—প্রেমিকার সঙ্গে ছদ্মবেশে সাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপ যাত্রা করলেন। এই কাজটি যদি তিনি না করতেন, তাহলে আমি বিনা দ্বিধায় এই হত্যাটিকে অতুলনীয় আখ্যা দিতে বিলম্ব করতাম না। পরিণামে কি হ'ল? বেতারের সুযোগ নিয়ে ভারতীয় পুলিশ তাঁকে জাহাজেই গ্রেপ্তার করলে। এই হত্যা-ঘটিত বিষয়ে এইটুকুই হ'ল সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক—কিন্তু জনসাধারণ এখনও পর্যন্ত এই অপ্রাসঙ্গিকটুকু নিয়েই করছে মাতামাতি। একজন বিখ্যাত চিত্রসমালোচক যখন কোন চিত্র সম্বন্ধে একটি প্রথম শ্রেণীর সমালোচনা করেন, তখন অল্পজনেই তা পড়ে। কিন্তু যেই কোন সবজান্তা সংবাদদাতা খবর দেয় যে চিত্রশিল্পী ক্যানভাস সাজানোর সময়ে সেক্সপীয়ারের সনেট আবৃত্তি করতে থাকেন অথবা একাহারী হয়ে এই সব বিখ্যাত চিত্র সৃষ্টি করেন—তখনই সমস্ত জগৎ একবাক্যে স্বীকার করে যে, তিনি বড় দরের শিল্পীই বটে।

যা অপ্রয়োজনীয়, তা আর কিছু করতে না পারলেও অকৃত্রিম সত্যটুকুকে চিরকালই

অস্পষ্ট ক'রে তোলে। জনতা যদি মিথ্যার পেছনে ধাওয়া করে, তাহলে সত্য তো অবহেলিত হবেই। সুতরাং বুদ্ধিভ্রষ্ট মিঃ সামন্তর জটিল কার্যকলাপ যখন সংবাদপত্র প্রায় ভরিয়ে রেখে দিয়েছে, সেই সময়ে অত্যাশ্চর্য আলিপুর-হত্যা-রহস্যকে স্থান দেওয়া হ'ল কাগজে চক্ষুর অগোচরে ক্ষুদ্র এক কোণে। বাস্তবিকই, খুঁটিনাটি তথ্যগুলি থেকে এমন ভাবে আমাদের বঞ্চিত করা হয়েছিল যে, এই স্মৃতিতে তা গেঁথে নেই; ঘটনাটা প্রায় এই ঃ আলিপুরের ছোটখাটো একটি ফ্ল্যাটের দোতলায় একজন যুবক একটি অভিনেত্রীর সঙ্গে কথা বলছে; অভিনেত্রীর বয়সের সীমারেখা, যতদূর আমার মনে পড়ছে, তিরিশ কি চল্লিশের মধ্যে হবে—এবং বিগতযৌবনা হওয়ার পরিণামস্বরূপ চিত্রজগতেও খ্যাতি বিলীন হয়েছে অনেকদিন। কথাবতর্তার মাঝখানে আচম্বিতে শোনা গেল একটা ফায়ারিংয়ের শব্দ—খুব কাছ থেকেই। যুবকটি ফ্ল্যাট থেকে ছিটকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল এবং বাড়ির সদর দরজায় দেখতে পেল একটি মৃত পুরুষকে—তার আপন পিতা—গুলি তাঁর বক্ষে বিদ্ধ হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, পিতাও এক সময়ে অভিনেতা ছিলেন এবং ওপরতলার অভিনেত্রীটি তাঁর পুরোন বান্ধবী। কিন্তু তারপরেই আসছে হত্যার অভিনব এবং আশ্চর্য অংশটুকু। মৃতের পাশে অথবা মৃতের হাতে কিংবা মৃতের কোটের পকেটে—আমার ঠিক মনে পড়ছে না কোনখানে—ভারি তারের তৈরি একটা অস্ত্র পাওয়া গেল—জঘন্য এবং অত্যন্ত সাংঘাতিক এক মারণাস্ত্র,—নিখুঁত নৈপুণ্যে অতি অদ্ভুত ভাবে গঠন করা হয়েছে সেই বিচিত্র অস্ত্রটি। তখন রাত্রি, কিন্তু প্রতিপদের শুভ্র চন্দ্রকিরণে চতুর্দিক আলোকিত। যুবকটি বললে, একজনকে সে দৌড়ে গিয়ে পাঁচিল টপকে পালাতে দেখেছে।

কিন্তু লক্ষ্য করুন পয়েন্টটি ঃ মৃত অভিনেতা তাঁরই পুরোন বান্ধবীর ফ্ল্যাটের নিচে লুকিয়ে ছিলেন, অন্তরালে থেকে অপেক্ষা করছিলেন, হাতে ছিল তাঁর সেই নির্মম অস্ত্রটি। তিনি কোন শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার প্রত্যাশায় ছিলেন। যাকে খুন করবার অভিপ্রায় না থাকলেও যার মারাত্মক অনিষ্টের অভিপ্রায় নিয়ে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

কে সেই শত্রু? মৃত ব্যক্তির বর্বর ও সুচিন্তিত অভিপ্রায়ের চেয়েও দ্রুতগামী ঐ বুলেটটি কার দ্বারা নিক্ষিপ্ত?

খুব সম্ভব আমরা কোনদিন তা জানতে পারব না, যে হত্যা প্রথম শ্রেণীর পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার উপযুক্ত ছিল, যে হত্যা বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার দিক দিয়ে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করতে পারত, সেই হত্যাই বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে যেতে বাধ্য হ'ল—মূর্খ জনতা ততধিক মূর্খ সামন্ত আর তার প্রেমিকাকে নিয়ে সৃষ্টি করলে বছরব্যাপী আলোচনার।

স্বভাবতই এই ধরনের অবহেলার জন্য যুদ্ধ অনেকাংশে দায়ী। সেই আতঙ্কভরা দিনগুলিতে মানুষের মাথায় শুধু একটি চিন্তাই জাগ্রত ছিল—বাদবাকি সব হয়েছিল উপেক্ষিত। সুতরাং ঢাকুরিয়া লেকে যত্ন ক'রে বস্তায় জড়ানো মৃত মহিলাটির বিকৃত দেহটির ওপর খুব অল্পই মনোযোগ দেওয়া হ'ল এবং বেশি বাগাড়ম্বর না ক'রে একটি লোককে ফাঁসীতে দেওয়া হ'ল ঝুলিয়ে। এ কেসে দু'একটি চিত্তাকর্ষক পয়েন্ট প্রত্যেকেরই দৃষ্টি গেল এড়িয়ে।

আর, তারপর শোনা গেল ভবানীপুরে এক আশ্চর্য হত্যা-কাহিনী। একটি সম্ভ্রান্ত পরিবার একটা বড় বাড়িতে নতুন ভাড়া এলেন। তখনও তাঁদের সমস্ত মালপত্র খোলা হয় নি—একরাত্রে গৃহকর্তাকে কে খুন ক'রে কয়েকটি জিনিস নিয়ে সরে পড়ল। লুণ্ঠন-সামগ্রীর

মধ্যে ছিল কি? একজোড়া বুট জুতো, খুব জোর, পনের টাকার বেশি দাম হওয়া উচিত না। আর একটি ঘড়ি—সেটার দামও পঁচিশ টাকার ওদিকে নয়। এক্ষেত্রেও হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার ক'রে বিনাবাক্যব্যয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল। আর বলতে বাধ্য হচ্ছি, তার গতিবিধির যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা ছিল। কিন্তু যুদ্ধপূর্ব অথবা যুদ্ধকালীন যাবতীয় কেসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ যে কেসটি লোকচক্ষুর অন্তরালে হারিয়ে গেছিল, সেটি হ'ল কাঞ্চনপুর-রহস্য। অশ্রুতপূর্ব এই কাহিনী শোনাবার আগে প্রথমেই আমি কাহিনীর ঘটনাস্থান ও পাত্রপাত্রীর নাম পরিবর্তনের অবাধ অনুমতি পাঠকের কাছ থেকে চেয়ে রাখছি। কারণ, এই কাহিনী সম্পর্কিত ব্যক্তিরা কোথায় বর্তমান আছেন, তা জানি না, জীবিত কি মৃত, তাও জানি না। সুতরাং পূর্ব থেকেই সাবধানতা অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত মনে ক'রে এইটুকু অধিকার আমি চেয়ে নিলাম। সংবাদপত্রে যখন এই কাহিনীর ছোট্ট একটি শিরোনামা প্রকাশিত হ'ল, তখন অতি ব্যস্ত জগতের নজরই পড়ল না সেদিকে। সংবাদপত্র মারফৎ উজবেক শিল্পীদের নৃত্যকলা প্রদর্শন বা নিখিল ভারত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মিলন বা ঐ জাতীয় কিছু বৈচিত্র্যময় সংবাদ পরিবেশিত হ'ত কিনা মনে নেই, হলেও জনগণ তখন সে সংবাদ রাখার চেয়ে ট্যাঙ্কা, ভি-টু অথবা প্যারাসুট বাহিনীর খবরটাই জেনে রাখা উচিত বলে মনে করত।

কাঞ্চনপুরের রহস্যের সূত্রপাত হয় এইভাবে। প্রথমেই ধরে নেওয়া যাক যে কলকাতা শহরের উপকণ্ঠে অতি মনোহর ক্ষুদ্র একটি কলোনি আছে—মনে করা যাক্, সেই সুসজ্জিত কলোনিটার নাম কাঞ্চনপুর। ক্ষুদ্র হলেও প্রয়োজনীয় কিছুরই অভাব সেখানে রাখা হয় নি। থানা বাজার, পোস্টাফিস ইত্যাদি যাবতীয় সুবিধাই সেখানে সহজ লভ্য। শহরের উপকণ্ঠে থাকায় যাতায়াতেও কোন অসুবিধা নেই—ট্রাম, বাস এবং ট্রেন, এই ত্রিবিধ যানই যাতায়াতের পথকে সুগম ক'রে তুলেছে। এ হেন কাঞ্চনপুরে চৌরাস্তা থেকে স্টেশনের বিপরীত দিকের পথটায় মিনিট তিনেক হেঁটে গেলে লাল পয়েণ্টিং করা যে দোতলা বাড়িটা দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে বাস করতে জগদীশ সরকার এবং তাঁর স্ত্রী। প্রাচীন দুর্গ-ফটকের মত লোহার বড় বড় কীলক মারা সদর দরজার ওপরেই একটা চকচকে তামার প্লেটে লেখা আছে, 'TAXIDERMIST : SKELETONS ARTICULATED' মৃত জন্তুজানোয়ারের চামড়া আবিকৃত রেখে ভেতরে শুষ্ক জিনিস ঠেসে কৃত্রিম জীবন্ত-দর্শন জানোয়ার তৈরির আর্টকেই Taxidermy বলে। এর বাংলা প্রতিশব্দ আমার জানা নেই। জগদীশ সরকার শুধু যে এই শিল্পতেই দক্ষ ছিলেন তা নয়, তিনি বিচ্ছিন্ন অস্থি জোড়া লাগিয়ে কঙ্কাল নির্মাণেও সমান পারদর্শী ছিলেন। তাঁর বাড়ির পেছনে ছিল ছোট্ট একফালি বাগান—এই বাগানের একপ্রান্তে জগদীশ সরকার নির্মাণ করেছিলেন ছোট্ট কারখানাটি—তাঁর যন্ত্রপাতি থাকত এইখানেই। নিভৃতে প্রতিবেশীদের সাদা-অনুসন্ধিৎসু চক্ষুর অন্তরালে তিনি তাঁর শিল্প নিয়েই দিনের পর দিন যেতেন কাটিয়ে।

যতদূর জানা গেছে, এই অস্থি সংযোজনকারী ট্যাক্সিডারমিস্ট ভদ্রলোকটি নিতান্ত নিরীহ এবং নম্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন। প্রতিবেশীরা এই ছোট খাট মানুষটিকে পছন্দ করতেন। পাশের বাড়ির সরকারী চাকুরে অময়বাবু, মোড়ের স্টেশনারি দোকানের স্বত্ত্বাধিকারী হরিহরবাবু এবং আরও দু'জন ভদ্রলোক সুখেন্দু দাস আর রবিপ্রসাদ মুখার্জি—এঁরা সবাই

জগদীশ সরকারের বৈঠকখানায় বহু বিকাল দাবা খেলে, চা পান ক'রে এবং গল্প ক'রে কাটিয়ে গেছেন। যুদ্ধপূর্ব শান্তির দিনে বহুবার এই ক'জন নিরীহ ভদ্রলোক ইডেন গার্ডেনে বেরিয়েছেন এবং গঙ্গার ঘাটে সূর্যাস্ত দেখেছেন।

তাঁদের কেউই খুব বেশি কথা বলতে ভালবাসেন না এবং একমাত্র বিকাল ছাড়া কখনই একত্রে বাজে সময় নষ্ট করা পছন্দ করতেন না। বৈঠকখানায় তাঁরা নীরবে বসে দাবা খেলতেন, দু'একটি কথা বলতেন আর না হয় শান্ত দৃষ্টি মেলে দেওয়ালে প্রলম্বিত সোনালীফ্রেমে বাঁধান রবীন্দ্রনাথের ছবিটা দেখতেন। অথবা বড় টেবিলটার ওপর রক্ষিত দুটি লালাভ প্রায়-জীবন্ত কুকুরের মধ্যস্থিত অদ্ভুত দর্শন ঘড়ির দোদুল্যমান পেণ্ডুলামটি নির্নিমেষ চোখে লক্ষ্য করতেন। জগদীশবাবু এই শান্ত পরিবেশের কেন্দ্রস্থল ছিলেন—তাঁর স্মিত বদন এবং সৌম্যমূর্তি দিয়ে এই ক'জনের মনকে তিনি একেবারেই জয় ক'রে নিয়েছিলেন। জগদীশবাবুর স্ত্রী ছিলেন যেমন কটুভাষিণী, তেমনই তীব্র-স্বভাবা। এই শান্তি-চক্রের পাঁচজন সভ্যই তাঁকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন। প্রতিবেশিনীরাও জগদীশ-গিন্নী সম্বন্ধে ছিলেন শঙ্কিত। নির্বিরোধী জগদীশবাবুর জীবন তিনি বিষিয়ে তুলেছিলেন। লৌহ-কীলক মারা মজবুত দরজা ভেদ করেও তীক্ষ্ণ বামা-কণ্ঠ প্রতিবেশীদের সচকিত ক'রে তুলত—একবার শুরু হলে যে পর্যন্ত না দম ফুরিয়ে আসত, জগদীশবাবুর প্রতি কণ্ঠনিঃসৃত সেই বিষোদগার আর থামতে চাইত না; আর বেচারি জগদীশবাবু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাইরে বেরিয়ে আসতেন—কেননা রসনার চেয়েও কার্যকরী আরও কিছুর আশঙ্কা তিনি করতেন।

কুখ্যাত এই মহিলাটি ছিলেন শ্যামবর্ণা, মধ্যমাকৃতি, কুঞ্চিতকেশী। নিমফুল খেলে মুখের ভাব যেরকম হয়, তাঁর মুখে সর্বদাই সেই ভাব থাকত ফুটে। তিনি হাঁটতেন দ্রুতগতিতে, কিন্তু বেশ একটু খুঁড়িয়ে। তাঁর অন্তরের তেজ ছিল প্রচুর—প্রতিবেশীদের কাছে তিনি ছিলেন একটি মূর্তিমান উৎপাত আর হতভাগ্য জগদীশবাবুর কাছে তিনি ছিলেন উৎপাতের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

রণ-দামামা বেজে ওঠার পর ইডেন গার্ডেনে ও গঙ্গার ধারে এই ক'জন শান্ত-পরিবেশ-প্রিয় ভদ্রলোকের বৈকালিক ভ্রমণটা প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হ'ল এবং তাঁদের নিবিড় স্বাচ্ছন্দ্যানুভূতিরও ব্যাঘাত ঘটল প্রচুর। তা সত্ত্বেও এই শান্তি-চক্রের বৈকালিক অধিবেশন পুরোপুরি ভাবে স্থগিত রইল না এবং এক সন্ধ্যায় জগদীশবাবু ঘোষণা করলেন যে তাঁর স্ত্রী এলাহাবাদে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন এবং খুব সম্ভবত বেশ কিছু সময়ের জন্য আর ফিরবেন না।

'ওখানেও হাওয়া পরিবর্তনের জন্য খুব বেশি লোক না গেলেও,' অময়বাবু বললেন, 'আমার একবার যথেষ্টে উপকার হয়েছিল।'

অপর কয়েকজন কিছু বললেন না। কিন্তু অন্তরের সঙ্গে জগদীশবাবু জানালেন অভিনন্দন। তাঁদের মধ্যে একজন পরে মন্তব্য করেছিলেন যে জগদীশবাবুর স্ত্রীর পক্ষে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হচ্ছে বৈতরণীর ওপারে এবং সকলেই তাতে একমত হয়েছিলেন। তখন তাঁরা কেউই জানতেন না যে প্রস্তাবিত চিকিৎসার সকল সুবিধাই সে সময় জগদীশ-গিন্নী উপভোগ করছিলেন।

যতদূর মনে পড়ছে, জগদীশ-গিন্নীর এক ভগ্নী, অন্নপূর্ণা মিত্রের আবির্ভাবের পর থেকেই জগদীশবাবু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এই মহিলাটি ছিলেন তাঁর ভগ্নীর মত প্রায় একই রকম বদ্‌মেজাজী এবং সন্দিগ্ধমনা। একটি অভিজাত পরিবারের নার্স হয়ে কয়েক বছর তিনি ব্রহ্মদেশে বাস করছিলেন। তারপর পরিবারটি কলকাতায় ফিরে এলে, তিনিও সেই সাথে কলকাতায় চলে এলেন। প্রথমে এই মহিলাটি তাঁর ভগ্নিকে খান দু'তিন চিঠি লিখেছিলেন, কোন উত্তর পান নি। এইখানেই তাঁর কি রকম খটকা লাগল, কেননা জগদীশ-গিন্নী পত্র-লেখিকা হিসাবে বড় নিয়মিত ছিলেন এবং প্রতি পত্রই তাঁর স্বামী সম্বন্ধে 'নোংরা কথা'য় পরিপূর্ণ থাকত। সুতরাং কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পরের সন্ধ্যাতেই অন্নপূর্ণা মিত্র সশরীরে এসে হাজির হলেন বোনের মুখে প্রকৃত সত্যটুকু জানতে। জগদীশবাবু চিঠিগুলো যে সরিয়ে ফেলেছেন, এ বিষয়ে তাঁর আর কোন সন্দেহই ছিল না। প্রায়ই বিড় বিড় ক'রে তাঁকে বলতে শোনা যেত, 'হতভাগা জানোয়ার; মজা আমি দেখাব তোমায়!' আর তাই কাঞ্চনপুরে এসে হাজির হলেন অন্নপূর্ণা মিত্র—এসেই কারখানা থেকে টেনে বের কলেন জগদীশবাবুকে। মহিলাটিকে দেখবামাত্র বেজায় দমে গেলেন জগদীশবাবু। চিঠিগুলো তিনি পড়েছিলেন। কিন্তু কলকাতায় ফিরে আসাটা এমন আকস্মিক যে আগে থেকে খবর না পাওয়ায় তিনি প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারেন নি। যাই হোক, মিস্ মিত্র এ সম্বন্ধে একটি কথাও বললেন না। জগদীশবাবু ভেবেছিলেন, তাঁর স্ত্রীর এই বোনটি অন্তত আরও দশ-কুড়ি বছর সুদূর ব্রহ্মদেশে বাস করতে থাকবেন—ইতিমধ্যে নাম পরিবর্তন ক'রে বছর খানেকের মধ্যে তিনিও সরে পড়বেন। আর তাই আচম্বিত মিস্ মিত্রকে সামনে দেখে তিনি গেলেন দারুণ দমে।

অন্নপূর্ণা মিত্র সোজা কাজের কথা পাড়লেন।

'কমলা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'ওপর তলায়? ঘণ্টা বাজনোর পর, দরজায় কড়া নাড়ার পর—তার তো নেমে আসা উচিত ছিল।'

'না।' জগদীশবাবু বললেন। তাঁর গোপন-রহস্য নিয়ে তিনি যে গোলকধাঁধাঁর সৃষ্টি করছেন, তার কথা চিন্তা ক'রে তিনি স্বস্তি বোধ করলেন; এই গোলকধাঁধাঁর ঠিক কেন্দ্রস্থলে তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ! 'না, সে ওপরতলায় নেই সে বাড়ি নেই।'

'ও' তাই নাকি? বাড়িতে নেই? তাহলে নিশ্চয় কোন বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে গেছে? কখন ফিরবে বলে মনে হয় আপনার?'

'সত্য কথা বলতে কি অন্নপূর্ণা, সে আর ফিরবে বলে আমি আশা করি না। আমাকে সে ছেড়ে গেছে—তিন মাস আগে সে চলে গেছে।'

'এই কথা আমায় বলতে চান আপনি! আপনাকে ছেড়ে গেছে! তার সঙ্গে কী ব্যবহারটা তাহলে করেছিলেন? কোথায় গেছে সে?'

'বিশ্বাস কর অন্নপূর্ণা, আমি জানি না। একদিন সন্ধ্যায় আমাদের মধ্যে একটু ঝগড়া-ঝগড়ি হ'ল, কিন্তু তা নিয়ে আমি বেশি কিছু ভাবি নি। কিন্তু সে বললে যে যথেষ্ট হয়েছে, বলে কয়েকটি জিনিস গোছ-গাছ ক'রে ব্যাগে পুরে বেরিয়ে গেল। আমি পিছু পিছু অনেকটা ছুটে গেলাম, বার বার মিনতি ক'রে বললাম ফিরে আসতে—কিন্তু সে একবারও ঘাড় ফিরিয়ে তাকালে না—সোজা স্টেশনের দিকে চলে গেল। আর সেই

দিন থেকে তাকে আর দেখিও নি, তার কথাও শুনি নি। আর যত চিঠি এসেছে, সব আমি পোস্ট-অফিসে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছি।'

ভগ্নীপতির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন অন্নপূর্ণা মিত্র। দোষটা কার, কমলার না জগদীশবাবুর—এই নিয়ে কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, সবশেষে ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে। আর জগদীশবাবু ফিরে গেলেন কারখানায়। কয়েকটি ময়ূর ঠাসা বাকি ছিল, সেইগুলো সেরে ফেলতে! আবার তিনি সুস্থ বোধ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণের জন্য তার বুকের স্পন্দন কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছিল—আশঙ্কা করেছিলেন তাঁর গোলকধাঁধাঁর রহস্য বুঝি গেল ফাঁস হয়ে। কিন্তু তারপরে আবার ফিরে এল তাঁর চিত্তের শান্তি।

এর পর সব কিছু মোটামুটি মানিয়ে যেত, যদি না চৌমাথার কাছে অন্নপূর্ণা মিত্রের সঙ্গে রেবা রায়ের মুখোমুখি সাক্ষাৎ হ'ত। রেবা রায় সরকারী চাকুরে অময়বাবুর স্ত্রী। ইতিপূর্বে জগদীশবাবুর বাড়িতে দু'জনের আলাপ হয়েছিল—কাজেই দেখামাত্র দুজনেই দুজনকে চিনতে পারলেন। কয়েকটি বাজে কথার পর মিস্ মিত্রকে রেবা রায় জিজ্ঞেস করলেন যে কলকাতায় ফেরবার পর ইতিমধ্যে তাঁর বোনের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেছেন কিনা।

'সে যে কোথায় তাই যখন জানি না, তখন কী ক'রে আমার সঙ্গে তার দেখা হতে পারে?' বেশ কিছুটা উষ্মা প্রকাশ ক'রে মিস্ মিত্র উত্তর দিলেন।

'কী মুস্কিল, আপনি তাহলে জগদীশবাবুর সঙ্গে দেখা করেন নি?'

'এই মুহূর্তে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে আসছি।'

'কিন্তু তিনি তাহলে নিশ্চয় এলাহাবাদের ঠিকানাটা ভুলে যেতে পারেন না?'

আর এইভাবে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গড়িয়ে গেল কথাবার্তার গতি এবং মিস্ মিত্র পরিষ্কার জানতে পারলেন যে জগদীশবাবু তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বলেছেন যে তাঁর স্ত্রী অনেক দিনের জন্য এলাহাবাদে আত্মীয়-স্বজনের কাছে বেড়াতে গেছেন। প্রথমত মিত্র-ভগ্নীদ্বয়ের কোন আত্মীয়ই এলাহাবাদে থাকত না—তাঁদের আদিবাস ছিল ময়মনসিংহে, আর দ্বিতীয়ত, জগদীশবাবু তাঁকে বলেছেন, কমলা ক্রুদ্ধ হয়ে বাড়ি ছেড়ে কোথায় বেরিয়ে গেছেন তা তিনি জানেন না। প্রথমে মিস্ মিত্র ভাবলেন এখুনি ফিরে গিয়ে ভগ্নীপতিকে এক হাত নেবেন—তারপর তিনি মত পরিবর্তন করলেন। দেরি হয়ে যাচ্ছিল, কাজেই তৎক্ষণাৎ আর দেখা না ক'রে তিনি কলকাতাতেই ফিরে গেলেন,—সারাপথে কি ভাবে জগদীশবাবুকে শায়েস্তা করবেন, সেই কথাই লাগলেন ভাবতে।

পরের হপ্তায় আবার তিনি আবির্ভূতা হলেন কাঞ্চনপুরে। কাঁচা মিথ্যা কথনের অপরাধে তিনি জগদীশবাবুকে অভিযুক্ত করলেন—তাঁর সামনে ধরে দিলেন দুটি বিভিন্ন কাহিনী। আর, আবার আগের মত জগদীশবাবুর বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। ভয়ানক আতঙ্কে হাত-পা প্রায় অবশ হয়ে আসার উপক্রম হ'ল। কিন্তু তাঁর সংযম নিতান্ত অল্প ছিল না।

'সত্যিই', তিনি বললেন, 'আমি তোমায় কোন মিথ্যেই বলি নি অন্নপূর্ণা। ঠিক যা ঘটেছে তোমায় বলেছি। কিন্তু এখানকার লোকদের জন্যে এলাহাবাদের ঐ কাল্পনিক গল্পটা

আমায় রানাতে হয়েছিল। এ বিষয় নিয়ে প্রত্যেকে আলোচনা করুক, এ ইচ্ছা আমার ছিল না—বিশেষ ক'রে কমলার ফিরে আসার সম্ভাবনা যখন রয়েছে—আমার তো মনে হয় আর কিছুদিনের মধ্যেই সে ফিরে আসবে।'

সন্দেহ পূর্ণ চোখে মুহূর্তের জন্য মিস্ মিত্র জগদীশবাবুকে এক দৃষ্টে লক্ষ্য করলেন আর তারপরেই দ্রুতপদে উঠে গেলেন দোতলায়। কিন্তু অচিরেই তিনি নেমে এলেন।

'কমলার ড্রয়ার আমি দেখে এলাম।' এমন ভাবে তিনি কথা শুরু করলেন যেন জগদীশবাবুকে যুদ্ধে আহ্বান করছেন। 'অনেকগুলো জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না। চুণীর লকেট বসান নেকলেশটা নেই, কৃষ্ণার দেওয়া হীরার আংটিটাও দেখতে পেলাম না, কানপাশা, চুড়ি আর তাগাও দেখতে পেলাম না।'

'কমলা চলে যাবার পর আমি ওর সব ক'টা ড্রয়ারই বাইরের দিকে খুলে ঝুলতে দেখেছি।' নিশ্বাস ফেললেন জগদীশবাবু। 'আমার বিশ্বাস, সে যাবার সময়ে সব গয়নাই নিয়ে গেছে।'

এটা স্বীকার করতেই হবে যে জগদীশবাবু প্রতিটি ছোটো-খাট বিষয়ের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলেন—এ গুণটি বোধ হয় তাঁর শিল্প-দক্ষতা থেকেই জন্মেছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে যাবার সময়ে স্ত্রী যাবতীয় অলঙ্কার ফেলে চলে গেছে—এ গল্প কেউই বিশ্বাস করবে না। আর কাজেকাজেই যাবতীয় অলঙ্কার-সম্পত্তি গেল অদৃশ্য হয়ে।

প্রকৃত পক্ষে, এ ক্ষেত্রে কি যে আর করা উচিত, তা মিস্ মিত্র আর ভেবে উঠতে পারলেন না। দুটি বিভিন্ন রকমের কাহিনী বলার তাৎপর্য জগদীশবাবু এমন সুন্দরভাবে যুক্তির সাহায্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, সে যুক্তি তিনিও না মেনে পারেন নি। সুতরাং জগদীশবাবু যে যে-কোন কৃমি-কীট মনুষ্যের চেয়েও জঘন্য—এই পরম সত্যটুকুই তাঁকে জানিয়ে দিয়ে তিনি দড়াম ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে প্রস্থান করলেন। পুনরায় দ্রুত-স্পন্দিত বক্ষ নিয়ে জগদীশবাবু ফিরে গেলেন তাঁর কারখানায়। গোলকধাঁধা তখনও নিরাপদ, রহস্য তার অনাবিষ্কৃত। দ্বিতীয়বার আবার যখন মিস্ মিত্রের অগ্নি-মূর্তির সম্মুখীন তিনি হলেন, প্রথমটা তাঁর হৃৎপিণ্ডটা বড় বেশি রকম লাফালাফি করছিল—কিন্তু এখন বুঝলেন এ আতঙ্ক সম্পূর্ণ কারণ বিহীন। তাঁর কোন বিপদ আর নেই। আমাদের মত তিনিও তখন ভাবলেন সামন্ত ঘটিত মামলার বিবরণটি। সামন্ত দৌড়োদৌড়ি করছিলেন বলেই ধ্বংস হয়ে গেলেন। যদি সামন্ত চঞ্চল না হয়ে এক স্থানে জেঁকে বসে থাকতেন, তাহলে তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করবার সাহস কারও হত না এবং কয়লার গাদার নিচে সমাধিও কোনদিন হ'ত না আবিষ্কৃত। জগদীশবাবু অবশ্য মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন যে সন্দিগ্ধমনা যে কোন ব্যক্তি আসুক তাঁর গৃহে, খুঁজে দেখুক প্রতিটি কোণ, চোর-কুঠরি এবং কয়লার গাদা। বাগানের প্রতিটি ফুলগাছের মাটি খনন করুক, প্রতিটি দেওয়াল ভেঙে তন্ন তন্ন ক'রে দেখুক। এই কথাই ভাবতে ভাবতে তিনি তুলে নিলেন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ একটি দাঁড়কাক। সকালের দিকে এ অর্ডারটি এসেছিল—সমস্ত মন নিবিষ্ট ক'রে তিনি কৃষ্ণ-প্রাণীটিকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইলেন।

ভগ্নীর অসাধারণ অন্তর্ধান রহস্যের সংবাদ বহন ক'রে মিস্ মিত্র ফিরে এলেন কলকাতায়

আর ক্রমাগত চিন্তা করতে লাগলেন। আগাগোড়া বিষয়টা বারংবার তোলা-পাড়া করেও তিনি চিন্তার কোন কূল-কিনারা পেলেন না। তিনি জানতেন না যে এরকম ভাবে নানা কারণে বহু নারী এবং পুরুষ উধাও হয়ে যায় প্রতি বছরে—কেউই তাদের সন্ধান পায় না, যে পর্যন্ত না দৈব এসে কল-কাঠি নেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু কি জানি কেন, মিস্ অন্নপূর্ণা মিত্রের কাছে এই ব্যাপারটি মনে হ'ল একটি রীতিমত অলুক্ষুণে, বিস্ময়-জনক, অতুলনীয় এবং ভয়াবহ ঘটনা। অনবরত এই বিষয় নিয়ে ভেবে ভেবে তিনি মাথা গুলিয়ে ফেললেন, তবুও স্বল্প-বাক্ জগদীশ সরকার যে গোলকধাঁধার সৃষ্টি করেছেন, তার প্রবেশ পথেরই হদিশ পেলেন না খুঁজে। অবশ্য ভগ্নীপতি সম্বন্ধে মিস্ মিত্রের কোন সন্দেহ ছিল না। কেননা তাঁর ব্যবহার এবং কথাবার্তা খুবই সরল, স্পষ্ট এবং অতীব বোধগম্য। তিনি একজন কৃমি-কীট—এই সংবাদ তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন—কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অবশ্যই সত্য কথাই বলেছেন। কিন্তু মিস্ মিত্র তাঁর একমাত্র বোনটিকে ভালবাসতেন এবং কমলা সরকার কোথায় গেছেন এবং তাঁর কি হয়েছে—এই সংবাদ জানার জন্যে তিনি আকুল হয়ে উঠলেন। আর তাই সর্বশেষে তিনি পুলিশের সমীপে এই ঘটনাটি হাজির করলেন।

অন্তর্হিত মহিলার যতটুকু বর্ণনা সম্ভব, মিস্ মিত্র স্মৃতি থেকে উদ্ধার ক'রে তা দিতে কসুর করলেন না; কিন্তু এই কেসের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীটি মিস্ মিত্রের দৃষ্টি একটি বিষয়ে আকর্ষণ করলেন—যেহেতু তিনি তাঁর ভগ্নীকে বহু বছর যাবৎ দেখেন নি, অতএব এ ক্ষেত্রে জগদীশ সরকারের পরামর্শ অপরিহার্য। সুতরাং পুনরায় শিল্প-কর্ম থেকে টেনে আনা হ'ল ট্যাক্সিডারমিস্ট ভদ্রলোককে। মিস্ মিত্রের আনা সংবাদটুকু এবং তাঁর দেওয়া কমলা সরকারের দৈহিক বর্ণনার ওপর ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। তিনি আর একবার তাঁর ছোট্ট জটিলতাবিহীন গল্পটি বললেন, বিশ্রী কানাঘুষো এড়াবার জন্যে প্রতিবেশিদের কাছে কেন মিথ্যা বলেছেন—সে কথারও উল্লেখ করলেন এবং সর্বশেষে মিস মিত্র বর্ণিত কমলা সরকারের ফটোগ্রাফে নিজেরও দু'একটি খুঁটিনাটি পরিবর্তন সংযোজন ক'রে দিলেন। তারপর তিনি কনস্টেবলটিকে দুটি ফটোগ্রাফ দিলেন। ফটো দুটির মধ্যে যে যে স্থানে সাদৃশ্য চোখ এড়ায় না, সেগুলিও তর্জনী নির্দেশ ক'রে দেখিয়ে দিলেন এবং তারপর প্রসন্ন-বদনে স্মিত-হাস্যে তাকে দিলেন বিদায়।

পুলিশের জোর তদন্ত চলল—Missing Squad ফটোগ্রাফ দুটি নিয়ে সম্ভব অসম্ভব সব জাতীয় স্ত্রীলোকের সঙ্গেই দেখতে লাগল মিলিয়ে। কিন্তু হা হতোস্মি! মিস্ মিত্র যে তিমিরে ছিলেন, সেই তিমিরেই রইলেন। তখন তিনি নিজেও নিজের প্রচেষ্টা আর অর্থ নিয়োগ ক'রে অনুসন্ধানকে ব্যাপকতর ক'রে তুললেন; প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রেই ফটো সহ নিরুদ্দেশ বিজ্ঞাপন ছাপা হল—কোন সাড়া পাওয়া গেল না। দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল আর ততই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন মিস্ অন্নপূর্ণা মিত্র। সবশেষে পুলিশের সঙ্গে এবং আরও কয়েক জনের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দেওয়াল-বিজ্ঞাপন ছাপালেন এবং কাঞ্চনপুর ও সহরের সর্বত্র দিলেন ছড়িয়ে। সহরের বাইরেও কিছু গেল। বাড়ির দেওয়ালে, গাছের গুঁড়িতে, পার্কের বেঞ্চে— সর্বত্র দেওয়াল প্রলম্বিত শ্রীমতী কমলা সরকারের ফটোগ্রাফ বহু পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল—এ সেই ফটোগ্রাফ যেটি জগদীশবাবু নিজে নগর-রক্ষীবাহিনীর হাতে দিয়েছেন তুলে, সেই সাথে তাঁর দেওয়া বিশদ দৈহিক

বর্ণনাও হয়েছে মুদ্রিত—বর্ণনার মধ্যস্থানে লেখা আছে 'বেশ একটু খুঁড়িয়ে চলেন'—এই কয়টি শব্দ মোটা মোটা হরফে ছাপা। প্লাকার্ডের ফল কিছু দেখা গেল না—কিছুই চাঞ্চল্যকর সংবাদও এল না। 'শেষবারের মত তাঁকে কাঞ্চনপুর স্টেশনের দিকে যেতে দেখা গেছে'—এই বিবৃতিও সরকারী গোয়েন্দার কাছে খুব আশাজনক সূত্র বলে মনে হ'ল না। এ ব্যাপারে কোন ইঙ্গিতও সংবাদপত্রে হ'ল না প্রকাশিত; আর তারপর ধীরে ধীরে আমরা আবার নিজস্ব সংবাদদাতা পরিবেশিত সম্মুখ-রণাঙ্গনের চাঞ্চল্যকর বিবরণে হয়ে গেলাম মগ্ন। একটি মুখরা স্ত্রীলোকের গতিবিধি নিয়ে আলোচনা করবার মত অবকাশ আমাদের আর কারুরই রইল না—কাঞ্চনপুর কলোনিও তাঁর কথা বিস্মৃত হয়ে এল ধীরে ধীরে।

আর তারপর হ'ল এই রহস্যের উপসংহার এবং সেটা নিছক দৈবঘটিত ছাড়া আর কিছুই নয়। কাঞ্চনপুর কলোনির একপ্রান্তে অবস্থিত একটি দ্বিতল ভবনের দোতলায় ততোধিক নির্জন এক কক্ষে অলস মধ্যাহ্নে পদচারণা করছিলেন শ্রীকান্ত মিত্র—একজন মেডিক্যান্স স্টুডেন্ট। হাতে বিশেষ কোন কাজ ছিল না এবং পড়াতেও বিশেষ মন বসছিল না। কাজেই উদাসীন এবং অলস ভঙ্গিমায় তিনি জানলা দিয়ে রাস্তার ওপারে দোকানের সাইনবোর্ডটি লক্ষ্য করলেন, রাস্তার মোড়ে দুটি ছোট মেয়েকে দেখলেন বেণী দুলিয়ে স্কুলে যেতে। তারপর দেখলেন এক স্থূলাঙ্গী মহিলা বহুকষ্টে রিক্সা থেকে নেমে প্রবেশ করলেন পার্শ্ববর্তী দোকানে। তখন তিনি শো-কেসের মূল্যবান হস্তীদন্ত নির্মিত নটরাজের মূর্তির শিল্পকৌশল দেখলেন, এবং ভাবলেন যে এরকম একটি মূর্তি কিনে তাঁর পড়ার টেবিলে সদ্যক্রীত মড়ার মাথার খুলি ওপর রেখে দিলে কিরকম দেখাবে; আর তারপর তাঁর ভ্রাম্যমান দৃষ্টি ঘুরতে ঘুরতে এসে স্থির হল পথপার্শ্বের একটি গাছের মোটা গুঁড়ির ওপর; গুঁড়িটির ওপরে দুটিমাত্র শাখা ঠিক ইংরাজী 'Y' এর মত ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। এই দুটি শাখার সংযোগস্থলে দেখতে পেলেন একটি নিরুদ্দেশ-বিজ্ঞাপন এবং কমলা সরকারের দৈহিক বর্ণনা।

'বেশ একটু খুঁড়িয়ে চলেন।'

শ্রীকান্ত মিত্রের শ্বাস-প্রশ্বাস মুহূর্তের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেল। জানলার একটি গরাদ চেপে ধরে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি আর একবার ঐ বিস্ময়কর শব্দগুলি পড়লেন। আর তারপর তিনি সোজা হাজির হলেন কাঞ্চনপুর পুলিশ-ফাঁড়িতে।

ব্যাপারটা এই : কমলা সরকারকে শেষবার দেখা যাওয়ার তিন হপ্তা পরে শ্রীকান্ত মিত্র জগদীশ সরকারের কাছ থেকে কিনেছিলেন একটি স্ত্রী-নরকঙ্কাল। উরুর একটি হাড়ের গঠন বিকৃত থাকার ফলে তিনি কঙ্কালটি খুব সুবিধা দরেই পেয়েছিলেন। আর এখন তাঁর আচম্বিতে মনে হ'ল যে কঙ্কালের ভূতপূর্ব অধিকারিণী একসময়ে নিশ্চয় বেশ একটু খুঁড়িয়ে চলতেন।

মামলা চলার সময়ে সোমদেব চৌধুরী তাঁর সুনাম বজায় রাখলেন। জমকালো বাগ্মীতার সাহায্যে তিনি জগদীশ সরকারের পক্ষ সমর্থন করলেন। আমি আদালতে ছিলাম—সে সময়ে প্রায় আদালতে যাওয়া আমার অন্যান্য কাজের অন্যতম ছিল এবং কয়েদীর পক্ষাবলম্বন ক'রে তিনি প্রথমেই বাকপটুতায় যে নিদর্শন দেখিয়েছিলেন, তা আমি কোনদিন ভুলব

না। ধীরে ধীরে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং সমস্ত আদালত-গৃহের চতুর্দিকে বুলিয়ে নিলেন তাঁর মসৃণ চক্ষু। সর্বশেষে তাঁর গাম্ভীর্যময় প্রশান্ত দৃষ্টি স্থির হ'ল জুরির ওপর। অনেকক্ষণ বাদে কথা শুরু করলেন তিনি। মৃদু, স্পষ্ট ও সতর্ক তাঁর স্বর, প্রত্যেকটি শব্দ উচ্চারণ করবার পূর্বে যেন মনে মনে গুঞ্জন ক'রে নিয়ে তবে বলছেন।

'ভদ্রমহোদয়গণ,' তিনি শুরু করলেন, 'একজন অত্যন্ত মহান্ পুরুষ এবং অত্যন্ত জ্ঞানবান পুরুষ এবং অত্যন্ত সৎ পুরুষ একবার বলেছিলেন যে, সম্ভাবনাই হ'ল জীবনের পথপ্রদর্শক। এটা যে একটি রীতিমত অর্থব্যঞ্জক বাক্য, এ সম্বন্ধে, আমার বিশ্বাস, আপনারা নিশ্চয় আমার সঙ্গে একমত হবেন। বিশুদ্ধ গাণিতিক পরিধি একবার আমরা অতিক্রম ক'রে এলে যা পাই—তার মধ্যে অতি অল্পই থাকে নিশ্চিত। ধরা যাক, লগ্নী করার মত যথেষ্ট অর্থ আমাদের আছে ঃ প্রথমে পরিকল্পনাটিকে আমরা সর্বপ্রকার দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করি এবং তারপর একটি সম্ভাবনাময় বিষয় সম্বন্ধে মনস্থির ক'রে ফেলি। নতুবা ভাগ্যের হাতে ক্রীড়নক হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। দায়ীত্বপূর্ণ পদে কোন ব্যক্তিকে অধিষ্ঠিত করার আগে আমরা তাঁর সততা এবং বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার কার্যকরী সম্ভাবনা সম্বন্ধে চিন্তা করে নিই। আবার সম্ভাবনাই আমাদের পথ দেখিয়ে মীমাংসার দিকে, চিত্ত সঙ্কল্পের দিকে নিয়ে যেতে পারে। একজনের সম্বন্ধে আর একজন কখনই নিশ্চিত ও অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে আসতে পারে না ঃ সম্ভাবনার ওপর বারংবার আমাদের নির্ভর ক'রে এগিয়ে যেতে হয়।

'কিন্তু প্রত্যেক নিয়মের আছে ব্যতিক্রম। যে নিয়ম আমরা এইমাত্র বর্ণনা করলাম, এরও ব্যতিক্রম আছে। এই মুহূর্তে আপনারা সেই ব্যতিক্রমের সম্মুখীন হচ্ছেন ভয়াবহরূপে। আপনারা হয়তো মনে করতে পারেন—আমি বলছি না যে আপনারা মনে করেন—হয়তো মনে করতে পারেন, কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান ঐ জগদীশ সরকার দ্বারা তাঁর স্ত্রী কমলা সরকারকে খুন করার সকল সম্ভাবনা থাকা বিচিত্র নয়।'

এই স্থানে হ'ল ক্ষণের বিরতি। তারপর ঃ

'আপনারা যদি তাই মনে করেন, তবে কাঠগড়াস্থিত আসামীকে মুক্তি দেওয়া আপনাদের এখন অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য। একটি মাত্র রায় আপনারা প্রকাশ করতে পারেন এবং সে রায় হ'ল—'নির্দোষ।'

এই মুহূর্ত পর্যন্ত সোমদেব চৌধুরী যেভাবে তাঁর বক্তৃতা শুরু করেছিলেন, ঠিক একই প্রকার শীতল, কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণ এলেন রক্ষা ক'রে—থেমে থেমে, এবং প্রতিটি শব্দ ঠোঁটের আগায় আসার আগে শব্দটির গুরুত্ব মনে মনে বিবেচনা ক'রে নিচ্ছিলেন। আচম্বিতে তাঁর কণ্ঠস্ব উদারা-মুদারা ছাড়িয়ে তারায় উঠে গেল, প্রতিটি শব্দ প্রত্যেকের অন্তরে যেন গেঁথে যেতে লাগল—সমস্ত আদালত-কক্ষটি গম্‌গম্ ক'রে উঠল তাঁর তীক্ষ্ণ এবং গম্ভীর কণ্ঠস্বরে। দ্রুতবেগে একটির পর একটি শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগল তাঁর মুখ থেকে ঃ

'মনে রাখবেন, এটা সম্ভাবনার আদালত নয়। এখানে সম্ভাবনার কোন স্থান নেই, সে তর্কের কোন অবকাশ এখানে নেই। এই স্থান নিশ্চিত সত্য নিয়ে আদান প্রদান

করে—এই স্থানের নাম আদালত। যতক্ষণ না আপনারা নিশ্চিত হচ্ছেন যে আমার মক্কেল দোষী এবং দু'য়ে দু'য়ে যোগ করলে চার হয়—এই নিশ্চিত সত্যটুকুর মত নিশ্চিত যে পর্যন্ত আপনারা না হতে পারছেন, ততক্ষণ আপনারা ওঁকে মুক্ত ক'রে রাখবেন।

'আবার, এবং তবুও আবার আমি বলছি—এটা আদালত, নিশ্চিত সত্যের স্থান। আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রায়, আমরা প্রায় দেখি, সম্ভাবনাই আমাদের পথপ্রদর্শক। কখনও কখনও আমরা ভুল করি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে ভ্রম সংশোধন করতে পারি। ক্ষতিযুক্ত লগ্নীকরণকে সামলে নেওয়া যায় লাভযুক্ত লগ্নীকরণ দিয়ে; অসৎ ভৃত্য সরিয়ে সেস্থানে সৎ ভৃত্য আনা চলে। কিন্তু এক্ষেত্রে—যেখানে হাতের দাঁড়িপাল্লায় একদিকে রেখেছেন জীবন, অপর দিকে মৃত্যু—সেখানে ভ্রান্তির কোন অবকাশ নেই, কেননা, এ ভ্রান্তি হবে অসংশোধনীয়। মৃত পুরুষকে জীবন দান ক'রে' আপনারা জীবিত করতে পারবেন না। 'এই লোকটি সম্ভবত হত্যাকারী, অতএব এ দোষী,' এই কথা কখনই আপনাদের বলা চলে না। এ ধরনের রায় প্রকাশ করার আগে, 'এই লোকটি হত্যাকারী' এই কথা বলার মত নিশ্চয়তা আপনাদের থাকা উচিত। আর ওকথা আপনারা বলতেই পারবেন না—কেন পারবেন না, তা আমি বলছি।'

তারপর সোমদেব চৌধুরী একটির পর একটি প্রমাণ নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। বিশেষজ্ঞের রিপোর্টে প্রকাশ, উরুর হাড়ে যে বিকৃত-গঠন দেখা গেছে, তার ফলে নরকঙ্কালটির পক্ষে বিজ্ঞাপন-বর্ণিত ভাবে অবিকল ঐ রকম খুঁড়িয়ে চলা উচিত—আর এই বিশেষ ভাবে খোঁড়ানোটাই হ'ল কমলা সরকারের একমাত্র বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বাদীপক্ষ বিবিধ যুক্তিতর্কের সাহায্যে ডাক্তারদের স্বীকার করতে বাধ্য করেছে যে এ ধরনের বিকৃত গঠন অস্বাভাবিক হলেও অদ্বিতীয় নয়। শুধু বলা চলে এটা অসাধারণ। কিন্তু আবার খুব অসাধারণ নয়। শেষকালে, একজন ডাক্তার স্বীকার করলেন যে তাঁর তিরিশ বছর হসপিটাল এবং প্রাইভেট প্র্যাকটিশকালে, উরুর বিকৃত-গঠন অস্থি-র কেস তিনি মাত্র পাঁচবার শুনেছেন। সোমদেব চৌধুরী ছোট্ট একটি স্বস্তির শ্বাস ফেললেন; তিনি যেন অন্তর দিয়ে অনুভব করলেন যে এরপর বিচারকের রায় কি হবে।

জুরির কাছে এই সব খুঁটিনাটি তথ্য তিনি পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দিলেন। যতক্ষণ না অপরাধ সম্পর্কিত অন্যান্য বস্তু, দেহ অথবা দেহের সনাক্তকরণযোগ্য কোন অংশ প্রমাণরূপে উপস্থাপিত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কাউকে যে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া অনুচিত—এই যুক্তিটির ওপর বারংবার জোর দিতে লাগলেন। বিষ্টুপুরের সেই কাহিনীটা তিনি বললেন, হত্যাপরাধে তিনটি লোকের ফাঁসী হয়ে যাবার দু'বছর পর কি ভাবে নিহত ব্যক্তি শিশ্ দিতে দিতে গ্রামে ঢুকেছিল। 'ভদ্রমহোদয়গণ,' তিনি বললেন, 'সবশেষে আমি যা জানি, এবং আপনারাও যা জানেন, তা হ'ল এই যে, যে কোন মুহূর্তে কমলা সরকার ভ্রূকুটি ক'রে এই আদালত-কক্ষ প্রবেশ করতে পারেন! (কয়েকটা শ্রোতা ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে বারকয়েক লক্ষ্য করল) আমি নির্ভীকভাবে শুধু এই কথাই বলব যে তিনি মৃত, এই ধরনের কোন অনুমান করা আমাদের কোনমতেই উচিত নয়।'

জগদীশবাবুর আত্মপক্ষ সমর্থন অবশ্য খুবই সংক্ষিপ্ত। যে কঙ্কালটি তিনি শ্রীকান্ত মিত্রের কাছে বিক্রয় করেছেন, সেটি গত তিন বছর যাবৎ বিভিন্ন অস্থি সংযোজন ক'রে

ধীরে ধীরে তৈরি করেছিলেন। দুটি হাতে যে হুবহু মিল নেই, এদিকেও তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। আর, বাস্তবিকই এই ছোট্ট বৈষম্যটুকুও তাঁর চোখ এড়িয়ে যায় নি।

সিদ্ধান্ত প্রকাশ করার আগে জুরিবর্গ আধঘণ্টা ধরে নিজেরা আলোচনা করলেন। তারপর ঘোষিত হ'ল, জগদীশ সরকার নির্দোষ।

কিছুদিন বাদে শুনেছিলাম জগদীশবাবু দিল্লীতে চলে গেছেন, সেখানেই তাঁর শিল্পনৈপুণ্য এবং নব বিবাহিতা নম্র স্বাভাবা একটি বধূ নিয়ে সুখে আছেন। একজন পুরোন বন্ধুর সাথে তাঁর দেখা হয়েছিল। কথায় কথায় সৌম্যমূর্তি জগদীশবাবু স্নিগ্ধ স্বরে বলেছিলেন, 'আমার বিচক্ষণ আইনজ্ঞটি আমায় একথাও বলেছিলেন যে, বেচারী কমলার মৃত্যু হয়েছে, একথা অনুমান ক'রে নিলেও আমায় আর কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।' প্রসন্নভাবে তিনি হেসে এরপর অন্য বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন।

সর্বশেষে একথা আমি বলে রাখতে চাই যে, আমার এ বর্ণনা হয়তো আংশিক কাহিনী হয়ে দাঁড়াতে পারে। সোমদেব চৌধুরীর অপূর্ব বাগ্মীতা স্মরণ ক'রে যতটুকু আমি বলতে পারি, তা হ'ল এই যে জগদীশবাবু নির্দোষ। খুব সম্ভব তাঁর কাহিনী সম্পূর্ণ সত্য। কমলা সরকারও বহাল তবিয়তেই জীবিত আছেন, বিষ্টুপুরের মত তিনিও হয়তো একদিন সাদা নিমফুল ভক্ষিত মুখ নিয়ে ফিরে আসতে পারেন। আমার এ কাহিনীতে যদি কিছু সংশয়-ছায়া কারও ওপর আমি ফেলে থাকি, তখন তা হয়তো শূন্যে বিলীন হয়ে যেতে পারে।

যুক্তির পথে দেখলে কাঞ্চনপুর-রহস্য তাহলে মীমাংসিত রহস্য। নিশ্চয় তাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে? □

* 'রোমাঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত। ফাল্গুন, ১৩৬৩।

মোমের আগুন

আমার বউ নন্দিনী ফ্যামিলি প্ল্যানিং প্রচারক। প্রচারক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ আমার জানা নেই। নন্দিনীর কাজ হল গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে টো টো করা। আর 'দুটি বা তিনটি সন্তান, সুখী ইনসান'—এই সরকারী বাণী প্রচার করা। কিছুদিন আগে রাজস্থান সরকারের কাছ থেকে নন্দিনী আমন্ত্রণ পেল—জয়পুরে ফ্যামিলি প্ল্যানিং সেমিনার হচ্ছে। সব প্রদেশ থেকেই অভ্যাগতরা আসছেন। নন্দিনীর আসা চাই। নন্দিনী রাজী হয়ে গেল।

আমি গেলাম না ছুটি পেলাম না বলে। নন্দিনী সহকর্মীদের সঙ্গে গেল রাজপুতদের দেশে। পরে চিঠি পেলাম। সেমিনার নামক প্রহসন শেষ হয়েছে। ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের বাজেট খসিয়ে ওরা এখন রাজপুতানা দেখতে বেরিয়েছে। তারপরেই একটা চিঠি এল বিকানীর থেকে। নন্দিনী লিখছেঃ

প্রিয়তম স্বামী আমার,

তুমি তো জান, ভুত দেখতে আমি ভালবাসি। ভালবাসি বলেই ভূতরা আমায় দেখা দেয় না। নিরুপায় হয়ে এন্তার ভূতের গল্প পড়ি। সম্প্রতি এমন একটা ঘটনা আমার

জীবনে ঘটল যা আমার ভূতদর্শনের সাধ জন্মের মত মিলিয়ে দিয়েছে। আমার ধাত ছেড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

সেমিনার করতে এসে সবারই দেখি ফূর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ। সরকারী পয়সা ফুট কড়াই হচ্ছে হোক, পো-পোয়াতীর ভাবনা সোয়ামীরা ভাবুক—আমরা ঘুরি দেশ। এই মন্ত্র সম্বল করে আমরা তো জয়পুর থেকে আজমীর হয়ে চিতোরগড়ে এলাম। তারপর উদয়পুর, মাউন্ট আবু ঘুরে গেলাম যোধপুর। সবশেষে বিকানীরে। মরুভূমির দেশ বিকানীর। এখানে এসেই আমার স্নায়ু জখম হবার উপক্রম হয়েছে। বেলা তিনটে নাগাদ একাই মরুভূমির দিকে গিয়েছিলাম। আমার সৃষ্টিছাড়া খেয়ালের সঙ্গে কারো মেজাজ খাপ খায় না। আমি ভালবাসি মরুভূমি, কাঁটাঝোপ, জঙ্গল আর ভাঙা কেল্লা। ওরা ভালবাসে প্রাসাদ আর সরোবর। বাগিচা আর ফোয়ারা। আমি চাই রুক্ষ, ধূসর, পরিত্যক্ত অঞ্চল। যেখানে মানুষ যেতে ভয় পায়। যেখানকার ধূ-ধূ শূন্যতা বুক কাঁপায়। যেখানকার ভয়াল বন্যতা রক্ত হিম করে দেয়। আমার এই বাউণ্ডুলে বিদ্ঘুটে মেজাজের সঙ্গে তুমি পরিচিত।

বিকানীর থেকে একটা উটের পিঠে চেপে মরুভূমির কিনারায় তাই একাই এলাম। উট ছেড়ে দিলাম। ঠিক করলাম, একা-একা মরুভূমির সূর্যাস্ত দেখব। কাঁকড়ার গর্ত দেখব, বালির কান্না শুনব। তারপর ফিরে এসে যোধপুর বিকানীর সড়ক ধরে যে কোনো গাড়িতে চেপে শহরে আসব।

উট থপথপ করে বিদেয় হতেই আমি বালিয়াড়ি পেরিয়ে এগিয়ে চললাম। ছোট ছোট বালির পাহাড় ডিঙোনোর মধ্যে সে যে কি আনন্দ, হে পতি দেবতা, তা তোমায় বোঝাতে পারব না। সে এক আশ্চর্য শিহরণ। পায়ের নিচে বালি সরে যাচ্ছে। চড়াইতে উঠতে গিয়ে মাঝে মাঝে হুমড়ি খাচ্ছি—কিন্তু তার মধ্যেই যে রোমাঞ্চ, যে পুলক, যে মুক্তির উল্লাস—তা শুধু উপলব্ধির বিষয়। কি ভাবছ? স্নায়ু সত্যিই জখম হয়েছে? পাগল হয়েছি? আজ্ঞে না মশাই—।

বালির পাহাড় ডিঙোতে ডিঙোতে হঠাৎ একটা পরিত্যক্ত গাঁয়ে পৌঁছোলাম। মরুভূমির গ্রাম। বুঝতেই পারছ অবস্থাটা। খান কয়েক কাঠামো আর ভাঙাচোরা ইটের গাঁথনি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। একটা কেল্লার ধ্বংসস্তূপ দেখলাম। সূর্যের পড়ন্ত আলোয় ভাঙা পাথরের বুকে যেন আর এক চিতোর দেখলাম। শৌর্য, বীর্যের ইতিহাস যেন মূর্ত হয়ে উঠল।

হেঁটে হেঁটে পা ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। ভাঙা পাঁচিলের আড়ালে ছায়ায় বসলাম। ঝোলা থেকে রুটি মাখন আর ডিম বার করলাম। খেয়ে দেয়ে সামান্য ঝিমুনি এসেছিল। মুক্ত পরিবেশে মনটাও নির্মেঘ হয়ে গিয়েছিল। আচমকা চোখ খুলে দেখলাম গোধূলির আলোয় আকাশ রাঙা হয়ে গিয়েছে।

এবার ফেরা দরকার। যে দিক দিয়ে এসেছিলাম, সেই দিকেই পা বাড়ালাম। দিব্বি কিছু দূর গেলাম। ইতিমধ্যে আলো আরও নিভে এল। বালির ওপর পায়ের ছাপ দেখে দেখে হাঁটছিলাম। অন্ধকার গাঢ় হতে সে ছাপও আর দেখতে পেলাম না। তারপর বুঝলাম, আমি পথ হারিয়েছি।

উঁচু উঁচু বালিয়াড়ির মধ্যে আমি একা দাঁড়িয়ে রইলাম। চারপাশে জমাট অন্ধকারের

মত বালির পাহাড় আমার ওপর ঝুঁকে রইল। ভয় ডর আমার বড় একটা নেই। কিন্তু সেদিন আমি অস্বস্তি অনুভব করলাম। তাছাড়া চারদিক এমন নিথর নিস্তব্ধ যে মাথার মধ্যে যেন মহাশূন্যের শূন্যতা অনুভব করলাম। সে এক বিচিত্র অনুভূতি।

ঠিক এই সময়ে দেখা হল সুরুচির সঙ্গে। সুরুচিকে তোমার মনে পড়ে?

দশ বছর আগে ধূমকেতুর মত ছায়াছবি মহলে যে মধ্য গগনে উঠে গিয়েছিল। সুরুচির মত প্রতিশ্রুতিময়ী চিত্রতারকা সিনেমা লাইনে বড় একটা দেখা যায়নি। প্রতিটি ছবি হিট করার পর অকস্মাৎ সুরুচি রূপোলি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিল কারণ সেই চিরন্তন। কোন এক হিজ হাইনেস মহারাজা নাকি সুরুচির পাণিপীড়ন করে এবং সুরুচি তখন মহারাজার কণ্ঠলগ্না হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সেই সুরুচির সঙ্গে দেখা হল বিকানীরের প্রান্তে মরুভূমির মধ্যে। সুরুচি দূর থেকে মাথা হেঁট করে আমার দিকেই আসছিল। আমি বিজন প্রান্তরে মানবী দেখে দৌড়ে গিয়েছিলাম। গিয়েই চেনা-চেনা ঠেকেছে। তারার আলোয় সুরুচিও আমার চোখে চোখ রেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি চিনেছি। ঐ চোখ ভোলবার নয়, সুরুচির সম্বল ছিল শুধু ঐ চোখ। শুধু চোখের মধ্যে দিয়ে মনের সব ভাষাও ফোটাতে পারত। কথার প্রয়োজন যত না ওর অতলান্ত চাহনিই যা বলবার তা বলত।

সুরুচি সেই চাহনিই মেলে ধরল আমার ওপর। দেখলাম, দুই চোখে গভীর বিষাদ।

আমি সচমকে বললাম—"আপনি? সুরুচি দেবী?"

"হ্যাঁ", নিষ্প্রাণ গলায় বলল সুরুচি। "পথ হারিয়েছেন?"

সুরুচি চিরকালই কম কথা বলেছে। সেদিনও বলল। বাকিটুকু আমি হৃদয় দিয়ে অনুভব করলাম। সুরুচি আমাকে সঙ্গ দিতে চাইছে। আমাকে পথ দেখাতে চাইছে। কোন কথা বললাম না! উত্তর যেন নিষ্প্রয়োজন। সুরুচি যেন মনের কথা মন দিয়ে পড়ে। পাশাপাশি দুজনে হাঁটলাম। মানুষের সঙ্গ যে এত মধুর হতে পারে, সেইদিন সেই প্রথম জানলাম। হে পতি দেবতা, দোষ নিও না! সত্যি কথাই বললাম। তখনকার অনুভূতির কথাই বললাম।

জিজ্ঞেস করলাম—"আর কদ্দূর?"

মৃদুস্বরে সুরুচি বলল—"আমার বাড়ি কাছেই। আপনার পথেরও শেষ সেইখানে।
"

"আমি কিন্তু আপনাকে বেশি বিরক্ত করতে চাই না।"

"বিরক্ত হব না। বাড়িতে পঞ্চাশটা শোবার ঘর আছে। ব্যবহার করা হয় মাত্র দুটি। আমি আর স্বামী ছাড়া কেউ থাকে না।"

"আপনার স্বামী মানে হিজ হাইনেস—"

"রাজা ভৈরব নামেই ওঁকে সবাই চেনে।"

"আমি গেলে মনে মনে অসন্তুষ্ট হবেন না তো?"

"না। আমরা মানুষ ভালবাসি।" বলে হাসল সুরুচি। তারার আলোয় ঝিকিমিকি দাঁতের সারি দেখলাম। দেখলাম, চিত্রতারকার জৌলুস এখনও বজায় রেখেছে সুরুচি।

একটা বালিয়াড়ি পেরোতেই একটা প্রাসাদ দেখলাম। বেশ বড়। অন্ধকারে বেশ খানিকটা জমাট অন্ধকার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। সামনের ফটকে কেরোসিন তেলের

বড় বাতি জ্বলছে দেখলাম।

সবিস্ময়ে বললাম—"ইলেকট্রিক লাইন এখানে আসেনি?"

"না," সংক্ষিপ্ত জবাব দিল সুরুচি। একটু থেমে বলল—"উনি পছন্দ করেন না।"

বাড়ির মধ্যে ঢুকে রাজা ভৈরবের পছন্দের আরও নমুনা দেখলাম। বড় বড় শাযাদানে জ্বলছে বিস্তর মোমবাতি। কোথাও কেরোসিনের প্রদীপ। বিশাল বড়ো লণ্ঠনগুলো ঝুলছে—কিন্তু বাতি জ্বলছে না।

ঘরের পর ঘরে গালিচা আর অয়েল পেইন্টিং, পাথরের মূর্তি আর ইস্পাতের হাতিয়ারের সমাবেশ।

একতলায় খাবার ঘরে আমি বসলাম। একসঙ্গে বারো মোমবাতির আলোয় শিশমহলের মত ঝলমল করতে লাগল ঘরটা। ভাল ভাল খাবার সাজিয়ে দিল সুরুচি। এত অল্প সময়ে এত সুখাদ্যের আয়োজন দেখে অবাক হলাম।

ঘরের এককোণে বড় ডিভান পাতা ছিল। আমি সেখানে বসলাম। সুরুচি বলল—"আমি যাচ্ছি।" বলে পাশের ঘরে গেল। ফিলে এল একটা ট্রে নিয়ে। রূপোর ট্রে। দু'গেলাস গরম দুধ আর দু পাত্র সোনালী মদিরা নিয়ে ওপরে চলে গেল।

আমি ডিভানে গা এলিয়ে দিলাম। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম, শূন্য পুরীর শূন্যতা কেন? রাজা আর রাণী ছাড়া প্রাসাদে আর কেউ নেই কেন? দাসদাসী ছাড়া প্রাসাদ কি মানায়? এ কেমনতর রাজ পরিবার? ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ উঠে বসলাম আমি। জানলা দিয়ে দেখলাম চাঁদের আলো মেঝেতে পড়েছে। আর দেখলাম ধোঁয়া ঢুকছে। পটপট শব্দ হচ্ছে।

ধড়মড়িয়ে জানলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আগুনের লাল আভা দেখে চমকে উঠলাম। দোতলায় আগুন লেগেছে। সিঁড়ির দিকে দৌড়ে গেলাম। উঠতে পারলাম না। সিঁড়িতে আগুন ও ধোঁয়া দুর্ভেদ্য বেড়াজালের সৃষ্টি করেছে।

বৃথাই চেষ্টা করলাম। সুরুচি দেবীর নাম ধরে ডাকলাম। কারও সাড়া না পেয়ে দৌড়ে বাইরে চলে এলাম। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োতে লাগলাম। আশ্চর্য এবার কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই যোধপুর বিকানীর সড়ক দেখতে পেলাম। চাঁদের আলোয় দৌড়োতে দৌড়োতে কতক্ষণ পরে যে বিকানীর পৌঁছলাম—তা বলতে পারব না। স্টেশনের সামনে চৌকিদারের কাছে হাঁপাতে হাঁপাতে আগুন লাগার খবর দিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

জ্ঞান ফিরে আসতে দেখলাম হাসপাতালে শুয়ে আছি। মাথার কাছে ডাক্তার দাঁড়িয়ে। ঘরে আর কেউ নেই।

চোখ মেলতেই ডাক্তার বলল—'কি হয়েছিল?'

আমি বললাম কি হয়েছিল। জিজ্ঞেস করলাম আগুন নেভাতে দমকল গেছে কিনা। ডাক্তার হাসল। বলল—"মরুভূমিতে আগুন লাগলে আর নেভে না। তা ছাড়া এখানে দমকল কোথায়?"

"তাহলে? সব পুড়ে যাবে যে?"

"পুড়ে গেছে। পাঁচ বছর আগেই পুড়ে গেছে।'

"সে আবার কি কথা?"

"আপনি যে বাড়িতে গিয়েছিলেন, সে বাড়িতে এখন আর কেউ থাকে না। পাঁচ বছর আগে সেখানে থাকত রাজা ভৈরব আর রাণী সুরুচি। রাজা ছিল বিকৃত মস্তিষ্ক এবং খেয়ালী। রাণীর জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। তাই একদিন রাজাকে মেরে রাজ সম্পত্তি হাতানোর প্ল্যান করে।"

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতে লাগলাম।

ডাক্তার বলল—"একদিন রাত্রে দু'গেলাস গরম দুধ আর মদ নিয়ে রাজার কাছে গেল রাণী। খুব যত্ন করে রাজাকে খাওয়াতে গেল। রাজার সন্দেহ হল! কেন না, যত্ন করে কিছু করা রাণীর কুষ্ঠিতে লেখেনি। দাস-দাসী না থাকায় সুরুচি দেবী খুবই অশান্তিতে ছিলেন। তাই সুরার সঙ্গে দুধ দেখে রাজার সন্দেহ হয়। রাণী দুধ নিয়ে গিয়েছিল বিষের গন্ধ ঢাকবে বলে। পেস্তাবাদা মেশানো দুধ নিয়ে হঠাৎ খাতিরের বহর দেখে অপ্রকৃতিস্থ রাজার খটকা লাগল।"

"বিষ?"

"হ্যাঁ। দুধে বিষ মেশানো ছিল। পাশে শামাদানে জ্বলন্ত মোমবাতি ছিল। দরজার বাইরে পেট্রোলের টিন ছিল। রাণীর প্ল্যান ছিল, বিষ খাইয়ে আগে রাজাকে খুন করা। তারপর পেট্রোল ঢেলে শামাদান উল্টে আগুন লাগিয়ে দেওয়া। সবাই জানবে, হঠাৎ আগুন লেগে রাজা ভৈরব পুড়ে মরেছে। রাণীকে কেউ সন্দেহ করবে না।"

"কিন্তু রাজার মনে খটকা লাগল। তাই রাণী যেই অন্য দিকে ফিরেছে, রাজা অমনি দুধ আর সুরার গেলাস পালটা পালটি করে দিল। রাণী সেই দুধ খেয়ে রাজার সামনেই মারা গেল। দারুণ উত্তেজিত রাজা শামাদান নিয়ে যেই ঘর থেকে বেরোতে যাবে, অমনি পেট্রোলের টিনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। পেট্রোল গড়িয়ে গেল মেঝেতে—শামাদানের জ্বলন্ত মোমবাতি ছিটকে গিয়ে পড়ল পেট্রোলে। সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ করে আগুন লেগে গেল দোতলায়। ফলে রাজা জ্যান্ত পুড়ে মরল। আর পুড়ল রাণীর মৃতদেহ।"

ডাক্তার থামতেই আমি শুধোলাম—"এ গল্প কবেকার?"

"পাঁচ বছর আগেকার।"

"আপনি কি করে জানলেন?"

"কেন না, দুধে আমিই বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলাম। রাণীর সুরুচির সঙ্গে আমার গোপন প্রেম ছিল। কিন্তু খবরদার, এ কথা যেন পাঁচ কান না হয়।" বলেই ডাক্তার আমার সামনেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

* 'উল্টোরথ' পত্রিকায় প্রকাশিত। ভাদ্র, ১৩৭৭। □

ভানুমতীর খেল

'ভানুমতীর খেল ছাড়া আর কি,' বিরক্তকণ্ঠে বললে ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর জয়ন্ত চৌধুরী। 'অশরীরী ছাড়া কারো পক্ষে আরুণিকে খুন করা সম্ভব নয়। সুতরাং এটা খুন

নয়, আত্মহত্যা।'....বলে, কফির কাপে প্রচণ্ড শব্দে চুমুক দিল সে।

কথা হচ্ছিল আমার বৈঠকখানায়। আড্ডার আসর জমিয়েছিল বন্ধুবর ইন্দ্রনাথ রুদ্র। প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসাবে ওকে আমার কলমে ঠাঁই দিয়েছিলাম। এখন দেখা যাচ্ছে, আমার চাইতে ওর নামই বেশী। যাক সে কথা।

নির্ভেজাল সেই আড্ডার আসরে ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হল আমার আর একটি গোয়েন্দা বন্ধু—জয়ন্ত চৌধুরী। সরকারের নুন খেয়ে গোয়েন্দাগিরি করে বলে ইন্দ্রনাথ তাকে যখন তখন ঠাট্টা বিদ্রূপ করে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে উপহাস করে। বলে—'রামভক্ত হনুমান, সরকারভক্ত জাম্বুবান।'

সেদিনও এই জয়ন্ত এসে আমাদের খোশগল্পের আসরটি পণ্ড করে দিল। এমন একটা অবিশ্বাস্য অপঘাত কাহিনী বর্ণনা করল যা আত্মহত্যা ছাড়া কিছুই নয়। অথচ লোকান্তরিত লোকটার পরিচিতবর্গের জবানবন্দী থেকে মনে হয় হত্যা। বেশ ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে আটঘাট বেঁধে হত্যা।

তাই জয়ন্ত চৌধুরীর মেজাজ সপ্তমে চড়েছে। গরুখোঁজা খুঁজে বার করেছে ইন্দ্রনাথকে। এক নিঃশ্বাসে বিবৃত করেছে আদ্যপান্ত ঘটনাটা। সশেষে মন্তব্য করেছে—'একে যদি হত্যাকাণ্ড বলতে হয় তো বলব ভানুমতীর খেল। অথচ ছোটকর্তা টিটকিরি দিয়ে বললেন কিনা জয়ন্ত, তুমি এবার রিটায়ার করো। এটা সাজানো আত্মহত্যা। আসলে খুবই ইনটেলিজেন্ট মার্ডার। আমার ইনটেলিজেন্স নিয়ে এ হেন কটাক্ষ, বলুন দিকি বৌদি, সহ্য করা যায় কি?'

গৃহিণী কবিতা মুখ টিপে হেসে বলেছে—'সত্যিই তো।'

'ইন্দ্রনাথ, তোর কি মনে হয়,' গলার শির তুলে চেঁচিয়ে বলেছে জয়ন্ত। 'তোর কি মনে হয়, সেটা বল। ইজ ইট এ মার্ডার? তাই যদি হয়। প্ল্যানচেট করে পি সি সরকারের প্রেতকে নামালেই হয়—আমাকে কেন? কুহক বিদ্যেটা আমি শিখিনি। ইন্দ্রজাল আর রহস্যের জাল কি এক জিনিস হল?'

ইন্দ্রনাথ তখন গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। ঠোঁটের কোণে ঝুলছিল আধপোড়া 'কাঁচি'। ধোঁয়ার সুতো কাঁপতে কাঁপতে স্পর্শ করছিল কড়িকাঠ। ওর কবি কবি মুখটিও উত্থিত সেই দিকে—স্বপ্ন-ছাওয়া চাহনি নিবদ্ধ কড়িকাঠের টিকটিকিটার ওপর। বলল উদাস গলায়—'জয়ন্ত, টিকটিকিটা দেখেছিস?'

'টিকটিকি!' জয়ন্ত খাবি খেল যেন।

'স্কাইলাইট থেকে বেরিয়ে কড়িকাঠ বরাবর হাঁটছে টিকটিকিটা। আমি যদি ওকে মনে করি হত্যাকারীর হাত, তাহলেই তো হত্যার সমাধান হয়ে যায়।'

'টিকটিকি! হত্যাকারীর হাত। ইন্দ্রনাথ আমার মাথার অবস্থা ভালো নয়। বেশী ইয়ার্কি মারলে তোকেই খুন করে বসতে পারি।'

চোখ নামিয়ে প্রশান্ত হাসল ইন্দ্রনাথ। টানাটানা চোখে কৌতুক উপচে পড়ল। বলল বুদ্ধিদীপ্ত ধীর কণ্ঠে—'জাম্বুবান কি সাধে বলেছি!'

'ফের।'

'ছোটকর্তা ঠিকই বলেছেন, এটা হত্যা, আত্মহত্যা নয়।'

'কি ভাবে? কি ভাবে? কি ভাবে?' তড়াক করে লাফিয়ে চিলের মত চেঁচিয়ে উঠল জয়ন্ত। এমন জোরে চেঁচালো যে টিকটিকিটা সুড়ুৎ করে উধাও হল স্কাইলাইটের ফোকরে! সেইদিকে আঙ্গুল তুলে বলল ইন্দ্রনাথ—'ঐ ভাবে!'

হেঁয়ালির আগের ঘটনাটা এবার বলা যাক।

ফিরোজা থিয়েটার এই রহস্যকাহিনীর অকুস্থল। থিয়েটারটি ব্রিটিশ আমলের। অনেক ইতিহাস, অনেক স্মৃতি বিজরিত এই প্রমোদ নিকেতন দীর্ঘ একশ বছর ধরে আমোদ বিতরণ করে এসেছে রসিকদের মধ্যে। ফিরোজা থিয়েটারের চাইতে বড় থিয়েটার হালে তৈরী হয়েছে শহরে। কিন্তু এমন জমকালো কোনটাই নয়। এ থিয়েটারে প্রবেশ করলেই মনের মধ্যে যেন সাতটা কোকিল গান গেয়ে ওঠে। মান্ধাতা আমলের লিফ্‌টয়ে চড়ে তিনতলায় ওঠবার পর বিশাল নাট্যশালার বিশালতা মাথা ঘুরিয়ে দেয়। সাহেবদের কাণ্ডই আলাদ। এ-হেন ফিরোজা থিয়েটারে নতুন নাটক মঞ্চস্থ হতে চলেছে। মহড়া শেষ হতে হতেই রাত আটটা বেজে যায়। রোজই বাড়ী ফিরতে রাত হয় তপন আর সুলতার।

তপন ফিরোজা থিয়েটারের বাঁধা বাজিয়ে আর গাইয়ে। ওর দরাজ গলায় গান আর সুরেলা পিয়ানো সঙ্গীত না থাকলে কোনো নাটকই জমে না। চেহারাটিও ভাল। তাই স্টেজেও নামতে হয়। নাটক লেখা হয় সেই ভাবেই। সুলতা ওর নতুন বিয়ে করা বউ। রূপসী। ফিরোজা থিয়েটারের যা কিছু নাটক রচনার দায়িত্ব ওর কাঁধে। সুলতার সংলাপ এত মিষ্টি, এত তেজালো, এত নাটকীয়, যে দর্শকরা ওর নামে পাগল।

ফিরোজা থিয়েটারেই দুজনের পরিচয়। প্রণয় এবং পরিণয়।

সেদিনও রাত করে ফ্ল্যাটে ফিরল তপন আর সুলতা। সুলতা শাড়ি পালটে টান টান হল শয্যায়, উদরাগ্নি হোটেলেই নিভিয়ে আসা হয়েছিল। সুতরাং—জামা খুলতে গিয়ে তপন চমকে উঠল। মানিব্যাগটা ফেলে এসেছে স্টাফরুমে।

সুলতার তখন ঘুম এসে গেছে। মানিব্যাগ স্টাফরুমে পড়ে আছে শুনে জড়িত কণ্ঠে বলল—'কালকে গেলেই পাবে'খন। এসো শুয়ে পড়ো।'

তপন বললে—'তা হয় না। মানিব্যাগ ভর্তি টাকা রয়েছে। ড্রেসিং রুমেও চাবি দেওয়া থাকে না। সকালে ঝাড়ুদার আসে। তার চাইতে আমি এখুনি গিয়ে নিয়ে আসি। এই তো তিন মিনিটের রাস্তা। যাবো আর আসবো।'

'এসো,' বলে পাশ ফিরে পাশবালিশে পা তুলে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সুলতা। রাত তখন দশটা। ফিরোজা থিয়েটার খাঁ-খাঁ করছে। সামনের ফটক দিয়ে প্রবেশ করল তপন। সিঁড়ি বেয়ে উঠল দোতলায়। দেখল, সামনেই লিফট। লিফটম্যান নেই। অসময়ে কোনদিনই থাকে না। বলতে গেলে সারা ফিরোজা থিয়েটারে একটি মাত্র প্রাণী ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকে না। নাম তার ইস্পাহানি।

ইস্পাহানি সম্বন্ধে দু'চার কথা এই সুযোগে বলে নেওয়া যাক। কেন না, দুর্ভেদ্য এই অপঘাত-রহস্যে বড় রকমের স্থান জুড়ে রয়েছে এই মানুষটা।

ইস্পাহানির বয়স সত্তরের ওপরে। লোকে বলে তার চোখে ছানি পড়েছে। কিন্তু সে তা মানতে রাজী নয়। ইস্পাহানির চুল সাদা, দাড়ি লাল, ভুরু কালো। সব চাইতে আশ্চর্য তার দৈর্ঘ্য। এ রকম বেঁটে গুড়গুড়ে বামন মূর্তি পিগমিদের দেশে পাওয়া যায়।

কলকাতার পথে ঘাটে পাওয়া যায় না। মাত্র আড়াই ফুট লম্বা বাঁটকুল মূর্তি—তার ওপর চুল-দাড়ি-ভুরুর রঙ তিন রঙের।

ইস্পাহানিকে সংগ্রহ করেছিলেন ফিরোজা থিয়েটারের মুসলমান মালিক পারস্যের পথ থেকে। থিয়েটারের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে তার চাকরী হয় পঞ্চান্ন বছর আগে। ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পায় তার অসাধারণ প্রভুভক্তি যা নাকি সারমেয়দের সমতুল্য। এরকম বিশ্বাসভাজন ভক্তি এ যুগে বিরল। তাই রাত্রি নিশীথে গোটা ফিরোজা থিয়েটারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তার একার—আর কারো নয়।

তিনতলায় ইস্পাহানির ঘর। রাত গভীর হলেই দরজা খুলে চারপাইয়ের ওপর ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে থাকে সে। আর আলবোলা সাজিয়ে ভুরুক ভুরুক করে তামাক খায়। এইটাই একমাত্র নেশা ইস্পাহানির। বিয়ে-থা সে করেনি।

একটা কথা আবার পুনরাবৃত্তি করা যাক। দরজা খুলে তাম্রকুট সেবন করে ইস্পাহানি। কারণ নাকি ধোঁয়ায় তার দম আটকে আসে। এটা তার বহু বছরের অভ্যেস।

খোলা দরজার বিপরীত দিকে আর একটা ঘর। এ-ঘর জাঁদরেল নায়ক আরুণির। ফিরোজা থিয়েটারে এমনি ঘর আরো আছে। করিডরের দু'পাশে সারি সারি স্টাফ রুম। থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিজনের বরাদ্দ একটি বিশ্রাম ঘর। কমন গ্রীনরুমে অনেকেই যেতে চায় না—নিজের নিজের ঘরই তাদের পছন্দ। ড্রেসিংরুম বলতে এই স্টাফরুমকেই বোঝায়। তিনতলার ওপরে ছাদ।

রাত দশটায় স্টাফরুম থেকে নিজের মানিব্যাগ উদ্ধার করে লিফটে উঠল তপন। কিন্তু নির্জন নিশ্চুপ থিয়েটার ভবনে একা-একা লিফ্ট চালানোর ছেলেমানুষী হঠাৎ পেয়ে বসল ওকে। দোতলা থেকে নীচে না নেমে সটান উঠে গেল তিনতলায়। কোলাপসিবল গেট-এ ফাঁক দিয়ে দেখল ইস্পাহানির দরজা খোলা। আলো জ্বলছে। তামাকের গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে। যথারীতি তাম্রকুটের নেশায় আবিল হয়েছে বৃদ্ধ।

আরো দেখল, আরুণির ঘরের দরজাও দুহাট করে খোলা। সে ঘরেও জ্বলছে আলো।

লিফট চালিয়ে একতলায় নামল তপন।

রাস্তায় বেরিয়ে কিছুদূর যেতে না যেতেই একটা গাড়ী উল্কাবেগে এসে ব্রেক কষল ফটকের সামনে। দরজা খুলে হন্তদন্ত হয়ে নামলেন ডক্টর লুথ্‌রা। ফিরোজা থিয়েটারের স্টাফ ডক্টর।

একটু বিস্মিত হল তপন। এত রাতে জনহীন থিয়েটারে কার চিকিৎসার দরকার পড়ল? পরক্ষণেই চিন্তা মুছে গেল মন থেকে ঘুমের দৌরাত্ম্যে।

ঘুম একেবারেই ছুটে যেত চোখ থেকে যদি আরুণির ঘরে উঁকি দিত তপন। দেখত, কড়িকাঠ থেকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে একটা সদ্য-ঝুলন্ত দেহ।

আরুণির দেহ!

পরের দিন সকালে হইচই পড়ে গেল ফিরোজা থিয়েটারে। ডক্টর লুথ্‌রা বললেন টেলিফোনে তলব করেছে আরুণি স্বয়ং। টেলিফোন অবশ্য তিনি নিজে ধরেন নি। ধরেছিল ওঁর দাসী মন্থরা। মন্থরাকে জেরা করল জয়ন্ত চৌধুরী। আমতা আমতা করে মন্থরা বললে—এ্জ্ঞে, তিনিই আরুণিবাবু কিনা জানব কেম্‌নে? বললেন তো আরুণিবাবু বলছি, ডাক্তারবাবুকে

এক্ষুনি থিয়েটারে পাঠিয়ে দাও। ভীষণ বিপদ।

জয়ন্ত মুখ ভেংচে চমকে উঠেছিল—'কেমনে আবার জানবে? আরুণিবাবু? কখনো ফোন করেন নি ডাক্তারবাবুকে? করেছিলেন তবুও গলা চিনতে পারলে না?'

ভয়ে কাঁটা হয়ে বললে মন্থরা—'এজ্ঞে, তাঁর গলা তো ভারী। মনে তো হয় উনি নন।'

অর্থাৎ কেসটা ঘোরালো হল। অন্য কেউ যদি ফোন করে থাকে, তাহলে সে কে? সেই কি নাটের গুরু হত্যাকারী না, আত্মহত্যার চাক্ষুষ সাক্ষী?

উভয়ক্ষেত্রেই তপন ফেঁসে যাচ্ছে। পুলিশের ছোটকর্তার তীব্র ধারণা মেনি মুখো ঐ গাইয়ে বাজিয়ে লোকটা হয় হত্যাকারী, নয় হত্যাকারীর সাগরেদ। আরে বাবা, তুমি যদি অতই সাচ্চা পার্টি হবে তো খামোকা লিফট চালিয়ে তিনতলায় উঠতে গিয়েছিলে কেন? তোমার ঘর তো দোতলায়? তাছাড়া, কোনদিন তোমার মানিব্যাগ নিতে ভুল হয় না, ভুল হল সেইদিনই যেদিন চিত্রগুপ্ত তাঁর জাবদাখাতায় ঢেঁড়া মারলেন আরুণির নামের পাশে?

কিন্তু এর পাল্টা যুক্তিও আছে। তপনকে কেউ দেখেনি ফিরোজা থিয়েটারে রাত দশটায়। তা সত্ত্বেও সে কবুল করেছে। না করলেও পারত। সে যদি নাটের গুরুই হবে তো যে-খবর কেউ জানে না, সে-খবর পুলিশকে বলে খাল কেটে কুমীর ডাকবে কেন?

তাছাড়া, ডক্টর লুথ্‌রা বলছেন, আরুণির হৃদপিণ্ড পরীক্ষা করে তিনি তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলেন। ধুকধুক করে তখনও হার্ট কাজ করে চলেছিল—নিঃশ্বাস যদিও পড়ছিল না। এরকম অবস্থা নাকি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ার মিনিট দু'তিন পর পর্যন্ত থাকে। উনি কোরামিন ফুঁড়েও অবশ্য হার্ট আর চালু করতে পারেন নি। তাছাড়া, ঘাড়ের কাছে মেরুদণ্ডর হাড় ভেঙে গিয়ে যার মৃত্যু ঘটেছে, তার হার্টে কোরামিন দিয়েও কোনো লাভ ছিল না। তবে একটা জিনিস স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

ডাক্তার যখন ফোন পান, তখনো জীবিত ছিল আরুণি। সে কড়িকাঠে ঝুলেছিল, ডাক্তার তার কাছে পৌঁছোনোর মিনিট দুতিন আগে।

কিন্তু সে সময়ে তপন ছাড়া আর কেউ তো আসেনি থিয়েটারে?

সুতরাং হয় তপন হত্যাকারী, না হয় আরুণি নিজেই আত্মঘাতী হয়েছে। ঠিক তার আগেই গলা পালটে ফোন করেছে ডাক্তারকে অভিনেতার পক্ষে যা অসম্ভব নয় মোটেই।

আরও তথ্য প্রকাশ পেল।

মদ্যপান করেছিল আরুণি। জিনের বোতল আর গেলাস ছিল ঘরের মধ্যেই। জিনের মধ্যে মেশানো ছিল পেমবুটাল। ঘুমের ওষুধ। এত বেশী মাত্রায় ছিল যে মরবার আগে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল আরুণি।

বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল। হুঁশ ছিল না। তবে ফোন করেছিল কে? নিশ্চয় সে নয়। তাহলে?

হত্যাকারী।

কিন্তু হত্যাকারী ঘরে ঢুকল কি করে? ডাক্তার পৌঁছোনোর দু'তিন মিনিট আগে দড়ি থেকে ঝোলানো হয়েছে বেহুঁশ দেহটাকে। সে সময় দরজার দিকেই তাকিয়েছিল ইস্পাহানি।

আরুণি বাবুর ঘরে কাউকেই সে ঢুকতে দেখেনি। বেরোতেও দেখেনি। মোটে দু'তিন মিনিটের তো মামলা।

অথচ ডাক্তার এসে দেখল তখনো হার্ট চলছে আরুণির।

ইস্পাহানি আরো বলল। নটা নাগাদ ক্যাসানোভা এসেছিল আরুণির ঘরে। আরুণি তখন সবে পাবলিক বার থেকে সুরার নেশা নিয়ে ফিরেছে। রোজ রাতের মতই আর এক প্রস্থ মাল টানা শুরু করেছে স্টাফরুমে। এমনি সময়ে এল ক্যাসানোভা।

ক্যাসানোভা! ঐতিহাসিক নাম! চরিত্রহীনতায়, লাম্পট্যে, নারী বিলাসে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক ক্যাসানোভা। এ নাম তার পিতৃদত্ত নাম নয়। ধর্মেও সে খ্রিস্টান নয়। কিন্তু তবুও তার নাম ক্যাসানোভা হয়ে গিয়েছে 'ক্যাসানোভা' নাটকে নায়কের সফল অভিনয়ের পর। একাদিক্রমে পাঁচশ রজনী অভিনয়ের পর স্তাবকদের দৌলতে আসল নামটি বিস্মৃত হল মুগ্ধ দর্শকরা......লোকে মুখে চালু হয়ে গেল ক্যাসনোভা নামটা।

সেই ক্যাসানোভা এসেছিল আরুণির ঘরে। বিদায় নিয়েছিল আধঘণ্টা পর। তারপর ইস্পাহানি আর কাউকে দেখেনি সে ঘরে ঢুকতে।

অথচ রাত দশটায় প্রাণবায়ু বিলীন হল আরুণির। ক্যাসানোভা বিদায় নিয়েছে সাড়ে নটায়। সুতরাং সে নিরাপরাধি। তপন লিফটে থেকে নামেনি। ইস্পাহানির সামনে আসেনি—সুতরাং সে-ও নিরপরাধ।

আরুণির অপঘাত মৃত্যুর হেতু তাহলে একটাই—সুইসাইড।

জয়ন্ত এই পর্যন্ত এসে তদন্তে যবনিকা টানতে চেয়েছিল।

কিন্তু প্রশ্ন উঠল কশেরুকার ভাঙা হাড়টা নিয়ে। ডাক্তার বললেন—নিশ্চয় কেউ নীচ থেকে দুপা ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়েছিল। ফলে কশেরুকার হাড় ভেঙেছে। অথচ মৃত্যুকালীন কষ্ট লাঘবের জন্যে গলা ঘিরে তুলোর প্যাড রেখেছিল আরুণি—তারপর ছিল দড়ি। মৃত্যুপথযাত্রীর পক্ষে এটুকু আরামের আয়োজন হাস্যকর সন্দেহ নেই, কিন্তু বিরল ঘটনাও নয়।

কেসটা তাহলে আত্মহত্যার।

কিন্তু পা ধরে টেনে কশেরুকার হাড় ভাঙল কে?

জানা গেল আরো একটা তথ্য। আরুণির ট্রাউজার্সের তলার দিকে গোড়ালীর ঠিক ওপরে ভাঁজ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে সেখানে দেখা গেল পাটের ফেঁসো। অর্থাল দুটো পা শক্ত করে বেঁধে ছিল কেউ। হয়ত হ্যাঁচকা টান দিয়ে কশেরুকার হাড় ভেঙে চম্পট দেওয়ার সময় খুলে নিয়ে গিয়েছে পায়ের দড়ি।

অদ্ভুত! অদ্ভুত! ঘাটে এসেও তরী ডুববে নাকি? আত্মহত্যার ফতোয়া দিয়ে ইনভেস্টিগেসন শিকেয় তুলতে চেয়েছিল জয়ন্ত, কিন্তু......!

জেরার মুখে অবশ্য প্রকাশ পেয়েছিল কতগুলো চাঞ্চল্যকর সংবাদ।

আরুণি মদ ভালবাসত। আর ভালবাসত সুন্দরী মেয়ে। চরিত্রে সে ক্যাসানোভা। মদের চাট হিসেবে রূপসী নাহলে তার দিবস রজনী অন্ধকার। এহেন আরুণি প্রথমে ঝুঁকেছিল সুলতার দিকে। কিন্তু সুলতা ঝুঁকেছিল তপনের দিকে। তপনও চেয়েছিল সুলতাকে সুতরাং যথাসময়ে বিয়ে হয়ে গেল ওদের। বিয়ের পরেই একদিন স্টেজের মহড়ায় নাটকের পাট

সংলাপের পরিবর্তে নিজস্ব সংলাপ ব্যবহার করল আরুণি। কদর্য ভাষার সংলাপ নিক্ষিপ্ত হল তপনের উদ্দেশে।

কেলেংকারী বেশিদূর এগোবার আগেই সুলতা স্বামীকে নিয়ে বেরিয়ে এল স্টেজ থেকে। পরের দিন সুলতার ফ্ল্যাটে গিয়ে তপনের কাছে ক্ষমা চেয়ে এল আরুণি। অকপটে বললে, ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে ব্যর্থতার জ্বালায় আর মদের নেশায় মাথা ঠিক রাখতে পারেনি সে।

তপন ভুলে গেল বিষয়টা। ভুলল না কেবল সুলতা। বললে—'ওগো, আমরা মেয়েরা পুরুষদের হাড় পর্যন্ত দেখে ফেলি। আরুণি মোটেই অনুতপ্ত হয়নি। তুমি কিন্তু সাবধানে থেকো বাপু!'

তপন ঘাবড়ে গিয়ে বলেছে—'কি করে থাকবো বলো?'

'রিভলভারটা কোথায়?'

'স্টীল আলমারীতে। কেন?'

'কোমরে গুঁজে রেখো।'

'ধ্যাৎ! বিচ্ছিরি রকমের উঁচু হয়ে থাকে। নাটক লিখে লিখে তোমার কল্পনাশক্তি বিপজ্জনকভাবে বেড়ে গেছে দেখছি।'

মাসখানেক পরেই কিন্তু ঘটল ছোট্ট একটা ব্যাপার।

যে সময়ে নিজের ঘরে ঢোকার কথা নয়, সেই সময়ে হঠাৎ ঘরে এসে পড়েছিল তপন। ঢুকেই দেখল, কী আশ্চর্য। ওর ক্রীমের জার থেকে চুরি করছে আরুণি। আঙ্গুলে তুলে তুলে রাখছে নিজের জারে।

অভাবনীয় দৃশ্য। প্রথমে থতমত খেয়েছিল আরুণি।

পরক্ষণেই বলেছে সপ্রতিভভাবে—'কিছুতেই মেক আপ উঠছে না আমার ক্রীমে। তাই তোমার ক্রীম নিয়ে একটু 'ট্রাই' করছিলাম, বলে, তপনের মন্তব্য শোনার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল আরুণি।

ফ্ল্যাটে ফিরে সুলতাকে ক্রীম বৃত্তান্ত জানাল তপন। বলল—'আরুণির মাথায় ছিট আছে।

'তাই কি?' ভুরু কুঁচকে ভারি মিষ্টি করে বললে সুলতা। 'অতই যদি ওর ক্রীমের ওপর লোভ তো জারটা ওকে দিয়ে দিও। আমি তোমার জন্যে ক্রীমের শিশি কিনে এনেছি। এই দ্যাখো'।

নতুন ক্রীমটা বাস্তবিকই উঁচুদরের। সুতরাং বিনা দ্বিধায় সেইদিন থেকেই বাতিল হয়ে গেল পুরনো ক্রীমের শিশি। দিন কয়েক পরে হঠাৎ ক্যাসনোভা বললে—'ধুত্তোর, আমার ক্রীমটা গেল ফুরিয়ে, তপনদা, একটু ক্রীম ধার দেবেন?'

তপন উদার গলায় বললে—'ধার কেন, একেবারেই দান করছি। এই নাও! তোমার সুলতাদি আমাকে একটা নতুন শিশি এনে দিয়েছে' বলে, পুরনো ক্রীমের জারটা চালান করে দিল ক্যাসানোভাকে।

ক্রীম পেয়ে ক্যাসানোভা তো মহা খুশী। দামী ক্রীম ছাড়া আজেবাজে ক্রীম ব্যবহারের বিরোধী সে। কারণ, তার একজিমা। থুতনীর ঠিক তলায় বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে বিশেষ এই চর্মরোগটিতে অনামী ক্রীম লাগাতে চায়না বলেই এত খুঁতখুঁতে সে!

ক্রীমের ব্যাপার মিটল এখানেই। ইতিমধ্যে আবার একটা কেলেংকারী ঘটল স্টেজের পেছনে---পর্দার অন্তরালে।

মেয়ে ঘটিত কেলেংকারী। মূলে সেই একজনই—লম্পট আরুণি!

ক্যাসানোভা রোমান্টিক অভিনয়ে বিখ্যাত। চেহারাটিও তার লেডি কিলার টাইপের। রীতিমত রোমিও-রোমিও একহারা ছিপছিপে চেহারা। মাথাভরা ঢেউ খেলানো চুল। নাক মুখ চোখা চোখা, বুদ্ধিদীপ্ত। রঙ সাহেবদের মত টকটকে লাল। ক্যাসানোভা চরিত্রকে সে জীবন্ত করেছিল শুধু চেহারার রোমান্স দিয়ে।

চেহারা যার রোমান্টিক তার অন্তরেও রোমান্স থাকা স্বাভাবিক। রোমান্স-সরোবরে হিল্লোল জাগিয়েছিল থিয়েটারেরই একটি মেয়ে। ক্যামেলিয়া। ক্যামেলিয়া যিশুর উপাসক। কিন্তু আচারে আচরণে তা বোঝা মুস্কিল। ক্যামেলিয়া ফর্সা নয়—কালো। কিন্তু কালোবরণ মেয়ে যে চোখ জুড়োতে পারে, ক্যামেলিয়া তার প্রমাণ। তার পদ্মদীঘির মত টলটলে চোখ, ঢলঢলে মুখশ্রী আর কলকলে কণ্ঠস্বর শুনে প্রেক্ষাগৃহ মুহুর্মুহু করতালিতে ফেটে পড়ে, পুরুষরা মোহিত হয়, নারীরা ঈর্ষান্বিত।

সেই ক্যামেলিয়াকে সহসা স্টেজের পেছনে দড়ির গাদায় ফেলে আরুণি.....ক্যামেলিয়ার কোমল তনু ননী দিয়ে গড়া নয়। আরুণির কবল থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে দেরী লাগেনি। ক্ষতির মধেও ব্লাউজটা একটু ছিঁড়ে গিয়েছিল। আর এগোতে পারেনি আরুণি।

সমস্ত ব্যাপারটা ঘটল অতি নিঃশব্দে। ঠিক সেই সময়ে সুলতা এসে পড়ে সেখানে। আঁচল দিয়ে বুক ঢেকে হাঁপাতে হাঁপাতে ক্যামেলিয়া তখন বেরিয়ে আসছে অন্ধকারের মধ্যে থেকে। পেছনে টলমলায়মান আরুণি—দুই হাত তখনো সামনে প্রসারিত—মুখে মদের গন্ধ। সুলতাকে দেখেই যেন জোঁকের মুখে নুন পড়েছিল। সুট করে উধাও হয়েছিল আরুণি।

উনিশ বছরের সদ্যফোটা ক্যামেলিয়া তখন কেঁদে ফেলেছিল সুলতার কাঁধে মাথা রেখে। সুলতা চেয়েছিল ব্যাপারটা থিয়েটার কর্তৃপক্ষের কানে তোলা হোক। পাঁচ কান হোক এবং আরুণিকে বিদেয় করা হোক। সে থাকতে এ-থিয়েটারে নারীর ইজ্জৎ অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব।

ক্যামেলিয়া কিন্তু রাজি হয়নি। বলেছে—'না সুলতাদি, কেলেংকারী বাড়িয়ে লাভ নেই। কেলেংকারীতে মেয়েরা পুড়ে মরে, পুরুষদের গায়ে আঁচ লাগে না'। কথাটা সত্যি।

জয়ন্ত প্রশ্ন তুলেছিল—'বেশ তো, ধরা যাক, আরুণি সুইসাইড করেনি, মার্ডাড হয়েছে। কিন্তু কেন? বিনা লাভে কেউ মানুষ খুন করে না। আরুণিকে খুন করে কার কি স্বার্থসিদ্ধি হচ্ছে, তা দেখা যাক।'

কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরোলো তখনি।

আরুণির ব্যাঙ্ক ব্যালান্স নেহাত কম ছিল না। অকৃতদার নায়কের তহবিল কখনো শূন্য থাকে না। মা কমলা যেন ঝাঁপি ভরে টাকা দিয়েছিলেন তাকে। আরুণির মৃত্যুতে এ-টাকা পাচ্ছে তার একমাত্র ভাই অরণ্যকুমার।

অরণ্যকুমার থাকে দার্জিলিংয়ে। বহুবার বিদেশ সফর করেছে সে। সারা পৃথিবী নাম জানে তার। সেতারের জাদুকর অরণ্যকুমার যে-ছবিতে মিউজিকের ভার নেয়, তা সুপারহিট

করে।

আরুণির মত সে মদ বা মেয়েমানুষের ভক্ত নয়। কিন্তু তবুও তার ভাঁড়ার শূন্য। অর্থ সঞ্চয় করা তার কোষ্ঠীতে লেখেনি। কারণ আর কিছুই নয়—মানুষটা অসম্ভব খামখেয়ালী। নিত্য নতুন উদ্ভট খেয়ালের পেছনে টাকা উড়িয়ে সে ফতুর। তার ওপর অতিরিক্ত মাত্রায় দুর্মুখ। ফলে মিউজিক ডিরেকসনের অফার নিয়ে কেউ চৌকাঠ মাড়াচ্ছে না ইদানীং। দায়িত্বজ্ঞানহীনও বটে। দু'দুটো ছবির মিউজিক অর্ধেক শেষ করে সে-নাকি গা ঢাকা দিয়েছিল হিমালয়ের অন্য অঞ্চলে। আরুণি ইহলোক ত্যাগ করেছে, এ-খবর তাকে জানানো হয়েছিল টেলিগ্রাম মারফৎ। জবাব এল ফিরতি টেলিগ্রামে। অদ্ভুত সেই টেলিগ্রামের বাংলা মানে এই,

উল্লসিত হলাম। অনেক মাসের প্রতীক্ষা সফল হল। সত্যিই কি আত্মহত্যা? খবরদার আমাকে যেন বিরক্ত করা না হয়।

অরণ্যকুমার

জয়ন্ত যথাসময়ে জেরা করেছিল তাকে। জিজ্ঞেস করেছিল সৃষ্টিছাড়া এই টেলিগ্রামের প্রকৃত অর্থ কি? কেন সে ভায়ের মৃত্যুতে এত উল্লসিত? অরণ্যকুমার জানিয়েছিল, শুধু সেতার দিয়ে একটা অভিনয় প্রোগ্রাম মঞ্চস্থ করতে চেয়েছিল সে। টাকা চেয়েছিল আরুণির কাছে, পায়নি। জয়ন্ত তখন বলেছিল, এর পরিণাম কিন্তু খুব খারাপ। পুলিশ তাকেই সন্দেহ করছে ভাই-ঘাতক হিসেবে। শুনে বিষম কৌতুক অনুভব করেছিল অরণ্যকুমার। শুধু জিজ্ঞেস করেছিল—আরুণির টাকাগুলো কবে নাগাদ পাওয়া যাবে?

রাগে ফুলতে ফুলতে ফিরোজা থিয়েটারে ফিরে এসেছিল জয়ন্ত। তখনি জানতে পেরেছিল, ক্যামেলিয়ার ওপর বলাৎকারের গোপন সংবাদ।

খটকা লেগেছিল জয়ন্তর মনে। তবে কি প্রিয়তমার ওপর বলাৎকারের প্রতিশোধ নিয়েছে ক্যাসানোভা? কিন্তু কি করে?

এর দুদিন পরেই সুলতার পীড়াপিড়িতে আর্যমতে ক্যাসানোভার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল ক্যামেলিয়ার।

বিয়ের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে খুন হতে হতে বেঁচে গেল সুলতা।

ক্যামেলিয়া বলেছিল—সুলতাদি, বিয়ের ইচ্ছে তো দুজনেরই। কিন্তু দুজনেই পিছিয়ে যাচ্ছি দুটো কারণে।'

'যথা?' জিজ্ঞেস করেছিল সুলতা।

ক্যামেলিয়া যদি ফর্সা হত, তাহলে কথাটা বলতে গিয়ে আরক্ত হত। কালো বলে হল বেগুনি। আঁচলের খুঁট আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলল—'কি-ই বা বয়স আমার। এই সময়ে বাচ্ছাকাচ্ছা হওয়া মানেই কেরিয়ার নষ্ট হওয়া।' হেসে ফেলল সুলতা—'এই ব্যাপার! একেবারেই ছেলেমানুষ তুমি। ওটা কোনো ওজোর নয়। বাচ্ছা না চাইলে হবে কেন?'

'কিন্তু—'

'আবার কিন্তু কি?'

'ক্যাসানোভার শরীর মোটেই ভাল যাচ্ছে না।'

'একজিমা বেড়েছে বলে?'

'না না। দিনকে দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে, চোখে অন্ধকার দেখছে একটু পরিশ্রম করলেই, পেটের অসুখ তো লেগেই রয়েছে।'

'ও সব হল ব্যাচেলারের রোগ। বিয়ের জল পড়লেই সেরে যায়,' বলে সস্নেহে ক্যামেলিয়ার চিবুক ধরে নেড়ে দিয়েছিল সুলতা।

বিয়ের পর পার্ক স্ট্রীটের অভিজাত রেস্তোরাঁয় ম্যারেজ-ডিনার দিল ক্যাসানোভা। খানাপিনার টেবিলে বসে এই কথারই জের টেনে নিয়ে বললে সুলতা—'ক্যামেলিয়া বিয়ে করে এক ঢিলে দু'পাখী মারল।'

'পাখী দুটোর নাম?' শুধোলো তপন।

'ক্যাসানোভার কাহিল শরীর এবার ক্যামেলিয়া-টনিকে চাঙা হয়ে উঠবে।'

'আর?'

'বর্বর দু'পেয়ে নারী শিকারীদের লোলুপ নজর ক্যামেলিয়ার ওপর আর পড়বে না।'

চামচ নামিয়ে রেখে মৃদুকণ্ঠে বললে ক্যাসানোভা—'আপনি আরুণির কথা বলছেন তো? সে তো আগেই মরেছে।'

টেবিল নিস্তব্ধ। তারপর বলল সুলতা—'তুমি কিছু বলেছো বুঝি ক্যাসানোভাকে?'

'স-ব,' দুষ্টু হেসে বলল ক্যামেলিয়া। 'না বললে পেট ফুলে মরেই যেতাম।' এমন ঢঙে কথাটা বলল ক্যামেলিয়া যে টেবিলের প্রত্যেকেই দুম করে ফেটে পড়ল দমকা হাসিতে। হাসতে হাসতে বললে সুলতা—'আরুণির মৃত্যুটা যেন মাধ্যাকর্ষণের ত্রিশঙ্কুর অ ব স্থা পাওয়া।'

'কথাটার মানে?'—খুক খুক করে হাসতে হাসতে শুধোলো ইন্সপেক্টর জয়ন্ত চৌধুরী। ভোজসভায় হাজির থাকতে বাধ্য হয়েছিল সে কর্তব্যের তাগিদে। সদ্য মরেছে একটা মানুষ, এর মধ্যেই বিয়ের এত ঘটা কেন বাপু?

সুলতা ঠোঁট উল্টে বললে—'মানে আবার কি? মাধ্যাকর্ষণের টানে আছাড় খেলে জানি ঘাড়ের হাড় ভাঙে। কিন্তু আরুণি মাধ্যাকর্ষণকে কলা দেখিয়ে শূন্যে ঝুলল ত্রিশঙ্কুর মত, অথচ ঘাড়ের হাড়টি ভাঙ্গল মট করে।'

'তবে হাড়টা ভাঙল কি করে? কড়িকাঠের ধাক্কায়? উল্টো মাধ্যাকর্ষণ নাকি?'

গম্ভীর ভাবে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল জয়ন্ত। এ প্রশ্নের জবাব তার জানা নেই। জানার সুযোগও পেল না। দুদিন পরেই হত্যাকারী হানা দিল সুলতার ফ্ল্যাটে।

তপন ফিরোজা থিয়েটারে গিয়েছে। সুলতা মার্কেট থেকে ফিরেছিল ফ্ল্যাটে। দরজা বন্ধ করে এক কাপ কফি বানাচ্ছে আর গুণ গুণ করে গান গাইছে। ফিরোজা থিয়েটারে তাকেও যেতে হবে এখুনি। এমন সময়ে দরজায় টক-টক-টক শব্দ হল।

অন্যমনস্কভাবে এক পাল্লার ফ্লাসডোর ঈষৎ ফাঁক করেছিল সুলতা। কিন্তু ফাঁকের মধ্যে দিয়ে কিছু দেখবার আগেই একটা হাত দেখা গেল। হাতে খানিকটা কালো কাপড়।

চক্ষের নিমেষে কাপড়টা সুলতার চোখে চেপে ধরল হাতটা। আর একটা হাত বেষ্টন করল কণ্ঠনালী। হাতের অধিকারী প্রবেশ করল ভেতরে এবং একইভাবে চোখ আর গলার ওপর যুগপৎ চাপ বৃদ্ধি করে চলল সর্বশক্তি দিয়ে। কোনোরকম শব্দ করতে পারল না সুলতা। বুঝল সে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। ফুসফুসটা বাতাসের অভাবে যেন ফেটে যাচ্ছে। পুরোপুরি অজ্ঞান হওয়ার আগে দরজার বাইরে শুনল মেয়েলী কণ্ঠের ডাক— 'সুলতা আছো?' তারপর আর কিছু মনে নেই সুলতার।

জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর দেখল, সে শুয়ে আছে লাগোয়া বাথরুমে। গলায় বেশ ব্যথা। অতিকষ্টে দরজা পেরোলো সুলতা। শোবার ঘরে কেউ নেই। খাবার ঘর শূন্য। বসবার ঘরও তাই। তেপায়ার টুলটার ওপর জেডপাথরের কনফিউসিয়াসের মূর্তি চাপা ছোট্ট একটা চিরকুট ছাড়া ঘরের মধ্যে বেমানান কিছুই চোখে পড়ল না। চিরকুটটা তুলে নিল সুলতা। গোটা গোটা হরফে মেয়েলী ছাঁদে একটি মাত্র পংক্তিঃ

'সুলতা, নতুন নাটকের একটা কপি এনো। প্রকাশক চেয়েছে।

আখতার।'

আখতার ফিরোজা থিয়েটারের পুরনো নায়িকা। এখন ছোটখাট পার্ট করে। স্বামীর বইয়ের কারবার। সুলতার সব নাটক বেরোয় ঐখান থেকেই।

জ্ঞান হারানোর ক্ষণ-পূর্ব ডাকটা মনে পড়ল। আখতারের গলাই বটে। হত্যাকারী ঐ ডাক শুনেই ওকে টেনে নিয়ে গেছে বাথরুমে। আখতার দরজা খোলা দেখে ভেতরে এসেছে। শোবার ঘরে, খাবার ঘরে, বসবার ঘরে কাউকে না পেয়ে চিরকূট রেখে গেছে।

আচ্ছন্নের মত খাবার টেবিলে বসে পড়ল সুলতা। কফি কাপটা টেনে নিল ঠোঁটের কাছে।

ফিরোজা থিয়েটারে ফোন এল তপনের নামে। ডাকছে সুলতা।

'কি ব্যাপার ডার্লিং?' উচ্ছল কণ্ঠে বলল তপন। 'এত দেরী কেন?'

ক্লান্ত কণ্ঠে বলল সুলতা—'ওগো, আমাকে কফির মধ্যে বিষ খাইয়ে মারবার চেষ্টা চলছে। তুমি তাড়াতাড়ি এসো।'

তীব্র অ্যাকোনাইট মিশানো ছিল কফির কাপে। রাসায়নিক পরীক্ষায় ধরা পড়ার অনেক আগেই স্বাদের তারতম্য থেকে সন্দেহ হয়েছিল সুলতার। কফির কাপ ঠোঁটের কাছে টেনে নিয়ে ভাবছিল—হাতে পেয়েও তার ধড়ে প্রাণটা রেখে গেল কেন হত্যাকারী? দয়া? উঁহু! নিশ্চয় অন্য পন্থায় নিকেশ করার আয়োজন করে গেছে। কফির কাপে বিষ মিশিয়ে দিয়ে যায়নি তো? গরম কফির কাপ টেবিলেই ছিল কিনা.....

চুমুক দেয়নি সুলতা। আঙুলে করে এক ফোঁটা নিয়ে জিভের ডগায় রেখেছিল। চিন চিন করে উঠেছিল স্বাদ-সচেতন রসনা-কেন্দ্রগুলো। এ-স্বাদ তার প্রিয় কফির স্বাদ নয়। একটু তফাৎ আছে।

তাই বেঁচে গেল সুলতা।

কিন্তু ধনেপ্রাণে মারা পড়ার উপক্রম হল জয়ন্ত বেচারী। একি ফ্যাসাদ! একটা খুনের (!) নিষ্পত্তি হতে না হতেই আবার একটা খুনের প্রচেষ্টা! তবে কি আরুণি সত্যিই নিহত হয়েছে? সুলতা হয়ত জানে হত্যাকারীর পরিচয়—তাই তার মুখ বন্ধ করার জন্যেই বিষ নিয়ে হত্যাকারী ফের নেমেছে হত্যার আসরে? কে সেই হত্যাকারী? আখতার? কিন্তু হত্যার চেষ্টা করে কেউ চিরকুট রেখে নিজের নাম লিখে ঘোষণা করে যায়? ধুত্তোর! ঠিক এই সময়ে আরও একটা কথা মনে পড়তেই মাথা ঘুরে গেল জয়ন্তর। আখতারের ড্রেসিংরুমে নেমবুটাল ভর্তি শিশি থাকত। কারণ নিদ্রাহীনতা ছিল তার ক্রনিক ব্যাধি। আরুণির অপঘাত-মৃত্যুর কিছুদিন আগে নেমবুটাল ভর্তি শিশিটা চুরি গিয়েছিল তার ঘর থেকে। আরুণির মৃত্যু হওয়ার পর জানা গেল, তার জিনের বোতলে মেশানো ছিল নেমবুট।

আসলে হয়ত আদৌ চুরি যায় নি শিশিটা—সন্দেহের আওতা থেকে রেহাই পাবার জন্যেই সাফাই গেয়েছে আখতার!

কিন্তু আখতার খুন করবে কেন? প্রৌঢ়ার ওপরেও কি নজর দিয়েছিল লম্পট আরুণি?

আরও দুদিন পর সাংঘাতিক একটা কাণ্ড ঘটল ফিরোজা থিয়েটারে। জোর কদমে রিহার্সাল চলছে। তপন দোতলায় নিজের ঘরে স্বরলিপি ওলটাচ্ছে। এমন সময়ে পাংশুমুখে উঁকি দিল ক্যামেলিয়া—'ওকে দেখেছেন?'

'কাকে? ক্যাসানোভাকে?'

'হ্যাঁ। শরীরটা খারাপ করছে বলে হঠাৎ কোথায় যে গেল!'

'শরীর খারাপ ছিল? তাহলে বাড়ী গিয়েছে।'

'না, না। বাড়ী যাওয়ার হলে আমাকে বলত। দুজনের একসঙ্গেই যে বাড়ী ফেরার কথা।' বলতে বলতে ক্যামেলিয়া কেঁদে ফেলে আর কি। 'তপনদা ও কোথায় গেল?'

ক্যামেলিয়ার ভীতির কারণ অনুমান করা যায়। আরুণির রহস্যজনক মৃত্যুর এখনো কিনারা হয়নি। অথচ সুলতার প্রাণ নিয়ে টানাটানি আরম্ভ হয়ে গেছে। আবার মরণের ডংকা বাজায়নি তো হত্যাকারী? এবার হয়ত ক্যাসানোভার প্রাণ—

উঠে পড়ল তপন। উদ্বিগ্ন ক্যামেলিয়াকে নিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজল সারা ফিরোজা থিয়েটার। না, ক্যাসানোভা ফটক পেরোয় নি। অথচ থিয়েটারেও নেই। তবে গেল কোথায়? হনুমানের মত ছাদ থেকে লম্ফ দিয়ে চম্পট দেয়নি তো?

শেষের সম্ভাবনাটা এসেছিল জয়ন্ত গোয়েন্দার উর্বর মগজে। থিয়েটারেই হাজির ছিল সে নতুন কোনো সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টায়। ছাদ থেকে লম্ফ প্রদানের সম্ভাবনাটা মাথায় আসতেই খেয়াল হল, সব দেখা হয়েছে—শুধু ছাদটা দেখা হয়নি।

ছুট! ছুট! ছুট! জিরাফ-দৌড় দৌড়ে লম্বা লম্বা লাফ মেরে লোহার মই পেরিয়ে ছাদে পৌঁছোলো জয়ন্ত তপন আর ক্যামেলিয়া।

আরুণির ঘরের কড়িকাঠ ফুঁড়ে উঁচু স্কাইলাইট আর লিফট-এর কলকব্জা ঢাকা ছোট্ট শেডটার মাঝামাঝি জায়গায় মুখ থুবড়ে শুয়েছিল সুদর্শন ক্যাসানোভা। হাত কয়েক দূরে খানিকটা বমি। সারা দেহে কোনো চোট নেই। দেহে প্রাণ নেই। শুধু একটু ফিকে বিস্ময়

লেগে আছে রোমান্টিক মুখে।

ক্যামেলিয়া ফিট হয়ে গিয়েছিল। প্রাণহীন আর জ্ঞানহীন দুটি দেহকে লোহার মই বেয়ে নীচে নামানো হল অতি কষ্টে। জয়ন্ত বিদ্যুৎবাতির নীচে দেখল, ক্যাসানোভার জিভ অস্বাভাবিক ফোলা, চোখের পাতাও লাল এবং ফুলো, হাতের চেটো কর্কশ এবং খড়িওঠা আঙ্গুলের নখ ঘিরে সাদা পাটি। একজিমা থুৎনির নীচ থেকে ছড়িয়ে পড়েছে দুই গালে।

আর্সেনিক পয়জনিং। একদিনের বিষক্রিয়া নয়—দীর্ঘদিনের। সব কটা লক্ষণই তাই। বিশেষ করে চর্মরোগ। অথচ আগে একজিমা থাকায় অতটা গা দেয়নি ক্যাসানোভা। যদি দিত, চর্মরোগের অকস্মাৎ বিস্তার নিয়ে যদি ডাক্তার কনসাল্ট করত, তাহলে প্রাণটা বেঘোরে যেত না। বেচারা!

সন্দেহ এসে পড়ল ক্যামেলিয়ার ওপর। এ-ধরনের মেয়েরা সব পারে। স্ত্রী ছাড়া খাবারে বিষ মেশাবে কে? ঘেয়ো স্বামীকে বোধহয় মনে ধরেনি। তাই—

সুতরাং ভানুমতীর খেল নিয়ে অর্ধোন্মাদ জয়ন্ত গোয়েন্দা একজন ছোটখাট গোয়েন্দা মোতায়েন করল ক্যামেলিয়ার পেছনে। তারপর চলে এল আমার ডেরায় ইন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হয়ে। জরুরী অবস্থায় যোগাযোগের জন্যে আমার টেলিফোন নাম্বার দিয়ে এল ক্ষুদে গোয়েন্দাকে।

শুধু সেই জন্যেই বেঁচে গেল একটা প্রাণ!

এই পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করেছিল ইন্দ্রনাথ রুদ্র। এমন শান্ত সুন্দর স্বপ্নিল চোখে তাকিয়ে সিগারেট টানছিল যে মনে হচ্ছিল যেন কালিদাস, শেক্সপীয়ার, রবীন্দ্রনাথ একযোগে ভর করেছেন তার কল্পনাকেন্দ্রে। সবশেষে উদাস গলায় অবতারণা করেছে টিকটিকি প্রসঙ্গ। টিকটিকিটা ছাদের স্কাইলাইট দিয়ে এসে, কড়িকাঠ বরাবর হাঁটছিল।

ইন্দ্রনাথ তখন বলেছিল, টিকটিকিটাকেই যদি হত্যাকারীর হাত কল্পনা করা যায়, তাহলেই তো সমাধান হয়ে যায় হত্যা রহস্যর।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বিকট বিশ্রী গলায় চেঁচিয়ে জানতে চেয়েছিল জয়ন্ত গোয়েন্দা—'কি ভাবে? কি ভাবে? কি ভাবে?'.......

চেঁচামেচিতে বোধহয় ভড়কে গিয়েই অথবা ঘরের বাতাস অপছন্দ হওয়ায় ঠিক সেই মুহূর্তেই সুড়ুৎ করে স্কাইলাইট দিয়ে উধাও হয়েছিল টিকটিকিটা। ইন্দ্রনাথ সেইদিকে আঙ্গুল তুলে বলেছিল—'ঐভাবে।'

শুনে চেঁচাতেও ভুলে গেল জয়ন্ত গোয়েন্দা। পুলিশী হুংকার বিস্মৃত হয়ে অসহায়ের মত চাইল কবিতার দিকে, আমার দিকে। নীরবে যেন বলতে চাইল—দ্যাখো, তোমাদের ইন্দ্রনাথের ফচকেমিটা দ্যাখো। মরছি নিজের জ্বালায়, এখন কি ইয়ার্কি করবার সময়।

কবিতার শিরদাঁড়া কিন্তু সিধে হয়ে গিয়েছিল টিকটিকির দিকে ইন্দ্রনাথ আঙুল তুলতেই। অক্ষম লেখক স্বামীর এই সক্ষম গোয়েন্দা বন্ধুটিকে সে চেনে। ও জানে, প্রগলভ ইন্দ্রনাথ যখন সহসা দুর্বোধ্য হয়ে যায়, নিজেই একটা ধাঁধা হয়ে যায়, তখনি বুঝতে হবে ওর

ভেতরের ধাঁধা আর ধাঁধা নেই—সরল হয়ে গিয়েছে।

কন্দর্পকান্তি ইন্দ্রনাথ রুদ্রর ওপর তাই অবিচল আস্থা আর অপরিসীম ভক্তি আমার গৃহিণীর। বাইরে কিন্তু বিরাম নেই খুনসুটির। সম্পর্কটি ভারি মধুর, আমার বেশ লাগে ওদের কপট কলহ দেখতে।

ইন্দ্রনাথের টিকটিকি-ধাঁধা শুনেই তাই মুখিয়ে উঠল আমার সুন্দরী বধূ। ডাগর চোখে ঘুরিয়ে গোল মুখ আরও গোল করে যেন তুবড়ি ফোটালো শাণিত রসনায়—'ঠাকুরপো, তুমি মার্চ মাসে জন্মেছো নিশ্চয়? ঐ সময়ে রবি মীন চিহ্নে ছিল নিশ্চয়?'

হকচকিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ—'কেন? কেন? কেন?'

জিভের মোচড় দিয়ে অদ্ভুতভাবে ভেংচে বললে কবিতা—'কেন? কেন? কেন? কেন? ঐ সময়ে যারা জন্মায়, তারা মদ আর মাদক দ্রব্যে অত্যন্ত আসক্ত হতে পারে। তা কি মহাশয়ের জানা নেই?'

'কিন্তু—'

'কিন্তু আবার কি?' তেড়ে উঠল কবিতা—'কোকেন গাঁজার নেশা না থাকলে এই রকম একটা সিরিয়াস মোমেণ্টে টিকটিকি নিয়ে অর্বাচীনের মত কেউ কথা বলে?'

'আরে বৌদি,' অসহায় কণ্ঠস্বর ইন্দ্রনাথের—'সমস্যার সমাধান তো গল্প শুনতে শুনতেই করে ফেলেছি। তাই—'

'তাই বিভ্রান্ত জয়ন্ত ঠাকুরপোকে আরো বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছো? দর বাড়াচ্ছো, না?'

'কি মুস্কিল! কি মুস্কিল!'

'মুস্কিল আসান তা তোমার হাতেই বন্ধু,' গৃহিণীর হাতে বন্ধুবরের নাকানিচোবানির দৃশ্য দেখে ব্যঙ্গ কণ্ঠে বললাম আমি—'আরুণি যদি নিহতই হয়ে থাকে তো হত্যাকারীর নামটা বলে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়।'

'ধাঁ করে যদি বলেই দিলাম, তাহলে সাসপেন্স রইল কোথায়?'

'আইভরি থাকলে কিন্তু তখন তর সইত না,' টিটকিরি দিল কবিতা।

আইভরি মানে মিস আইভরি লাহা। ইন্দ্রনাথ রুদ্রর সুযোগ্যা সহকারিণী।

'শার্লক হোমক ক্লাব' মামলায় তার আবির্ভাব ঘটেছিল বিপুল বিস্ময়, কৌতুক আর রহস্যের মধ্যে দিয়ে। এক খোঁচাতেই কাজ হল।

দুহাত মাথার ওপর তুলে বলল ইন্দ্রনাথ—'আর না, বৌদি, সারেণ্ডার করছি। হত্যাকারীর নাম—

ঠিক সেই সময়ে ঝন ঝন করে বাগড়া দিল টেলিফোনটা। খপাং করে রিসিভার তুলল কবিতা, ধরন দেখে মনে হল রিসিভার ছুঁড়ে মারতে পারলেই বাঁচে তারের অপর প্রান্তের মানুষটিকে।'

'কাকে চাই? জয়ন্ত চৌধুরীকে? আছেন।'

লাফিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলল জয়ন্ত। মিনিটখানেক পরে নামিয়ে রাখল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে অদ্ভুত স্বরে—'আমার টিকটিকির ফোন। ক্যামেলিয়ার পেছনে গিয়েছিল ন্যাশানাল লাইব্রেরীর রিডিং রুমে। ক্যামেলিয়া সেখানে বিষবিজ্ঞানের বই নিয়ে আর্সেনিক পয়জনিংয়ের

চ্যাপ্টার খুলে পড়ছে। আশ্চর্য! ক্যামেলিয়ার মত মেয়ে মানুষ খুন করে?'

'মেয়েরা সব পারে', সুযোগটাকে লুফে নিয়ে কবিতার দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে যেন শোধ তুলল ইন্দ্রনাথ। 'ওরা দেবী হতে পারে, দানবীও হতে পারে।'

শ্লেষটা দাগ কাটল না কবিতাকে। বিমূঢ়কণ্ঠে ও বললে—'ক্যামেলিয়া? দুদিন যেতে না যেতেই নিজের হাতে বরণ করল বৈধব্য?'

পা নাচাতে নাচাতে বললে ইন্দ্রনাথ—'বলিহারি যাই মেয়েদের বুদ্ধিকে। বৌদি, সাসপেন্স কিন্তু শেষ হল না—সবে শুরু হল।'

'আবার সাসপেন্স!'

'কি করি বলো। আমি নিরুপায়। জয়ন্ত জীপ এনেছিস?'

'কেন?'

'আর একটা খুন ঠেকাতে হবে।' বলতে বলতে গম্ভীর হয়ে গেল ইন্দ্রনাথ। তপন-সুলতার টেলিফোন নাম্বার জানা আছে?'

'আছে।'

'ডায়াল কর.....কে ধরেছে?' বলতে বলতে সর্বাঙ্গ টানটান হয়ে উঠল ইন্দ্রনাথের।

রিসিভার নামিয়ে বলল জয়ন্ত—'একটু আগে একটা চিরকুট এসেছিল তপনের নামে। চিরকুটে বলা হয়েছে অমুক ঠিকানায় যেন এক্ষুনি চলে আসে তপন।'

'কে বলেছে?'

'জয়ন্ত চৌধুরী।'

'জয়ন্ত চৌধুরী! মানে জাল চিঠি। তুই তো এখানে,' বলতে বলতে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল ইন্দ্রনাথ। চুল খামচে ধরে বললে—'কি গাধা আমি! খামোকা সময় নষ্ট করলাম এতটা! এখুনি না বেরোলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। ঠিকানাটা মনে আছে?'

'আছে।'

'চল।'

দুড়দাড় করে দুই বন্ধু নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

ঠিকানায় যথাসময়ে পৌছোলো দুজনে।

বাড়ীটা ন্যাশানাল লাইব্রেরীর ধারে কাছেই। নির্জন পাড়া। বাড়ীটা দোতলা। একতলায় থাকে একটি পাঞ্জাবী পরিবার।

হুড়মুড় করে দোতলায় উঠল দুই গোয়েন্দা। ফ্ল্যাটের দরজায় তালা ঝুলছে বাতাস শুঁকে বলল জয়ন্ত—'হ্যারে, এ যে গ্যাসের গন্ধ!'

'তুই বাতাস শুঁকবি না, দরজা ভাঙবি?' খেঁকিয়ে উঠল ইন্দ্রনাথ। উৎকণ্ঠায় মেজাজ তিরিক্ষে হলে যা হয় আর কি।

জয়ন্ত দরজার পাল্লার দিকে চেয়ে বললে—'মজবুত দরজা রে। তার চাইতে তালাশুদ্ধ কড়া উপড়ে আনা যাক।'

বলে, জীপ থেকে হাতখানেক লম্বা একটা লোহার রড নিয়ে এল সে। কড়ায় ঢুকিয়ে সামান্য চাড় দিতেই খসে পড়ল কড়া।

নিস্তব্ধ ঘরগুলো যেন নিঃশব্দে হেসে উঠল ওদের উদভ্রান্ত মুখচ্ছবি দেখে। কোনও ঘরে কেউ নেই।

অথচ তীব্র হয়েছে গ্যাসের গন্ধ। বাকী ছিল একটা ঘর। রান্নাঘর। শেকল খুলে ভেতরে ঢুকতেই পাওয়া গেল তপনকে জ্ঞানহীন, কিন্তু তখনো প্রাণহীন নয়।

গ্যাসের চাবি বন্ধ করে দরজা জানলা খুলে দিল ইন্দ্রনাথ। পাখা চালিয়ে দিয়ে জল ছিটে দিতেই চোখ মেলল তপন। বলল তার আহাম্মকের মত আচরণ বৃত্তান্ত। জয়ন্ত চৌধুরীর হস্তলিপির সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না। তবুও শমন পেয়ে ছুটে এসেছিল এই ঠিকানায়। কারণ আর কিছুই নয়। ঠিকানাটি তার পরিচিত। সঙ্গে এনেছিল রিভলভার।

ঘরের দরজা ভেজোনো ছিল। ঢুকতেই পেছন থেকে ডাণ্ডা পড়ল মাথায়। তারপর আর কিছু মনে নেই।

রিভলভারটা? নেই। কোমরে নেই, ঘরের কোথাও নেই। যাওয়ার সময়ে হত্যাকারী নিয়ে গেছে হত্যার আর একটা হাতিয়ার।

ঘড়ির দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল তপন—'সর্বনাশ! আজকে যে আমাদের শো শুরু হচ্ছে। ইণ্টারভ্যালের পর থেকেই যে পিয়ানোয় বসতে হবে আমাকে।'

'এই অবস্থায়?' চটে গিয়ে বললে জয়ন্ত। 'প্রাণটা ফিরে পেয়েছেন স্রেফ ইন্দ্রনাথের বুদ্ধির জোরে। এখনো টলছেন আপনি। এখন বাজনা আসবে?'

'আসবে।' গোঁয়ারের মত দরজার দিকে টলতে টলতে এগিয়েছে তপন। 'আজকের প্রথম 'শো'য়ে হাজির আমাকে থাকতেই হবে।'

'শো' আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। চাপা উত্তেজনায় থমথম করছে ফিরোজা থিয়েটার গ্রীনরুম। তপন এখনো আসেনি।

ইন্টারভ্যাল হয়ে গেল। তবুও তপন এল না। নিঃসীম শংকায় ছেলে মানুষের মত কেঁদে ফেলল সুলতা। থিয়েটার কর্তৃপক্ষ শংকিত হলেন অন্য আশংকায়। দর্শকরা চেয়ারগুলো আস্ত রাখবে কি তপনের মিউজিক না শোনার পর? এতদিন ধরে ফলাও করে বহু বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে তপনের নাম দিয়ে। এখন? কিন্তু তপন এল। পর্দা ওঠবার আগেই ঝড়োকাকের মত সে এল। দুপাশে জয়ন্ত আর ইন্দ্রনাথ। ড্রেসিংরুমে গেল না। মেকআপও নিল না, এসেই বসল পিয়ানোয়। বিশাল হলঘর গমগম করে উঠল তার হাতের জাদুতে।

হারানো রিভলভারটা আবির্ভূত হল তার মিনিট কয়েক পরেই।

সহসা তপনের খেয়াল হল কোথায় যেন কি একটা গণ্ডগোল হয়েছে। ডাণ্ডার মার আর গ্যাসের বিষে মুমূর্ষু হয়েও সঙ্গীত-সুধায় সে চাঙা হয়ে উঠেছিল মিনিট কয়েকের মধ্যেই। আত্মবিস্মৃত হয়ে পিয়ানোর রীডের ওপর আঙুল চালনা করছিল ক্ষিপ্রবেগে।

আচম্বিতে ওর মনে হল সামনের সারির শ্রোতারা ঈষৎ উন্মনা হয়েছে। তাদের কান এখন পিয়ানোর দিকে নেই—সারি সারি চোখগুলো গেঁড়ির চোখের মত ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

সম্বিৎ ফিরতেই তপন দেখল বিস্ফারিত চোখগুলো তার দিকে নিবদ্ধ নয়—নিবদ্ধ

তার পেছন দিকে।

সুতরাং কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে তাকিয়েছিল তপন নিছক কৌতূহল বশে। এক পলকে যা দেখল কাজ হল তাইতেই। পিয়ানো ছেড়ে ছিটকে গেল তপন। একলাফে মঞ্চ থেকে প্রেক্ষাগৃহ, সেখান থেকে দরজা। পিস্তল নির্ঘোষটা শোনা গেল দরজায় পৌঁছোনোর আগেই। আশ্চর্য! এ-রকম নাটকীয় কাণ্ডর পর হট্টগোলে ফেটে পড়া উচিত ছিল প্রেক্ষাগৃহ। কিন্তু যুগটা নিওরিয়ালিজম্-এর। নাটকটিও নতুন। সুতরাং দর্শক সাধারণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাবল পিয়ানো ছেড়ে চম্পট দেওয়াটা বোধ হয় নাটকেরই অঙ্গ। ভাবল, নতুন চমক। অনেকে তো শতমুখে তারিফ করার জন্যে যুৎসই বুলি সাজাতে আরম্ভ করে দিল মনের মধ্যে।

কিন্তু সামনের সারির দর্শকরা ভ্যাবাচাকা খেয়ে ভাবল—তাইতো! এ আবার কি ধরনের নিওরিয়ালিজম! সিরিয়াস মুহূর্তে একী ছন্দপতন! তারা যে স্বচক্ষে দেখেছে রিভলভারটাকে পেছনের উইংসের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসতে। দেখেছে নলচের মুখে আগুন—শুনেছে ফায়ারিংয়ের পিলে চমকানো আওয়াজ।

বেশী কিছু বোঝবার আগেই পর্দা নেমে এসেছিল হুড়মুড় করে। বিদ্যুৎবেগে মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিল দুই গোয়েন্দা—ইন্দ্রনাথ আর জয়ন্ত। রিভলভার সমেত গ্রেপ্তার করেছিল—

ক্যামেলিয়াকে!

তপন? না, মরেনি। আহতও হয়নি। আনাড়ির বুলেট তাকে স্পর্শও করেনি।

নাটক আবার শুরু হয়েছিল। তপন ফের বসেছিল পিয়ানোর সামনে।

মৌজ করে সিগারেট সেবন করতে করতে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছিল ইন্দ্রনাথ—'ওহে সরকারী টিকটিকি, ক্যামেলিয়াকে যেন আরুণি-নিধন আর স্বামীবধের অপরাধে নির্যাতন করো না। দুদিনের মধ্যে বিধবা হয়েছে বেচারা, পাগল হতে বেশী দেরী নেই।'

আমতা আমতা করে বলেছিল জয়ন্ত—'মাই ডিয়ার ইন্দ্রনাথ, ক্যামেলিয়া কিন্তু তপনকে খুন করবার চেষ্টা করেছিল ডাণ্ডা মেরে, গ্যাস দিয়ে আর গুলি করে।'

'তাতো করবেই।' বলে আর দাঁড়ায়নি ইন্দ্রনাথ। ঊর্ধ্বশ্বাসে উধাও হতে হতে শুধু বলেছে—'ভানুমতীর খেল-এর ঐন্দ্রজালিকের নামটি যদি জানতে চাও কাল সকালে এসো মৃগাঙ্কর বৈঠকখানায়। কফি আর মাছের কচুরীর নেমন্তন্ন রইল। আর হ্যাঁ, সঙ্গে আনবে তপন আর সুলতাকে।'

মাছের কচুরীর পাহাড় বানিয়ে ফেলেছিল গৃহিণী। একদা বোম্বাই বাসিনী কোটিপতির দুহিতা যে পাচকশালায় প্রবেশ করলে ইন্দ্রের শচী হয়ে যায়—তা যে-না মাছের কচুরী চেখেছে, সে বুঝবে না।

উদগার তুলে হট কফিতে চুমুক দিল তপন। শুধোলো—'এবার বলুন ইন্দ্রনাথবাবু, আরুণিকে খুন করেছে কে?'

'আপনি', বলে কাঁচির নতুন প্যাকেট ছিঁড়ল ইন্দ্রনাথ।

ঠং করে একটা শব্দ হল। কাপ নামিয়ে রেখেছে তপন। চোয়ালটা শিথিল হয়ে ঝুলছে অদ্ভুতভাবে। আর, সুলতা অস্ফুট চীৎকার রোধ করার জন্যে হাত চাপা দিয়েছে মুখে।

ধীরে সুস্থে প্যাকেট ছিঁড়ল ইন্দ্রনাথ। দেশলাইয়ের খোলে ঠক ঠক করে ঠুকল সিগারেটের

প্রান্তদেশ। ঠোঁটে ঝুলিয়ে অগ্নিসংযোগ করল অপর প্রান্তে। বলল এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে—'আপনাদের অনেকেরই বিশ্বাস মিঠে চেহারার ঐ ক্যামেলিয়াই এতগুলি খুনের নায়িকা। বিশেষ করে তাকে যখন হাতে নাতে ধরা গেছে তপনবাবুকে খুন করার প্রচেষ্টায়। ঠিক কিনা?'

'দু'বার,' শুকনো গলায় বলল তপন, 'দুবার সে চেষ্টা করেছিল আমাকে প্রাণে মারবার।'

'খুব একটা অন্যায় করে নি। ও আপনাকে ঘৃণা করত। ঘৃণার কারণ আর কিছুই নয়। আমরা জানবার অনেক আগেই ও জেনে ফেলেছিল, তার স্বামীকে বিষ দিয়ে মেরেছেন আপনি।'

কাগজের মত সাদা হয়ে গেল তপন। বিন্দু বিন্দু ঘাম দাঁড়িয়ে গেল কপালে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আচ্ছন্নের মত। সুলতাও উঠে দাঁড়াল একই মুখচ্ছবি নিয়ে।

বিহ্বল কণ্ঠে বললে তপন—'আপনার তাহলে বিশ্বাস, আরুণিকেও মেরেছি আমি?'

'তা আর বলতে,' প্রসন্ন কণ্ঠে বলল ইন্দ্রনাথ। পরিহাসের বাষ্পও নেই কথার সুরে—'আরুণিকেও খুন করেছেন আপনি।'

সুলতা হিস হিসিয়ে উঠল সর্পিনীর মত—'আপনি......আপনি মানুষ না জানোয়ার?'

প্রত্যুত্তরে অ্যাসট্রেতে ছাই ঝাড়ল ইন্দ্রনাথ। বলল একই রকম হৃষ্টকণ্ঠে—'ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে ক্যামেলিয়া গিয়েছিল আর্সেনিক দিয়ে কিভাবে মানুষ খুন করা যায়, তা জানতে। তখনি সে জেনেছিল, চামড়ার মধ্যে দিয়েও আর্সেনিকের বিষ ক্রিয়া হয়। মনে পড়েছিল থুৎনির আর গালের একজিমা ঢাকবার জন্যে রোজ ঘণ্টাখানেক ধরে মেক আপ করত ক্যাসানোভা। আরও মনে পড়ল, যে ক্রীম দিয়ে মেক আপ করা হত, সেটি দান করেছিলেন আমাদের তপনবাবু। ক্রীমটিতে যে সাদা আর্সেনিক বোঝাই, তা আমি কাল রাতে REINSGH টেস্ট করে দেখেছি। থিয়েটার থেকে ক্রীমের নমুনা এনে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, জল, তামার তার আর বুনসেন বার্নার নিয়ে বসেছিলাম আমার এক কেমিস্ট বন্ধুর ল্যাবোরেটরীতে। ক্যামেলিয়া কিন্তু এক্সপেরিমেণ্টের ধার ধারেনি। মিথ্যে চিরকুট লিখে তপনবাবুকে নিয়ে গেছে নিজের ডেরায়। তারপর গ্যাস দিয়ে মারতে চেয়েছিল ভদ্রলোককে। জয়ন্তর স্যাঙাৎ যদি টেলিফোনে তার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বিষ বিজ্ঞান অধ্যয়নের সংবাদটি না জানাতো, তাহলে এতক্ষণে তপনবাবুর মড়া নিয়ে কাটা ছেঁড়া আরম্ভ হয়ে যেত পুলিশ মর্গে। শুনেই বুঝেছিলাম শোকে পাগল হয়ে গিয়েছে ক্যামেলিয়া। বাঘিণীসত্ত্বা জেগেছে। তাই ভয় পেয়ে দৌড়েছিলাম। ক্যামেলিয়া যাবার সময়ে তপনবাবুর রিভলভার নিয়ে পালিয়েছিল বোধ হয় নিজে মরবার জন্যে। কিন্তু তাঁকে জ্যান্ত অবস্থায় পিয়ানো বাজাতে দেখে গুলি ছুঁড়েছিল থিয়েটারের মধ্যেই।'

এতগুলো কথা বেশ খুশী খুশী স্বরে বলে থামল ইন্দ্রনাথ। তারপর বললে হাসি মুখে—'তপনবাবু, সুলতা দেবী, আপনাদের অহেতুক উদ্বেগের মধ্যে রাখতে চাই না। বসুন আপনারা। শুনে রাখুন, দু'দুটো মরণফাঁদ পাতা হয়েছিল ফিরোজা থিয়েটারে। দুটোকেই অপারেট করেছেন একা তপনবাবু। দুটোর মধ্যে একটা পাতা হয়েছিল অবশ্য শুধু তপনবাবুর জন্যেই।'

ঢোক গিলল তপন। সুলতার সাদা মুখে আবার রক্ত ফিরে আসতে দেখা গেল। নিজের মনেই বলল তপন—'দুটো মরণ ফাঁদ.....'

'হ্যাঁ। কারণ এ মামলায় হত্যাকারীর সংখ্যা দুই—এক নয়।'

'কি বলছ ঠাকুরপো? এতক্ষণে মুখ খুলল কবিতা। 'দুজন হত্যাকারী?'

'দুই হত্যাকারীই এখন মৃত,' শান্ত স্বর ইন্দ্রনাথের।

'আরুণি আর ক্যাসানোভা!' ছিপিখোলা সোডার বোতলের মত বিস্ময় ধ্বনি করল তপন।

'হ্যাঁ। ক্যাসানোভা খুন করেছে আরুণিকে। আরুণি আপনার প্রাণ নিতে গিয়ে নিয়েছে ক্যাসানোভার। ভাগ্যের কি পরিহাস দেখুন। মরবার পরেও ঘাতককে মেরে গেল আরুণি।'

কপালের ঘাম মুছতে মুছতে সুলতা বললে—'কিন্তু আমার ওপর চড়াও হওয়ার সখ হল কার?'

'ক্যাসানোভার। কারণ একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলেছিলেন ম্যারেজডিনারে। মনে পড়ছে?'

'বেফাঁস কথা! কী?'

'জয়ন্তকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তবে হাড়টা ভাঙল কি করে? কড়িকাঠের ধাক্কায়? উল্টো মাধ্যাকর্ষণ নাকি?'

'আমি তো বুঝতেই পারছি না সে কথার সঙ্গে—

'বুঝিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে ক্যাসানোভা বধের দুর্বোধ্য জায়গাগুলো বোঝবার চেষ্টা করা যাক। প্রথম থেকেই জানতাম ক্যামেলিয়া নির্দোষ। স্বামীকে সে ভালবাসত। খুন করা তার কল্পনাতীত। অথচ স্বামীর খাবারে বিষ মেশানোর সব চাইতে বেশী সুযোগ তারই। কিন্তু বিষ দেওয়ার জন্যে কেউ বিয়ে করে না। তাহলে? কাজটা অন্য কারো। আর্সেনিককে ক্যাসানোভার দেহে ঢোকানো হয়েছে অন্য কোনো পথে। কি পথে? ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল চামড়ার মধ্যে দিয়ে আর্সেনিক পয়জনিংয়ের নজীর নতুন নয়। বহুবিধ কসমেটিকস্ এর মধ্যে দিয়ে, বিশেষ করে ফেস ক্রীমের মাধ্যমে এ দুর্ঘটনা বহুবার ঘটেছে অতীতে। আরও মনে পড়ল, একজিমার দাগ ঢাকবার জন্যে মেক আপ নিয়ে মেহনৎ করাটা খুবই স্বাভাবিক ক্যাসানোভার পক্ষে। মনে পড়ল দানবীর তপনবাবুর ক্রীমদানের বৃত্তান্ত। নিজের অজান্তে বিষাক্ত ক্রীম দিয়ে মেরে ফেলেছেন ক্যাসানোভাকে। তাই বলছিলাম ক্যাসানোভার হত্যাকারী ওঁকেও বলা চলে।

'তপনবাবু, এই সব কারণেই প্রথমে আপনাকেই সন্দেহ করেছিলাম। কি হল? মন খারাপ হল নাতো? জানেন তো, আমরা গোয়েন্দারা ভূশণ্ডির কাক। সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ যেন—অন্ততঃ আমার লেখক বন্ধু মৃগাঙ্কর গল্পগুলো পড়ে এই রকম মিথ্যে ইমেজ খাড়া হয়ে যায়। আসলে তা নয়, আমরা সন্দেহ করি সবাইকেই। তারপর বাদ দিতে থাকি একে একে। আপনিও বাদ পড়লেন দুটি কারণে। প্রথমতঃ, আপনার অকুণ্ঠ সরলতা এবং প্রাণ খোলা কথাবার্তা। বিষাক্ত ক্রীমের জার জেনে শুনে কেউ অর্পণ করলে এতটা সহজ হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ ক্যাসানোভাকে মেরে আপনার লাভ কী? কিছু না।

ক্যামেলিয়াকে নিয়ে ক্যাসানোভার সঙ্গে আপনার কোনো প্রেমের ত্রিভুজ গড়ে ওঠেনি। ফলে, ওর ওপর কোনো বিদ্বেষ নেই আপনার। অবশ্য 'জ্যাক দি রিপারের' মত উন্মাদ খুনে যদি হন আপনি, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আপনার ড্রেসিংরুমে আরুণি গিয়েছিল নিজের জার থেকে বিষযুক্ত ক্রীম আপনার জারে চালান করতে। কিন্তু আপনি বুঝলেন উল্টো। আপনাকে বোঝানোও হল—ক্রীম ফুরিয়ে গিয়েছে আরুণির। তাই কাঁচুমাচু মুখে সটকে পড়ল ঈর্ষাকাতর নায়ক। এ-কাহিনীতে অবশ্য সে খল নায়ক। প্রতিযোগিতায় আপনার কাছে হেরে'—

'প্রতিযোগিতা কেন বলছেন? ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ জানায় সুলতা। 'প্রেমের? আমি কি তাকে প্রেম করতাম?'

'সরি। আমি তা মনে করিনি। যাই হোক, ঈর্ষার বিষে জ্বলেপুড়ে কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে গিয়েছিল আরুণি। বিষযুক্ত ক্রীম কিছুদিন ব্যবহার করলেই তপনবাবু অসুস্থ হতেন, ডাক্তার দেখাতেন, আর্সেনিক পয়জনিং ধরা পড়ত—কিন্তু এমনই পাথর চাপা কপাল লোকটার, হাতে নাতে ধরা পড়ল আপনার কাছে। তারপরেও বেচারীর বুদ্ধিশুদ্ধি তালগোল পাকিয়ে গেল আপনি দিব্বি সুস্থ থাকায়। ও হয়ত চেয়েছিল বিষযুক্ত ক্রীম ফিরিয়ে নিতে—কিন্তু কেন নেয়নি সে-রহস্য আমি উদ্ধার করতে পারিনি।'

'ঐ ঘটনার পর থেকে আমার জিনিসপত্র আলমারীতে তালা দিয়ে রাখতাম,' বলল তপন।

'ঠিক। ঐ জন্যেই সে ক্রীম পুনরুদ্ধার করতে পারে নি, অথচ ক্রীমের বিষাক্ত ফলাফলও দেখতে পায়নি।'

'সে জন্যে আমি কৃতজ্ঞ আমার স্ত্রীর কাছে,' বলল তপন। 'সেইদিনই ও নতুন ক্রীমের জার না আনলে ওকে আজ বিধবা হতে হত। তবে হ্যাঁ, ক্যামেলিয়া সধবা থেকে যেত।'

'সাময়িকভাবে থাকত,' বলল ইন্দ্রনাথ। আর্সেনিক পয়জনিংয়ে না মরলেও ফাঁসির দড়িতে মরত ক্যাসানোভা.....আরুণির অনেক আগে থেকেই ক্যাসানোভার শরীরে বিষ ঢুকতে শুরু করেছিল বলেই সন্দেহের আঁচ থেকে রেহাই পেয়েছেন তপনবাবু। নইলে ধরে নেওয়া যেত, আপনি ক্যাসানোভাকে খুন করেছেন এই কারণে যে ক্যাসানোভা জানত আপনি আরুণিকেও খুন করেছেন। কিন্তু আসলে তা তো হয় নি। আরুণির প্রাণপাখী উড়িয়ে দিয়েছিল একজনই—ক্যাসানোভা।'

কাষ্ঠহেসে বললে তপন—'কিন্তু আপনি যে বললেন আমিই—'

দমাস্ করে বেতাল শব্দ হল। ঝনঝন করে নেচে উঠল টেবিল ভর্তি কাপডিস প্লেট চামচ। দেখা গেল, বিপুল মুষ্ট্যাঘাত করেছে ইন্সপেক্টর জয়ন্ত চৌধুরী। আর চেঁচাচ্ছে গাঁকগাঁক করে—'কিন্তু কিভাবে? কিভাবে? কিভাবে?'

'এইভাবে,' বলে শুরু করল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

আরুণির ওপর ক্যাসানোভার বিতৃষ্ণার কারণটা আর একবার ঝালিয়ে নিই। সুলতাদেবী সেই দৃশ্যের উপসংহারটুকু দেখেছিলেন। ক্যামেলিয়াকে আরুণি ধর্ষণ করতে চেয়েছিল,

তাই না?'

মুখ লাল হল সুলতা দেবীর। কবিতা বললে—'মরণ দশা আর কি! কথার ছিরি ছাঁদ নেই।'

ইন্দ্রনাথ বললে—'তাই আরুণির প্রাণপাখীকে উড়িয়ে দেওয়ার সংকল্প নিল ক্যাসানোভা। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের প্রাণ পাখীটিও যাতে অকালে ফাঁসির দড়িতে না উড়ে যায়, তাই আটঘাট বাঁধল সে। উদ্ভট নাটক করে করে ব্রেনের মধ্যে তার গজগজ করছিল উদ্ভট বুদ্ধি, তাই—'

'নাটকটা আমার লেখা, গম্ভীর মুখে বলল সুলতা। এবং সেটা উদ্ভট নয়।'

'ঐ হল গিয়ে। তাই একটা বিটকেল প্ল্যান ডালপালা মেলে ধরল ক্যাসানোভার উর্বর মস্তিষ্কে। ওর প্রথম কাজ হল, কড়িকাঠে একটা হুক পেঁচিয়ে লাগানো, সেই হুক থেকেই পরে খলনায়ক আরুণিকে ঝুলতে দেখা গেছে। সুযোগের অভাব ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ঠাসহকারে সূচনা পর্ব সমাপ্ত করেছে ক্যাসানোভা। হুকটা আরুণির চোখে পড়লেও বিপদ নেই। হুক নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। আরুণিও নিশ্চয় ঘামায় নি।

এর পরের ধাপে বেশ খানিকটা নেমবুটাল জোগাড় করতে হল ক্যাসানোভাকে। আখতারের ঘর থেকে শিশি ভর্তি নেমবুটাল সরাতে বেগ পেতে হল না মোটেই। বেশ খানিকটা ড্রাগ জিনের বোতলে মিশিয়ে রেখে দিল আরুণির ঘরে। ভুল করল সেইখানেই। কেননা নেমবুটাল মেশাতে হলে বোতলের মদে মেশাতে হবে। অথচ বোতলটি পরে পাওয়া যাবে এবং সন্দেহের উদ্রেক ঘটাবে। তাই ক্যাসানোভার প্ল্যান ছিল নিশ্চয় কামফতে হওয়ার পর নেমবুটাল মিশোনো মদের বোতল সরিয়ে সেখানে নিরীহ জিনের একটা বোতল রাখা, কিন্তু বোতল পালটা-পালটি করার মুহূর্তটি যেই এল বেমালুম বিষয়টি বিস্মৃত হল ক্যাসানোভা। অতি বড় হুঁশিয়ার অপরাধীও কিছু না কিছু ভুল করে। ক্যাসানোভাও সাজানো আত্মহত্যার দৃশ্যে রেখে গেল মার্ডারের স্পষ্ট সূত্র।'

'যথা সময়ে বাইরে রেস্তোরাঁয় খেয়ে দেয়ে মাল টেনে ড্রেসিংরুমে এল আরুণি ফের জিনের বোতল ফাঁক করার সাধু অভিলাষ নিয়ে। ঘুমের ওষুধের কাজ শুরু না হওয়া পর্যন্ত সবুর করল তারপরে উঠে এল ছাদে বেশ খানিকটা দড়ি নিয়ে। ওঠবার সময়ে দেখে গেল, লিফট্‌টা প্ল্যানমাফিক দোতলাতেই আছে—একতলায় নেই। ও জানত, বুড়ো ইস্পাহানির লিফট-র কলকব্জায় হাত দিতে চায় না কখন বিগড়ে গিয়ে মাঝখানে আটকে যায় এই ভয়ে। অত রাতে ফিরোজা থিয়েটারে যে কেউ আসবে না—তাও জানত ইস্পাহানি। সুতরাং যেখানকার লিফট্, সেইখানেই রেখে সে তামাক খাবে নিজের ঘরে বসে, সেই ফাঁকে ঘরের স্কাইলাইটের কাছেই লিফট্ এর কলকব্জায় কেরামতি করতে পারবে ক্যাসানোভা।'

'বটে!' আচম্বিতে সটান হয়ে বসল জয়ন্ত।

'ঠাকুরপো! বুঝেছি,'—সবিস্ময়ে বলল কবিতা।

কিন্তু যেই আমি বিজ্ঞতা জাহিত করতে গেলাম, ইন্দ্রনাথ আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললে—'হ্যাঁ, ধরেছো ঠিক তোমরা। কিন্তু তপনবাবু যদি লিফট নাও চালাতেন, ক্যাসানোভা চালাত। তার কাজটা আপনি সেরে দিলেন দেখে সে অবশ্য অবাক হয়েছিল যথেষ্ট।

'দড়ির একটা প্রান্ত সে বাঁধল হয় লিফট-এর কলকব্জার সঙ্গে, না হয় লিফট্-এর মাথায়। দড়িটা কতখানি লম্বা রাখলে লিফট্-এর টানে আরুণির মুণ্ডু ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না, সেটা অবশ্য হিসেব করে মেপে রেখেছিল ক্যাসানোভা। তাই অপর প্রান্তটা গলিয়ে আনল স্কাইলাইটের ফোকর দিয়ে, ঝুলিয়ে দিল মেঝের ওপর। স্কাইলাইট দিয়েই আরও দুটি জিনিস ঘরে ফেলল সে। খানিকটা তুলো আর দুগাছা দড়ি। আগে থেকেই একটা উপযুক্ত উচ্চতার টুলও রাখা হয়েছিল ঘরের মধ্যে।

মঞ্চসজ্জা সম্পূর্ণ হল। নাটকের সংলাপ বা ঐ জাতীয় কিছু নিয়ে সফল নায়ক আরুণির সঙ্গে আলোচনার জন্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল আগে থেকে। কারো মনে সন্দেহ না আনার জন্যেই এই ব্যবস্থা। আরুণির ঘরে এল কাঁটায় কাঁটায় নটায়। চেয়ারে দাঁড়িয়ে একগাছি দড়ি বাঁধল কড়িকাঠের হুকে। অপর প্রান্তে রইল একটা ফাঁস। এমনভাবে ফাঁস তৈরি হল যাতে গিঁটটা চোয়ালের খাঁজে পড়ে।'

'এরপর আর একগাছি দড়ি বাঁধা হল আরুণির কোমরে। অন্য প্রান্তটা গলিয়ে আনল কড়িকাঠের হুকের মধ্যে দিয়ে এবং টান মারল হেঁইও বলে। নেমবুটালে অচেতন আরুণি দুলতে দুলতে উঠল শূন্যে। ত্রিশঙ্কুর মত তাকে শূন্য মার্গেই রেখে দড়ির প্রান্তটা বাঁধল দরজার কড়ায়। টুলটা এমন ভাবে রাখল হুকের নীচে যাতে আরুণির পায়ের ভর রইল টুলের ওপরে। আবার উঠল চেয়ারে। গলা ঘিরে তুলোর পটি দিয়ে মুণ্ডুটা গলিয়ে দিল ফাঁসের মধ্যে। তুলোর পটির ওপর আলতো করে এঁটে দিল দড়ির ফাঁস।

'সুইসাইড যারা করে, তাদের কেউ কেউ মৃত্যুকালেও একটু আরাম পেতে চায়। ক্যাসানোভার তাতে সুবিধে হল। কেননা, আরুণির মৃত্যুর যে সময় নির্ধারণ করেছিল ক্যাসানোভা, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে বাঁচিয়ে রাখার দরকার ছিল বই কি।

'চেয়ার থেকে নামল ক্যাসানোভা। আরুণির কোমর থেকে খুলল দড়ির বাঁধন। সঙ্গে সঙ্গে দেহটা হেলে পড়ল। পা রইল টুলে—ফাঁস রইল গলায়। কিন্তু দম বন্ধ হল না তুলোর দৌলতে। এ ভাবে অনেকক্ষণ বাঁচিয়ে রাখা যাবে আরুণিকে। দেহের খানিকটা ওজন টুলের ওপর পড়ায় গলায় ছাপ পড়ছিল অনেক কম।

'তারপর লিফট-এর সঙ্গে বাঁধা দড়ির প্রান্তটা তুলে আনল ক্যাসানোভা। বাঁধল আরুণির পায়ে। টাউজার্সের ক্রীজ নষ্ট হয়েছিল ঐ জন্যেই। পাটের ফেঁসো নিয়েও কতই না গবেষণা করেছে জয়ন্ত। একবারও খেয়াল হয়নি স্রেফ ধোঁকা দেওয়ার জন্যেই পায়ের চামড়ার ওপর না বেঁধে ট্রাউজার্স সমেত দড়ি বেঁধেছিল ক্যাসানোভা।

'এরপর টুলের পায়া ঘিরে একটা দড়ি জড়ালো ক্যাসানোভা। দড়ির দুটোপ্রান্তই বেঁধে রাখল স্কাইলাইটের শিকে। সবশেষে মুছল চেয়ারটা।

'কাজ শেষ। ঘর থেকে বেরিয়ে এল ক্যাসানোভা। রাত তখন সাড়ে নটা। ইস্পাহানি ওকে এগিয়ে দিল নীচতলায়। একটু অপেক্ষা করে ক্যাসানোভা গেল পাবলিক টেলিফোন বুথে। ফোন করল ডক্টর লুথ্রাকে আরুণির নাম নিয়ে। জরুরী দরকার, এখুনি আসতে হবে। একজন ডাক্তারকে অকুস্থলে হাজির না করলে এত আয়োজন ফেঁসে যেতে পারে। ডাক্তারের সার্টিফিকেট থাকা চাই এই মর্মে যে, হ্যাঁ ক্যাসানোভা বেরিয়ে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরে মারা গিয়েছে আরুণি। তিনি আসার মিনিট কয়েক আগেই তাঁর প্রাণ পাখী উড়েছে।

'থিয়েটারে ফিরে এল ক্যাসানোভা। বাড়ী থেকে থিয়েটারে আসতে ডক্টর লুথ্রার ক'মিটি সময় লাগে, সে হিসেব তার জানা। তাই ঠিক সময়ে থিয়েটারে এল সে লিফ্‌ট্‌টা নীচে নামিয়ে আরুণির দম বন্ধ করার জন্যে। কিন্তু গিয়ে কি দেখল? না আমাদের তপনবাবু তার হয়ে অপকর্মটি নিজেই করছেন অর্থাৎ লিফ্‌ট নামাচ্ছেন। ফলে আরুণিকে আর স্বহস্তে বধ করতে হল না ক্যাসানোভাকে।

'মাগো!' অস্ফুট কণ্ঠে বলল সুলতা। তপন কেবল ঢোঁক গিলল শুকনো গলায়।

'ঘাবড়াবেন না, তপনবাবু না জেনে যা করেছেন তার জন্যে আপনাকে দায়ী করা চলে না কোন মতেই। যাই হোক, লিফট নীচে নামতেই তিনতলায় আরুণির গোড়ালিতে বাঁধা দড়িতে টান পড়ল। টানের চোটে গোড়ালী গিয়ে পৌঁছোলো স্কাইলাইটের ইঞ্চি কয়েক দূরে। ঘাড়ের পেছনটা কড়িকাঠের কোণে লাগতেই মট করে ভাঙল সারভাইকালভারটিব্রা অর্থাৎ কশেরুকার একটা হাড়।

'চটপট ছাদে উঠল ক্যাসানোভা। স্কাইলাইটের ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে খুলে দিল গোড়ালীর বাঁধন। পেণ্ডুলামের মত দোদুল্যমান হল আরুণির লাস। দড়িটা টেনে নিল ক্যাসানোভা। শিকে বাঁধা দড়ির দুপ্রান্ত ধরে টান দিতেই উলটে পড়ল টুলটা। দড়ির একপ্রান্ত ধরে টেনে বার করে নিল ক্যাসানোভা। ঘরের মধ্যে ঝুলতে লাগল কেবল আরুণির দেহ।

'সুলতা দেবী, কি বেফাঁস কথা বলেছিলেন এখন বুঝছেন তো? জয়ন্তকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'হাড়টা ভাঙল কি করে? কড়িকাঠের ধাক্কায়? উল্টো মাধ্যাকর্ষণ নাকি? শুনেই টনক নড়েছিল ক্যাসানোভার। চোরের মন বোঁচকার দিকেই থাকে। ওর দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল, আপনি ওর গুপ্তরহস্য জেনেছেন। তাই পরলোকে যাওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ল আপনার।'

'কি বেইমান! বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমিই বিয়ে দিলাম ওদের—' সুলতা ফুঁসে উঠল।

ইন্দ্রনাথ ঝকঝকে চোখে তাকিয়ে বললে—'কি সুন্দর প্ল্যানখানা দেখেছেন। জটিল সন্দেহ নেই। কিন্তু পরিষ্কার তকতকে। খোঁচ নেই কোথাও। সমস্ত ঘটনাটা ঘটতে লেগেছে দশ মিনিট। ইস্পাহানির দরজা খোলা ছিল আগাগোড়া, তার চোখও ছিল এই দিকে। শুধু একটা খটকা লেগেছিল আমার। টুলটা উলটে পড়ার শব্দ শুনে ইস্পাহানি কেন উঠে আসেনি। এলে ক্যাসানোভার জবর সাক্ষী জুটতো। থিয়েটারে গিয়ে কারণটা আবিষ্কার করলাম। ইস্পাহানির বার্ধক্য হেতু কানে একটু কম শোনে। ক্যাসানোভার হিসেবে এ সম্ভাবনাটা ছিল বলেই ডাক্তারকে হাজির করেছিল টেলিফোন করে। কিন্তু ঘুণাক্ষরেই আঁচ করতে পারেনি, যাকে খতম করার জন্যে এত যোগাড়যন্ত্র তারই দেওয়া আর্সেনিক বিষে সে নিজেই খতম হয়ে চলেছে তিল তিল করে। একেই বলে ভগবানের মার, দুনিয়ার বার।'

ইন্দ্রনাথ থামল। উৎপাত-যন্ত্র টেলিফোনটাও যেন এতক্ষণ ধরে রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল ওর বচন মালা। রহস্যোদ্ঘাটন পর্ব সমাপ্ত হতে না হতেই এমন আওয়াজ করে উঠল যে কান ঝালাপালা হয়ে গেল ঘরশুদ্ধ সকলের।

ধরল কবিতা। বলল—'জয়ন্ত ঠাকুরপো, লালবাজারের ফোন। তোমার বস্‌।' বিপুল

উৎসাহে লম্ফ দিয়ে রিসিভার ধরল জয়ন্ত। কান পেতে শুনল কিছুক্ষণ, তারপর মেঘ গর্জনের মত বলল গুরুগম্ভীর গলায়—'কেস সেটল্‌ড্ হয়ে গেছে, স্যার। আমি আসছি।'

ইন্দ্রনাথ কাষ্ঠ হেসে বললে—'বাহাদুরিটা তুই-ই নিস্ রে। প্রোমোশন হবে। আর আমাকে দিস শুকনো ধন্যবাদ।'

'মাভৈঃ,' অভয় দিলাম। 'আমি তোকে দেব তুই যা চাস।'

'গল্পের নাম কি দেবে? বচন ফকিরের কল্কে?' টিটকিরি দিল কবিতা।

'ভানুমতীর খেল,' দরজার কাছ থেকে বলল জয়ন্ত এবং বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল ভোজরাজ কন্যা ভানুমতীর মতই। □

*'বিচিন্তা' পত্রিকায় প্রকাশিত। শারদীয় সংখ্যা, ১৯৭৩।

আফিং ও ইন্দ্রনাথ রুদ্র

ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে অনেক অপকর্মের নাড়ীনক্ষত্র জানতে হয়েছে, কারণ সে প্রাইভেট ডিটেকটিভ। তা সত্ত্বেও একটি কেস নিয়ে নাজেহাল হয়েছিল ইন্দ্রনাথ। হওয়াটা আশ্চর্য নয়। কেন না, এত জেনেও যা নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামাতে হয় নি তাকে, চাঞ্চল্যকর এই মামলার মূল রহস্য ছিল সেইটাই। আমি আফিংয়ের চোরাই কারবারের কথা বলছি।

বড়দিনের সময়ে সাধারণতঃ আমরা কলকাতায় থাকি না। শীতের আমেজ গায়ে লাগলেই মনটা উড়ু উড়ু হতে থাকে। বড়দিনের ক'টা দিন কোথাও না কোথাও কাটিয়ে আসি। একা কখনো যাই না। গৃহিণী কবিতা সঙ্গে তো থাকেই। সেই সঙ্গে বন্ধুবর ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

বছর কয়েক আগে এমনি একটা বড়দিন কাটাতে আমরা এসেছিলাম রাজস্থানে। মরুভূমির শীতের একটা আলাদা আমেজ আছে। ধু-ধু বালির দিকে তাকিয়ে মনটাও কেন যেন হু-হু করে ওঠে। আমার গিন্নী বলে, 'তুমি নির্ঘাৎ আরব বেদুইন ছিলে গত জন্মে।' আমি ওর থুতনি নেড়ে বলতাম—'আর তুমি ছিলে বেদুইন বউ?'

ইন্দ্রনাথ অমনি গলাখাঁকারি দিত পেছন থেকে। বলত—'ওহে কপোত-কপোতী, তোমাদের দস্যুবৃত্তির মধ্যে আমি কিন্তু ছিলাম না।'

মুখ টিপে হেসে কবিতা বলত—'তুমি দস্যু নও, তুমি তস্কর। রমণীকুলের চিত্ত লোপাট করতে অদ্বিতীয়।'

ছেলেমানুষ হয়ে যেতাম তিনজনেই। মরুভূমি আমাদের সব ভুলিয়ে দিত। আমরা ভুলে যেতাম আমাদের শিষ্টাচারের আড়ষ্টতা, ভুলে যেতাম কথা বলার ঠাটবাট। সহজ হয়ে যেতাম অন্তর পর্যন্ত। ফলে যে ধরনের ইয়ার্কি-ঠাট্টায় মত্ত হতাম, তা নিষ্পাপ মনেই করতাম।

দিনরাত পাপী-তাপীদের নিয়ে ঘেঁটে ঘেঁটে ইন্দ্রনাথ নিজেও চাইত সব কিছু ভুলে যেতে। কিন্তু এমনই কপাল, কোনবারেই তা সম্ভব হত না। একটা না একটা ভজঘট ব্যাপার এসে জুটতই। যেমন হল সেবার—রাজস্থানে।

বিকানীরে গিয়ে আমরা মরুভূমির রুখু চেহারা দেখে কবিতার পর কবিতা আওড়াচ্ছিলাম,

ইন্দ্রনাথ ওর কবি-কবি চেহারা নিয়ে বসে থাকত বালিয়াড়ির ওপর। হাওয়ায় চুল উড়ত। টানা-টানা স্বপ্নালু দুটি চোখে ও কিসের স্বপ্ন দেখত, তা ভগবানই জানেন। দেখে আমার মনটা কি-রকম হয়ে যেত। ব্যাচেলর হলেই কি অমনি হয়? আমিও এককালে ব্যাচেলর ছিলাম। বম্বের কোটিপতি কন্যার পাণিপীড়ন করার আগে আমিও নিঃসঙ্গ ছিলাম। কিন্তু ইন্দ্রনাথের একাকীত্বের জাত আলাদা। ওর মনের নাগাল পাওয়ার ক্ষমতা বোধকরি কোন নারীরই নেই। তাই ও চিরকুমারই রয়ে গেল।

সেদিন হঠাৎ কবিতা বায়না ধরল, 'ঠাকুরপো, চল উটে চড়ি।'

'চড়ে?' ভুরু কোঁচকালো ইন্দ্রনাথ।

'মরুভূমির ভেতর পর্যন্ত চলে যাব। যেখানে মোটর-সাইকেল যায় না, জীপ যায় না—সেইখানে চলবে আমাদের উট খপ খপ করে। আমরা উটের পিঠে বসে দুলব আর দুলব। গলা ছেড়ে গান গাইব। বালিয়াড়ির ঢেউ দেখব। ফণিমনসা আর কাঁটাঝোপ গুণব। সূর্যাস্তের রঙ মনে গেঁথে নেব। তারপর আবার ফিরবে আমাদের উট খপ খপ করে বালির টিলা পেরিয়ে। ভাল লাগবে না?'

কবিতার কথার সুরে কি যেন ছিল। জাদু বোধহয় একেই বলে। ঘরকুণো বাঙালি আমরা। কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারের নেশা কেন আমাদের রক্তে, এ প্রশ্নের জবাব পাই না। থর মরুভূমির দিকে তাকিয়ে ভাসা ভাসা দুটি চোখে দূর দিগন্তের ছবি দুলিয়ে কবিতা যা বলল, তা যেন আমাদেরই মনের কথা। আমরা যেন একই সুরে একই গান গেয়ে উঠলাম। সমস্বরে বললাম—'তাই ভাল। চল যাই।'

এলাম স্টেশনের কাছে। উটের আড্ডা সেখানে। সেইসঙ্গে জীপ আর মোটর-সাইকেল। অপরূপা কবিতার দুইপাশে দুই বঙ্গ-তনয় দেখে ছেঁকে ধরল ড্রাইভাররা। ওদের অনর্গল কথা থেকে এইটুকু বুঝলাম যে বাবুরা শুটিংয়ের জন্যে মরুভূমি দেখতে যাবেন তো? ফার্স্টক্লাস জীপ দেব, চলে আসুন। শুনলাম, শুটিং এখানে হামেশাই হচ্ছে। বিশেষ করে সত্যজিৎ রায় তাঁর 'গোপী গায়েন বাঘা বায়েন'-এর কিছু দৃশ্যগ্রহণ করতে এ অঞ্চলে এসেছিলেন। তারপর থেকেই বেঙ্গলীবাবু দেখলেই আর রক্ষে নেই।

অত কথায় আমরা আর গেলাম না। শুধোলাম—'উট আছে?'

হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওরা।

কবিতা এবার ওর দুর্গাপ্রতিমার মত বড় বড় দুই চোখ পাকিয়ে ঝঙ্কার দিল—'হাঁ করে দেখবার কি আছে? বলি, উট আছে?'

উট? এমনভাবে ওরা সাড়া দিল যেন উট জিনিসটা প্রাগৈতিহাসিক জন্তু—এ যুগে দুর্লভ। ডাইনোসর বা টেরোড্যাকটিস-এর মত উট প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলাও নিরাপদ নয়।একজন তো বলেই বসল—'উট কি হবে? উটের পিঠ একতলা উঁচু। পড়ে মরবেন নাকি? হাড়গোড় গুঁড়িয়ে যাবে যে।'

কবিতা গেল ক্ষেপে—'তাতে তোমার কি? আমরা উট চাই। উটের পিঠে চাপব, মরি মরব। তিনটে উট চাই। সারাদিনের জন্যে।'

ওরা অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রইল। দু-একজন নিজেদের মধ্যে ফিসফাসও করে নিল। তারপর শুনলাম, উট নামক জীবটা নাকি ইদানীং বিকানীরে বড়ই দুর্লভ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চাইলেই তা পাওয়া যায় না। সবুর করতে হবে।

রাগে গজ গজ করতে করতে আমরা ফিরে এলাম হোটেলে। কবিতা যদি নাগিনী হত, তাহলে নিশ্চয় আসবার সময় ছোবল বসিয়ে আসত উটের আড্ডায় কাউকে না কাউকে। কিন্তু কিছুই যখন করা গেল না, তখন আমরা গেলাম বিকানীর প্যালেসে। সেখানে পাথরের চত্বরে দাঁড়িয়ে নীচের শহরের দিকে তাকিয়ে আছি, দেখছি সাদা সাদা ঘিঞ্জি বাড়ির চেহারা আর ভাবছি সব দেশীয় রাজ্যেই কি একই দৃশ্য? চকমিলানো মার্বেল প্রাসাদ একজনের, ঝুঁকো বাড়ি সকলের?

এমন সময়ে কবিতা বলল—'ঠাকুরপো, বললে তো বলবে মেয়েদের মনে সন্দেহ লেগেই আছে। কিন্তু সেই সকাল থেকে একটা লোক আমাদের পিছু নিয়েছে। লোকটা এখানেও এসেছে।'

কবিতা কথাটা বলল যেন হাওয়াকে লক্ষ্য করে নীচের ঘিঞ্জি বাড়ির দিকে তাকিয়ে। ইন্দ্রনাথও কথাটা শুনল যেন হাওয়ার মুখে। দুজনের কেউই পিছন ফিরল না, এদিক ওদিক তাকাল না। অগত্যা আমিও যেভাবে দাঁড়িয়েছিলাম, রইলাম সেইভাবেই দাঁড়িয়ে।

ইন্দ্রনাথ বলল—'যদি কেউ পেছনে লেগে থাকে তো তোমার জন্যে।'

'অপরাধ?'

'তোমার উর্বশীরূপ। বিদেশ-বিভুঁয়ে বেরিয়ে রূপটাকে ঢেকে রাখলেই পার।'

'তুমি গোয়েন্দা না কচু।'

'কেন?'

'চোখ থাকতেও চোখ নেই। মেয়েদের এইজন্যই গোয়েন্দা হওয়া উচিত।'

'খুলে বল।'

'আমরা সোজা চলি। সোজা দেখি। কিন্তু পাশ থেকে কে আমাদের দেখে কি করছে, না তাকিয়েও বুঝতে পারি। যেমন এখন পেরেছি।'

'সে তো ভালো কথা। কিন্তু সে জন্যে আমি গোয়েন্দা না হয়ে কচু হতে যাব কেন?'

'যাবে এই কারণে যে লোকটা কার দিকে তাকিয়ে আছে তা তুমি দ্যাখনি—কিন্তু আমি দেখেছি।'

'কার দিকে তাকিয়ে?'

'তোমার দিকে।'

ইন্দ্রনাথ কোন জবাব দিল না। পকেট থেকে চন্দনকাঠের কাজ-করা সিগারেট কেস বার করল। একটা সিগারেট ঠোঁটের ফাঁকে আলগোছে ঝুলিয়ে নিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল। তারপর দেশলাই বার করে জ্বালতে গিয়ে কাঠি নিভে গেল। হাওয়া বোধহয় সামনে থেকে আসছে। তাই পেছন ফিরে হাত আড়াল করে কাঠি জ্বালতেই জ্বলে উঠল। সিগারেটও জ্বলল।

আমি দেখলাম, আঙুলের ফাঁক দিয়ে সেইসঙ্গে অদূরে মার্বেল ক্যানোপির কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকেও দেখা হয়ে গেল ইন্দ্রনাথের।

কাঠিটা ফেলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ।

বলল—'বৌদিকে ধন্যবাদ জানাই। আমার নাম কচু হওয়াই উচিত। লোকটা আমাকেই

নজরে রেখেছে।’

‘কিন্তু কেন?’ শুধোলাম আমি।

‘বুঝতে পারছি না। আমরা তিনজনেই এ অঞ্চলে বিদেশী। অথচ নজর আমার দিকে। তার মানে একটাই। লোকটা আমাকে চেনে। আমি কিন্তু ওকে চিনতে পারছি না।’

এই পর্যন্ত কথা হল বিকানীর প্যালেসে। এবার ফেরার পালা। মনটা আর ততটা হাল্কা নয়। রোমাঞ্চ-রোমাঞ্চ ভাবের সঙ্গে একটু দুর্ভাবনা তো আছেই। রাজপুতদের দেশে এসে না জানি কি ঝামেলায় পড়তে হয়।

হলও তাই। এঁকাবেঁকা পথে ফিরছে আমাদের অটোরিক্সা। মানে, তিনচাকার মোটর সাইকেল। আচমকা রাস্তার ওপর ডিনামাইট ফাটল।

পরে শুনেছিলাম, রাস্তা চওড়া করার জন্যে অমন ডিনামাইট নাকি হামেশাই ফাটছে শহরে। কখনো ফাটাচ্ছে মিলিটারী, কখনো অন্য কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সেদিনের ডিনামাইটটি কার দয়ায় সমস্ত রাস্তা জুড়ে ফাটল, সে হদিশ আর পাওয়া গেল না।

ফল হল সাংঘাতিক। বেগে ছুটছিল মোটর-সাইকেল রিক্সা, আচম্বিতে সামনে দেখলাম রাস্তা উড়ে গেল। তিনতলা বাড়ির সমান ধুলো আর ধোঁয়ার ফোয়ারা লাফিয়ে উঠল।

আর আমাদের অটোরিক্সা সোজা গিয়ে আছাড় খেল সেই গর্তে।

তারপর আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান ফিরলে দেখলাম রাস্তাতেই শুয়ে আছি। মাথা ভিজে গেছে রক্তে। রক্তটা আমার চাইতে আমার ড্রাইভারের বেশী। তার খুলি দু ফাঁক হয়ে গিয়েছে। মারা গিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

কবিতার হাত ভেঙে গিয়েছে। ইন্দ্রনাথ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। মাথা দিয়ে গড়াচ্ছে রক্ত।

আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে অনেকে। তার মধ্যে মিলিটারী দেখলাম, পুলিশ দেখলাম সাধারণ পথচারীও দেখলাম।

মাথার মধ্যে অত যন্ত্রণা নিয়েও চোখ সরাতে পারছিলাম না ইন্দ্রনাথের ওপর থেকে। ইন্দ্রনাথ......যে ইন্দ্রনাথ সহস্র বিপদ-ঝঞ্ঝায় চিরকাল অকুতোভয়, যে ইন্দ্রনাথ বহুবার বহুভাবে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা কষে হাসতে হাসতে কদলী দেখেছে যমালয়কে—সেই ইন্দ্রনাথ সামান্য একটা অ্যাকসিডেন্টের ফলে এমন হয়ে গেল?

হাসছিল ইন্দ্রনাথ। আপনমনে হাসছিল। শব্দহীন হাসি।

শব্দ ওর কণ্ঠেও আর জাগেনি।

ব্রেন শক! ডাক্তারেরা তাই বললে। মাথায় এমন চোট লেগেছে যে সহসা কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে ইন্দ্রনাথ রুদ্র। সেই সঙ্গে চিন্তার স্বচ্ছতাও। সংক্ষেপে পাগল হয়ে গিয়েছে দুরন্ত ইন্দ্র......সেই সঙ্গে হয়েছে বোবা।

সে কি কান্না কবিতার। খবর ছড়িয়ে পড়ল দেখতে দেখতে। সারা বিকানীর শহরে যেন জাদুমন্ত্রবলে রটে গেল, কলকাতার বিখ্যাত গোয়েন্দা ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে ডিনামাইট ফাটিয়ে কারা যেন বোবা করে দিয়েছে, উন্মাদ বানিয়ে ছেড়েছে। ‘মোমের হাত’ রহস্য

ভেদ করে ভারত সরকারের মুখোজ্জ্বল করেছিল যে ইন্দ্রনাথ রুদ্র, 'হীরামনের হাহাকার' প্রহেলিকায় অভূতপূর্ব মুন্সিয়ানা দেখিয়েছিল যে প্রাইভেট ডিটেকটিভ, মরুভূমির দেশে এসে সে ঘায়েল হয়েছে।

কিন্তু কাদের হাতে?

রহস্য রহস্যই রয়ে গেল। আমি ওকে কলকাতায় সরাতে চাইলাম। কিন্তু নতুন বিপদ দেখা দিল। একমুখ দাড়ি নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় টো-টো করত ইন্দ্রনাথ। এমনও গেছে রাতে ফেরেনি—সারাদিন ফেরেনি। তারপর আবার দেখা দিয়েছে লাল চোখ নিয়ে...মুখে সেই শব্দহীন হাসি। সরল চাহনি। মাঝে মাঝে কি এক আতঙ্কে বিস্ফারিত....তখন যেন চমকে চমকে উঠত অকারণে.....খুট শব্দ শুনলেই এমন করে উঠত যেন কানের কাছে আবার ডিনামাইট ফাটল।

জয়ন্তকে চিঠি লিখলাম। জয়ন্ত চৌধুরী। আমাদের কলেজবন্ধু। এখন পুলিশের দাসত্ব করে। চোর-ছ্যাঁচোড় নিয়ে কারবার। বিপদে-আপদে তিন বন্ধুই তিনজনকে স্মরণ করতাম। এবারও করতে হল। কেননা, ইন্দ্রনাথকে আমি বিকানীর থেকে সরাতে পারছিলাম না কিছুতেই। যার দেখা পাওয়াই ভার, তাকে স্টেশনে নিয়ে যাই কি করে?

জয়ন্ত এল যথাসময়ে। সব শুনল। ইন্দ্রনাথের সঙ্গেও দেখা হল। কিন্তু জয়ন্তকে যেন চিনি চিনি করেও চিনতে পারল না ইন্দ্রনাথ।

কি ভাবে যে দিন কেটেছে, ভগবানই জানেন। কবিতা প্রায় নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করেছিল ইন্দ্রনাথের ঐ শোচনীয় অবস্থা দেখে। কাকে সামলাই আমি? বন্ধুকে না, বউকে? আমার নিজের অবস্থাও যে শোচনীয়। নার্ভের সহ্যের একটা সীমা আছে তো।

জয়ন্ত স্থানীয় পুলিশ-মহলে গেল। উদ্দেশ্য ছিল ডিনামাইট বিস্ফোরণের কারণ অনুসন্ধান। ইন্দ্রনাথকে যে লোকটা পিছু নিয়েছিল, তার হদিশ পাওয়া গেছে কিনা, এ খোঁজও নিয়েছিল। খবর কিছুই পায়নি। পুলিশ মহল অন্য ঝামেলা নিয়ে নাকানি চোবানি খাচ্ছে। ডিনামাইট বিস্ফোরণ আর উধাও আততায়ী নিয়ে মস্তিষ্ক ঘর্মাক্ত করবার সময় তাদের নেই।

তবে চাঞ্চল্যকর একটা খবর নিয়ে এল জয়ন্ত। বালির দেশের সাজানোগোছানো সুন্দর এই শহরটিতে যে এমন অসুন্দরের কারবার চলছে, তা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি আফিং, মরফিন, হেরোইনের কথা বলছি।

বছরখানেক আগেই নাকি বোম্বাই, কলকাতা, দিল্লির পুলিশ-মহল আর আবগারী বিভাগের টনক নড়েছিল। রাতারাতি মাদকদ্রব্যের চোরাই চালান কেন যে এত বেড়ে গেল, তা ভাবতে ভাবতে চুল পাকবার উপক্রম হয়েছিল কেষ্ট-বিষ্টুদের। হোমরা-চোমরারা অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে, অনেক তদন্ত-টদন্ত করে জানতে চাইল মালটা আসছে কোত্থেকে? সমস্ত উত্তর ভারত তোলপাড় করে জানা গেল সেই তথ্য।

বিস্ময়কর তথ্য সন্দেহ নেই। প্রথমে সন্দেহ করা গিয়েছিল বোম্বাই আর কলকাতাকে। যত লটঘট ব্যাপার তো অপরাধের এই দুটি ডিপো থেকেই ঘটছে। কাজেই প্রচণ্ড চাপ এসে পড়েছিল দুই শহরের পুলিশ চাঁইদের ওপর। নাকে কি সরষের তেল দিয়ে ঘুমনো হচ্ছে? মরফিন-আফিং-হেরোইনে দেশ যে ছেয়ে গেল।

চাপে পড়ে খোঁজ-খোঁজ শুরু হল। তখনই জানা গেল চাঞ্চল্যকর খবরটা। ঘুণাক্ষরেও

যা কেউ কল্পনা করতে পারেনি, ঘটছে তাই। বড় শহর নয়, আফিং আর আফিংজাতীয় সব কিছুই বিপুল পরিমাণে চালান হচ্ছে বিকানীর শহর থেকে।

বিকানীর! যার নাম শুনলেই নেচে ওঠে টুরিস্টরা, চোরাই চালান আসছে সেই শহরেই। সেখান থেকে বিভিন্ন পথে মালটা ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেশে।

তবে কি টুরিস্টদের হাতেই আসছে চোরাই চালান? অসম্ভব। টুরিস্টরা আসছে কোত্থেকে? অধিকাংশই দিল্লী এবং বোম্বাই থেকে। অথচ পাকা খবর রয়েছে, মাল যাচ্ছে বিকানীর থেকে দিল্লী এবং বোম্বাইতে। ওদিকে থেকে এদিকে আসছে না।

তবে? তখন গবেষকরা বসলেন আফিংয়ের জাত নির্ণয় করতে। জানা গেল এ আফিংয়ের চাষ হয়েছে তুরস্কর মাটিতে। অর্থাৎ তুরস্কর আফিং মরফিন আর হেরোইনের আকারে ভারতে ঢুকছে বিকানীর দিয়ে।

কিন্তু কি ভাবে? এই নিয়ে পাগল হবার উপক্রম হয়েছে স্থানীয় পুলিশ। সুরাহা আর হচ্ছে না। তুরস্ক আর ভারতের মাঝে রয়েছে পারস্য, আফগানিস্তান, পাকিস্তান। তিন-তিনটে দেশ পেরিয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি হেরোইন ভারতে প্রবেশ করছে। অথচ পথটা কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না।

জয়ন্ত বলল—'মৃগাঙ্ক, আফিং থেকে যে ক'টা মাদক দ্রব্য তৈরি হয়, তার মধ্যে সবচাইতে মারাত্মক হল হেরোইন। আউন্স পিছু এব দাম নিউইয়র্কে তিনশো থেকে ছশো ডলার। প্যারিসেও তাই। ইণ্ডিয়ায় প্রতি আউন্স তিন হাজার থেকে ছ'হাজারে খুচরো বিক্রী হচ্ছে নীচের মহলে।'

শুনে হাঁ হয়ে গেলাম আমি। বললাম—'বল কি! তার মানে এক-এক চালানেই তো রাজা বনে যাওয়া যায়।'

'যায়ই তো। বিকানীর এয়ারপোর্ট থেকে একটা উড়োজাহাজ লেজের মধ্যে লুকিয়ে এক খেপে কত টাকার মাল নিয়ে গিয়েছিল জান?'

'কত টাকার?'

শুনে কথা আটকে গেল আমার। জয়ন্ত দেখলাম খুবই উত্তেজিত। বলল—'হিরোইনের যারা চোরাই চালান দেয়, তাদের একটা আন্তর্জাতিক দল আছে। নারকোটিক ব্যুরোর কাছে তাদের নামের লিস্টও আছে। নিউইয়র্ক থেকে চাপ এসেছে আমাদের ওপর। ইণ্ডিয়া ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছে হেরোইন পাচারের। ওরা বলছে, তুরস্কর আফিং ইরানের একটা ফ্যাক্টরীতে এসে হেরোইন হচ্ছে। সেখান থেকে ভারত হয়ে চলে যাচ্ছে বোর্নিও। বোর্নিও থেকে আরও ওদিকে। কি ফ্যাচাং বল তো!'

আমি বললাম—'ফ্যাচাং বলে ফ্যাচাং! কিন্তু তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথার দরকার কি ভাই? ইন্দ্রনাথকে নিয়ে পিট্টান দিতে পারলেই বাঁচি।'

জয়ন্ত বললে—'তাহলে তো হেরে ভূত হয়ে দেশে ফিরতে হয়।'

'হেরে ভূত হতে যাব কেন?'

'ইডিয়ট। ইন্দ্রনাথকে ঘায়েল করেছে যারা, তারা আঁচ করেছিল ইন্দ্রনাথ বিকানীর এসেছে ওদের ঘাঁটি খুঁজতে। বিকানীর পুলিশকে যারা থোড়াই কেয়ার করে, ইন্দ্রনাথকে তারা ভয় পেয়েছে। তাই চেয়েছিল পথের কাঁটা সরাতে। কিন্তু কি হতে কি হয়ে

গেল।'

খট করে একটা শব্দ হল। দেখি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রনাথ। কখন জানি ফিরেছে রাস্তা থেকে। কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল তাও জানি না। নিঃশব্দে হাসছে জয়ন্তর দিকে চেয়ে।

মুখের হাসিটা পাগলের হাসি, কিন্তু চোখের হাসিটা যেন কি-রকম।

দিন কয়েক পরের কথা।

কবিতার প্লাস্টার করা হাত নিয়ে ট্রেনের ধকল সইবে না বলেই বোধহয় জয়ন্ত কলকাতা যাত্রা স্থগিত রেখেছিল। বেরিয়ে যেত সেই সকালে, ফিরত রাতে। শুনতাম কলকাতা বোম্বাই দিল্লীর নারকোটিক স্কোয়াড ডিটেকটিভরা এসে রোজ গুলতানি করছে বিকানীরে। এমন কি লণ্ডন আর নিউইয়র্ক থেকেও দুজন এক্সপার্ট এসেছে চোরাই চালানের হদিশ বার করতে। কিন্তু ঘোল খেয়ে যাচ্ছে সবাই।

যে দিনের কথা বলছি, সেদিন সকাল থেকেই টিকি দেখা যায়নি ইন্দ্রনাথের। দুপুরের দিকে হন্তদন্ত হয়ে ফিরল জয়ন্ত। এসেই নাকে মুখে গুঁজে সেই যে বেরিয়ে গেল, সারা রাত আর পাত্তা নেই। যাবার সময়ে অবশ্য একটু অদ্ভুত হেসেছিল। বলেছিল, 'কাল সকালে একটা সারপ্রাইজ নিউজ দেব। তৈরি থাকিস।'

সুতরাং সারারাত জয়ন্ত না ফেরায় খুব দুশ্চিন্তা হয়নি। ধরে নিয়েছিলাম, হেরোইন নিয়ে নিশ্চয় সাতঘাটের জল খেয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে উন্মাদ ইন্দ্রনাথও নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় চোখ থেকে ঘুম উড়ে গেল। কর্তা-গিন্নী দুজনেই ঠায় বসে। রাগ হতে লাগল জয়ন্তর ওপর। আফিংয়ের পাহাড়ে ভারত চাপা পড়ে পড়ুক, তাতে আমাদের কি? ইন্দ্রনাথ আগে না আফিং আগে? চটপট কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ভাল ডাক্তার দেখালে এখনও হয়তো একটা অমূল্য ব্রেন রক্ষা পেতে পারে।

ছটফট করে কাটালাম সমস্ত রাত। ভোরের দিকে যখন নিজেই পুলিশ ফাঁড়ির দিকে যাব ভাবছি, এমন সময়ে একটা জীপ এসে থামল ফটকের সামনে।

পুলিশ জীপ। প্রথমে নামল জয়ন্ত। পেছনে ইন্দ্রনাথ রুদ্র। হাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট।

সিগারেট! ইন্দ্রনাথ ফের সিগারেট ধরেছে? অথচ ডিনামাইট বিস্ফোরণের পর থেকে সিগারেটের সঙ্গে ওর কোন সম্পর্কই ছিল না!

জয়ন্ত বলেছিল, একটা সারপ্রাইজ নিউজ দেবে। সে নিউজটা যে এমনি পিলে-চমকানো হবে, তা ভাবিনি।

ঘরে ঢুকল ওরা দুজনে। ঢুকেই নাটকীয় ভঙ্গিমায় জয়ন্ত বলল—'বন্ধুবর মৃগাঙ্ক এবং বন্ধুপত্নী কবিতা। তোমাদের প্রথমেই একটা সু-খবর জানাই। খবরটা হচ্ছে এই ঃ থ্রি চীয়ার্স ফর ইন্দ্রনাথ রুদ্র! হিপ হিপ হুররে! হিপ হিপ হুররে!! হিপ হিপ হুররে!!!'

কোটরাগত দুই চোখ নাচিয়ে ইন্দ্রনাথ শুধু হাসল। শব্দহীন হাসি। সিগারেটে জম্পেশ টান দিয়ে বসল সোফায়।

চিরকালই দেখেছি, অধিক উত্তেজনায় আমি তোতলা হয়ে যাই। বিয়ের আগে কবিতার কাছে কতবার হয়েছি। এখনও গিন্নীর মুখ-নাড়ায় মাঝে মাঝে হই। কিন্তু সেদিন তোতলা

হলাম ইন্দ্রনাথের ঐ পাগল মূর্তির মধ্যেও একটা অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করে।

জয়ন্ত মুখ টিপে হাসল। বলল—'মৃগ, আফিং-রহস্য ভেদ হল। কাল রাতে পুরো গ্যাংটা ধরা পড়েছে।'

'কোথায়?' যন্ত্রচালিতের মত প্রশ্ন করলাম।

'উটের আড্ডায়।'

'উটের আড্ডায়!' বলে ক্ষণেক হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। তারপর বিজ্ঞের হাসি হেসে বললাম—'তাই বল। উট আফিং বয়ে আনছিল। অথচ কেউ অ্যাদ্দিন দেখেনি।'

'উট আফিং বয়ে আনছিল—ঠিকই ধরেছিস।' বলে অদ্ভুত হাসল জয়ন্ত। 'তবে কেউ দেখেনি। দেখবে কি করে? ফ্লোরোস্কোপ করার বিদ্যে যে কারো জানা ছিল না।'

'কি কোপ বললি?'

'ফ্লোরোস্কোপ। মানে যা দিয়ে চামড়া ভেদ করে মেট্যাল ক্যাপসুলগুলো দেখা যায়।'

'মেটাল ক্যাপসুল! ফ্লোরোস্কোপ! ভাই জয়ন্ত, আমার মাথা ঘুরছে। একে সারা রাত জেগেছি। আর তার ওপর আর হেঁয়ালী ভাল লাগে না। কি হয়েছে খুলে বল। আফিং, উট, ফ্লোরোস্কোপ, মেট্যাল ক্যাপসুল—মানে কি এ-সবের?'

'হে লেখক, গাঁজাখুরী গপ্‌পো না বানিয়ে এ কেস নিয়ে দুকলম লিখো। সুনাম হবে। তুরস্ক থেকে পাকিস্তান পর্যন্ত এসে হেরোইন আর মরফিন কি ভাবে থর মরুভূমি পেরিয়ে বিকানীরে ঢুকেছিল তা জান?'

'জানবার জন্যেই তো আমি বসে।'

'উটের চলাচল মরুভূমির সীমান্তে খুব সন্দেহজনক কিছু নয়। তাই থর মরুভূমির ও-প্রান্তে ধাতুর ক্যাপসুল খাইয়ে দেওয়া হত উটদের। সাধারণ ক্যাপসুল নয়। ক্যাপসুলের ভেতরে থাকত হেরোইন আর মরফিন। উটের পাচকযন্ত্র যে কি বিদঘুটে, তা তোমার অজানা নয়। দীর্ঘদিন না খেয়েও শরীরের মধ্যে জমানো খাবার ভাঙিয়ে ওদের চলে যায়। মেটাল ক্যাপসুলগুলো অন্যান্য খাবারের সঙ্গে শরীরের মধ্যেই খাবার জমানোর খুপরীতে গিয়ে জমা থাকত। মরুভূমি পেরিয়ে বিকানীরে আসার পর উট মেরে খুপরির মধ্যে থেকে বার করে নেওয়া হত মেটাল ক্যাপসুল।'

'উট মেরে?'

'অবাক হওয়ার কি আছে? এক-একটা উট কত টাকার হেরোইন নিয়ে আসত জান?'

আমি নীরব।

জয়ন্ত বলল—'লাখখানেক টাকার কম তো নয়। কাজেই একটা উট মরলেও লাভের ভাগ এমন কিছু কমছে না। অথচ কারো চোখে পড়ছে না। তন্ন তন্ন করে সার্চ করেও কিছু ধরা পড়ছে না। ফ্লোরোস্কোপ কই?'

'ফের ফ্লোরোস্কোপ! বলছি না হেঁয়ালি করিস নি।' খেঁকিয়ে উঠলাম আমি। 'সারা রাত জেগে মাথার কি ঠিক থাকে?'

থতমত খেয়ে জয়ন্ত বলল—'বারে, হেঁয়ালি আর রইল কোথায়? সবই তো বললাম।'

'আজ্ঞে না, সব এখনো বলা হয়নি।'

'কি বাকী রইল বন্ধু?'

'উটকে সন্দেহ হল কেন?'

'বিকানীরে উট কমে গিয়েছিল বলে, উটের দাম হঠাৎ চড় চড় করে বেড়ে গিয়েছিল বলে, মরুভূমিতে বেড়াতে যাওয়ার জন্যে ইন্দ্রনাথ রুদ্র উট পায়নি বলে।'

'মরুভূমিতে-বেড়াতে-যাওয়ার-জন্যে-ইন্দ্রনাথ-রুদ্র-উট-পায়নি-বলে!' যেন আবৃত্তি করলাম....থেমে থেমে প্রতিটি শব্দ ওজন করে করে বললাম। তারপর বুঝি বিদ্যুৎ খেলে গেল মাথায়। বললাম সন্দিগ্ধ কণ্ঠে—'ইন্দ্রনাথ কেন বলবে? ইন্দ্রনাথ তো বোবা।'

আচমকা অট্টহাসি মানুষকে যে কি সাঙ্ঘাতিক চমকে দেয়, এতদিনে হাড়ে হাড়ে বুঝলাম।

কিঞ্চিৎ ধাতস্থ হয়ে দেখলাম ইন্দ্রনাথ রুদ্র হাসছে। হাসির ধমকে ফুলে ফুলে উঠছে সর্বদেহ। সশব্দ অট্টহাসি—নিঃশব্দ নয়।

ইন্দ্রনাথ রুদ্র হাসছে! শব্দ যার কণ্ঠ থেকে বিদায় নিয়েছিল ডিনামাইট বিস্ফোরণের পর মাথায় চোট পেয়ে, সে হাসছে।

হাসি থামিয়ে বলল ইন্দ্রনাথ রুদ্র—'তুই একটা প্রকাণ্ড গর্দভ। আমাকে যারা মারতে গিয়ে মারতে পারল না, তারা আবার আমাকে মরণ-মার মারত যদি না আমি বোবা আর পাগলের ভান করতাম। আমি বোবা নই, পাগল নই, কোনকালেই হই নি। কেবল অভিনয় করেছিলাম ওদের টিট করবার জন্যে। উদ্দেশ্য আমার সফল হয়েছে। এবার হে বন্ধু, চল গৃহে ফিরি।'

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, কবিতার সংজ্ঞাহীন দেহ লুটোচ্ছে সোফার নীচে। জ্ঞান নেই। অথচ দুই চোখে বইছে অশ্রুর ধারা। আনন্দ-অশ্রু! □

* 'সিনেমা জগৎ' পত্রিকায় প্রকাশিত।

মায়াবী মোটিভ

রহস্য নেই বলেই একে রহস্য-গল্প বলব না। রহস্য সৃষ্টিও করব না। শুধু এক গোয়েন্দার কাহিনী বলব। সরকারী গোয়েন্দা। এই কলকাতারই।

বিশ্ববন্ধু ব্যানার্জী মুচিপাড়া থানার ও-সি। ভদ্রলোক মাঝবয়সী। সুগঠিত দেহ। রোগা নন, মোটাও নন। দোহারা চেহারা বলতে যা বোঝায়। কানের পাশে এবং মাথার পেছনের চুলে সাদা রঙ ধরেছে। মুখটি ভারী। কিন্তু পায়াভারী নন। কথা মন দিয়ে শোনেন, নীরবে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন, সাধ্যমত উপকার করার চেষ্টা করেন। এ হেন সমাজহিতৈষী আদর্শ দারোগার প্রয়োজন প্রতিটি থানায়।

আমি গিয়েছিলাম একটা বড় রেফারেন্স নিয়ে আমার ভাইপোর একটি উপকারের আশায়। কিন্তু পরিচয় দেবার পর দেখলাম, রেফারেন্সের প্রয়োজন ছিল না। উনি আমাকে চেনেন।

বললেন "আপনি তো গল্প লেখেন?"

কোলের ওপর দু'হাত জড়ো করে মৃদু হেসে বললাম—"লিখি। আপনাদের নিয়ে।"

"কিন্তু কি জানেন মৃগাঙ্কবাবু, মাঝে মাঝে দু'একটা বাংলা গল্প পড়ে দেখেছি আপনারা ছেলে ভুলোনো গল্প লেখেন। যেমন, অমুক ডিটেকটিভ অমুক জায়গা থেকে একটা জিনিস কুড়িয়ে পেয়ে ঝট করে পকেটে রেখে দিল—সেইটাই নাকি একটা বড় প্রমাণ। কিন্তু সেটা সেইখানেই পাওয়া গিয়েছে, তার কি প্রমাণ? আপনাদের সখের গোয়েন্দা তা নিয়ে মাথা ঘামায় না।"

"মানছি। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের এত দুর্গতি এই কারণেই। আমরা কিছু না জেনেই লিখি। মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্স পড়ি না, ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের পাতা ওল্টাই না, ফোরেন্সিক সায়ান্স ল্যাবোরেটরীর দরজা মাড়াই না। অথচ লিখি।"

বিশ্ববন্ধুবাবু বললেন—"বিলেত আমেরিকার সব গল্পই কি এদেশে খাপ খায়? টেকনিক আলাদা, সমাজ আলাদা, আমরা আলাদা।"

"সেইজন্যেই আমি বিশ্বাস করি আপনাদের সঙ্গে না মিশে গোয়েন্দা গল্প লেখা উচিত নয়। শুধু কাহিনীর জন্যে নয়, আপনাদের না জেনে, আপনাদের স্বভাব চরিত্র না বুঝে, আপনাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না হয়ে যে গল্প লেখা হয়—তা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না কিছুতেই। তা ছাড়া সরকারী এই গোয়েন্দামাত্রই মুর্খ আর সখের গোয়েন্দারা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী—ট্র্যাডিশন ভাঙবার জন্যে আমি আপনাদের গৌরবময় দিকটা তুলে ধরবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি এক-আধটা গল্প লিখেছি। ইণ্ডিয়ান পুলিশ জার্নাল, ওয়ার্ল্ড ডিটেকটিভ এজেন্সীর মান্থলি বুলেটিন আর স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের একজন সুদক্ষ পুলিশ অফিসার আমাকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।"

বিশ্ববন্ধুবাবু টেবিলের ওপর দু'হাত রেখে ঘাড় কাৎ করে একমনে শুনছিলেন। আমি থামতেই বললেন—"আমিও আপনাকে একটা স্টোরি বলে হেল্প করতে পারি। জাল চেকের কেস। আমি তদন্ত করেছিলাম, সঙ্গে স্বপন ছিল—স্বপন চৌধুরী—এখন এ-সি-ডি-ডি-ওয়ান।"

ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের যে দুজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার, স্বপন চৌধুরী তাঁদের একজন। শুনে আগ্রহান্বিত হলাম। মুখে আর কিছু বললাম না। শুধু ঘাড় বেঁকিয়ে চোখ কুঁচকে তাকালাম।

বিশ্ববন্ধুবাবু বৈঠকী সুরে বললেন—"স্বপন তখন আমার মতই সাব-ইন্সপেক্টর। দুজনেই আছি ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টে। এমন সময়ে লণ্ডন ব্যাঙ্কে চব্বিশ হাজার টাকার একটা চেক ভাঙানো হল। বেয়ারার চেক। সইটা জাল। জালিয়াত টাকা নিয়ে চলে যাবার সাতদিন পর জানা গেল সইটা জাল।"

আমি বললাম—"লণ্ডন ব্যাঙ্ক? বলেন কি! এত বড় ব্যাঙ্কেও জাল সই ধরা পড়ে না? কোন ব্রাঞ্চ? চৌরঙ্গী রোড?'

"না। নেতাজী সুভাষ রোড। সইটা যে জাল, ব্যাঙ্কের কেউ ধরতে পারে নি। যার নামে অ্যাকাউণ্ট, তিনি টিম্বার মার্চেণ্ট। পাণ্ডু থেকে ওয়াগনে কাঠ এনে কলকাতায় কাঠের দোকানে চালান দেন। দিন সাতেক পরে অ্যাকসিডেণ্ট্যালি তিনি ব্যাঙ্কের স্টেটমেণ্ট দেখতে

গিয়ে দেখলেন, চব্বিশ হাজার টাকা নগদে তোলা হয়েছে। অথচ উনি জানতেন এ রকম কোন টাকা তোলা হয়নি। চেক নাম্বার মিলিয়ে চেক বইয়ের কাউন্টার পার্ট দেখতে গিয়ে দেখলেন—কাউন্টার পার্টই নেই। তার পরেরটাও নেই। মোট দুটো চেক ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে চেক বই থেকে।"

"একদম ভেতর থেকে?"

"হ্যাঁ। —ওভাবে চেক বার করে নিলে কারও পক্ষে ধরা সম্ভব নয়। টিম্বার মার্চেন্ট ভদ্রলোকও জীবনে ধরতে পারতেন না যদি না চব্বিশ হাজার টাকা খোয়া যেত। —যাক, যথাসময়ে আমরা হাজির হলাম। জানেন তো, তদন্তের শুরুতে সবাইকে সন্দেহ করতে হয়। কাউকে সাধু পুরুষ বলে মনে মনে ছেড়ে দেওয়াটাও অন্যায়। প্রাথমিক তদন্তে আমরা জেরা কনসেনট্রেট করলাম সেই সব লোকদের ওপর যারা টিম্বার মার্চেন্টের চেক সরানোর সুযোগ পেয়েছে।

"এরকম লোক পেলাম একজনকেই। টিম্বার মার্চেন্টের তিনি পি-এ। বয়স খুব একটা নয়। বছর পঁয়ত্রিশ। সুশ্রী। শ্যামবর্ণ। চোখে চৌকো ফ্রেমের বাহারি চশমা। খুব চটপটে। মিষ্টভাষী। মিশুকে এবং অতিশয় কাজের রোগ। ইকনমিক্সে এম-এ।

"টিম্বার মার্চেন্ট ভদ্রলোকের নাম কুঞ্জবিহারী গড়াই। লেখা-পড়া বলা বাহুল্য কম করেছেন, কিন্তু টাকা করেছেন প্রচুর। জঙ্গলের ইজারা নিয়ে বসে বসে টাকা রোজগার তো—টাকার ওপর মায়া মমতা তাই একটু কম। চেক বইটা যে সযত্নে লুকিয়ে রাখতে হয়, সে খেয়ালও ছিল না। রেখে দিতেন নিজের সেক্রেটারিয়েট টেবিলের বাঁদিকের ড্রয়ারে। কস্মিনকালেও ড্রয়ারে তালা দিতেন না। বিশ বছরের কাঠের কারবারে কখনো বিশটা পয়সাও খোয়া যায়নি ড্রয়ার থেকে—চেক হারাবার প্রশ্নই ওঠে না।

"পি-এ ছোকরার নাম প্রদ্যোল পাল। অল্প শিক্ষিত মালিকের প্রায় সব কাজ সে একাই করত। চেক লেখা, হিসেব রাখা—স-ব। চেক কে নিতে পারে, এই হাইপোথিসিস ধরে এগোতে গিয়ে পেলাম প্রদ্যোৎ পালকে। হাইপোথিসিস মানে, একটা কিছু অনুমান করে নিয়ে তদন্ত শুরু করতে হয়—নিশ্চয় তা জানেন।

"প্রদ্যোৎ ছোকরাকে যত জিজ্ঞেস করি, চেক দুটে সে নিল কখন, ততই সে নাকে কেঁদে বলতে লাগল—আমি সাতে নেই, পাঁচে নেই, কেন স্যার আমাকে কষ্ট দিচ্ছেন? সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না দেখে থার্ড ডিগ্রী প্রয়োগ করলাম।"

আমি সকৌতুকে বললাম—"থার্ড ডিগ্রী কিন্তু একটা সায়ান্স বললেও চলে। ঠিক মত অ্যাপ্লাই করতে পারলে সুফল ফলাবেই।"

থার্ড ডিগ্রী মানে যে কচুয়া ধোলাই, সুধী পাঠককে নিশ্চয় আর তা ব্যাখ্যা করতে হবে না।

বিশ্ববন্ধুবাবু গম্ভীর মুখে বললেন—"থার্ড ডিগ্রী সায়ান্স নয়। তবে যে যাই বলুক না কেন, থার্ড ডিগ্রী পৃথিবীর সব দেশেই আছে। সোজা আঙুলে ঘি না উঠলেই থার্ড ডিগ্রী দাওয়াই ছাড়ে সব মিঞাই।"

"ইট ইঝ অ্যান আর্ট।" আমি কিন্তু থার্ড ডিগ্রীর স্বপক্ষে লেগে রইলাম নাছোড়বান্দার মত। আসলে আমি মনে মনে বিশ্বাস করি, মারের মত ওষুধ আর নেই। শক্তের ভক্ত

প্রত্যেকেই!

বিশ্ববন্ধুবাবু বললেন, "থার্ড ডিগ্রী অনেক রকমের আছে। ধরুন চোখেব ওপর স্পট লাইট ফেলে জেরা করা। ঘর অন্ধকার করে প্রদ্যোল পালকে গোল হয়ে ঘিরে বসে এইভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেলাম। কিন্তু পেট থেকে একটা কথাও বার করতে পারলাম না। মাথার ওপর টপ টপ করে জলের ফোঁটা ফেললাম এক নাগাড়ে—তবুও মনোবল শিথিল হল না। শেষকালে টেবিলের ওপর হাত উপুড় করে রাখতে বললাম। আঙুলের নখের ডগায় জ্বলন্ত সিগারেটের ছেঁকা দিলাম। কোন মানুষ তিন সেকেণ্ডের বেশী সহ্য করতে পারে না। এক ছোকরা একটা মেয়েকে কিডন্যাপ করে লুকিয়ে রেখেছিল। বিস্তর আড়ং ধোলাই দেওয়ার পরেও যখন ঠিকানাটা কিছুতেই বার করা গেল না—তখন নখের ডগায় সিগারেট ধরলাম—দু সেকেণ্ডের মাথায় সে বললে—বলছি স্যার। কিন্তু প্রদ্যোৎ পালকে এই ট্রিটমেন্টেও নোয়াতে পারলাম না। তখন সন্দেহ হল, ছোকরা হয়ত সত্যিই নির্দোষ অথবা রাম দুঁদে।

"ছেড়ে দিলাম প্রদ্যোৎ পালকে। ব্যাঙ্ককে জানিয়ে দেওয়া হল, আর একটা চেক ভাঙাতে আসামী আসতে পারে। চেকের নাম্বার মুখস্থ করে রাখল কাউণ্টার কর্মচারীরা।

"মাস কয়েক কেউ এল না। আমরাও হাল ছেড়ে দিলাম। এ রকম কত কেসই শেষ পর্যন্ত আনসলভ্ড থেকে যায়। এ কেসেরও সুরাহা কখনই সম্ভব নয়। কোন ক্লু নেই। ধরব কাকে?

"সুতরাং আমি স্বপন কেসের কথা ভুলে গেলাম। টিম্বার মার্চেন্ট কুঞ্জবিহারীবাবুও টাকার শোক ভুলে গেলেন। প্রদ্যোৎ পালও আমাদের আতংক কাটিয়ে উঠল।

"ঠিক এই সময়ে এন এস বসু রোডের লণ্ডন ব্যাঙ্কে আবার এসে পৌঁছল ছত্রিশ হাজার টাকার একটা বেয়ারার চেক। এত মাস পরে কাউণ্টার ক্লার্কদের মনে রাখার কথা নয় চেক নাম্বারটা। রোজ অমন কত চেক আসছে। কিন্তু দৈবক্রমে যার হাতে চেকটা ভাঙাবার জন্যে এগিয়ে দেওয়া হল—সেই ভদ্রলোকের হঠাৎ কি ভাবে জানি মনে পড়ে গেল নাম্বারটা।

"কিন্তু চমকে উঠলেন না। ভাবান্তর দেখালেন না। স্বাভাবিকভাবে যেমন সবাইকে বলেন, সেই ভাবেই বললেন—আপনার সই?

"চেক যিনি এনেছিলেন, তিনি রীতিমত সুদর্শন পুরুষ। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স। গায়ে টেরিলিনের দামী স্যুট, পায়ে বাটা কোম্পানীর সবচেয়ে দামী জুতো, হাতে হীরের আংটি, মুখে পাইপ। পাক্কা সাহেব বললেই চলে।

"প্রশ্ন শুনে নীরবে ঘাড় হেলিয়ে জানালেন—হ্যাঁ।

"পেছনে আর একটা সই করুন।—খুব সহজভাবেই বললেন কাউণ্টারের ভদ্রলোক। সবাইকেই বলেন। কিন্তু এঁকে বলার পর যেই দেখলেন কলম বার করে ঘাড় হেঁট করে সই করছেন দিশী সাহেবটি, অমনি চোখের ইঙ্গিতে দূরের দারোয়ানকে জানালেন গেট বন্ধ করতে।

"কিন্তু জ্ঞানপাপী যে, তার চোখ সব দিকেই থাকে। কাউণ্টার থেকে চোখের নির্দেশ কোন দিকে গেল, চোখের কোণ দিয়ে তা দেখেই দিশী সাহেব সই না করেই দৌড়

দিলেন দরজার দিকে।

“কিন্তু এইখানেই লণ্ডন ব্যাঙ্কের চরম এফিসিয়েন্সির পরিচয় পাওয়া গেল। মাস কয়েক আগে জাল সই যারা ধরতে পারেনি তারাই চক্ষের পলকে দেখিয়ে দিলে জালিয়াতকে কিভাবে ধরতে হয়। মুহূর্তের মধ্যে বেজে উঠল অ্যালার্ম বেল—এক সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল সব কটা দরজা। ধরা পড়ল দিশী সাহেব।

“কিন্তু চেকটা তখন তার হাতে নেই। গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝেতে। আমরা খবর পেয়ে দৌড়ে গেলাম। গিয়ে তার তম্বি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। পরিচয় শুনে আরো অবাক হলাম। ভদ্রলোক নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের কনট্রোলার অফ ওয়াগন্স্। হেডকোয়ার্টার পাণ্ডুতে। পরিচয়পত্র পকেটেই ছিল। নাম, হীরকবরণ মুখার্জী।

“সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের পর্যন্ত সন্দেহ হল—এ কাকে ধরতে কাকে ধরে বসল ব্যাঙ্কের দারোয়ান? হীরকবরণও হম্বিতম্বি করে বললেন—হোয়াট ননসেন্স! কে না কে চেক জাল করেছে তার আমি জানি কি? আমাকে কেন আটকাচ্ছেন?

“কুণ্ঠিত গলায় স্বপন বললে—খুবই অন্যায় হয়েছে। কিন্তু আপনি কেন আজ ব্যাঙ্কে এসেছিলেন?

“চেক ভাঙাতে নিশ্চয় নয়।

“তবে?

“বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।

“ব্যাঙ্কে কাজ করেন?

“হ্যাঁ। বিল ডিপার্টমেণ্টে।

“নাম?

“জিজ্ঞেস করবেন তো? করুন না।—দোয়েল দত্ত।

“তৎক্ষণাৎ খবর গেল বিল ডিপার্টমেণ্টে। সত্যিই দোয়েল দত্ত নামে এক ভদ্রলোক কাজ করেন সেখানে। কেরাণীর কাজ। সেকশন ইনচার্জও নন। তলব পেয়ে এলেন আমাদের সামনে। মাথায় প্রায় সবটুকু টাক দখল করেছে—বয়স সেইজন্যেই বেশী মনে হয়। ফর্সা। পুরু ঠোঁট। নেয়াপাতি ভুঁড়ি আছে। নিশ্চিন্ত, তৃপ্ত মুখচ্ছবি। সেই মুহূর্তে ঈষৎ উদ্বিগ্ন পুলিশের সামনে আসায়। চেক জালিয়াৎ ধরা পড়েছে। ব্যাঙ্কের সবাই জেনে গিয়েছিল—ইনিও জেনেছেন।

“ঘরে ঢুকেই স্বভাবতই আগে কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্যে চাইলেন হীরকবরণ মুখার্জীর দিকে। ক্ষণেক পিট পিট করে চেয়ে যেন কুয়াশার মুখ দিয়ে অনেক দিন আগেকার চেনা মুখ আবিষ্কার করলেন।

“বললেন অবাক কণ্ঠে—হীরক না?

“কনট্রোলার অফ ওয়াগন্স্ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আমাদের দিকে চাইলেন। দোয়েল দত্তর প্রশ্নের জবাব দেওয়ার দরকার আছে বলেও মনে করলেন না।

“আমি বললাম দোয়েল দত্তকে—বসুন।

“হীরকবরণ আর আমাদের দিকে পর্যায়ক্রমে চেয়ে বসে পড়লেন দোয়েল দত্ত। ভদ্রলোক শান্তিপ্রিয়। তাই অস্বস্তি পেয়ে বসেছে লক্ষ্য করলাম।

“এঁকে চেনেন দেখছি। কি সূত্রে চেনেন?—আমার প্রশ্ন।

“ক্লাস ফ্রেণ্ড। আরামবাগে একসঙ্গে পড়তাম। এক ক্লাশে।

“স্কুল ফ্রেণ্ড?”

“আজ্ঞে।

“কত বছর আগে?

“তা প্রায় বিশ বছর।

“আপনি এখন কোথায় থাকেন?

“বেলেঘাটায়।

“আর উনি কোথায় থাকেন?

“তা তো জানি না।

“হীরকবরণ মুখার্জী কথা বলতে গেলেন। হাতের ইঙ্গিতে নিরস্ত করলাম।

“কেন জানেন না? আপনার বন্ধুতো। বিশ বছরের বন্ধু।

“দেখুন, বিশ বছর আগে এক ক্লাশে পড়েছি বলেই বিশ বছর পরে কে কোথায় থাকে জেনে রাখতে হবে তার কোন মানে নেই।—দোয়েল দত্ত নিজেকে কোণঠাসা মনে করে নিয়ে কাটা-কাটা গলায় বললেন।

“আমি সুর নরম করে বললাম—তা ঠিক। কিন্তু আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য হল আপনাদের মধ্যে বন্ধুত্বটা কোন্ পর্যায়ে তা আবিষ্কার করা।

“কথাটা শুনেই চাবুক খাওয়ার মত চমকে উঠলেন দোয়েল দত্ত। চোখের তারা দুটো আকারে বড় হয়ে গেল প্রশ্নের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝে।

“তা হলে আপনি কি বলতে চাইছেন জাল চেকের ব্যাপারে আমার হাত আছে।

“আমি কিছু বললাম না।

“দোয়েল দত্ত ঈষৎ তীব্র কণ্ঠে বললেন—জানেন বিশ বছরের মধ্যে হীরক আমার কাছে এসেছে বড় জোর দুবার?

“খবরটা আগ্রহের সঞ্চার করল আমাদের মনে।

“দুবার? মাত্র?

“আজ্ঞে হ্যাঁ,—দোয়েল দত্তর স্নায়ু যে মোটেই শক্ত নয়, রেগে ওঠা দেখে তা বুঝলাম—“যখন ওর চাকরী ছিল না আর আমার চাকরী হয়েছিল—এইখানে—তখন একবার। তারপর যখন রেলে কি একটা বড় চাকরী পেয়ে চলে গেল—তখন আর একবার।

“হীরকবরণ মুখার্জী এতক্ষণ কথা বলার সুযোগ না পেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। এবার হাত তুলে যেই কথা বলতে গেছেন, আমি বললাম—আপনি এখন কথা বলবেন না। শুনতে দিন—দোয়েলবাবু, শেষবার হীরকবাবু যখন এসেছিলেন, সেটা কত বছর আগে?

“মনে মনে হিসেব করে নিয়ে দোয়েল দত্ত বললেন—প্রায় সতেরো আঠারো বছর আগে।

“আশ্চর্য! এত বছর পরে দেখেও চিনতে পারলেন?

“চিনতে একটু অসুবিধে হয়েছিল। কেননা, হীরক কখনো সুট-টাই পরত না।

“এখন পরেন, বড় চাকরী করেন বলে—খুবই বড়।—শেষ শব্দ দুটোয় যে অহেতুক মোচড় দিই নি, হীরকবাবুর মুখে তার প্রতিক্রিয়া দেখেই বুঝলাম।

“উষ্ণকণ্ঠে বললেন হীরকবরণ মুখার্জী—আজ্ঞে হ্যাঁ, খুবই বড়। আপনার চাকরীর চাইতেও বড়। ট্রাঙ্ককলে জানলেই পারেন!”

“জানব—যথাসময়ে। আপাতত শুধু বলুন, যে বন্ধুর সঙ্গে আঠারো বছর যোগাযোগ রাখেননি, আজ কেন তার সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

“এমনি।

“কোন কাজ না নিয়ে?

“কাজ নিয়ে কেউ আড্ডা মারতে আসে না।

“আপনার মত বড় অফিসার অফিস টাইমে একজন কেরাণী বন্ধুর সঙ্গে আঠারো বছর পরে আড্ডা মারতে এসেছেন—আশ্চর্য নয় কি? দোয়েলবাবু আপনাকে কেরাণী বলছি বলে কিছু মনে করবেন না। কিন্তু আপনারও কি খটকা লাগছে না পদমর্যাদায় স্ফীত যে বন্ধু আঠারো বছর আপনার ছায়া মাড়ায়নি মর্যাদার হানি ঘটবে বলে, আজ সে হঠাৎ আড্ডা মারতে এল কেন?

“দোয়েল দত্ত চতুর ব্যক্তি। বুঝলেন, জল কোন দিকে গড়িয়েছে। তিনি সন্দেহমুক্ত। কিন্তু হীরকবরণ জড়াতে চাইছেন তাঁকে!

“তাই ঈষৎ কঠিন কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ লেগেছে।

“গতবারও যদি ধরা পড়তেন, একই সাফাই গাইতেন হীরকবাবু, তাই না? অ্যালিবি রেডি করেই এসেছিলেন।

“গতবার ধরা পড়তাম মানে? হোয়াট দি হেল ইউ মীন?

“আই মীন ইউ আর এ পাক্কা ক্রিমিন্যাল, মিঃ হীরকবরণ মুখার্জী,—চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম আমি।—“চব্বিশ হাজার টাকরা চেকে সই জাল করে ভাঙিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত বুকের পাটা যার-তার থাকে না।

“মুখ লাল হয়ে গেল কনট্রোলার অফ ওয়াগন্‌সের।—“স্পীক প্রপারলি। আপনার মত পেটি পুলিশ অফিসারের তক্তা নড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আমার আছে জানবেন।

“বিনীতকণ্ঠে বললাম—জানলাম। আপনিও জানুন, এই মুহূর্ত থেকে আপনি আনডার অ্যারেস্ট। রেডিওগ্রাম পাঠাচ্ছি পাণ্ডুতে। জবাব এলে তারপর দেখা যাবে।

“রেডিওগ্রামের জবাব আসতে সাত আট দিন দেরী হবে ভাবিনি। বসেও থাকিনি। সমানে জেরা করে গিয়েছি কনট্রোলার অফ ওয়াগন্‌স্‌কে।

“প্রথম দিনের কথা বলা যাক।

“একরাত পুলিশ হাজতে থেকে মুখটা একটু শুকিয়ে গেলেও মেজাজটা একটু গরম হয়েছে দেখলাম হীরকবরণ মুখার্জীর। তেল শুকায় সব মিঞারই লক-আপে রাত্রিবাস করলে। পাঁচরকম থার্ডক্লাস ক্রিমিন্যাল, প্রজাদের গন্ধ এবং উদ্বেগ—ভদ্রসন্তানরা সইতে পারে না।

“কিন্তু হীরকবরণ মুখার্জীর ধাত খুব কড়া। খুব বেশী টসকান নি।

“টেবিলের সামনে থেকে ইচ্ছে করে সব চেয়ার সরিয়ে নিয়েছিলাম। দাঁড়িয়ে রইলেন

হীরকবরণ। তীব্র চোখে পর্যায়ক্রমে চাইতে লাগলেন আমার আর স্বপনের দিকে। আমরাও টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে টকটক করতে নিরীক্ষণ করলাম তাঁর মুখচ্ছবি। দেখলাম, হীরকবরণের চোখে একটা চাপা তীক্ষ্ণতা আছে। না রাগলে তা প্রকাশ পায় না। এ জাতীয় তীক্ষ্ণতা বাজপাখির চোখের দিকে চাইলে দেখা যায়।

"বললাম—ভাল আছেন?

"ডেকেছেন কেন?

"রেগে আছেন মনে হচ্ছে?

"সমুদ্র দেখেছেন?

"কি কথার কি জবাব। সাবধানে বললাম—দেখেছি। আপনি?

"আমি নিজে সমুদ্র। এমনিতে শান্ত—ঝড় উঠলে ভয়ংকর। আমার রাগের নমুনা যথা সময়ে টের পাবেন। প্রেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া আমার কলেজ ফ্রেণ্ড খেয়াল রাখবেন।

"রাখলাম। এখন যা জিজ্ঞেস করব তার জবাব দিন। আপনার অফিস পাণ্ডুতে। কলকাতায় এসেছিলেন কেন?

"বলব না।

"বললে আপনার ভাল হত না?

"সেটা আমি বুঝব। আমার প্রেস্টিজ আমার কাছে।

"ও। প্রেস্টিজ যাবার ভয়ে বলবেন না কার কাছে এসেছিলেন?

"হীরকবরণ জবাব দিলেন না।

"স্বপন বললে—কোথায় উঠেছিলেন?

"বলব না।

"স্বপন খুব কম কথা বলে। এই জবাবের পর একটি কথাও বলল না। দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে বললে—চল বিশুদা। হোটেলগুলোয় ঘুরে আসি। হীরকবরণ সামান্য ভুরু কুঁচকোলেন। আমি বললাম—চলুন আপনার ফটো নেওয়া যাক।

"পুলিশ ফটোগ্রাফার তৎক্ষণাৎ হীরকবরণের ছবি তুলে খানকয়েক এনলার্জমেণ্ট দিয়ে গেল টেবিলে। জীপ নিয়ে আমি আর স্বপন বেরিয়ে পড়লাম। কলকাতা আর হাওড়ার সবকটা প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণীর হোটেলে গিয়ে ছবি দেখালাম। রদ্দিমার্কা হোটেলগুলো বাদ দিলাম—কেননা হীরকবরণ মুখার্জীর মত চালিয়াৎ লোক এসব হোটেলে যাবে না। অনেক খোঁজবার পর হাওড়ার একটা হোটেলে ফটো দেখেই চিনে ফেললেন ম্যানেজার। হোটেল রেজিস্টার খুলে দেখালেন, হীরকবরণ সেখানে নিজের নাম লিখিয়েছে প্রবাসজীবন হালদার।

"ম্যানেজার অবশ্য হলফ করে বললেন, ছবিটা প্রবাসজীবনেরই। আরও বললেন, মাস কয়েক আগে ভদ্রলোক হোটেলে উঠেছিলেন। দিন কয়েক ছিলেন।

"হোটেল-বাস সাঙ্গ করে চলে যাওয়ার সময়ে সব হোটেল রেজিস্টারে লিখতে হয় কোথায় যাওয়া হচ্ছে! প্রবাসজীবন সেই ঘরে লিখেছিল—বেলঘরিয়া।

"ফটোর পেছনে হোটেল ম্যানেজারকে দিয়ে লিখিয়ে নিলাম, এঁর নাম প্রবাসজীবন

হালদার। অমুকদিন থেকে অমুকদিন পর্যন্ত এই হোটেলে ছিলেন। যাওয়ার সময়ে বেলঘরিয়ায় যাচ্ছি লিখে গিয়েছিলেন। হোটেলের সীল দিয়ে সই করে দিলেন ম্যানেজার।

"অফিসে এলেন হীরকবরণকে দেখালাম লেখাটা। যেন অদৃশ্য হাতে একটা চড় খেলেন ভদ্রলোক। মুখ লাল হয়ে গেল। ভাল খেয়ে দেয়ে এমনিতেই লাল-লাল চেহারা। তার ওপর মিথ্যে ধরা পড়ে যাওয়ার লাঞ্ছনা। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে ছেড়ে দিয়ে বললেন— হ্যাঁ, আমার ছবি, আমারই ছদ্মনাম, তাতে হয়েছে কি?

"ছদ্মনাম নিলেন কেন?

"আমার খুশী। ভারতীয় সংবিধানে নতুন নাম নেওয়ার বিরুদ্ধে কোন বিধান আছে কি?

"আমার জানা নেই। শুধু এইটুকু জানি চোর-বাটপাররা নাম ভাঁড়ায়, সাধু-সত্যবানরা নয়—বেলঘরিয়ায় গিয়েছিলেন কার কাছে?

"যাইনি। একটা কিছু লিখতে হয়, তাই লিখেছিলাম।

"আমি চোখ পাকিয়ে চেয়ে রইলাম। হীরকবরণ ঠোঁটের কোণে তাচ্ছিল্যের হাসি দুলিয়ে চেয়ে রইলেন। কম কথার মানুষ স্বপন ততক্ষণে ফের আঙুল দিয়ে টরেটক্কা বাজিয়ে চলেছে টেবিলের ওপর। যেন সংকেতে বলতে চাইছে, বিশুদা, এ-বড় শক্ত ঠাঁই। এ ভাঙবে তবু মচকাবে না। চেক ওর, জাল সইটাও ওর, আগের টাকাও এ নিয়েছে— কিন্তু প্রমাণ নেই, এভিডেন্স নেই, ক্লু নেই। রেডিওগ্রামের জবাব আসার পর যখন শুনবে হ্যাঁ, ইনিই দোর্দণ্ডপ্রতাপ কনট্রোলার অফ ওয়াগন্‌স্‌, তখন মানে মানে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া পথ পাবে না। বিশুদা, এ বড় শক্ত ঠাঁই।

"হীরকবরণের চোখের চাপা তীক্ষ্ণতায় সেই আত্ম-ভরসাই দেখলাম। ওঁকে ভাঙতে পারব না, ওঁকে ছুঁতে পারব না—ছেড়ে দেওয়ার পথ ছাড়া ধরে রাখারও কোনো পথ পাব না। সত্যিই বড় শক্ত ঠাঁই।

"হালে পানি না পেলে শেষ পর্যন্ত থার্ড ডিগ্রীর শরণাপন্ন হতে হয়। স্বীকার করছি কাজটার মধ্যে খুব বীরত্ব নেই। কিন্তু রেজাল্ট নিয়ে আমাদের দরকার। একটা লোক কুকর্ম করেছে বুঝতে পারছি, হাতেনাতে ধরেও ফেলেছি, অথচ সাজা দেওয়া যাবে না প্রমাণের অভাবে—হাসতে হাসতে হারিয়ে যাবে জনঅরণ্যের মধ্যে। আরো কতজনের সর্বনাশ করবে—ভাবা যায় না। এইজন্যেই জানবেন থার্ড ডিগ্রীর হেল্প নিতে হয়। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার জন্যে, অপরাধীকে অপরাধ কবুল করানোর জন্যে অশাস্ত্রীয় যদি কিছু করি তো জানবেন সেটা মহৎ উদ্দেশ্যেই করা—নিজের স্বার্থে নয়।

"কিন্তু হীরকবরণ সব কটা পরীক্ষায় পাস করে গেলেন। মানে কোনরকমেই তাঁকে কবুল করানো গেল না। সাত দিন হয়ে গেছে। রেডিওগ্রামের জবাব তখনো আসেনি। আমরা বেদম হয়ে পড়েছি। রাত হয়েছে। আমার চেয়ারের বাঁ ধারে মেঝের ওপর উপুড় হয়ে বসে আছেন হীরকবরণ। এককথায় তখন তাঁর জর্জরিত অবস্থা বললেই চলে। চুপসে গেছেন। মুখের সে চেকনাই আর নেই। চোখের চাপা তীক্ষ্ণতাও নেই। আমার চেয়ারের ডানদিকে দাঁড়িয়েছিল স্বপন।

"বলল—বিশুদা, তাহলে লকআপ পাশ লিখে একে সেন্ট্রাল লকআপে পাঠানো যাক?

“তাই করো—বললাম আমি।

“স্বপন কিন্তু লকআপ পাশ না লিখে টেলিফোন রিসিভার তুলে নিল। শুনলাম অপারেটরকে বলছে—মিসিং স্কোয়াড দিন। শুনলাম বটে, কিন্তু মিসিং স্কোয়াড কেন চাইছে, তা ভাবলাম না। জিজ্ঞেসও করলাম না। হাতের কেসের সঙ্গে মিসিং স্কোয়াডের যে কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে, তা কল্পনাতেও আনতে পারিনি। আমি কেন, নাটের গুরু স্বয়ং হীরকবরণও তিলমাত্র সন্দেহ করেননি—আঁচ করতেও পারেননি কম কথার মানুষ স্বপন চৌধুরী, ভবিষ্যতের এ-সি-ডি-ডি (ওয়ান) স্বপন চৌধুরী কোন লাইনে যাচ্ছে, কি মোক্ষম প্যাঁচে ঘায়েল করতে যাচ্ছে বোবা হীরকবরণকে। নিঝুম হয়ে হীরকবরণ তখন মেঝের পানে চেয়ে ভাবছিলেন বোধহয় ওঁর দুর্দৈবের কথা। আর ভাবছিলাম মোগল আমল হলে এত প্রমাণ-টমাণের কেউ ধার ধারত না। হাতীর তলায় ফেলে হীরকবরণের বুকের ওপর হাতীর একটা পা চালিয়ে দিলেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতো স্বীকারোক্তি। স্বপন তখন ফিনিশিং টাচ দিচ্ছে টেলিফোনে। ওস্তাদের মার শেষ রাত্রেই হয়। কথাটা যে কত বড় সত্যি, স্বপনের কেরদানি দেখে সেদিন বুঝলাম। হয়তো গোড়া থেকেই আঁচ করে রেখেছিল, কোন্ লাইনে ল্যাং মারবে হীরকবরণকে—কিন্তু ইচ্ছে করেই বলে নি এতক্ষণ। হীরকবরণের হীরে চকচকে চেহারায় কালি না পড়া পর্যন্ত, মনোবল ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত চুপ করে থেকেছে। তারপর সময় বুঝে ছেড়েছে তুরুপের তাস। রিয়্যাল ডিটেকটিভ একেই বলে। স্রেফ ঝোপ বুঝে কোপ মারা, বুদ্ধির খেলায় হারিয়ে দেওয়া, নাটক সৃষ্টি করে ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে আচম্বিতে অতর্কিতে অপরাধীর মন ভেঙে চুরমার করে দেওয়া।

“দেহে মনে আমিও তখন অবসন্ন। তাই অন্যমনস্ক ভেবে শুনলাম স্বপন বলছে—হ্যালো মিসিং স্কোয়াড? তারপর শুনলাম একটা চেহারার ডেসক্রিপশন বলে গেল। কিছুক্ষণ কান পেতে শুনল। সবশেষে রিসিভার নামিয়ে রেখে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললে—দাও, লকআপ পাশটা লিখে ফেলি।

“লিখতে লিখতে মাথা নীচু করে বললে—বাদলবাবু, বেঙ্গল কেবিনে ওয়াইফকেও বলে আসেন নি?

“ঘরের মধ্যে আমি আর হীরকবরণ ছাড়া বাদলবাবু বলে কেউ নেই। কিন্তু ‘বাদলবাবু’ নামটা শুনে হীরকবরণের গায়ের ওপর যেন এক গামলা গরম জল ঢেলে দেওয়া হল। তিড়বিড়িয়ে লাফিয়ে উঠেই ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখে চেয়ে রইলেন স্বপনের পানে।

“স্বপন লেখা থামিয়ে খুব সহজভাবে মুখ তুলে বলল—আসবার সময়ে বলে এলেই পারতেন। ভাবনা চিন্তা হয়তো!

“হীরকবরণের মুখের চেহারা তখন আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। ঠোঁটের পাশে চামড়া কাঁপছে থিরথির করে, চোখদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে বাইরে—মুখের কোথাও আর সেই অনমনীয় দৃপ্ত মনোভাবের তিলমাত্র ছায়া নেই। নকআউট করেছে স্বপন। মিডল উইকেট ডাউন।

“ঢোঁক গিলে স্বপনকে বললেন হীরকবরণ—স্যার, একটু পাশের ঘরে আসবেন? উঠে

দাঁড়িয়ে স্বপন বললে—চলুন। আমাকে চোখের ইঙ্গিতে বসতে বলে হীরকবরণকে নিয়ে গেল পাশের ঘরে। পরে শুনলাম, কি হয়েছিল সেখানে। সটান স্বপনের দু'পা জড়িয়ে ধরেছিলেন হীরকবরণ। বলেছিলেন—'আমি সব বলব স্যার কিন্তু দয়া করে হ্যাণ্ডকাফ লাগিয়ে বাড়ি নিয়ে যাবেন না। বন্ধুর মত সঙ্গে চলুন। সব ফিরিয়ে দেব। কিন্তু বাড়ির লোকের সামনে, পাড়া-পড়শীর সামনে হাতকড়াটা লাগাবেন না।

"নিজে থেকেই সব কবুল করে বললেন হীরকবরণ। 'বাদলবাবু'—এই ছদ্মনামটি এবং হ্যারিসন রোডের 'বেঙ্গল কেবিনে'র নাম শুনেই হীরকবরণ ধরে নিয়েছিলেন—স্বপন চৌধুরী সারাদিন এত কম কথা বলেছে সব জানে বলে। সুতরাং মান বাঁচাতে প্রাণ খুলে কথা বলাই ভাল।

"জীপে হীরকবরণকে বসালাম আমার আর স্বপনের মাঝখানে। কিন্তু সাবধান থাকার আর দরকার ছিল না। হীরকবরণ তখন সব টাকা ফিরিয়ে দিয়ে ইজ্জত বাঁচাতে চান। নিজেই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন হ্যারিসন রোডের 'বেঙ্গল কেবিন' হোটেলে। ফ্যামিলি হোটেল। আগে এগিয়ে দিলাম হীরকবরণকে। ম্যানেজার গোল কাউন্টারের সামনে বসে আলপিন দিয়ে দাঁত খুঁটছিলেন। যেন কাঠকয়লা দিয়ে তৈরি একটা ফ্রান্কেন্সটাইন মূর্তি। যেমন বিরাট মুখ, তেমনি বিরাট চেহারা। হীরকবরণকে দেখেই আলপিন নামিয়ে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন—আচ্ছা বেআক্কেলে লোক তো মশাই আপনি। কোথায় ডুব দিয়েছিলেন? ওয়াইফকেও তো বলে যাবেন? থানা-পুলিশ পর্যন্ত হয়ে গেল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। পেছন ফিরে আমাদের দেখে নিয়ে ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললেন হীরকবরণ—ওরা কোথায়?

"কোথায় আবার—বাড়ীতে। এই তো আজ সকালে কাঁদতে কাঁদতে বেলঘরে গেল। বলিহারি যাই আপনার আক্কেলকে। আমাদের গুডউইল পর্যন্ত টাইট করে ছেড়েছেন মশায়। আজ পর্যন্ত ওঙ্কার মিত্তিরের হোটেলে পুলিশ ঢোকেনি কখনো—আপনার কৃপায়—

এই পর্যন্ত শুনেই অন্তরাল থেকে সামনে এসে দাঁড়ালাম আমি আর স্বপন। স্বপনের হাতে আইডেনটিটি কার্ড। তৎক্ষণাৎ বাকী কথাটা কোঁৎ করে যেন গিলে নিয়ে চক্ষের নিমেষে হেঁ-হেঁ করে হেসে বললেন ওঙ্কার মিত্তির—আসা হোক! আসা হোক! কি সৌভাগ্য! পেয়েছেন তাহলে বাদলবাবুকে।

"পেয়েছি।—অল্পকথার মানুষ স্বপন অল্প কথাতে বললে—"হোটেল রেজিস্টার বার করুন।

কাষ্ঠহাসি মিলিয়ে গেল ওঙ্কার মিত্তিরের চারকোল্ ফেস থেকে। বিনা বাক্যব্যয়ে কাউন্টারের কোণ থেকে রেজিস্টার টেনে নিয়ে এগিয়ে দিল স্বপনের দিকে।

"খাতায় লেখা হীরকবরণ মুখার্জীর আর এক নাম—বাদল ভৌমিক। এসেছেন সপরিবারে। স্ত্রী, দুই মেয়ে এবং ছেলেকে নিয়ে। আজ সকালেই তারা চোখের জল মুছতে মুছতে গেছেন বেলঘরিয়ায়—হীরকবাবুর পৈত্রিক ভিটেতে।

"মনে পড়ল হাওড়ার হোটেলে রেজিস্টারেও হীরকবরণ লিখেছিলেন বেলঘরিয়ায় যাচ্ছি। এই একটি ব্যাপারে তিনি মিথ্যার আশ্রয় নেন নি। বিপদের আশংকা নেই জেনেই নেন নি। ভয় আসল ওই নামকে নিয়ে। ঐ জন্যে দু হোটেলে লিখেছেন দুটো নাম।

"স্বপন বের করল হীরকবরণের আর একটা ফটোগ্রাফ। পেছনে ওঙ্কার মিত্তিরকে

দিয়ে হোটেলের রবার স্ট্যাম্প মারিয়ে সই করিয়ে নিল যে ফটো যার তিনি বাদল ভৌমিক নামে অমুক তারিখ থেকে অমুক তারিখ পর্যন্ত বেঙ্গল কেবিনে থেকে রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়েছিলেন। মিসিং স্কোয়াডে খবর দেওয়া হয়েছিল। রেডিওতে অ্যানাউন্সমেন্ট হয়েছিল, হাসপাতালে খোঁজ নেওয়া হয়েছিল।

"ঠিক এই অনুমানটি করেছিল স্বপন—দি পুলিশ ডিটেকটিভ। যে লোক কলকাতার বাইরে থেকে এসে একবার হোটেলে উঠেছে, সে নিশ্চয় এবারও হোটেলে উঠেছে। এই কদিন যদি একজন বোর্ডার উধাও হয়ে গিয়ে থাকে, মাথা বাঁচাবার জন্যে ম্যানেজার মিসিং স্কোয়াডের শরণাপন্ন হবেই। সুতরাং.....

সেই রাতেই জীপ হাঁকিয়ে গেলাম বেলঘরিয়ায়। হীরকবরণের বাড়ি দেখে তাক লেগে গেল। ভাল কথা, রুটিন জেরার সময় হীরকবরণ বলেছিলেন, তাঁর বাবা নেই, বউ নেই, কেউ নেই। বউ যে আছে ওঙ্কার মিত্তিরের কাছে শুনে এসেছিলাম। বাড়িতে ঢুকে দেখলাম, বাবাও আছেন। সত্তর বছরের বৃদ্ধ। হীরকবরণ তাঁর একমাত্র সন্তান। পুত্রগর্বে গর্বিত। আজকালকার বাজারে এরকম একটা চাকরি করা ভাগ্যের ব্যাপার। হীরকবরণ বাড়িতে কম কথা বলেন। ব্যক্তিত্ব রাখেন। এমনকি পিতৃদেবও অকারণে কথা বলেন না ছেলের সঙ্গে। মেয়ে, ছেলে, বউও মুখ তুলে কথা বলেন না তাঁর সামনে। পাড়া-পড়শী সম্মান করে। সবাই জানে তিনি কৃতী পুরুষ। জীবন সংগ্রামে বিজয়ী পুরুষ।

"আমরা কথা রেখেছিলাম, হ্যাণ্ডকাফ দিই নি। এমন কি বাপকেও সব কথা বলিনি—সেই মুহূর্তে। কিন্তু অত রাতে পুলিশ জীপে ছেলেকে আধমরা চেহারায় ফিরতে দেখে বুঝলেন অভাবনীয় কিছু ঘটেছে। তারপর যখন ছেলে শোবার ঘরে ঢুকে দেওয়ালের সিন্দুক খুলে বার করল থরে থরে সাজানো আনকোরা সোনার গয়না—তাঁর তখন আর কিছুই বুঝতে বাকী রইল না।

"লিস্ট করলাম গয়নার।

"গয়নার সঙ্গেই ছিল সব ক্যাশমেমো। দাম ফেলে যোগ করলাম। মোট চোদ্দ হাজার। আর পাওয়া গেল খানকয়েক ফুলস্ক্যাপ কাগজ। তাতে প্রায় দু'শ বার কুঞ্জবিহারী গড়াইয়ের নামটা সই করা। মক্স করেছেন হীরকবরণ।

"এই পর্যন্ত যখন এগিয়েছি, বাড়িতে তখন চাপা কান্না শুরু হয়ে গেছে। বাড়িশুদ্ধ লোক জানত, হীরকবরণ এত গয়না কিনেছেন বিবাহযোগ্যা দুই মেয়ের জন্যে, সেই মেয়ে দুটিই রাঙা চোখে কাঁদতে কাঁদতে এসে গায়ের বারোমেসে গয়না পর্যন্ত খুলতে আরম্ভ করল—যাতে বাবা ছাড়া পায়। বছর কুড়ি-বাইশ বয়স হবে মেয়ে দুটির। মার্জিত মুখশ্রী। কিন্তু ভয়ে উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় মাথার ঠিক নেই। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে একটার পর একটা চুড়ি খুলে নামিয়ে রাখতে লাগল আমার আর স্বপনের পায়ের কাছে। পুলিশের কাজ করলেও আমরা মানুষ। ঘরসংসার করি। ভেতরে বিচলিত হলেও অবিচল থাকতে হল বাইরে।

"কিন্তু বাধা দিলেন হীরকবরণ নিজেই।

"বললেন—ও গয়না আমার টাকায় কেনা। চোদ্দ হাজারের হিসেব এই গয়নায় দিলাম।

"বাকী দশ হাজার?—অনেক কষ্টে নীরস গলায় জিজ্ঞেস করলাম আমি।

‘‘তাও আছে। আসুন।

‘‘নীচে নেমে এলাম। বৃদ্ধ সুনীলবরণ, হীরকবরণের বাবা হাত জড়িয়ে ধরলেন স্বপনের আর আমার। কেলেঙ্কারী যেন না হয়—ঐ তাঁর একমাত্র ছেলে। সচ্চরিত্র, শিক্ষিত, দায়ীত্বসম্পন্ন। এতবড় ফ্যামিলি রয়েছে ওর মাথার ওপর। হীরক আজ রাতে ফিরবে তো?

‘‘কথা দিতে পারলাম না। জীপে ওঠালাম হীরকবরণকে। একটা ঠিকানা দিলেন উনি। জায়গাটা বেলঘরিয়াতেই অ্যাডভোকেটের বাড়ি।

‘‘বললেন—দশহাজার টাকার জমি কিনব ঠিক করেছিলাম। টাকাটা গচ্ছিত রেখেছিলাম অ্যাডভোকেটের কাছে। জমির দালালকে বলা ছিল সেরকম জমি পেলেই যেন দেখা করে ওঁর সঙ্গে।

‘‘অ্যাডভোকেটের নাম মুক্তারামবাবু। প্রবীণ, বিচক্ষণ, হুঁশিয়ার। প্রথম কথাতেই প্রকাশ পেল তাঁর চরিত্রের সদাসতর্ক বৈশিষ্ট্য। বেরিয়ে এলেন খালি গায়ে। ব্রাহ্মণ। চওড়া বুকে সাদা পৈতে। মুখে বুদ্ধির ছাপ। তীক্ষ্ণ চোখে দেখলেন আমাকে আর স্বপনকে।

‘টাকা চাইলেন হীরকবরণবাবু। মুক্তারামবাবু আঙুলে পৈতে জড়াতে জড়াতে কঠোর গলায় বললেন—তার আগে বলুন এরা কে?

‘‘আমার বন্ধু। জমির খোঁজ পাওয়া গেছে। তাই—

‘‘শুনেছি বাজপাখীর চোখ মানুষের চোখের তিনগুণ বেশী শক্তিশালী হয়। নিমেষের মধ্যে জ্বলে ওঠা মুক্তারামবাবুর চোখে সেই শ্যেনদৃষ্টিই প্রত্যক্ষ করলাম। হীরকবরণের কলজে পর্যন্ত যেন এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল সেই চাহনিতে। ইস্পাতের ছুরীর মতো ধারাল হাসি হেসে বললেন চিবিয়ে চিবিয়ে—তাই এত রাতে এলেন টাকা নিতে। হীরকবাবু, আমি ক্রিমিন্যাল চরিয়ে খাই। এত বোকা আমাকে ঠাওরাবেন না। এরা কোত্থেকে আসছেন আমি জানি। আপনি দশহাজার টাকা যে সোজা পথে পাননি—সেটাও আঁচ করেছিলাম বলে ঝুটঝামেলায় যেতে চাইনি। টাকা রেখেছিলাম—কিন্তু প্রত্যেকটা নোটের পেছনে আপনাকে দিয়ে ইনিসিয়াল করিয়ে নিয়েছিলাম। নিন আপনার টাকা।

‘‘সিন্দুক খুলে তৎক্ষণাৎ দশহাজার টাকা বার করে দিলেন মুক্তারামবাবু। প্রত্যেকটা নোটের পেছনে ছোট সই করে তারিখ দিয়েছেন হীরকবরণ। আমরা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। সই করা তারিখ দেওয়া নোটগুলোই এখন হীরকবরণের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ। লিকুইড কেসকে এক নিমেষে সলিড গ্রাউণ্ডে দাঁড় করিয়ে দিলেন হুঁশিয়ার, দূরদর্শী মুক্তারামবাবু। এখন হীরকবরণ বলতে পারবেন না—এ নোট আমি নিইনি। নম্বরী নোট ব্যাঙ্কের হিসেবের সঙ্গেও মিলে যাবে।

‘‘মিলেও গেল। সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল হীরকবরণ মুখার্জীর কুকীর্তি।

‘‘হীরকবরণকে নিয়ে যাওয়া হল টিম্বার মার্চেন্ট কুঞ্জবিহারী গড়াইয়ের সামনে। কনট্রোলার অফ ওয়াগন্‌সের অধঃপতনের কাহিনী শুনে ভদ্রলোক মনে হল মূর্চ্ছা যাবেন। জীবনে তিনি এরকম একজন স্বনামধন্য অফিসারকে এত হীন কাজ করতে দেখেন নি। হ্যাঁ ঘুষ-টুষ নেন অনেকেই—হীরকবরণ মুখার্জী জীবনে একটা আধলাও কারো কাছে নেন নি—ঘুষ তো দূরের কথা—ধার পর্যন্ত নিতেন না। অফিসে ব্যবসায়ী মহলে তাই হীরকবরণ

বলতে হীরের টুকরোই বোঝাত।

"সেই হীরকবরণ তাঁর চেকবই থেকে একটি চেক ছিঁড়ে নিয়েছেন, একথা তিনি বিশ্বাস করবেন কি করে? মাস কয়েক আগে উনি এসেছিলেন গড়াই মশাইয়ের অফিসে! প্রায় আসতেন—কুঞ্জবিহারীবাবুও যেতেন। কন্ট্রোলার অফ ওয়াগন্‌সকে খাতির করতে হত, হাতে রাখতে হত—তাতে ওয়াগন সহজে পাওয়া যেত, কাঠ চালান নইলে অসম্ভব এই ওয়াগন-আকালের দিনে।—বিশেষ করে ঐ অঞ্চলে। কিন্তু হীরকবরণ পয়সা নেন না—তাই নতুন বছরে একটা ডায়েরী দিয়েছিলেন। দামী ডায়েরী। কাকে কটা ডায়েরী দেওয়া হল, সে হিসাব নিজে হাতে লিখে রাখতেন কুঞ্জবিহারীবাবু—যাতে সামনে বছর ডাইরী দিয়ে আপ্যায়ণে ভুল-ত্রুটি না হয়। সেই খাতা বার করে দেখালেন নাম লেখা রয়েছে হীরকবরণ মুখার্জীর।

"কিন্তু চেক দুখানা কিভাবে সরালেন হীরকবরণ? সেই পি-এ ছোকরাকে টাকা খাইয়ে কি? এ প্রশ্নের উত্তরে সত্যবাদী রূপে বিখ্যাত হীরকবরণ সত্যি কথাই বললেন।

"ডাইরী হাতে নেওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত নাকি চেক চুরির কোন প্ল্যান তাঁর মাথায় ছিল না। এসেছিলেন কাজের কথা বলতে। সে কথা হয়েছে, ডায়েরীও পেয়েছেন নববর্ষের শুভেচ্ছাসহ, উঠে পড়লেই পারতেন—কিন্তু উঠলেন না। এদিকে খেতে যাবার সময় হয়েছে কুঞ্জবিহারী গড়াইয়ের। হীরকবরণ মুখার্জীকে লাঞ্চের নেমন্তন্নও করলেন তিনি। দুজনে একদিন ভালমন্দ খেলে ক্ষতি কি। কিন্তু হীরকবাবু গেলেন না। উৎকোচ-নির্লোভ বলেই বোধহয় গেলেন না। এই মনে করে কুঞ্জবিহারীবাবু বললেন—তাহলে আপনি একটু বসুন, আমি যাব আর আসব। সায় দিলেন হীরকবাবু। ঘর ফাঁকা হতেই উঠে গিয়ে দেখলেন ড্রয়ারে চাবি দেওয়া নেই। স্বপন জিজ্ঞেস করল—এই যে বললেন চেক চুরির কোন প্ল্যান আপনার ছিল না—তাহলে ড্রয়ার দেখতে গেলেন কেন? হীরকবরণ বললেন—কি জানি কেন হঠাৎ মনে হল দেখিই না কি আছে ড্রয়ারে। প্রথম ড্রয়ারে পেলাম চেকবই। কি যে দুর্মতি হল, তৎক্ষণাৎ খান দুই চেক একেবারে গোড়া থেকে ছিঁড়ে বার করে নিলাম চেক বইয়ের ভেতর থেকে। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলেন কুঞ্জবিহারীবাবু। চা খেয়ে অফিসে চলে এলাম। নেক্সট উইকে কলকাতা গিয়ে তুললাম চব্বিশ হাজার টাকা।

সব তো হল। কিন্তু মোটিভ কই? মোটিভ ছাড়া ক্রাইম সচরাচর হয় না। মোটিভ ছাড়া যারা ক্রাইম করে, তারা বিকৃত মস্তিষ্ক। জ্যাক দি রিপারের মত উন্মাদ। ক্লেপটোম্যানিয়্যাকরা যেমন চুরি করে আনন্দ পায়—তেমনি আর কি! কিন্তু হীরকবরণ মুখাৰ্জ্জী সজ্জন। সুস্থমস্তিষ্ক এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত পুরুষ। তাঁর অভাব নেই, লোভ নেই। তা-সত্ত্বেও এতবড় অন্যায় কেন করলেন? মোটিভ কি?

"এ কাহিনীর সেইটাই সবচেয়ে মর্মান্তিক অংশ। হীরকবরণ মুখার্জী বিবেকবান সজ্জন পুরুষ—তাই বিবেকদংশন সহ্য করতে না পেরে এক অন্যায়কে ঢাকতে আর এক অন্যায় করে বসলেন। ক্ষণিকের ভুলে পদস্খলন তাঁর হয়েছিল। জীবনে কখনো পাপ করেন নি বলেই একটিমাত্র পাপের অনুতাপে তিনি জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিলেন। তাই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আর একটি পাপের পথে পা বাড়ালেন।

"মায়াবী মোটিভ একেই বলে।

"হীরকবরণ মুখার্জীর ডিপার্টমেন্টে রামতনু বলে একটি ছেলে কাজ করত। ছেলেটির দুনিয়ায় কেউ নেই—একটিমাত্র বোন ছাড়া। বোনটির বয়স যখন সতেরো, ঠিক তখন রামতনুকে বদলি

হতে হল নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়েরই এমন একটা দুর্গম জায়গায় যেখানে অনূঢ়া বোনকে নিয়ে যাওয়া সেই মুহূর্তে সম্ভব নয়। রামতনুর মাইনেও এমন কিছু বেশী নয়। মেসে থেকে বাসাবাড়ি খুঁজতে হবে। তদ্দিনের জন্যে বোনটিকে কোথায় রাখা যায়?

"হীরকবরণ মুখার্জীকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করত রামতনু। ধরল তাঁকেই। বলল—স্যার, বাসাবাড়ি না পাওয়া পর্যন্ত আপনার কাছে যদি সরোজিনীকে রাখেন, আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।

"হীরকবরণ রাজি হলেন। রামতনুকে স্নেহ করতেন তিনি। তিনি নিজেও পরোপকারী। সরোজিনী রইল তাঁর কোয়ার্টারে। পাণ্ডুর কোয়ার্টারে তিনি ঠাকুর-চাকর নিয়ে একাই থাকতেন। বৃদ্ধ বাবার দেখাশুনার জন্যে এবং ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্যে স্ত্রীকে রেখেছিলেন বেলঘরিয়ায়।

"মাস কয়েক পরে সরোজিনীর স্কুলে খবরটা প্রকাশ পেল। মেয়েদের চোখকে ধুলো দেওয়া যায় না এসব ব্যাপারে। বান্ধবীরাই ধরে ফেলল, সরোজিনী সন্তানসম্ভবা। হীরকবরণ মুখার্জীর দুর্দিন শুরু হল তখন থেকেই। রামতনু এল। সে-ও স্তম্ভিত। হীরকবরণ লজ্জায় অধোবদন। এদিকে কানাঘুসো আরম্ভ হয়েছে রেলওয়ে কোয়ার্টারে। তাই রামতনু আর সরোজিনীকে নিয়ে এলেন পুরীতে। প্রস্তাব করলেন গর্ভপাত করা হোক।

"বেঁকে বসল সরোজিনী—রামতনুর ইচ্ছে সত্ত্বেও। নিরুপায় হয়ে কলকাতায় এলেন হীরকবরণ। কালিঘাটে গিয়ে সরোজিনীর মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে বিয়ে করলেন। বাগবাজারে একটা ছোট্ট ফ্ল্যাটে তার থাকার ব্যবস্থা করলেন।

"কিন্তু ঐ পর্যন্তই। মুহূর্তের মোহে যে ভুল তিনি করেছিলেন, বিয়ের লাইসেন্স নিয়ে তাকে প্রলম্বিত করলেন। সরোজিনীর আর বাচ্চাটার খোঁজখবর নিতেন। কিন্তু সরোজিনীর ফ্ল্যাটে রাত্রিবাস করতেন না।

"দিবারাত্র বিবেকের দংশন আর সইতে পারে না হীরকবরণ। সরোজিনী আর নিষ্পাপ শিশুটির ভবিষ্যতের একটা পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করার সংকল্প নিলেন মনে মনে। তাঁর অবর্তমানে দ্বিতীয় স্ত্রী আর পুত্রের যাতে খাওয়া পরার অভাব না থাকে, জীবিতকালে সেই ব্যবস্থা করে যাবেন ঠিক করলেন।

"কিন্তু রোজগার তাঁর রবারের মত নয় যে টানলে বড় হবে। উৎকোচ নিয়ে এতদিনের সুনাম আর শ্রদ্ধাকে বলি দিতে রাজী নন। তাই সব দিক বজায় রেখে কাকপক্ষীকে না জানতে দিয়ে প্রথম যে কাজে হাত দিলেন—তা নিয়েই এই গল্প।"

গল্প শেষ করে বিশ্ববন্ধুবাবু হেসে বললেন—"মৃগাঙ্কবাবু, এ গল্পের ডিটেকটিভ চমকে দেওয়ার মত কোন ক্লু পায়নি—শুধু দেখিয়েছে উপস্থিত বুদ্ধির খেলা। কিন্তু সে সুযোগও সে পেত না—হীরকবরণ কোনদিনই ধরা পড়তেন না—যদি তিনি প্রফেশনার ক্রিমিন্যাল হতেন—তাহলে আর দ্বিতীয় বার ঐ ব্যাঙ্কে তিনি আসতেন না। ঐ একটি মাত্র ভুলের জন্যে তাঁকে শেষ পর্যন্ত জেলেই যেতে হল—পাঁচ বছরের জন্যে।" □

* 'উল্টোরথ পত্রিকায় প্রকাশিত। জুলাই-আগষ্ট, ১৯৭৬।

কনে হলো বিধবা

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শেষবারের মত নিজেকে দেখল মণিকা। বিধবার বেশে কোনো ত্রুটি নেই। অথচ এই সেদিন বেনারসী পরে শিবমন্দিরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। আশা ছিল এই আয়নার সামনে বেনারসী পরেই স্বামীর পাশে দেখবে নিজেকে। কিন্তু.....

মণিকার চোখ শুকনো কেন? জবাব দিল মণিকার মন। বলল—মণিকা তো বেঁচে নেই।

আলমারী থেকে টাকার বাণ্ডিলটা বার করে আনল মণিকা। পাঁচ ভাগ করে রাখল সুটকেশের ওপর। প্রতিটি ভাগে রইল সমান পরিমাণ টাকা। একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল পাঁচ থাক টাকার দিকে। বুকের তুফানের ছায়াও পড়ল না চোখের তারায়। কি করে পড়বে? মণিকা তো বেঁচে নেই!

কেবল পাঁচ থাক টাকার প্রতিফলন পাঁচ-পাঁচটি ধিকি-ধিকি প্রতিজ্ঞাস্বরূপ জ্বলতে লাগল ওর বিশাল দুই চোখে।

"বৌমা," মণিকার শাশুড়ি ঘরে এলেন। "বৌমা, আমার কথা রাখো। যেও না।"

"না, মা, যেতে আমাকে হবেই।"

শাশুড়ি আর পীড়াপীড়ি করলেন না। একশ টাকার নোটের একটা তাড়া মণিকাকে দিয়ে বললেন—"তপনের সারাজীবনের সঞ্চয়। নাও। মনে রেখো আমার শেষ কথাটা—যেদিন মন চাইবে, সেদিনই ফিরে আসবে।"

সুটকেশ খুলল মণিকা। পাঁচ থাক টাকা একসঙ্গে করল। শাশুড়ির দেওয়া টাকা রাখল তার ওপর। সুটকেশ বন্ধ করে বলল—"মা, চললাম।"

শাশুড়ি এবার কেঁদে ফেললেন।

রাস্তায় নেমে এল মণিকা। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সেই ফুটফুটে মেয়েটা। সবুজ ফ্রক উড়ছে জোর হাওয়ায়। বেণীর ডগাটা অস্থিরভাবে কামড়াচ্ছে ছোট ছোট দাঁত দিয়ে।

মণিকাকে দেখেই দৌড়ে এল কাছে—"মাসীমা, চলে যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁরে।"

"আমি সঙ্গে যাবো?"

"আয়।"

স্টেশন বেশী দূরে নয়; বড় জংশন; ইলেকট্রিক ট্রেন হরবখৎ যাচ্ছে আসছে। প্ল্যাটফর্মে কিছুক্ষণ দাঁড়াতেই এল কলকাতাগামী ট্রেন। ফুটফুটে মেয়েটার গাল টিপে দিয়ে একটা ফার্স্ট-ক্লাস কামরায় উঠে পড়ল মণিকা।

উল্টোদিকের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে তখন যদি কেউ মণিকার গতিবিধি নজরে রাখত, তাহলে একটা অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ত। দেখত, মণিকা কামরার একদিকের দরজা দিয়ে ভেতরে উঠল বটে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একদিকের দরজা দিয়ে নেমে পড়ল রেল লাইনের খোয়ার ওপর। সেখান থেকে প্ল্যাটফর্মে উঠে ওভারব্রীজ পেরিয়ে মিশে গেল ভীড়ের মধ্যে।

চোদ্দতলা ফ্ল্যাটবাড়ী; একতলায় মেঝে মুছছিল প্রসাদী। প্রসাদী এ বাড়ীর ঝাড়ুদারও বটে,

দারোয়ানও বটে। কো-অপারেটিভ হাউসিং স্কীমে তৈরী ফ্ল্যাটবাড়ীর সবাইকেই সমান যত্ন করার দায়ীত্ব তার।

হলঘরের মোজেক মেঝে মুছছে প্রসাদী। ঘরে আর কেউ নেই। তাই গান ধরেছে গলা ছেড়ে। পুরু লেন্সের সুতো বাঁধা চশমাটা মাঝে মাঝে পিছলে নেমে আসছে নাকের ডগায়। সেই অবস্থাতেই "মেরে স্বপ্নোকা রাণী"কে ডাকছে তারস্বরে।

আচমকা স্তব্ধ হল রাসভ কণ্ঠ। কারণ, প্রসাদীর অদূরে ভোজবাজীর মত এসে দাঁড়িয়েছে একটি নারীমূর্তি। আগুনের মত রূপ তার। অংগ ঘিরে বেনারসীর বাহারে সে-রূপ যেন দাবাগ্নির মত লেলিহান।

মেয়েটি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে প্রসাদীর দিকে। মুখে কথাটি নেই। কিন্তু বিশাল দুটি চোখে যেন কিসের অনুনয়।

প্রসাদী তার কর্তব্য করল—"কাকে খুঁজছেন?"

"ব্যারিস্টার বারীন বাগচীকে।"

"উনি তো এখন থাকেন না।"

"কখন থাকেন?"

"সন্ধ্যের পর। আর সকালের দিকে।"

"কামরা নম্বর?"

"পঁয়তাল্লিশ। দশতলার 'বি' ব্লক।"

"ফোন আছে?"

"হ্যাঁ।"

"কত নম্বর?"

নম্বর জানতে বারীন বাগচীর চিঠির খুপরির সামনে গেল প্রসাদী। তারপর নম্বর বলতে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল, মেয়েটি নেই।

সেইদিনই সন্ধ্যের পর বারীন বাগচীর টেলিফোনে ভেসে এল নারীকণ্ঠ।

"আপনি ব্যারিস্টার বাগচী?"

"দ্যাটস মি।"

মেয়েটি আর কোনো জবাব দিল না। রিসিভার রাখার শব্দ ভেসে এল।

ভুরু কুঁচকে সিগার কামড়ে ধরল বারীন বাগচী। ব্যাপারটা যেন কেমনতর। এই মেয়েটিই কি আজ দুপুরে তার খবরাখবর নিয়ে গেছে প্রসাদীর কাছে?

পরের দিন সকালবেলা আবার টেলিফোনে ভেসে এল সেই নারীকণ্ঠ।

"বারীন বাগচী?"

"স্পিকিং।"

টুকরো হাসি—"আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।"

"কেন?"

"আলাপ হলেই বুঝবেন।"

"আজকে আসুন। ফ্ল্যাটে একটা টি-পার্টি দিচ্ছি। সন্ধ্যে ৭টা। আলাপ করার উপযুক্ত

সময়।”

“থ্যাকংস।” লাইন কেটে গেল।

সারাদিন রহস্যময়ীর কথাগুলো পাক খেল বারীন বাগচীর ব্যাচেলার মগজে। রোমান্স? মন্দ কি!

সন্ধ্যে নাগাদ ফ্ল্যাটে যখন টি-এর ফাঁকে ফাঁকে দু'চারটে গেলাসের রঙীন পানীয় বিলি হচ্ছে ঠিক তখনি একটি আশ্চর্য সুন্দরী মেয়ের দিকে বারীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার বন্ধু সঞ্জয়।

বলল—“বারীন, মেয়েটাকে কখনো দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না। তোর নতুন বান্ধবী নাকি? সমানে তোর দিকেই তাকিয়ে আছে।”

চকিতে তাকাল বারীন। দেখল, দরজার ঠিক পাশটিতে দাঁড়িয়ে যেন মূর্তিমতী প্রদীপ-শিখা। মানুষ এত রূপবতীও হয়?

মন্ত্রমুগ্ধের মত পায়ে পায়ে মেয়েটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল বারীন। হাতের মদের গ্লাস হাতেই রইল। চোখে চোখ লেগে রইল চুম্বকের মত।

“আপনি?”

মেয়েটি হাসল। বারীন দেখল, মোনালিসা যেন মূর্ত হল হাসির মধ্যে।

বারীন বলল—“আপনি ফোন করেছিলেন?”

জবাব দিল না অপরূপা। বিশাল নয়নের চাহনি ফিরল চওড়া বারান্দার দিকে। বারান্দায় আলো-আঁধারি, জাপানি ফানুস আর ক্যাকটাস।

বুঝল বারীন। পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়ালো ব্যালকনিতে। একপাশে সেই মেয়েটি। আর একপাশে সঞ্জয়।

জাপানী ফানুসের রামধনু-রশ্মির মধ্যে পরীর মত চেয়ে আছে মেয়েটি।

বারীন বিস্মিত। বিস্মিত সঞ্জয়ও। বিস্ময়ের মাঝেই হাতের গ্লাস ঠোঁটের কাছে তুলেছিল বারীন। কিন্তু ঠোঁটের সঙ্গে পানীয়র মিলন হওয়ার আগেই হাত থেকে গ্লাসটা টেনে নিল মেয়েটি। নিয়ে গেলাস উপুড় করে ধরল পাশের ক্যাকটাসের টবে।

বলল সঞ্জয়কে—“চা আনবেন?”

সঞ্জয় বেরিয়ে গেল।

মেয়েটি বলল—“হ্যাঁ, আমিই ফোন করেছিলাম। আমিই দেখা করতে এসেছিলাম। আমার নাম মণিকা। আমি বড় একা।”

বারীন কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

মণিকা কাশ্মিরী শালটা গা থেকে খুলে মেলে ধরল বারান্দার বাইরে। হাওয়ায় বেশ টান। ঝড়ের টান। হাত থেকে শালটা খসে গিয়ে আটকে গেল হাততিনেক দূরে ঝুলন্ত রেডিও এরিয়ালের কঞ্চিতে।

মণিকা বললে—“এনে দেবেন?” চোখে অনুনয়।

বারীন ব্যালকনির রেলিং টপকে দাঁড়াল সরু কার্নিশের ওপর। অবাক চাহনি তখনো মণিকার বিশাল চোখের ওপর। তারপর এক হাতে রেলিং ধরে ঘুরে দাঁড়িয়ে যেই আর

এক হাত বাড়িয়েছে শালের দিকে, অমনি দু'হাতে তাকে প্রচণ্ড ধাক্কা মারল মণিকা।

রেলিং থেকে হাত খসে গেল বারীনের। দশতলার ব্যালকনি কার্নিশ থেকে দেহটা পাকসাট খেয়ে আছড়ে পড়ল একতলার লনে।

চেঁচিয়েছিল বারীন, কিন্তু কেউ শুনতে পায়নি। ঘরে তখন জাজ মিউজিকের ধুম পড়েছে।

মণিকা এ-দরজা সে-দরজা দিয়ে উধাও হয়ে গেল। কাশ্মীরী শালটা হাওয়ার টানে এরিয়েল থেকে উড়ে গিয়ে ভেসে গেল নীচতলার একটা বাড়ীর ছাদে।

চায়ের ট্রে নিয়ে সঞ্জয় এসে দেখল ব্যালকনি শূন্য।

দিনকয়েক পরে।

মঘা দত্ত ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যেতেই রামদাস ঝাড়ন ফেলে আলমারী খুলে বার করল হুইস্কির বোতল। মঘা দত্তর হুইস্কির বোতল। বিপত্নীক মঘার এই এক বদভ্যেস। ফ্ল্যাটে বসে মদ গেলা চাই।

রামদাস তার ফাইফরমাস খাটে। ঘরদোর সাফ করে। রান্না-বান্নাও করে দেয়। বাবুর দেখাদেখি তারও ইদানীং সখ হয়েছে হুইস্কি গেলার। তাও চুরি করে। মঘা দত্ত বেরিয়ে গেলেই রোজ খাওয়া চাই এক ঢোক। তারপর অবশ্য বেসিন থেকে জল ঢালতে হয় বোতলে। কেননা মঘা ভারী হুঁশিয়ার। হুইস্কির বোতলে রোজ কলম দিয়ে দাগ দিয়ে রাখে। লুকিয়ে-চুরিয়ে রামদাস তবুও হুইস্কি খায়। খেয়ে জল ঢেলে দাগে দাগ মিলিয়ে রাখে।

সেদিনও এক ঢোক গিলল রামদাস। জল মেশালো। বোতলটা আলমারীতে ফিরিয়ে দেওয়ার আগেই দারুণ চমকে উঠল।

খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে এক পরমাসুন্দরী। বিশাল চাহনি রামদাসের ওপর।

বোতলটা তাড়াতাড়ি পেছনে লুকালো রামদাস। বলল—"কাকে চাই?"

"মঘা দত্ত।"

"নেই।"

"কখন থাকবেন?"

"সন্ধ্যের পর।"

"তোমার নাম?"

"রামদাস।"

"বাবুর দেখাশোনা করো?"

"আজ্ঞে।"

"বাবুর সময় কাটে কি করে?"

"আজ্ঞে, সিনেমা দেখে, আড্ডা মেরে, বই পড়ে—"

"খুব সিনেমা দেখেন?"

"থিয়েটারও।"

"ও।"

"আজ্ঞে, বাবু এলে কি বলবো?"

হাসল মেয়েটি—"পেন্সিল আছে? কাগজ আছে? আনো, চিঠি লিখব।"

বোতল সামলাতে সামলাতে কাগজ-পেন্সিল আনতে পাশের ঘরে গেল রামদাস; ফিরে এসে দেখল মেয়েটি নেই।

মঘা দত্ত ফ্ল্যাটে ফিরেই লেটারবক্সে একটা খাম পেল। ভেতরে সবুজ কাগজে দু'লাইন চিঠি আর একটা থিয়েটারের বক্স-টিকিট।

সবুজ কাগজে ল্যাভেণ্ডারের সৌরভ। চিঠির দু'লাইনে রোমান্সের ইংগিত।

প্রিয়,

আলাপ করতে চাই। আসছেন তো?

মাথা ঝিমঝিম করে উঠল মেঘা দত্তর। এমন সময়ে রামদাস এল। সেই পরমাসুন্দরীর আবির্ভাব-বৃত্তান্ত রসিয়ে রসিয়ে বলল।

মঘা দত্ত স্থাণুর মত বসে রইল খাটের ওপর।

থিয়েটার-হল।

বক্সে ঢুকে মঘা দেখল, কেউ নেই। এদিকে থিয়েটার শুরু হল বলে। তবেকি ঠাট্টা করল কেউ?

থিয়েটার শুরু হল। আস্তে আস্তে কমে এল মঘার ছটফটানি। মন যখন থিয়েটারের মঞ্চে, ঠিক তখনি বক্সের ছায়ামায়ায় এসে দাঁড়াল সেই মেয়েটি। নাম তার মণিকা।

দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। অনিমেষে চেয়ে রইল মেঘার পানে। ভাবলেশহীন চাহনি। তারপর এসে বসল পাশে।

মঘা যেন আইসক্রীমের মতই গলে গেল। মেয়েটি চেয়ে আছে মঞ্চের দিকে। নিশ্চল তনু।

বলল—"আমার নাম মণিকা।"

"অঃ।"

"আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে।"

"অ্যাঁ।"

"এখানে বলব না।"

"হোটেলে?"

"না, আপনার বাড়ীতে।"

"তাই নাকি?" এ যে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া। "কবে?"

"কাল। আর কেউ থাকুক আমি চাই না। একটু থেমে, "শুধু আপনি আর আমি।"

মঘার যেটুকু বাকি ছিল, এবার তাও গেল।

মঘা দত্তর ফ্ল্যাটের ধুলো ঝেড়েছে মঘা। সাজিয়েছে। রজনীগন্ধার স্টিক আর বেল-জুঁইয়ের গন্ধে ঘরে যেমন ফুলশয্যার আমেজ এনেছে।

মঘা নিজেও সেজেছে। বুকে খুশীর তুফান।

তুফান ছুটে যেত যদি সেইমুহূর্তে মঘা দত্তর তৃতীয় নয়ন খুলে যেত। এবং সেই তৃতীয় নয়নে ভেসে উঠত সেই শহরেরই একটি দামী হোটেলের কক্ষ।

দেখা যেত, খাটের ওপর একটা গোটা হুইস্কির বোতল নিয়ে বসে মণিকা। এক হাতে একটা ইঞ্জেকসন দেবার সিরিঞ্জ। সিরিঞ্জভর্তি সাদা আরক। ছুঁচটা ছিপি ফুঁড়ে বোতলের ভেতর ঢুকিয়ে দিল মণিকা। সাদা আরকটা মিশিয়ে দিল হুইস্কির সাথে।

মঘার ফ্ল্যাটে মণিকা এল ব্যাগের মধ্যে আরকমিশানো বোতল নিয়ে। মঘার প্রথম উচ্ছ্বাস কমতেই ভিজে গলায় বলল—"আমি জানি আপনি কি ভালবাসেন।"

"কি?"

"হুইস্কি।"

মঘা কাষ্ঠহাসি হাসল।

মণিকা বলল—"হুইস্কি আমি খাই না। ভারমুথ ছাড়া কিছু ছুঁই না। কিন্তু আপনি যা ভালবাসেন তাই দিয়েই শুরু হোক আমাদের প্রথম পরিচয়।" ব্যাগ থেকে বেরুলো হুইস্কির বোতল। "বিলিতি স্কচ। একশ টাকা এক বোতল। নিন, দু'গেলাস ঢালুন।"

মঘার চোখ শামুকের চোখের মত উদ্ধত হল। মাথায় টাইফুনের ছোঁয়া লাগল। ত্বরিতপদে উঠে গেল বোতল হাতে। ফটাৎ করে খুলল ছিপি। পর দু'গ্লাস খাঁটি (!) স্কচ ঢেলে সোডা পাঞ্চ করে রাখল মণিকার সামনে।

মণিকা আকাঁপা আঙ্গুলে একটা গ্লাস তুলে নিল। আকাঁপা চোখে মঘার পানে চাইল। গ্লাসে গ্লাস ঠেকিয়ে বলল—"চিয়ার্স।"

গ্লাস শূন্য করে দিল মঘা। মণিকা গ্লাস হাতে রাখল। বলল—"অর এক গ্লাস খান। তারপর কথা।"

মঘা উঠে গেল গ্লাস ভরতে। সঙ্গে সঙ্গে রজনীগন্ধার ফুলদানীতে হাতের গ্লাস উপুড় করে ধরল মণিকা।

মঘা ফিরে এসে দেখল শূন্য গ্লাস কোলে নিয়ে বসে মণিকা। বিলোল আঁখিতে কালো ইশারা।

পুরো গ্লাসটা এক ঢোকেই শেষ করল মঘা। মাথার মধ্যে মৃত্যুর ঐকতান শুরু হল সেই মুহূর্ত থেকে।

প্রথমে মঘা বোঝেনি। মনে হয়েছিল স্কচের নেশা। তারপর মাথার খোঁচা যখন চোখেও এসে পৌঁছোলো, তখন ভাবল জবর স্কচ তো! দু'পেগেই এফেক্ট! তারপর চোখ ঘোলাটে হয়ে এল। বিশ্বসংসার ঝাপসা হয়ে এল। মেঝের ওপর সটান আছড়ে পড়ল মঘা।

মণিকা উঠে দাঁড়াল। মঘার দিকে তাকালো না। গেলাসদুটো নিয়ে বেসিনে ধুয়ে তুলে রাখল। আরকমিশানো হুইস্কির বোতল বেসিনে উপুড় করে ঢেলে দিল। খালি বোতলটা রাখল ব্যাগের মধ্যে।

মঘা তখন ধুঁকছে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে পাশে বসল মণিকা। চেয়ে চেয়ে দেখল, মঘা মরছে; ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছে।

বলল—"শুনতে পাচ্ছেন?"

কাতরে উঠল মঘা।

মণিকা বলল—"স্কচে আমি বিষ মিশিয়ে আপনাকে খাইয়েছি। এখুনি মরবেন। আর দেরী নেই। মরবার আগে নিশ্চয় জানতে ইচ্ছে করছে, কেন আপনাকে মারলাম। তাই বলছি। শুনুন, কেন'র উত্তর একবছর আগে একটা শিবমন্দিরের সামনে রয়েছে। নতুন বউ নিয়ে শিবকে প্রণাম করতে গিয়েছিল একজন। মন্দির থেকে বেরোতে না বেরোতেই বিধবা হয়েছিল কনে বউ।"

এই পর্যন্ত বলে থামল মণিকা। শোনবার মত কেউ আর ছিল না ঘরে।

অনেক রাতে রামদাস এসে দেখেছিল মেঝের ওপর মরে কাঠ হয়ে শুয়ে তার বাবু।

অন্য একটি শহরতলী।

স্কুল। সবে ছুটি হয়েছে। বাচ্চা মেয়েটার হাত ধরে তার মা রওনা হয়েছে বাড়ীর দিকে। মেয়েটি বার বার ফিরে তাকাচ্ছে পেছনে।

কোয়ার্টার এসে গেছে। সামনে খানিকটা সবুজ লন। তারপর দোতলা বাড়ী। হালফ্যাসানি। বোগানভালিয়ার থোকা আর রঙবেরঙের ফুল দিয়ে সাজানো চত্বর।

ফটক দিয়ে ঢোকবার সময়ে আবার পেছন ফিরে তাকালো মেয়েটি। স্কুলের উষাদির মত দেখতে মেয়েটা এখনো আসছে। বেশ দেখতে।

ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালো পিছু নেওয়া মেয়েটি; নাম তার মণিকা।

বেশীক্ষণ দাঁড়াতে হল না। খেলতে বেরিয়েছে বাচ্চা মেয়েটি। রঙীন প্লাস্টিকের বল নিয়ে ছুটোছুটি করছে সবুজ লনে। একবার ফটক দিয়ে রাস্তায় ঠিকরে গেল বলটা। ধরে ফেলল মণিকা। হাসিমুখে তাকিয়ে রইল বাচ্চা মেয়েটির দিকে। কাছে ডাকল হাত নেড়ে।

ভয় পেল না ছোট্ট মেয়েটি। স্কুলের উষাদির মতই তো দেখতে। কি সুন্দর হাসি। স্কুল থেকেই তো পেছন পেছন এসেছে।

কাছে গেল মেয়েটা। মণিকা বলটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল—"কি নাম তোমার?"

"ঝুমি।"

"বাঃ, কি সুন্দর নাম। আমার নাম উষাদি তোমাদের স্কুলে পড়াই।"

"তোমার নামও উষাদি?"

"হ্যাঁগো। তোমার মায়ের নাম কি?"

"শ্রীমতী বনমালা লাহিড়ী।"

"সাবাস। তোমার মামার বাড়ী কোথায়?"

"অনেকদূর।"

"কোথায়?"

"আগরতলায়।"

"তোমার মামা আছেন?"

"হ্যাঁ।"

"আগরতলায় থাকেন?"

"হ্যাঁ।"

"কি নাম জানো?"

“পল্টু মামা।”

“দাদু আছেন?”

“হ্যাঁ।”

“আগরতলায় থাকেন?”

“হ্যাঁ।”

এইসময়ে দোতলার জানলা দিয়ে ডাক দিল ঝুমির মা—“ঝুমি, ভেতরে এসো।”

বল নিয়ে এক দৌড়ে ভেতরে চলে গেল ঝুমি।

মণিকা প্লেনে আগরতলা গেল। সেখান থেকে একটা টেলিগ্রাম পাঠালো ঝুমির মা শ্রীমতী বনমালা লাহিড়ীকে।

টেলিগ্রাম হাতে পেয়ে শ্রীমতী বনমালা লাহিড়ী দেখল, ভাই লিখছে বাবার শেষ অবস্থা; এখুনি না এলেই নয়।

কাজেই পরের প্লেনেই আগরতলা রওনা হল ঝুমির মা। ঝুমির বাবার কাছে রেখে গেল ঝুমিকে। ঘরসংসার দেখার জন্যে ঠিকে ঝি, রাঁধুনি তো আছেই। কোনো অসুবিধে হবে না। ঝুমির বাবা অফিস গেলে ঠিকে ঝি-ই সারাদিন বাড়ী আগলাবে’খন।

সেইদিন রাত্রে ঝড় উঠল। দরজার কড়া নড়ল। ঝুমির বাবা ঝুমিকে নিয়ে একতলায় বসেছিল। উঠে এসে দরজা খুলে দিল।

মণিকা ভেতরে ঢুকল। হাওয়ায় উড়ছে ওর কপালের চুল। বুকের আঁচল। ঝুমির বাবা শান্তনু লাহিড়ী বিস্মিত হলেন অপরূপ মহিলার সহজ আচরণে।

মণিকা বলল—“ঝুমি কই?”

“ঐ তো।”

স্বচ্ছন্দ পায়ে ঝুমির পাশে গিয়ে বসে পড়ল মণিকা। বলল—“আমি ঝুমিদের উষাদি। ওদের স্কুলে পড়াই। তাই না ঝুমি?” ঝুমি ঘাড় নেড়ে সায় দিল। “এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম, যাই দেখে যাই।”

শান্তনু লাহিড়ী বললে—“ভালই করেছেন। ওর মা গেল বাপের বাড়ী। একা আমি সামলাতে পারছিলাম না।”

হেসে উঠল মণিকা—“খাওয়া হয়েছে?”

“না। কিন্তু—”

মণিকা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে—“কোনো কথা নয়। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। খাইয়ে-দাইয়ে ঝুমিকে ঘুম পাড়িয়ে বাড়ী যাব’খন।” একটু থেমে মোনালিসা হাসি হেসে—“এ কাজ আমি ভালবাসি।”

শান্তনু লাহিড়ী অপ্রস্তুত হলেন। খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাসও ফেললেন।

রান্নাবান্না করাই ছিল। এটা-সেটা গল্প করতে করতে গ্যাসের উনুনে সব গরম করে নিল মণিকা। এর ফাঁকে পাঁউরুটি কাটা বড় ছুরিটা নিয়ে দরজার পাশের টেলিফোনের তারটা কেটে রাখল। বাপবেটিকে খাওয়াল। নিজে কিছু দাঁতে কাটল না। ঝুমিকে ভুলিয়ে ভালিয়ে দোতলায় নিয়ে গিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল। নীচে নেমে এসে দেখল হলঘরের টেবিলে তখনও

বসে শান্তনু লাহিড়ী। মুখে পাইপ। চোখে বিস্ময়।

"চলে যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ। আমার কাজ ফুরিয়েছে।"

নিস্তব্ধ রাত। বাইরে ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছে। শান্তনু লাহিড়ীর রক্তে দোলা লাগল মণিকার বিশাল চোখজোড়ার আয়তচাহনি দেখে।

পাইপ সরিয়ে শুধু বলল—"আপনার মত মেয়ে আমি দেখিনি।"

"তাই নাকি?" বলে মণিকা হ্যাণ্ডব্যাগ নিয়ে শান্তনু লাহিড়ীর পেছনে গেল। ব্যাগ থেকে ছোট্ট পিস্তল বার করল। নলচেটা মুঠোয় ধরে কুঁদো দিয়ে ব্রহ্মতালুতে খুব জোরে চোট মারল। অজ্ঞান হয়ে গেল শান্তনু লাহিড়ী।

ব্যাগ থেকে নাইলন দড়ি বার করল মণিকা। পিছমোড়া করে বাঁধল শান্তনুকে। মুখের মধ্যে বেশ খানিকটা তুলো ঠেসে দিল। তারপর চওড়া স্টিকিং প্লাস্টারের পটি দিয়ে মুখ আটকে দিল।

টানতে টানতে শান্তনুকে নিয়ে এল ছোট্ট রান্নাঘরে। স্টিকিং প্লাস্টারের পটি দিয়ে প্রতিটি বন্ধ জানলার ফাঁক বন্ধ করল। তারপর একটা টুল নিয়ে বসল শান্তনুর পাশে। ব্যাগ থেকে স্মেলিং সল্টের শিশি নিয়ে ধরল নাকের কাছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝাঁঝালো গন্ধে জ্ঞান ফিরে এল শান্তনু লাহিড়ীর। চেঁচাতে পারল না—মুখ বন্ধ। হাত-পা নাড়তে পারল না—দড়ি দিয়ে বাঁধা।

মণিকা বলল—"একটু পরেই মারা যাবেন আপনি। আমার নাম উষা নয়। আমি ঝুমির স্কুলে পড়াই না। মিথ্যে টেলিগ্রাম করে আমিই সরিয়েছি ঝুমির মাকে আপনাকে নিজের হাতে মারব বলে। কেন জানেন? একবছর আগে একটা শিবমন্দিরের সামনে একজন গুলি খেয়ে মরেছিল। মনে আছে? নতুন বর। আমি তার নতুন বউ। বিধবা।"

শান্তনু লাহিড়ীর চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই দৃশ্য। তিনতলা বাড়ীর চিলেকোঠায় বসে ওরা তাসের জুয়ো খেলছিল। মেসবাড়ী। জুয়োর সঙ্গে মদের ব্যবস্থাও রয়েছে। আর রয়েছে শান্তনুর দোনলা বন্দুকটা। ফাঁড়িতে দেখতে চেয়েছিল বন্দুকের চেহারা। নইলে নাকি লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে। তাই বন্দুক নিয়ে আসা। ফাঁড়ির কাজ শেষ। এখন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে একটু ফুর্তিতে মত্ত।

চিলেকোঠায় ওরা পাঁচজন ছিল। বারীন, মঘা, শান্তনু, ভৈরব আর কালিদাস। পাঁচজনের কর্মস্থল পাঁচদিকে। দৈবাৎ পাঁচ বন্ধু মিলেছে। তাই এই ফুর্তির আয়োজন।

কে জানত ফুর্তির শেষে এ-ট্র্যাজেডী থাকবে। কেননা, একদান খেলে উঠে জানলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ভৈরব। হাতে ছিল শান্তনুর দোনলা বন্দুক। নিছক খেয়ালবশেই তাগ করছিল রাস্তার ও পাশে শিবমন্দিরের চুড়োর ত্রিশূলটা। খেলাচ্ছলেই মন্দির দিকে নজর রেখে নলচে নামিয়ে আনছিল চুড়ো বরাবর নীচের দিকে। ত্রিশূলের পর গম্বুজের পলস্তারা। তারপর মন্দিরের চত্বর। ঠিক এই সময়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে এসেছিল নবপরিণীতা একটি দম্পতি। ভৈরবের নলচের সামনেই এসে পড়ল নতুন বরটি। মাছির সঙ্গে একরেখায় যখন বরের হৃৎপিণ্ড, ঠিক তখুনি শান্তনুর চোখে পড়েছিল জানলায় বন্দুক বাগিয়ে কাকে যেন তাগ করছে ভৈরব। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠে দৌড়ে গিয়েছিল শান্তনু। কেননা সে ছাড়া আর কেউ জানত

না বন্দুকে গুলিভরা আছে।

আচমকা শান্তনুর চেঁচানিতে এবং তারপরেই শান্তনুর হেঁচকা টানেতে চমকে গিয়েছিল ভৈরব। এমনই বরাত, সঙ্গে সঙ্গে গুলি বেরিয়ে গিয়েছিল বন্দুক থেকে। এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছিল নতুন বরের হৃৎপিণ্ড।

ওরা আর দাঁড়ায়নি। ফুর্তির ট্র্যাজেডি মাথায় নিয়ে চোঁ-চাঁ চম্পট দিয়েছিল পাঁচ বন্ধু। কে মারা গেল, তা নিয়ে আর মাথা ঘামায়নি।

মণিকার চোখে জল। বলছিল—"আমারও স্বপ্ন ছিল, সংসার করব। এ স্বপ্ন হঠাৎ দেখিনি। ছেলেবেলায় কল্প ছিল আমার খেলার সাথী। সেই কল্প বড় হল। কিশোর হল। তরুণ হল। আমি কিশোরী হলাম। তরুণী হলাম। মন দেওয়ার পালাও গড়ে উঠেছে ধাপে ধাপে। স্বপ্নও দেখেছি তিল তিল করে। সে স্বপ্ন মুহূর্তের মধ্যে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছেন আপনারা—আপনারা পাঁচ বন্ধুতে। কল্প মারা গেল। আমি বেঁচে মরে রইলাম শুধু প্রতিহিংসার জন্যে। এক বছরে অনেক টাকা খরচ করেছি, অনেক কাঠখড় পুড়িয়েছি। তবে বার করেছি আপনাদের পাঁচজনের নাম আর ধাম। বারীন আর মঘা কল্পর কাছে পৌঁছে গেছে। আপনি এখুনি যাবেন। ভৈরব আর কালিদাসও যাবে কয়েকদিনের মধ্যে।"

বলে, মণিকা উঠে দাঁড়াল। গ্যাসের চাবি পুরো খুলে দিল। বাইরে এসে বন্ধ করল পাল্লাদুটো। স্টিকিং প্লাস্টারের পটি দিয়ে টিপে টিপে বন্ধ করল পাল্লার ফাঁক।

যথাসময়ে পুলিশ এসেছিল। ঝুমি বার বার বলেছিল, "উষাদি এসেছিল স্কুল থেকে। তারপর বাবা মরে গেছে।"

পুলিশ স্কুলে গিয়ে উষাদিকে গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ফোন এল ফাঁড়িতে। একটা নারীকণ্ঠ বললে—"উষা দেবী নির্দোষ। ওঁর নাম নিয়ে আমিই খুন করেছি শান্তনু লাহিড়ীকে।"

পেট্রল-পাম্পের পাবলিক ফোন থেকে থানায় ফোন করেছিল মণিকা। রিসিভার রেখেই দৌড়ে এসে উঠেছিল গাঢ় রক্ত-রঙের ক্যাডিলাক গাড়ীটায়। ড্রাইভ করেছিল নিজেই। ঘণ্টাতিনেক একটানা গাড়ী চালিয়ে পৌঁছেছিল একটা মোটর মেরামতি কারখানায়। জি. টি. রোডের ওপর গাড়ী দাঁড় করিয়ে হেঁটে হেঁটে পৌঁছেছিল গ্যারেজে।

বেশ বড় কারখানা। ভাঙা-আধভাঙা গাড়ী দাঁড় করানো এলোমেলোভাবে। এঁকেবেঁকে আপিসের দিকে এগুলো মণিকা। তেলকালিমাখা একজন মেক্যানিককে বললে ভৈরবকে ডেকে দিতে।

মণিকা দাঁড়িয়ে রইল। জায়গাটা বেশ নির্জন। মাথার উপর কাক উড়ছে। আশেপাশে মানুষ নেই। ভাঙা গাড়ীর ভীড়ে মণিকাকে দেখা যাচ্ছে না।

মণিকা হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে ক্ষুদে পিস্তলটা বার করল। তুষার-শুভ্র ওড়না দিয়ে ঢেকে রাখল ডান হাত আর হাতে ধরা পিস্তল।

নলচে ফেরানো রইল আপিসের দিকে। ঐ পথেই আসবে ভৈরব। ঐ তো আসছে। মাথাজোড়া টাক। গ্যাঁট্টাগোট্টা চেহারা। এ কারখানার মালিক। একাই আসছে।

মণিকা পিস্তল তাগ করল। ট্রিগার টিপতে যাবে—

এমন সময়ে ভৈরবের পেছনে একটা সোরগোল শোনা গেল। পাহাড়প্রমাণ লোহালক্করের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর, দু'জন কনস্টেবল এবং একজন তেলচুকচুকে ভদ্রলোক। চেঁচাচ্ছেন ভদ্রলোক—"ঐ যে...ঐ দেখুন...জোচ্চোর কোথাকার...অ্যারেস্ট করুন...মেরামতের নাম করে আমার গাড়ী নিয়ে ভাড়া খাটাচ্ছে একবছর ধরে...গাড়ী দিচ্ছে না...চোর...গুণ্ডা...বদমাস..."

মণিকা থমকে গেল। ভৈরব ঘুরে দাঁড়িয়েছে। কনস্টেবল দুজন এসে দাঁড়িয়েছে দুপাশে। তারপর পুরো দলটা এগিয়ে চলল বড় রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশভ্যানের দিকে।

মণিকা আর দাঁড়ালো না। ফিরে এল ক্যাডিলাকে। সিটে বসে হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে বার করল একটা কাগজ। তাতে লেখা এই ক'টি নাম ঃ

বারীন

মঘা

শান্তনু

ভৈরব

কালিদাস

বারীন, মঘা আর শান্তনুর নাম তিনটে পেন্সিল দিয়ে কাটা। মণিকা জিজ্ঞাসা চিহ্ন বসালো ভৈরব-এর নামের পাশে।

সত্যিই তো! ভৈরব যে এখন হাজতে!

কালিদাস রায় চিত্রশিল্পী। জীবনধর্মী চিত্রাঙ্কনে পারদর্শী। তাই তার নিভৃত স্টুডিওতে মডেলের আনাগোনা চলে সকাল সন্ধ্যায়।

কালিদাস রায় ব্যাচেলার। সুপুরুষ। ধনী। তাই তার মক্কেল হতে রাজী হয় এমন অনেক কন্যা যাদের রূপ আছে, হয়ত রূপাও আছে।

কাজেই সেদিন সন্ধ্যায় কলিংবেল টিপে যে মেয়েটি কালিদাসের স্টুডিওতে পা দিল, তার প্রস্তাব শুনে বিস্মিত হল না কালিদাস। মেয়েটি কাজ চায়। মডেল হতে চায়। ফি খুব কম। ঘণ্টায় পাঁচ টাকা।

কালিদাস আপাদমস্তক দেখল মেয়েটির। দেখে রাজী হল। কারণ, এ মেয়ে কেবল রূপসী নয়, রূপকে কিভাবে মেলে ধরতে হয়, তা জানে। উৎসাহের বশে কালিদাস সঙ্গে সঙ্গে তাকে সিটিং দিল। ইজেলে কাগজ আটকে পেন্সিলের লম্বা লম্বা টানে ফুটিয়ে তুলল অপরূপার রূপরেখা।

মোহিনী হেসে বিদায় নিল মেয়েটি। নাম তার মণিকা। বলে গেল সে আবার আসবে। কাল সন্ধ্যায় সে হবে ব্যাধের বউ। কালিদাসের ইচ্ছে তাই।

নীচে নেমে এল মণিকা। চাতাল ঘুরে যেই লন পেরোতে যাচ্ছে, এমন সময়ে পাশ দিয়ে হন হন করে বেরিয়ে গেল একটি মূর্তি।

পুরুষ মূর্তি। এক পলকেই মণিকা তাকে চিনেছিল। তাই আর পেছনে না ফিরে সিধে ফটক পেরিয়ে পড়েছিল রাস্তায়।

পুরুষটিও থমকে দাঁড়িয়েছিল। পেছন ফিরে তাকিয়েছিল অপসৃয়মান তন্বীর দিকে। সন্দিগ্ধ চোখে। মেয়েটাকে এত চেনা চেনা ঠেকছে কেন?

সেই মুহূর্তে মনে পড়েনি। পড়লে অনেকগুলি বন্ধুকৃত্য একসাথেই সারতে পারত। কেননা, যুবা পুরুষের নাম সঞ্জয়। বারীন বাগচীর বন্ধু। যে বারীন এই সেদিন নিহত হয়েছে, মণিকার হাতে।

এই সঞ্জয়কে দিয়েই চা আনতে পাঠিয়েছিল মণিকা বারীনের মদের গেলাস ক্যাকটাসের টবে উপুড় করে দিয়ে।

পরের দিন সন্ধ্যায় কালিদাসের ফ্ল্যাটে এল মণিকা। একটিমাত্র বাঘের চামড়া পাতলা কোমর জড়িয়ে বুকের ওপর দিয়ে ঝুলে রইল কাঁধের ওপর। আর এক কাঁধে তীরভরা তূণ। হাতে ধনুক। ছিলায় তীর। ছিলা টান করে ধরা কান পর্যন্ত।

এই পোজে বিভিন্ন কোণ ধরে অনেকগুলি স্কেচ আঁকলো কালিদাস। প্রতিটি স্কেচের মধ্যেই অনুভব করল কামনার স্বাদ। মেয়েটার অনাবৃত কাঁধ, উরু এবং পিঠ ওকে টানতে লাগল চুম্বকের মত। পাগলের মত পরের পর স্কেচ এঁকে চলল ও। ক্লান্তি নেই ওর পেন্সিল টানার। ক্লান্তি নেই মণিকার অঙ্গেও। সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারানো চলবে না।

এবার ফ্রন্ট পোজে দাঁড়াল মণিকা। তীরের মুখ সিধে ফেরানো কালিদাসের দিকে। কালিদাসের চোখ পর্যায়ক্রমে ঘুরছে ইজেল আর মণিকার ওপর।

এমন সময় সাঁই করে কালিদাসের পাঁজর ছুঁয়ে তীর বেরিয়ে গেল—খটাং করে আটকে গেল ওদিকের দেওয়ালে টাঙানো ছবির ফ্রেমে।

ভীষণ চমকে উঠেছিল কালিদাস। আর মণিকা কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়েছিল পাশের টুলের ওপর—"আর পারছি না...বড্ড হাত-পা কাঁপছে।"

"তবে থাক," সামলে নিয়ে বলল কালিদাস। "কাল হবে'খন্।"

"না।" ফ্যাকাসে মুখ মণিকার। "আজকের মুড কালকে নাও থাকতে পারে। যত রাতই হোক, ছবি শেষ করুন। একটু ব্র্যাণ্ডি দেবেন?"

একটু কেন, বেশী করেই ব্র্যাণ্ডি ঢালল কালিদাস। নিজের রক্তেও আগুন ছোটালো ব্র্যাণ্ডির প্রসাদে। মণিকাকে দুটো আদরের কথা বলার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু তার আগেই একটা কাণ্ড ঘটল।

জানলার সামনে দাঁড়িয়েছিল মণিকা। দেখল, একতলার লন পেরিয়ে সঞ্জয় আসছে। আসছে কালিদাসের ফ্ল্যাটেই।

মণিকা বলল—"আমি যে এখানে আছি, তা আপনার কোন বন্ধু-বান্ধবকে জানাতে চাই না। আপনার হেল্প চাই।"

"একশবার।"

"আমি বাথরুমে যাচ্ছি। আপনার বন্ধুটি চলে গেলে আমাকে ডাকবেন।"

যথাসময়ে সঞ্জয় এল। ইজেল আঁকা মণিকার ছবি দেখে ভুরু কুঁচকে ভাবল অনেকক্ষণ। গত সন্ধ্যায় ছবিটায় রঙ চড়িয়েছিল কালিদাস। মণিকা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল সে ছবিতে। এ ছবিটাও চিনি-চিনি মনে হল সঞ্জয়ের। কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ল না প্রথম দেখার ঘটনাটা।

ইচ্ছে ছিল কালিদাসের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা মারার। কিন্তু কালিদাস যেন তাকে তাড়াতে পারলেই বাঁচে, এমনি ভাব দেখালো। বিস্মিত হল সঞ্জয়। হয়ত ইজেলের ছবিটা নিয়েই ব্যস্ত শিল্পীবন্ধু, এই ভেবেই আর দাঁড়ালো না সঞ্জয়। মডেলের মেয়েটি কে, এ প্রশ্ন বলি-বলি করেও বলতে পারল না কালিদাসের ঠোঁটে চাবি-দেওয়া ভাব দেখে।

ভাবিত মনে বাড়ি ফিরল সঞ্জয়। মেয়েটা কে? কার ছবি আঁকছে কালিদাস? কেন এত চেনা-চেনা লাগছে ছবিটা? একেই তো গতকাল সন্ধ্যায় কালিদাসের বাড়ী থেকে বেরোতে দেখা গিয়েছিল? চোখে চোখ পড়েছিল, মেয়েটি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে পাশ কাটিয়ে গিয়েছিল—আর ফিরেও তাকায়নি। কিন্তু সঞ্জয়ের কেন জানি মনে হয়েছিল, ফিরে তাকায়নি পাছে সঞ্জয় তাকে চিনে ফেলে তাই। ধরা দিতে চায় না মেয়েটা। কিন্তু কেন? কালিদাস এত রাতে তার ছবি আঁকছে তন্ময় হয়ে কেন? স্কেচ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মডেলের ছবি। তার মানে, মডেল ঘরের মধ্যেই ছিল। সঞ্জয়কে দেখেই লুকিয়েছে। অথবা কালিদাস লুকিয়ে রেখেছে। কেন এই লুকোচুরি? কে এই রহস্যময়ী? কার প্রভাবে কালিদাসের মত প্রিয় বন্ধুও এত দূরে সরে যেতে পারে?

ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে গেল সঞ্জয়ের। গলাও শুকিয়ে কাঠ। তাই কুঁজো থেকে গেলাসে জল গড়িয়ে গলায় ঢালল। ঢেলে, গেলাসের তলানিটা অভ্যেসমত উপুড় করে ধরল পাশে রাখা ক্যাকটাসের টবে।

উপুড় করেই থমকে গেল। স্মৃতির বিদ্যুৎ ঝলসে উঠেছে মাথার মধ্যে। আবার গেলাসটা উপুড় করল সঞ্জয়। আবার! আবার!

এবার মনে পড়েছে। ঠিক এমনি করেই ক্যাকটাসের টবে মদের গেলাস উপুড় করে ধরেছিল অজানা এক সুন্দরী, বারীন বাগচীর ফ্ল্যাটে। দিয়ে সঞ্জয়কে বলেছিল চা আনতে। সঞ্জয় চা নিয়ে ফিরে এসে দেখেছিল বারান্দা শূন্য। বহু নীচে পড়ে রক্তাক্ত একটা মাংসপিণ্ড—বারীন বাগচী!

আকাশের বিজলী মানবীরূপে দেখা দিলে যে রূপ হয়, মেয়েটির অঙ্গে সেই রূপ দেখেছিল সঞ্জয়। তাই ভোলা যায়নি। কালিদাস এই মেয়েরই ছবি আঁকছে তন্ময় হয়ে। অন্য ছাঁদে চুল বাঁধার জন্যে চিনি-চিনি করে চিনতে পারেনি সঞ্জয়।

বারীন বাগচীর রহস্যজনক আত্মহত্যার (?) পূর্ব মুহূর্তে যে মোহিনীকে দেখা গিয়েছিল—এই সেই কন্যা। বারীনের মৃত্যুর কারণ সে, হয়ত বা হত্যাকারিণীও। কিন্তু কালিদাসের সঙ্গে জুটল কেন মেয়েটা? এত গোপনীয়তাই বা কেন?

হঠাৎ একটা কুৎসিত চিন্তা হুল ফোটালো সঞ্জয়ের মগজে। ছিটকে গিয়ে রিসিভার তুলল ও। ডায়াল করল কালিদাসের নাম্বার। কিন্তু ফোন বেজেই গেল। কেউ ধরল না।

কালিদাস কি ঘুমোচ্ছে?

সঞ্জয়ের মাথায় সেই কুৎসিত চিন্তাটা তখনো সমানে হুল ফুটিয়ে চলেছে। কাজেই কিছুক্ষণের মধ্যেই অত রাতেও তাকে দেখা গেল গেল কালিদাসের ফ্ল্যাটের সামনে।

দরজা ভেজানো ছিল। ভেতরে আলো জ্বলছিল। ইজেলের পায়ার কাছে মুখ থুবড়ে পড়েছিল কালিদাস।

একটা তীর পিঠের মধ্যে ঢুকে আধখানা বেরিয়েছিল বুক দিয়ে।

পরের দিন।

জেলখানার সামনে এসে ব্রেক কষল একটা রক্তরঙের ক্যাডিলাক। নেমে দাঁড়াল পরমাসুন্দরী একটি তরুণী।

জেল সুপার অবাক হলেন তরুণীকে দেখে। মেয়েটি নাকি ভৈরব সাহার সহোদরা। দাদা হাজতবাস করছে শুনে দেখা করতে এসেছে।

সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। জেলখানার নিয়মকানুন ছার সে মুখের কাছে। কাজেই অচিরেই গরাদের এপাশে এসে দাঁড়াল মণিকা। ওপাশে ভৈরব।

চোখে চোখ রেখে মণিকা বলল—"চিনতে পারছেন?"

"না।"

"আপনাকে মুক্তি দিতে এসেছি।"

বলে, আঁচল ঢাকা পিস্তল থেকে পর পর তিনবার গুলি করল মণিকা। ভৈরব মুক্তি পেল ধরাধাম থেকে।

সেই সঙ্গে মণিকাও। চতুর্থ গুলিটা দিয়ে নিজের মগজ ফুটো করে দিয়ে সে রওনা হল পরপারে স্বামীর কাছে। □

* 'রহস্য' পত্রিকা'য় প্রকাশিত। শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭৮।

পরশ পাথর

ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিলাম অনেক মাস, অনেক বছর। সঙ্গে আছে আরো অনেকেই। দিশেহারা। উদ্দেশ্যহীন।

কিন্তু আমার মত ম্যাজিক জানে না কেউ। জাদুমন্ত্র আমার সূক্ষ্ম সত্তায়। আমি চাইলে অনেক কিছু করতে পারি। কিন্তু ইচ্ছে নেই।

পৃথিবীর আকর্ষণ বড্ড বেশী। প্রবল। মাঝে মাঝে দূরের ঐ গ্রহনক্ষত্রের দিকে ছিটকে গেছিলাম বটে, কিন্তু প্রচণ্ড আকর্ষণ আমাকে টেনে নামিয়ে এনেছে। বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে গুহায়, মন্দির কাঠ গির্জায় মসজিদে ঘুরে ঘুরে বেড়াই। এই সব জায়গাই আমার বেশি ভাল লাগে।

পগাড়ে নালায়, পোড়োবাড়ি আর বাঁশঝাড় নিমগাছে যারা ঘোরে, মায়া হয় ওদের দেখে। একেবারেই শক্তিহীন। যতদিন বেঁচেছিল, শুধু নাওয়া খাওয়া, টাকা রোজকার আর ভোগবাসনা নিয়েই মেতে থেকেছে। ব্রহ্মাণ্ডের অসীম শক্তিদের শরীরের আধারে সঞ্চয় করার কোনো চেষ্টা করেনি।

আমি করেছিলাম। বছরের পর বছর ল্যাবোরেটরীতে সাধনা করেছি। হিমঠাণ্ডায় পাহাড়ের গুহায় অজানাকে জানতে চেয়েছি। শক্তি পেয়েছি। অকল্পনীয় শক্তি।

কিন্তু অত শক্তিকে ধরে রাখার মত শরীর আমার ছিল না। রক্তমাংসের শরীর জীর্ণ করে দিয়ে আমার মূল সত্তাকে আঁকড়ে ধরে ধারণাতীত শক্তিরা বেরিয়ে এল বাইরে। মূল সত্তার বিনাশ নেই, জরা নেই, ক্ষয় নেই। জাদুবলে বলীয়ান এই সত্তা আবার নবদেহে প্রবিষ্ট

হতে পারে। কিন্তু আমার ইচ্ছে নেই।

না, ইচ্ছে নেই। লাভ কী?

কিন্তু মায়া হল ছেলেটিকে দেখে। কতই বা আর বয়স। বড়জোর চোদ্দ। ভারি সুন্দর চেহারা। চোখদুটো বড় বড়। টকটকে ফর্সা রঙ। মাথায় বেশ লম্বা। একমাথা হাল্কা চুল।

সবচেয়ে ভালো লেগেছিল ছেলেটার চোখের চাহনি। দীঘির মত টলটলে, কালো। সমুদ্রের মত অতলান্ত। আকাশের মত অসীম, প্রশান্ত।

অথচ এই চোখই কখনো কখনো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। হিংস্রতায় নিষ্করুণ হয়ে ওঠে। তখন তার দিকে চাওয়া যায় না।

ঠিক এই সময়েই কিন্তু গভীর চোখে তার দিকে চেয়েছিল তার মা। তন্ময় চাহনি। ব্যথা যেন ঝরে পড়ছে দুই চোখে।

মা বলে ঠিকই চিনেছিলাম আমি। ড্রেসিং টেবিলের ওপরেই রয়েছে যে তার ফটোগ্রাফ। ছেলেটি আত্মনিমগ্ন সেই ফটোর পানে চেয়ে। চোখ, চিবুক, মুখের গড়ন একই রকমের।

ছবির মা কিন্তু সামনেই দাঁড়িয়ে। ছলছল চোখে চেয়ে রয়েছে ছেলের দিকে।

আমি যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছি, সে তখনও তা দেখেনি। ছেলেটির দেখবার কথা নয়। কিন্তু মা তো দেখবে। কিন্তু যার সমস্ত মনপ্রাণ জুড়ে রয়েছে ওই ছেলে, সে পাশের দিকে তাকাবে কখন?

মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করেছিলাম—"কি হয়েছে?"

ভীষণ চমকে উঠল ছেলের মা। আমাকে দেখেই বিস্ময়ভরা চোখদুটোয় ফুলে উঠল নিবিড় বিস্ময়—"কে আপনি?"

"তোমারই মত একজন। দেহত্যাগ করেও ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। পৃথিবীর মায়া আর কাটাতে পারছি না।"

"আপনারও ছেলে আছে নাকি?"

"না। কেউ নেই আমার।"

"তবে?"

"কিসের আকর্ষণে আটকে আছি পৃথিবীতে, এই তো? হয়তো মাটির আকর্ষণ....অথবা হয়তো আমাদের মতই যারা দুঃখ শোকে অধীর, তাদের ছেড়ে যেতে পারছি না বলেই...।"

"আপনি কি সাধু ছিলেন?"

"লম্বা দাড়ি দেখে বলছো?" হাসলাম আমি—"চুলদাড়ি কাটবার সময় পেতাম না—তাই।"

"শুধু দাড়ি নয়," ছেলের মা আমার চোখের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়ে—"আপনার মত সৌম্য বিদেহী আজ পর্যন্ত দেখিনি। ঋষির মতই চেহারা আপনার," বলতে বলতে হঠাৎ দু'চোখে আশার আলো জ্বলে ওঠে মেয়েটির—"আপনিই কি সেই সব অদৃশ্য সহায়দের একজন যারা মরণের পরেও মানুষের উপকার করে যান নানাভাবে?"

হাসলাম। জবাব দিলাম না।

মেয়েটির চোখমুখ তখন জ্বলজ্বল করছে। কতই বা আর বয়স হবে। বড় জোড় চব্বিশ।

মৃত্যুকালে যে বয়স ছিল, এখনও তা রয়ে গেছে। পরমা সুন্দরী। যেমন রঙ, তেমনি মুখের গড়ন। দীর্ঘাঙ্গী। চোখদুটো সবচেয়ে সুন্দর। বড় বড়। গভীরভাবে আচ্ছন্ন।

বলল আকুল কণ্ঠে—"ঠাকুর, আমার ছেলেটাকে ভাল করে দেবেন?"

"ঠাকুর!" হেসে ফেললাম আমি—"ঠাকুর বললে কেন আমাকে?"

"ঐরকমই যে দেখতে আপনাকে। বলুন না, ভাল করে দেবেন ছেলেটাকে?"

"কি হয়েছে ওর?"

"ভেবে ভেবেই বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছে। ঐ দেখুন...ঐ দেখুন।"

দেখলাম ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়েছে। স্কিপিং-এর দড়িটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। চোখদুটো বিষণ্ণ। মায়ের ছবির দিকে তাকাচ্ছে আর দড়িটাকে টেনে টেনে দেখছে কত শক্ত।

মতলবটা বুঝলাম। বললাম—"ওর বাবা কোথায়?"

"কাজে বেরিয়েছে। রাত হবে ফিরতে। তার মধ্যেই দেখুন....ঐ দেখুন ঐ দেখুন....!"

ছেলেটা মায়ের ফটো তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে কাঁদছে। দু'গাল বেয়ে জল গড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে পাশেই বাবার ছবির দিকে। কিন্তু কী আশ্চর্য। সে চোখে বিদ্বেষ! বিজাতীয় ঘৃণা।

"বাপকে একদম সইতে পারে না দেখছি," বলেছিলাম আমি।

"অথচ বাপকেই সবচাইতে ভালবাসে। আমার চাইতেও। হঠাৎ ওর অখণ্ড বিশ্বাসে ঘা লেগেছে। খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে বাবার ওপর অগাধ বিশ্বাস। ও আজ তাই দিশেহারা।"

"বিশ্বাস ভাঙল কেন?" দেখলাম ছেলেটা দড়ি নিয়ে আবার টেনে টেনে দেখছে। খালি গা। প্রদীপ্ত চোখে বিকার ভাব। অস্থির। মাথার মধ্যে যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

"ওর মামা কানে বিষ ঢেলেছে। নিজেদের দোষ ওর বাবার ঘাড়ে চাপিয়েছে। বলেছে, তোর বাবা তোর মাকে মেরে ফেলেছে।—একী—একী করছিস রাজু। —ঠাকুর—ঠাকুর! ওকে বাঁচান!"

মায়ের চীৎকার ছেলে শুনতে পাবে কেন? একজন ইহলোকে, আর একজন পরলোকে। কিন্তু ছেলের কাণ্ড দেখে মায়ের সে খেয়াল নেই। আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠেছে—"বাঁচান! বাঁচান! ঠাকুর, ওকে বাঁচান।"

খাটে উঠে পড়েছে রাজু। স্কিপিং দড়ির একটা প্রান্ত বেঁধেছে সিলিংয়ে লাগানো হুকে। অন্য প্রান্তে একটা ফাঁস তৈরি করেছে।

গলায় দড়ি দেওয়ার মতলব। কাঁদছে ওর মা। হাওয়া-শরীর নিয়ে ছেলেকে আটকাতে পারছে না। ঘর ফাঁকা। দরজায় ল্যাচ দেওয়া। চাবি নিশ্চয় বাবার কাছে। তিনি না ফিরলে এ ছেলের আত্মহত্যা কেউ রোধ করতে পারবে না। কিন্তু আমি পারব।

চনমন করে উঠল আমার বিদেহী সত্তার শক্তিকেন্দ্রগুলো। দ্রুত হ্রস্ব স্বরে শুধোলাম ব্যাকুল-নয়না মেয়েটিকে—"নাম কি তোমার, মা?"

"দুর্গা। রাজু। রাজু। লক্ষ্মী ছেলে আমার—ধীর হ। মাথা ঠাণ্ডা কর।"

রাজু ততক্ষণে দড়ির ফাঁস গলায় দিয়েছে। আমি আর দেরী করলাম না। ঢুকে পড়লাম ওর শরীরের মধ্যে। চলে গেলাম একেবারে মস্তিষ্কে। যেখানে দশ হাজার কোটিরও বেশি নিউরণ পরিপাটিভাবে সাজানো রয়েছে। ন'হাজার কোটি এখনও নিষ্ক্রিয়। সারা জীবন জানতে

চেয়েছি এই ন'হাজার কোটি নিউরণের কাজ কী। কেন তাদের সৃষ্টিকর্তা ভরে দিয়েছেন করোটির মধ্যে। নিশ্চয় উদ্দেশ্য আছে। নিষ্ক্রিয় নিউরণদের সক্রিয় করলে কি কি ঘটতে পারে, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আর ধ্যানের মাধ্যমে তা জানতে চেয়েছি—পেরেছিও।

প্রবেশ করলাম এই নিষ্ক্রিয় নিউরণের রাজ্যে। থাকে থাকে সাজানো কোটি কোটি পুঞ্জীভূত রহস্য। প্রতিটি নিউরণ এক্-একটি অন্তহীন প্রহেলিকা। শক্তি কেন্দ্র। অসীম শক্তির ভাণ্ডারকে করোটির মধ্যে নিয়ে মানুষ কত অসহায়....ভাবে বুঝি মাত্র পাঁচটা ইন্দ্রিয়ই তার একমাত্র সম্বল। এই পাঁচ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ ছাড়া অন্য আর কিছুই মানতে চায় না। মূর্খ! মূর্খ!

নিউরণ-লোকে বিচরণ এই আমার প্রথম নয়। ধ্যানের শক্তি নিয়ে আমি কোটি কোটি প্রহেলিকাদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে তাদের চরিত্র জেনেছি, তাদের কাজ জেনেছি, অলৌকিক কাণ্ডকারখানার আধারদের প্রয়োজনমত সক্রিয় করে তুলে অসম্ভবকেও সম্ভব করে তোলার মন্ত্রগুপ্তি আয়ত্ত করেছি।

রাজুর নির্মল মস্তিষ্কে প্রবেশ করেই টের পেলাম দোটানার প্রচণ্ড আলোড়ন চলছে। নিউরণদের মধ্যে দিয়ে যেন ঝড় বয়ে চলেছে। আবেগের এই প্রভঞ্জন ধেয়ে আসছে একদিক থেকেই—একগুচ্ছ নিউরণ-কেন্দ্র থেকে—ভুল ধারণা মৌরসীপাট্টা গেড়ে বসেছে যেখানে।

অনেক কিছুই করা যায় এখন। কিন্তু সে সময় তো নেই। প্রথমেই ওর অসুস্থ চিন্তাধারায় যে প্ল্যানটা ছকে রেখেছে, সেটাকে ভণ্ডুল করে দিতে হবে। ওর চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, মায়ের ছবিটা বুকে ধরে কাঁদতে কাঁদতে সিধে হয়ে দাঁড়াল। এরপর ওর ইচ্ছে চেয়ারটাকে টেনে তার ওপর দাঁড়িয়ে দড়িটাকে ছোট করে নেওয়া। যাতে চেয়ার থেকে লাফিয়ে পড়লে গলায় এঁটে যায়।

ঠিক এই জায়গাটাতেই কয়েকটা নিউরণকে অসাড় করে দিলাম। দড়ি ছোট করার কথা ভুলে গেল রাজু। খাটে উঠে দাঁড়িয়ে লাফ দিতেই দড়িটা আলগা হয়েই রইল। আরও কয়েকটা নিউরণকে নিষ্ক্রিয় করে দিলাম—যাতে উপস্থিত বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। রাজু মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে গলায় দড়িটা টেনে টেনে বসাতে লাগল। কাঁদছে। হিস্টিরিয়া এসে গেছে। অজ্ঞান হয়ে গেল। গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে ঠোঁটের কষ বেয়ে।

বেরিয়ে এলাম। দুর্গা আতঙ্কঘন চোখে তাকিয়ে ছেলের দিকে।

বললাম—"বেঁচে গেল তোমার ছেলে। কিন্তু এভাবে কতদিন ওকে বাঁচাবে?"

"আপনি ব্যবস্থা করুন ঠাকুর।"

ঠাকুর। বেঁচে থাকতে কেউ ঠাকুর বলে ডাকেনি। পাগল বলত সবাই।

বললাম—"ঠিক আছে, মা। দেখছি কি করা যায়।"

দুর্গার কষ্ট হচ্ছিল। সূক্ষ্মদেহী। অনেক ঊর্ধ্ব স্তর থেকে নেমে এসেছে ছেলের টানে। এখন কষ্ট হচ্ছে। জলের মধ্যে মানুষ ডুবে থাকলে যে রকম কষ্ট হয়, তার চাইতেও বেশি।

বললাম—"মা, তুমি যাও। আমি আছি।"

"আপনার কষ্ট হচ্ছে না?"

"হলেও যেতে পারছি না, মা। যাও।"

দুর্গা চলে গেল। নিশ্চিন্ত মনে আমার পাহারায় ছেলেটাকে সঁপে দিয়ে সে ফিরে গেল ঊর্ধ্বলোকের বিদেহীদের মাঝে।

আমি চেয়ে রইলাম রাজুর মুখের দিকে। অসহায়। বড় অসহায়। বিকারগ্রস্ত হওয়ার ফলে এত বুদ্ধিদীপ্ত হয়েও নির্বোধের মত আচরণ করে চলেছে। একে টেনে তুলতেই হবে। ঘোর কাটাতেই হবে। অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসতে হবে।

দরজার ল্যাচ-কী ঘুরে গেল। রাজুর বাবা ঢুকলেন ঘরে। শ্রান্ত, ক্লান্ত চেহারা। বয়সে প্রৌঢ়। চোখেব তারায় কিন্তু অবসাদ ফুঁড়ে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য ঠিকরে বেরোচ্ছে। যৌবনে ব্যায়ামচর্চার চিহ্ন এখনো রয়ে গেছে বাহু আর বুকের পেশিতে। লম্বা চুল উস্কখুস্ক। জুলপি পেকে সাদা। সরু গোঁফও বিলকুল রূপোলী।

ঘরে ঢুকেই ভদ্রলোক এদিক-ওদিক তাকালেন। ছেলেকে দেখতে পেলেন না। নিমেষে আতঙ্ক ঘনিয়ে এল দুই চোখে। ছুটে গেলেন রান্নাঘরে, তারপর কলতলায়। ছেলে কোথাও নেই। উদভ্রান্তের মত ফের দৌড়ে ঘরে ঢুকলেন বড় ঘরে। ছেলে অনেক সময় খাটের তলায় লুকিয়ে ভয় দেখায় বাবাকে। তাই খাটের তলায় হেঁট হয়ে উঁকি দিলেন। ট্রাঙ্ক আর কার্ডবোর্ড বাক্স বোঝাই থাকায় খাটের ওদিক পর্যন্ত দেখতে পেলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে খাট ঘুরে এদিকে আসতে যাবেন, এমন সময় চোখে পড়ল সিলিং থেকে লাকলাইন দড়ি ঝুলছে। দড়ি নেমে গেছে খাটের ওপাশে মেঝে পর্যন্ত।

মেঝেতে শুয়ে রাজু। অজ্ঞান। বুকের ওপর দু'হাতে জড়িয়ে মায়ের বাঁধানো ফটোগ্রাফ— যে মাকে ওর মনেই নেই।

গলায় দড়ির ফাঁসের দিকে চেয়ে রইলেন ওর বাবা। সেকেণ্ড খানেক। বিপদ অনেক মানুষের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব জাগিয়ে তোলে। এই ভদ্রলোগের ক্ষেত্রে তাই ঘটল। নিমেষে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে রাজুর শিথিল একটা হাত তুলে নিয়ে মণিবন্ধে আঙুল টিপে দেখলেন— নাড়ি আছে। ফটোটা বুক থেকে নিয়ে রাখলেন ড্রেসিং টেবিলে। গলা থেকে ফাঁস ফুলে বগলের তলায় হাত দিয়ে মেঝের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে এলেন খাটের এদিকে। দু'হাতে ছেলেকে তুলে শুইয়ে দিলেন খাটে। দৌড়োলেন রাস্তার ওপার থেকে ডাক্তারকে ডেকে আনতে।

ডাক্তার এলেন সঙ্গে সঙ্গে। সব শুনে বললেন—"এ কেস অফ সিজোফ্রেনিয়া। মেণ্ট্যাল হোমে ট্রান্সফার করুন ইমিডিয়েটলি।"

সিজোফ্রেনিয়া? সন্দেহ হল আমার। রাজুর মগজের ভেতর এইমাত্র টহল দিয়ে এলাম আমি। এলোমেলো চিন্তার দুঃসহ টানাপোড়েন ছাড়া তো কিছুই চোখে পড়েনি। সিজোফ্রেনিয়া নামক উন্মত্ততার বিকৃতি তো কোনো কোষে দেখিনি—অবশ্য কোটি কোটি নিউরণের সবগুলো আর দেখা হয়নি। তবুও—

ডাক্তার বিদায় নিতেই টেলিফোন তুললেন পলাশবাবু। ব্যবস্থা হয়ে গেল বালিগঞ্জের একটি মেণ্ট্যাল হোমে। রাজু তখন কলতলায়—শুনতে পেল না—জানতেও পেল না অন্যায়ভাবে তাকে পাঠানো হচ্ছে পাগলা গারদে!

ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দুহাতে মাথা টিপে ধরেছেন পলাশবাবু। পাঁচদিন বয়স থেকে যাকে একটা দিনের জন্যেও কাছ ছাড়া করেননি—আজ তাকে পাঠাচ্ছেন পাগলা গারদে—

রাজু পাগল। এইজন্যেই কি তিনি বিয়ে করলেন না দ্বিতীয়বার? ছেলের জীবনে কোনো অন্তরায় আসুক, তা তিনি চাননি। কিন্তু পরিণাম?

ঠিক এই সময়ে, পলাশবাবুর এই বিহ্বলতার সুযোগে ঢুকে গেলাম তাঁর মগজের কন্দরে—

বললাম—"বিয়ে করিনি, ভালই করেছি। ছেলেটা সৎ-মার হাতে পড়ত। নির্ঝঞ্ঝাট থাকতে গিয়ে আরও ঝঞ্ঝাট বাড়ত।"

বললাম—"ডাক্তার বলুক গে, পাগলা-গারদে ছেলেকে দেওয়া ঠিক হবে না। সেখানে পাঁচ রকম পাগলের মত একেও পাগলের ট্রিটমেন্ট দেওয়া হবে। ইলেকট্রিক শক দেবেই ঝামেলা কমানোর জন্যে। ব্রেনসেল নষ্ট করে দেবে। খামোকা ছেলেটাকে মগজের শক্তি কমিয়ে দেওয়াটা ঠিক নয়।"

পুনরুক্তি করে গেলেন পলাশবাবু। ভাবনাগুলো যেন তাঁরই।

এইভাবেই চলল মগজ ধোলাই। পলাশবাবুর মগজটিও বেশ। আধ্যাত্মিক চিন্তায় ভরপুর। বিশুদ্ধ। পবিত্র পরিবেশ। সৎ চিন্তা, সৎ সঙ্গ আর সৎ কথা তাঁর মগজের এহেন উচ্চাবস্থা এনেছে। যেটুকু দ্বিধা, সংশয়, দিশেহারা অবস্থা এসেছিল, আমি তা কাটিয়ে দিলাম মগজে অধিষ্ঠান করে।

ফলটা কিন্তু নাটকীয় করতে চাইনি ইচ্ছে করেই। রাজুকে বাঁচাবো কথা দিয়েছি দুর্গাকে। তাই সইয়ে সইয়ে পলাশবাবুকে তৈরি করতে হয়েছে। কখনো রাজুর মগজেও প্রবেশ করেছি—তার দানবিক সত্তাকে রুখে দিতে। তার মাথায় যখন খুন চেপেছে, হিংস্র চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে সাইকেলের পাম্পার হাতে নিয়েছে পেটাবে বলে, আমি তখন পলাশবাবুকে ছেড়ে তার মধ্যে ঢুকে মহাবিপর্যয় রুখে দিয়েছি।

কিন্তু হঠাৎ একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটল যার পর আমাকে ভাবতে হল অন্য পন্থা।

বেশ ছিল বাপবেটায়। নতুন স্কুলেও ভর্তি হয়ে গেছে। স্কুল খুললেই নতুন বন্ধুদের সঙ্গে হৈ-চৈ করার স্বপ্নে বিভোর রাজু। নতুন জামা-প্যান্ট-জুতো-বই এসে গেছে। দুর্গার মুখে হাসি ফুটেছে। ও তো দেখছি রোজই রাত্রে আসে। ছেলের মাথার কাছে চুপটি করে বসে থাকে। রাজু ঘুমিয়ে পড়লেই ওর সূক্ষ্ম দেহের সঙ্গে কত কথাই না বলে।

তাই নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। সংসার সুখের হয়েছে। একজনের হাওয়ার শরীর, বাকি দুজনের রক্তমাংসের।

দিনকয়েকের জন্যে চুম্বক ক্ষেত্রে ভেসে গিয়েছিলাম। বিজ্ঞানীরা এখনও পুরো হদিশ পাননি এই চুম্বক ক্ষেত্র আর তার অকল্পনীয় শক্তির। এই পৃথিবীতেই বিরাজমান এই শক্তি-ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে সূক্ষ্ম শরীরেও আমাকে অবগাহন করে নিতে হয়। বিশেষ করে সৌরঝড়ের সময়ে। মহাজাগতিক রশ্মির প্রভঞ্জন বয়ে যায় পৃথিবীর ওপর দিয়ে। চুম্বক ক্ষেত্র অকল্পনীয় শক্তির আধার হয়ে ওঠে। এইচ, রাইডার হ্যাগার্ডের 'শী' উপন্যাসটা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা অবাক হয়েছন মৃত্যুকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে হাজার হাজার বছর ধরে বেঁচে থাকার রহস্য-কেন্দ্র এক মৃত আগ্নেয়গিরির মধ্যে রয়েছে জেনে। আসলে, পৃথিবীর বেশ কয়েকটা জায়গায় পুঞ্জীভূত রয়েছে এই শক্তি। প্রাচীন মঠ-মন্দিরগুলো নির্মিত হয়েছে এই সব জায়গাতেই। দৈবী-শক্তি প্রকৃতপক্ষে এই মহাশক্তি। কুম্ভমেলায় বারো বছর অন্তর যাঁরা গেছেন, তাঁরা দেখেছেন, মধ্যরাত্রে স্নান করার ঠিক সময়টিতে আচম্বিতে কোথা থেকে প্রবল হাওয়া বইতে শুরু করে। প্রচণ্ড শীতে কাঁপতে কাঁপতে একটা ডুব দিলেই কিন্তু কাঁপুনি চলে যায়—আর শীত করে না। এ হাওয়া কোথা থেকে আসে, আসলে তা হাওয়া কি অন্য কিছু, বারো

বছর অন্তর কুম্ভ মেলায় কেন সারা পৃথিবীর যোগীরা আসেন—তা অনেকেই জানেন না। পৃথিবীর অনেক অজানা রহস্যের অন্যতম এই রহস্য কিন্তু আমার কাছে মোটেই রহস্য নয়। যখন বেঁচে ছিলাম, সাধনা করেছি হিমালয়ের বিশেষ এক গিরিগুহায়—শক্তির কেন্দ্র আছে সেখানে। মৃত্যুর পরেও অমর সত্তাটাকে মাঝে মাঝে নিয়ে যাই শক্তি-স্নানে অক্ষয় অব্যয় থাকবার মানসে।

কিন্তু নিজের প্রসঙ্গ বড় বেশি বলে ফেলেছি। শক্তি কেন্দ্রে সেবার দেখলাম আরও অনেক বিদেহী গুরু এসেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছে মাদাম ব্লাভাটস্কি, কর্ণেল অলকট এবং একজন স্বামীজি যিনি থিয়সফিস্টদের সম্বন্ধে কত কটূক্তিই করেছেন একসময়ে।—কিন্তু এই শক্তি ক্ষেত্রে দেখলাম তোফা আছেন তিনজনে।

কথায় বলে, সৎসঙ্গে স্বর্গবাস। তা আমার স্বর্গ তো এই পৃথিবী। তাই মিশে গেলাম সৎসঙ্গে বেশ কিছুদিনের জন্যে। এমন সময়ে একদিন গুরুজী দর্শন দিলেন অকস্মাৎ। এই গুরুজীর নাম পৃথিবীর সবাই জানেন। কিন্তু আমি তা বলতে চাই না। কথা দিয়েছি।

গুরুজী সৌম্য হেসে বললেন—"তুই এখানে সৎ-সঙ্গ করছিস, ওদিকে তোর রাজুর অবস্থা যে কাহিল হয়ে এল। যা পালা।"

তৎক্ষণাৎ চলে এলাম রাজুর ঘরে। দেখলাম রাজু মেঝেতে বসে কটমট করে তাকাচ্ছে আর চোখ ঘোরাচ্ছে। একটু তফাতে বসে ওর বাবা। ম্লান উদ্বিগ্ন মুখে বিপদের কালো ছায়া।

রাজুর সামনে ময়লা ধুতি পাঞ্জাবী পরা কালোমত বেঁটেপানা চশমাধারী এক প্রৌঢ় একটা ঝাঁটার কাঠি নিয়ে মন্ত্র পড়ছে।

রাজুর সমস্ত সত্তায় জড়িয়ে রয়েছে বীভৎস কালো একটা ছায়া।

দেখেই আঁৎকে উঠেছিলাম। এ যে সেই বিভীষিকা—অন্ধকারের পুঞ্জ হতে যার জন্ম—অন্ধকারেই যার নিবাস। কিন্তু সরল রাজুকে আশ্রয় করেছে কেন?

ফ্ল্যাটটা একতলায়। পাশেই জলা জায়গা। নোংরা বস্তি। বুঝলাম সবই। রাজু দাঁত মাজা ছেড়েছে। ঘরদোর বমি করে ভাসাচ্ছে। যেখানে সেখানে মলত্যাগ করছে। শুভ শক্তি ঘর থেকে বিদায় নিয়েছে। আবির্ভূত হয়েছে অশুভ শক্তি।

এই ছায়াদানবকে আমি চিনি। মানুষের মনের যত পাপ, যত অন্যায়, যত কালিমা—সব পুঞ্জীভূত হয় ইথারে—ইথিরীয় উপাদানে গঠন করে নেয় কায়া—অপার্থিব সেই কায়া হন্যে হয়ে খোঁজে একটি আশ্রয়—এমন একটি আশ্রয় যাকে বেষ্টন করে পরজীবি লতার মত নিজের পুষ্টিসাধন করে চলবে, ভোগবাসনা মিটিয়ে চলবে।

এ ছায়াদানবের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাপাচার, অতৃপ্ত কামনার ক্ষুধিত লিপ্সা; এর বিবেক নেই, বোধ নেই, মায়া নেই, মমতা নেই। অতীতেও দেখেছি জগতের অনেক শুভশক্তি এর কুটিল শক্তির কাছে হার মেনেছে। পারব কি আমি?

গুণীন ভদ্রলোক আঁচ করেছে খানিকটা। অশরীরীর অস্তিত্ব অনুমান করে নিয়ে ঝাড়ফুঁক করে চলেছে সেইভাবে—কিন্তু কল্পনাও করতে পারেনি—অশরীরী বা দুষ্ট প্রেতাত্মার চাইতেও সহস্র গুণে ভয়াবহ এই ছায়াদানব। মানুষের চোখে সে অদৃশ্য। দৃশ্যমান হলে দাঁতকপাটি লাগতই।

"রাজু, মাপো তো কাঠিটা আঙুল দিয়ে," বলে মন্ত্রপড়া ঝাঁটার কাঠিটা এগিয়ে দিল

গুণীনবাবু। চশমাটা ঠিক করে নিয়ে চেয়ে রইল হাসি হাসি মুখে। ভাবখানা, যাবে কোথায় বাছাধন!

রাজুর চোখ জ্বলছে। অমানুষিক চাহনি। বনের শ্বাপদও এ চাহনি দেখলে শিউরে উঠত। কাছে ঘেঁসত না। কিন্তু গুনীনবাবু আঙুলের স্টীলের আংটিটা একবার নিজের কপালে ছুঁইয়ে শুধু বললেন—"মাপ রে, মাপ। এক ঘণ্টার মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

রাজুর শরীর এই ক'দিনেই যেন দু'গুণ ফুলে উঠেছে। গোল কাঁধে চিতাবাঘের মত ঝুঁকে লাফিয়ে পড়ার প্রবণতা। স্ফুলিঙ্গ চোখে সেই রক্তহিম করা জিঘাংসা।

ঠোঁট আর চোয়াল শক্ত হয়ে গেল রাজুর। কিন্তু সামলে নিলে নিজেকে শেষ মুহূর্তেও। কাঠিটাকে মেঝেতে ফেলে আঙুল ফেলে ফেলে মাপল—বাইশ।

অর্থাৎ বাইশ আঙুল লম্বা কাঠি।

কাঠি টেনে নিল গুণীনবাবু। আবার কিছুক্ষণ মন্ত্র পড়ল আর ফুঁ দিল—মন্ত্র পড়ল আর ফুঁ দিল—বার বার তিনবার। তারপর কাঠিটা বোলাতে লাগল রাজুর গায়ে।

চাপা গলায় গজরে উঠল রাজু। চোদ্দ বছরের এই ছেলের গলায় শুনেছি সুমিষ্ট স্বর—এত কর্কশ, গুরুগম্ভীর গজরানি এ কণ্ঠে কল্পনাই করতে পারা যায় না। শিউরে উঠলেন পলাশবাবু। ভয়ে কাঠ হয়ে চেয়ে আছেন ছেলের দিকে।

চমকে উঠেছিল গুণীনবাবুও। পরক্ষণেই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দ্রুত হাতে বারকয়েক সারা গায়ে কাঠি বুলিয়ে নিয়ে টেনে ধরল মেঝের ওপর।

বলল—"রাজু, নিজে মাপ।"

প্রতিবার গায়ে কাঠি বোলাবার সঙ্গে সঙ্গে কুঁচকে কুঁচকে যাচ্ছিল রাজু। চোখে সেই অগ্নিগর্ভ দৃষ্টি, শক্ত ঠোঁট একটু ফাঁক হয়ে যাওয়ায় না-মাজা হলুদ দাঁত বাঘের মত যেন রক্ত-তৃষ্ণায় লোলুপ। দৃশ্যটা অতিশয় রোমাঞ্চকর। কিন্তু গুণীনবাবু তো এসব দেখেশুনে অভ্যস্ত। তাই পরোয়া করেনি। হুকুমের স্বরে বললে—"রাজু, নিজে মাপ।"

ভেবেছিলাম এবার রাজুর ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। কিন্তু আবার সামলে নিল সে নিজেকে। আমি যে শক্তি দিয়ে এসেছি ওর মগজে, এখনও তার রেশ রয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

কাঠিটা মাপল রাজু। একই কাঠি একটু আগে মেপেছিল বাইশ আঙুল। কোনো হাতসাফাই যে হয়নি তা তো দেখাই যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও এবার তা মাপবার পর দাঁড়াল চৌত্রিশ আঙুল।

কাঠি বেড়ে গেছে। গুণীনবাবু বাহাদুর বলতে হবে। ছায়াদানবের কিছুটাকে মন্ত্রবলে টেনে এনেছে কাঠির মধ্যে।

তাকিয়ে দেখলাম, রাজুর অবয়ব ঘেরা ছায়াদানব কাঁপছে থির থির করে....একবার গুটিয়ে গিয়ে আবার বড় হয়ে যাচ্ছে.....আর ভলকে ভলকে কালচে বেগুনি কুৎসিত আভা ঠিকরে যাচ্চে চারিদিকে।

বলা বাহুল্য এ সবই দেখলাম আমি। আর কেউ না।

খুশী গলায় বললে গুণীনবাবু—"রাজু, আর ভয় নেই। ব্যাটাকে পাকড়েছি। কব্জায় এসে যাবে এখুনি। তারপর কাঠি ছোট হতে হতে দেখবি পনেরো আঙুলে এসে দাঁড়িয়েছে। আর কয়েকবার ঝাড়লেই—"

পরক্ষণেই বুঝি প্রলয় ঘটে গেল ঘরের মধ্যে। এত দ্রুত ঘটনাগুলো ঘটে গেল যে ভাল

করে দেখাও গেল না কি হয়ে গেল।

শুনলাম একটা শতবজ্রগর্জনের মত হুঙ্কার রাজুর কণ্ঠে। সঙ্গে সঙ্গে সে ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠেই বোধহয় পর পর প্রচণ্ড লাথি মেরে গেছিল বসে থাকা গুণীনবাবুর চোয়ালে, বুকে আর পেটে। বোধহয় বললাম এই কারণে যে তিড়িংমিড়িং করে লাফিয়ে উঠে রাজুকে কেবল এ-পা আর ও-পা ছুঁড়তে দেখেছিলাম। এরই নাম বোধহয় ক্যারাটে বা কুংফু।

ফলটা হল এইরকমঃ বেঁটেখাটো গুণীনবাবু বসে থাকা অবস্থাতেই শূন্য পথে উড়ে গেল এবং দশ ফুট পেছনকার খোলা দরজা দিয়ে আছড়ে পড়ল বাইরের চাতালে।

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আছে বটে ভদ্রলোকের। নিমেষমধ্যে গড়িয়ে গিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়িয়েই কাঁচাকোঁচা সামলাতে সামলাতে ছুটল বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে।

ফিরে তাকালাম রাজুর দিকে। তার চোখে খুনের সঙ্কল্প। আতঙ্কে পাংশুবর্ণ পলাশবাবু।

মনস্থির করে নিলাম তৎক্ষণাৎ। প্রবেশ করলাম পলাশবাবুর মগজে। সব যেন পাথর হয়ে গেছে সেখানে। শক্তি প্রভাবে খানিকটা ধাতস্থ করলাম তাঁকে। দুর্গার কথা আমি রাখব ঠিকই। বাঁচাবো রাজুকে। তার আগে বাঁচাতে চাই পলাশবাবুকে। খুন হয়ে যাবে যে ছেলের হাতে।

বললাম—"রাজু, যা হাত মুখ ধুয়ে আয়।"

রাজু তো চায় কলতলাতেই থাকতে। চায় তার শরীরের দখলদার এই বিভীষিকা। রক্তবর্ণ চোখে সে কলতলায় ঢুকতেই পলাশবাবুর হাতটা বাড়িয়ে দিলাম টেলিফোনের দিকে। যে নম্বরটা অনেকদিন ধরে মনে করতে পারছিলেন না—সেটা ডায়াল করালাম ওঁর আঙুল দিয়ে। ওপাশ থেকে ভেসে এল তীব্র ব্যক্তিত্বময় কণ্ঠস্বর।

কথা হয়ে গেল সংক্ষেপে। রাজু বেরিয়ে আসার আগেই (পাক্কা দু'ঘণ্টা পরে) রিসিভার রেখে প্রতীক্ষায় রইলেন পলাশবাবু। মনকে আমি শক্ত করে ধরে রয়েছি। তাই আজ এত নিষ্ঠুর হতে পারবেন। ছেলের মঙ্গলের জন্যেই হতে হবে।

রাজু অশুচি কলতলা-পাইখানা থেকে অশুচি দেহ আর অশুচি মন নিয়ে বেরিয়ে এসে তিন লিটার দুধ আর আমসত্ত খেয়ে নিল একসঙ্গে, সেইসঙ্গে কলা বেশ কয়েকটা। পেট জয়ঢাক। অবয়ব ঘিরে ছায়াদানবকে বেশ পরিতৃপ্ত দেখলাম। বিজয় গৌরবে উল্লসিত। তাই বিকট আভার বিকিরণ আর দেখা যাচ্ছে না। একটু একটু করো কালো ছায়াটা প্রবিষ্ট হচ্ছে সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা গৌরবর্ণ দেহটার মধ্যে। মৌরসীপাট্টা গেড়ে বসেছে আর কী।

হাসলাম। জানি এর ওষুধ কী। ওঝা, গুণীনরা তা জানে না। বিজ্ঞানসাধক ছিলাম বলেই—

ঘুমিয়ে পড়েছে রাজু। ওর নিঃশ্বাসেও এখন দুর্গন্ধ। মুখে তো বটেই। ফুলের মত সেই ছেলেটা, যার নিষ্পাপ মুকুলে ছিল অরণ্যের আশ্বাস—আজ সে ক্ষুদে দানব!

চেয়ারে ঠায় বসে আছেন পলাশবাবু। দরজা জানলা সব বন্ধ। আলো জ্বলছে ঘরে—দিনের বেলাতেও।

মৃদু টোকা পড়ল দরজায়। উঠে গেলেন পলাশবাবু। সামনে দাঁড়িয়ে তিনজন জোয়ান চেহারার যুবক।

একজন বললে—"ডক্টর বক্সীর কাছ থেকে আসছি।"

দরজাটা দু'হাট করে খুলে দিলেন পলাশবাবু। বললেন—"গাড়ি কোথায়?"

"ঐ তো—।"

"দরজার সামনে এনে রাখুন।"

গাড়ি এল দরজার সামনে—শুধু ফুটপাত পেরোতে হবে। ব্যাকডোর খোলাই রইল।

যুবক তিনজনকে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকলেন পলাশবাবু। ঘুমন্ত রাজুকে তিনদিক থেকে ঘিরে ধরল তিনজনে—খাটের তিন পাশে। মাথার কাছে দেওয়াল। পালাবার পথ ওখানে নেই।

পলাশবাবু টেলিফোনে সব কথাই বলেছিলেন ডাক্তার বক্সীকে। তিনি বড় মনোরোগ-বিশেষজ্ঞ হতে পারেন—কিন্তু রাজু তাঁর কাছে হবে একটা চ্যালেঞ্জ। এশিয়া-বিখ্যাত তিন মনোচিকিৎসককে সে ঘোল খাইয়েছে (সেটা যে আমার জন্যেই, পলাশবাবু তা জানবেন কি করে?) ক্যারাটে মার জানে, গায়ে এখন অসুরের মত শক্তি। এর আগে একটা পাগলা-গারদে একাই এক মিনিটের মধ্যে মেল নার্স, ডাক্তার, দারোয়ানকে পিটিয়ে, চেম্বার তছনছ করে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে পিথিডন ইঞ্জেকসন দেওয়া সত্ত্বেও।

ডাক্তার বক্সী তাই সেইরকম লোক পাঠিয়েছেন। পলাশবাবু জানেন, এক্ষুণি কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটে যাবে। তবুও সাহস সঞ্চয় করে ঠেলা দিলেন রাজুকে— "ওঠ রে।"

চোখ মেলল রাজু। খাটের তিন পাশে তিনজন অচেনা পুরুষ দেখে চোখ বন্ধ করে ফেলল তৎক্ষণাৎ। নগ্ন গা, পাজামার দড়ি শিথিল—এসময়ে.....

মৃদু স্বরে পলাশবাবু বললেন—"যেতে হবে—ওঠ!"

সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলেই চিৎকার করে উঠল রাজু—"না!"

বুঝেছে সে কোথায় যেতে হবে। কিন্তু হাত-পা চালানোর সময় দিল না তিন মজবুত পুরুষ। দু'জনে চেপে ধরল দু'কব্জি আর দু'পায়ের গোছা। আর একজন মাথা—যাতে ঘাড় বেঁকিয়ে কামড়ে দিতে না পারে।

প্রলয় ঘটতই। কিন্তু তা হল না। চ্যাংদোলা করে বিছানা থেকে টেনে নামিয়ে সটান গাড়িতে তুলে ফেলা হল রাজুকে। কালো ছায়াদানবকে ফুঁসতে দেখলাম ওর অবয়ব দিয়ে।

ট্যাক্সি বেরিয়ে যেতেই আমি ওদের পৌঁছনোর আগেই চলে গেলাম মেণ্ট্যাল হোমে—ঢুকে গেলাম ডাক্তার বক্সীর মগজে।

দীর্ঘদেহী, উন্নতনাসা, গৌরবর্ণ ডক্টর বক্সী যখন অনর্গল পাইপ টানছেন, রাজুকে চ্যাংদোলা করে এনে ফেলা হল তাঁর সামনে।

পাজামা অর্ধেক খুলে গেছে। বিশাল শরীর বিশালতর হয়েছে। রাজু যেন সত্যিই এখন দানব। নোংরা দাঁতে মুখে অকপট হত্যালালসা, রক্তবর্ণ ঘূর্ণিত চোখে ঘৃণার বিষ। কণ্ঠে হুহুংকার—"এখানে কেন?"

মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে তিনবার টেবিলে ঠুকলেন ডাক্তার বক্সী। যে কাজটা অনেক পরে করার কথা, সেটা যাতে এখুনি করা হয়—এই প্ল্যান আমি তখন তাঁর মাথায় বসে জুগিয়ে চলেছি। আমার কথাই তিনি বললেন মুখ দিয়ে—"সেলে ঢুকিয়ে দাও। গিভ হিম শক!"

ডাক্তার বক্সী শকথেরাপিতে বিশ্বাস করেন না। খামোকা ব্রেন সেল নষ্ট করে দেওয়ার

পক্ষপাতী তিনি নন। টকথেরাপীতে মিরাক্যল দেখান, কিন্তু সেটা সময়সাপেক্ষ। মাসের পর মাস মেণ্ট্যাল হোমে থাকতে হয়। খরচসাপেক্ষও বটে। মাসে চার-পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে যেতে হয়। তাই তিনি কুসংস্কারমুক্ত হলেও খোলা মনে কিছুদিন স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটির শক-থেরাপি নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। সমসাময়িক মনোরোগ-বিশেষজ্ঞদের বলেন নি—ভূতে পাওয়া রোগীদের ভাল করার জন্যেই তাঁর এই গবেষণা। টিটকিরি দেওয়ার লোকের তো অভাব নেই। প্রেতদেহ যে স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটিতে সইতে পারে না—এ তত্ত্ব তিনি জেনেছিলেন সাইকিক রিসার্চ সোসাইটি থেকে। সুফলও পেয়েছিলেন কয়েকটা কেসে—কিন্তু টিটকিরির ভয়ে গবেষণা-পত্রে তা হাজির করেননি—পাঁচ কান করেন নি। লোকে জেনেছে, তিনি শক দিয়ে রোগ সারিয়েছেন।

আমাকে পাঁচ জায়গায় যেতে হয় বলেই জানতাম তাঁর চিকিৎসার গুপ্তরহস্য। রাজুকে এতদিন এখানে আনিনি—কারণ ভূতে পাওয়ার কেস তার নয়। কিন্তু আজ ভূতেদের গুরু ঢুকেছে তার শরীরে।

সুতরাং.....

তিন মাস পরে দেখা গেল সল্টলেকের স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে নতুন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে রাজুকে স্কুটার চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন পলাশবাবু। মুখে প্রশান্ত হাসি। রাজু ঝকঝক করছে। ব্যক্তিত্ব আর আচরণ পাল্টে দিয়েছেন ডাক্তার বক্সী।

ছায়া-দানব শক খেয়েই পালিয়েছিল। তারপর ওকে টক-থেরাপি দিয়ে খাপখোলা বাঁকা তলোয়ার বানিয়ে ছেড়েছেন ডাক্তার বক্সী। টিকালো নাক, বুদ্ধি-উজ্জ্বল চোখে কোথায় সেই অতীতের বিভীষিকা?

পেছন পেছন দুর্গা যাচ্ছিল। সঙ্গে আমি।

ও বললে—"বড় কষ্ট হচ্ছে। এখন চলি?"

"যাও," বললাম আমি—"রাজুর ভার আমার।"

দুর্গা আর আসেনি। ভেবেছিলাম পুনর্জন্ম নিয়েছে।

রাজুর বিয়ে হল কালকে। মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতে দেখলাম দুর্গাকে। সূক্ষ্ম দেহে।

পাগলি! □

* 'রহস্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত।

ভা রহস্য

কাঞ্চনজঙ্ঘাকে এভাবে সবসময়ে দার্জিলিং থেকে দেখা যায় না। ইন্দ্রনাথ এই প্রথম দার্জিলিং আসে নি। শীতকালটা বরাবর এড়িয়ে যায় অবশ্য—ঠাণ্ডার ভয়ে। দু-এক বছর অন্তর শৈলনগরীতে যায় পাহাড় আর ঝাউবন দেখতে। ক্লান্ত স্নায়ুকে চাঙ্গা করতে।

প্রতিবার আসে এপ্রিল মাস নাগাদ। প্রিয় হোটেল একটাই আছে। জলাপাহাড়ের দিকে

যে রাস্তাটা, যে রাস্তা দিয়ে সকালে আর বিকেলে টুরিস্টরা হৈ-হৈ করতে করতে ঘোড়া টগবগিয়ে যাতায়াত করে, সেই রাস্তার পাশেই পড়ে হোটেলটা। ঘোড়ার যাতায়াতের সময়টুকু ছাড়া জায়গাটা খুব নিস্তব্ধ। যে ঘরটায় বরাবর ওঠে, তার তিন দিকে কাচের জানলা। খাটে বসেই একদিকে দেখা যায় টাইগার হিলের ওপরে মাইক্রোওয়েভ টাওয়ার, আর একদিকে এভারেস্ট আর অন্যান্য পাহাড়চুড়ো। সামনে পাহাড় আর পাহাড়।

ইন্দ্রনাথ এখানে এলেই অন্যরকম হয়ে যায়। যে ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে গোয়েন্দা কাহিনীর পাঠকপাঠিকারা চেনে, জানে এবং ভালবাসে, এ যেন সে ইন্দ্রনাথ নয়। বজ্রকঠিন ইন্দ্রনাথ এখানে এলে যেন ঋষিপ্রতিম হয়ে যায়। যতক্ষণ ঘরে থাকে, ততক্ষণ পাহাড় আর আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যে ভাবে আপন মনে, সে ছাড়া কেউ জানে না। যখন বেড়াতে বেরোয়, পাহাড়ের গা বেয়ে নিচে নেমে যায়, কখনো দার্জিলিং ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে যায় ঝাউবনের পত্র মর্মর শুনতে শুনতে—তখন যেন আরও বেশী আত্মস্থ, আরও বেশী ধ্যানস্থ, আরও বেশী করে অন্য জগতের মানুষ হয়ে যায়। তার ভেতরকার যে সত্তাটার সন্ধান কেউ পায় নি, দার্জিলিংয়ের মন উদাস করা পরিবেশে এলেই তা ব্যাকুল হয়ে বেরিয়ে আসে বাইরে। রহস্যপ্রেমিক ইন্দ্রনাথ তখন প্রকৃতই উন্মনা হয়ে খোঁজে এমন এক রহস্য-সূত্র যা বিশ্বচরাচরে ব্যাপ্ত অথচ অনাদি অনন্ত সে রহস্যকে অনেকেই আজও বুঝে ওঠে নি।

ভার্গব বসুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এই রকমই একটা মুহূর্তে।

জায়গাটা দার্জিলিং থেকে বেশ দূরে। একটা গোল পাথরের ওপর চুপ করে বসে রয়েছে একটা মনুষ্যমূর্তি। মাথার লম্বা চুল পিঠ পর্যন্ত লুটিয়ে পড়েছে। গায়ে তিব্বতী পোশাক। পায়ে পশমের জুতো। হঠাৎ দেখলে তিব্বতী লামা বলেই মনে হয়।

সুদূরের পানে মেলে ধরা ইন্দ্রনাথের চাহনি সহসা আটকে গেছল নিথর নিষ্কম্প মানুষটার ওপর। মাথার ওপর ঝাউগাছটা খুব বেশি হেলে পড়েছে ছাতার মত—দুলে দুলে যেন সম্মান জানাচ্ছে মানুষটাকে।

সরু পায়ে-চলা পথটা পাথরটার হাত দশেক দূর দিয়ে গেছে। ইন্দ্রনাথই যাচ্ছিল সেখান দিয়ে। হঠাৎ চোখ আটকে গেল অদ্ভুত জায়গায় অদ্ভুতভাবে মানুষটাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে। অন্যমনস্কভাবে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। পরক্ষণেই উজ্জ্বল হল দুই চোখ। ঝলসে উঠল হীরকদ্যুতি—এই সেই দ্যুতি যার ঝিলিক দেখলেই প্রমাদ গণে অপরাধী, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অপরাধসন্ধানী।

ধারালো ঠোঁটের কোণে ভেসে ওঠে মৃদু হাসি। একটু ব্যঙ্গের, একটু বিস্ময়ের।

কেশে গলা সাফ করে নিয়ে ডাকল ধীর-গম্ভীর গলায়, 'ভার্গববাবু!....ভার্গব বসু!'

নড়ে উঠল নিথর মূর্তি। পাথরের ওপর পাথরের স্ট্যাচুর মধ্যে বুঝি প্রাণের স্পন্দন দেখা গেল। আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ইন্দ্রনাথের পানে।

ধবধবে সাদা মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে। জোড়া ভুরুর নিচে চোখ দুটো এতক্ষণ স্তিমিত ছিল। ইন্দ্রনাথের পানে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পরেই তা নক্ষত্রকুচির মত চিকমিকে হয়ে উঠল। বললে শান্ত গলায়, 'ইন্দ্রনাথ রুদ্র।....অনেক দিন পরে দেখা। কেমন আছেন?'

'ভাল। আপনি এখানে?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে না ভার্গব বসু। মৃদু হাওয়ায় মাথার লম্বা চুল উড়ে এসে পড়ল

কপালে, চোখে মুখে। হাত দিয়ে সরানোর চেষ্টাও করল না।

তারপর বললে 'আসুন। পাশে বসুন। বলছি।'

নড়ল না ইন্দ্রনাথ। বলল বাঁকা সুরে, 'সঙ্গে ছুরি নেই তো? অথবা রিভলভার? সেই রিভলভারটা—যার একটা গুলিতে নাম লিখে দিয়েছেন আমার হার্ট ফুটো করবেন বলে?'

আশ্চর্য হাসি হাসল ভার্গব বসু। ঝকঝকে সাদা দাঁতে রোদ্দুর ঝিলিক তুলে গেল নিমেষের জন্যে। ঝিলিক দেখা গেল তারকা উজ্জ্বল দুই চোখেও।

বলল ভরাট গলায়, 'ইন্দ্রনাথ রুদ্র, আমার বয়স ষাট পেরিয়েছে। রক্তের নেশাও বিদায় নিয়েছে।'

'টাকার নেশা? মদের নেশা? পরস্ত্রীর নেশা?'

প্রত্যেকটা প্রশ্ন যেন ব্লোপাইপ থেকে নির্ভুল লক্ষ্যে ছোট ছোট তীরের মত ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারল ইন্দ্রনাথ। প্রত্যেকটা তীর গিয়ে বিঁধল যথাস্থানে। মানুষটার মনের মধ্যে। তাই বুঝি ঝকঝকে হাসিটা ম্লান হল সামান্য। ঈষৎ নিষ্প্রভ হল ঝিকিমিকি চাহনি। ধবধবে সাদা সুন্দর মুখটার ওপর দিয়ে যেন চাপা বেদনার ঢেউ ভেসে গেল চকিতের জন্যে।

বলল একই রকম ভরাট মাদল-বাজনের সুরে, 'ইন্দ্রনাথ রুদ্র, আর কেউ না জানলেও আপনি তো জানেন, সব মানুষের মনের মধ্যেই সু আর কু দুটো প্রবৃত্তি আছে। কু প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিলে সে সমাজের চোখে অপরাধী। আর সু প্রবৃত্তি যখন ঠেলে ওঠে, তখন সে—'

'আপনার ভেতরে তাহলে এখন—'

'সু ছাড়া কু আর নেই। পাশে এসে বসুন, ইন্দ্রনাথবাবু। অনেক কথা আছে।'

ইন্দ্রনাথ আর কথা বাড়াল না। সে জানে, তার প্রাণটাকে পিঞ্জরশূন্য করার জন্যে ধরাতলে বহু ব্যক্তি এখনও তৎপর, সে জানে অগণিত মানুষ যেমন তাকে ভালবাসে, বহু পুরুষ এবং নারী তেমন তার চিতাভস্মের সন্ধান পেলে বড় খুশি হবে। সঙ্গে তাই সবসময়ে রাখে ছোট্ট আগ্নেয়াস্ত্র। প্রতিটি পেশীর বজ্রশক্তিকেও প্রকট করে তুলতে থাকে সব সময়ে। পেশায় এবং নেশায় সে যে গোয়েন্দা—তার বিশ্রাম নেই, তার জীবনের নিশ্চয়তা নেই, মুহূর্তের নিরাপত্তাবোধও নেই।

বোধ হয় এইগুলোর সন্ধানেই এই পর্বতাঞ্চলে আসে বারবার। একা।

কিন্তু ভার্গব বসুকে নির্জন এই অঞ্চলে এভাবে বসে থাকতে দেখে অণুপরমাণুর ওয়ার্নিং বেল বেজে উঠে নিঃশব্দে। ভার্গব বসু। একদা যে ছিল পুলিশের আতঙ্ক, সাধারণ মানুষের কাছে বিভীষিকা, সমাজের চোখে এক জীবন্ত প্রহেলিকা—আজ সে এই শান্তির অঞ্চলে মূর্তিমান অশান্তির করাল চেহারা নিয়ে উপস্থিত কেন?

দূর থেকেই তাই ছুঁড়ে দেয় বিদ্রূপ-তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণ, 'গাঁজা চরসের স্মাগলিং ধরেছেন নাকি? মিথাকুয়ানল ট্যাবলেটের সঙ্গে পাল্টাপাল্টি ব্যবসাটা অবশ্য ইদানীং ভালই চলছে এ অঞ্চলে।'

'ইন্দ্রনাথ রুদ্র, আপনি কি সেই মতলবেই ঘুরঘুর করছেন এখানে?' খরখরে হয়ে ওঠে ভার্গব বসুর ঈগল চক্ষু। বিষাণ বেজে ওঠে যেন কণ্ঠে।

গ্রীক স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। হাওয়ায় উড়তে লাগল গায়ের শাল। চুনোট

করা কোঁচার অগ্রভাগ। হিরো সে চিরকাল। সুদর্শন। ব্যক্তিত্বময়। স্থিতধী। অসমসাহসিক।

বলল নিশ্চল দেহে নিষ্কম্প স্বরে, 'না।'

'তবে কেন এসেছেন এখানে?'

'আপনি কেন এসেছেন?'

'আমি?' থমকে গেল ভার্গব বসু। চোখে চোখে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর গলার স্বর নামিয়ে এনে বললে ভল্যুম কমিয়ে দেওয়া স্টিরিও আওয়াজে, 'জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে। বিশ্বাস হল না? আসুন, বলছি।'

পাশাপাশি বসে দুজনে এখন। দশ বছর আগেও দুজনে দুজনের অন্বেষণে হন্যে হয়ে ঘুরেছে। আজ বসে দুজনে পাশাপাশি। একটা মাত্র গোল পাথরের ওপর। মাথার ওপর দুলন্ত ত্রিভঙ্গমুরারি ঝাউ। সামনে গভীর খাদ। দূরে তুষারমৌলী হিমালয়। সূর্য যতই দিগন্ত ছাড়িয়ে মাথার ওপর উঠছে, কুয়াশা ততই কেটে যাচ্ছে। পাখির কাকলি আর পাতার সরসরানি ছাড়া কোন শব্দ নেই।

'ইন্দ্রনাথ রুদ্র,' দূরের বরফ-ছাওয়া পাহাড়-চুড়োগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বলল ভার্গব বসু, 'আপনি জানেন, অনেক কলঙ্কে ভরা আমার অতীত। আপনি জানেন, একমাত্র শ্যালকের স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করতেও আমি দ্বিধা করি নি। লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছি, কাশ্মীর থেকে মেঘালয় পর্যন্ত পুরো হিমালয় বেল্টে চোরাকারবার করেছি, রাজামহারাজার সঙ্গে বসে মদ খেয়েছি, ধনীর টাকা লুঠ করেছি, গরীবের মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। কেন ইন্দ্রনাথবাবু, কেন?'

'জানি কেন,' মৃদু স্বরে বলল ইন্দ্রনাথ, 'যখন আপনি কপর্দকহীন, যখন আপনি সদ্যবিবাহিত, তখন আপনার সুন্দরী স্ত্রী ঘরছাড়া হয়েছিল এক আমেরিকান টুরিস্টের সঙ্গে। বিয়েও করেছিল তাকে। তারপর—'

'লম্পট আমেরিকান দেহের ক্ষুধা মিটিয়ে চম্পট দেয় আমেরিকায়। তারই একটি ছেলে আর একটি মেয়েকে মানুষ করতে হচ্ছে আমাকে আজও। কারণ, ওদের মা ছিল একটা কাওয়ার্ড। আমার সামনে আর আসতে পারে নি। ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দিয়ে—'

'বিষ খেয়েছিল সেই রাতেই।'

'ভারতীকে কাছে এনে রাখতে হয়েছিল সেই কারণেই।'

ভারতীর কথা ভাবতেই ইন্দ্রনাথের মনে পড়ে যায় মিশরের আশ্চর্য সুন্দরী নেফারতিতিকে। রিমার্কেবল বিউটি ছিল যাঁর, যিনি বিস্ময়ের পর বিস্ময় সৃষ্টি করে সহসা একদা যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছিলেন, তাঁর জায়গায় আবির্ভূত হয়েছিল এক পুরুষমূর্তি— মিশর শাসন করেছিল কঠোর হস্তে।

কে এই নবাগত? কেউ জানে না। আজও তা রহস্যাবৃত।

অনুমান, শক্তিময়ী নেফারতিতি নিজেই পুরুষবেশে মিশর শাসন করে গেছিলেন।

কেন? না, ফারাও চতুর্থ আমেনহোটেপ মিশরীয় প্রাচীন দেবদেবীদের ফেলে রেখে সূর্যদেবতা অ্যাটন উপাসনায় মেতে উঠেছিলেন। নীল নদের পাড়ে থিবস নগরীর মন্দির

পরিত্যাগ করে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেছিলেন তিনশ মাইল উত্তরে জনহীন ভূখণ্ড আমারনা-তে। সতেরো বছর ছিলেন সেখানে—সূর্যই ছিল তাঁর একমাত্র উপাস্য দেবতা।

সবচেয়ে বিস্ময়কর স্বামীস্ত্রীর চেহারা। ফারাও ছিলেন কদাকার। নেফারতিতি ছিলেন অসামান্যা রূপসী।

এ যুগের নেফারতিতি বলা যায় ভারতীকে। অসাধারণ রূপবতী। কিন্তু স্বামী নির্বাচন করেছিল যাকে, তার মত কুৎসিত মানুষ বোধ হয় ভূভারতে আর নেই। কুঁজো, কালো, সারা মুখে আর গায়ে বড় বড় আঁচিল। একটা চোখ পাথরের। ভাস্কর তার নাম। পেশাতেও তাই। নেশাও বটে। কৃষ্ণনগরের চুর্ণি অঞ্চলে ছোট্ট একটা স্টুডিওতে দিন নেই রাত নেই পাথর খুদে মূর্তির পর মূর্তি গড়ে যেত।

প্রতিটি মূর্তিই অনবদ্য। আশ্চর্য সুন্দর। তারিফ না করে পারা যায় না।

ভারতী ভালবাসত শিল্পী ভাস্করকে—কদাকার ভাস্করের বাইরের সত্তাটাকে দেখেও দেখে নি সেই কারণেই। কিন্তু আস্তে আস্তে অসহ্য হয়ে উঠেছিল ভাস্করের সান্নিধ্য। শিল্পী ভাস্কর দরিদ্র ছিল না—কিন্তু ছিল অসংযমী! মদ, মেয়েমানুষ এবং জুয়ো—এই তিনটে সর্বনাশা নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল একটু একটু করে।

কি নিয়ে থাকবে ভারতী? সন্তান? ভাস্কর তা দিতে পারে নি। ভালবাসা? ভাস্কর তাও তাকে দেয় নি।

রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিল ভার্গব বসু ঠিক এই সময়ে।

বেথুয়াডহরির জঙ্গলে দাঁড়িয়ে কথা হয়েছিল দুজনের মধ্যে।

মাথায় ছ'ফুট লম্বা যেন সাদা মার্বেল কুঁদে গড়া ভার্গব। দুই চোখে কঠিন হীরে। কণ্ঠস্বরে অশনি সঙ্কেত।

বলেছিল নীরস স্বরে, 'ভারতী, শুনেছ সব?'

মুখ নিচু করে বলেছিল পরমাসুন্দরী ভারতী, 'হ্যাঁ।'

'বিষ খেয়ে মরেছে—বেশ করেছে। আগেই মরা উচিত ছিল। কিন্তু ছেলেমেয়ে দুটো তো কোন দোষ করে নি।'

'কিন্তু তুমি নিজেই তো পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে চর্কিপাক দিয়ে বেড়াচ্ছ সারা ভারতে—ছেলেমেয়ে মানুষ করবে কিভাবে?'

'আমি তো করব না।'

'তবে কে করবে?'

'তুমি।'

'আমি!'

'হ্যাঁ, ভারতী, তুমি। তুমি যা চাও, তা কি পেয়েছ ভাস্করের কাছে?'

মুখ নিচু করেছিল ভারতী।

পাষাণকণ্ঠে বলে গেছিল ভার্গব, 'অথচ তোমার ভালবাসার ভেল্কি থেকেই সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছে ভাস্কর। কি ছিল সে বিয়ের আগে? কপর্দকহীন কারিগর। তুমিই তাকে আইডিয়া দিয়েছ, প্রেরণা দিয়েছ, শক্তি জুগিয়েছ, মূর্তিগড়ার উপাদান কেনা থেকে শুরু করে স্টুডিও যোগাড় করার টাকা পর্যন্ত সব জুটিয়ে দিয়েছে।'

'তুমিই দিয়েছ—নইলে পেতাম কোথায়?'

'ভারতী, তার বিনিময়ে আমি তোমাকে চাইছি না। ছেলেমেয়ে তোমার দরকার—নয় কী? বেশ, মুখে না বলো—তোমার মন তা চাইছে, আমি জানি। মাঝে মাঝে আমি আসব—দেখে যাব তাদের—কিন্তু এক-আধ রাতের বেশী থাকতে পারব না। রাজী?'

রাজী হয়েছিল ভারতী। সেই মুহূর্তে চলে এসেছিল ভার্গবের সঙ্গে—বাড়ি আর ফেরে নি। ভাস্কর তার ঠিকানাও আর খুঁজে পায় নি। মাসে মাসে আসত শুধু মোটা টাকার ডিমাণ্ড ড্রাফট।

সেই সঙ্গে ভার্গব বসুর নিজের হাতে লেখা একটা চিরকূট।

প্রিয় ভার্যাট,

তোমার নেশার টাকা পাঠালাম। বউকে নিয়ে ভেবো না। আগের জন্মে সে ছিল ভোজরাজার কন্যা, বিক্রমাদিত্যের পত্নী। মায়াবিদ্যায় নিপুণা। তারই ভেল্কিতে তুমি আজ প্রসিদ্ধ ভাস্কর। একই মায়াবিদ্যা দেখিয়ে আমেরিকানের ঔরসে জাত দুই ছেলেমেয়েকে সে নিজের ছেলেমেয়ে করে নিয়েছে। আমি তার নাম দিয়েছি ভানুমতী। আপত্তি নেই তো?

ভার্গব বসু

ডিমাণ্ড ড্রাফট পেয়ে বড় খুশি হত ভাস্কর প্রতিবার। একই বয়ানের চিঠি পেয়েও অখুশি হত না। কিন্তু তেলেবেগুনে জ্বলে উঠত ভার্যাট সম্বোধনটা পড়ে।

প্রথমটা মানে বুঝতে পারে নি। অভিধান দেখেছিল। মানেটা জানতে পেরে অবধি বিছুটির জ্বালা ধরে যায় হাতে চিঠিখানা পেলেই।

কারণ, ভার্যাট মানে সেই পুরুষ যে স্ত্রীকে বেশ্যাবৃত্তি করায় জীবিকার জন্য।

বাড়ি ঠিক করেই রেখেছিল ভার্গব। অজ্ঞাতবাসের জন্যে হিমালয়ের কোলে ছিমছাম সুন্দর কটেজ। দার্জিলিংয়ের উপকণ্ঠে।

ছেলেমেয়েদের ধমনীতে বইছে আমেরিকান রক্ত। মানুষ হোক তারা শীতের দেশে—সাহেবী কায়দায়।

ছেলের নাম ভারদ্বাজ। মেয়ের নাম ভায়োলেট।

দুজনেরই চোখের রং নীল। গায়ের লং লালচে। ভারতীয় বলেই মনে হয় না। চুলগুলো পর্যন্ত সোনালী।

ভার্গব ধূমকেতুর মত মাঝে মাঝে আসত নিরালা এই ডেরায়। কালিম্পঙের ডক্টর গ্রাহাম হোম থেকে আনিয়ে নিত ছেলেমেয়েদের। দিন দুই হৈ চৈ করে আবার উধাও হয়ে যেত মাস কয়েকের জন্যে।

ভানুমতীকে মা আর ভার্গবকে বাবা বলত ভারদ্বাজ আর ভায়োলেট।

ভানুমতী ভারদ্বাজকে বলত, ভাস্করাচার্য—ভাস্কর হওয়ার প্রতিভা আছে নাকি তার মধ্যে।

ভায়োলেটকে বলত ভাস্বতী—বড় দীপ্তিশালী, বড় তেজস্বিনী বলে।

ভারতীকে শুধু ভানুমতী নামেই ডাকত না ভার্গব। বলত, 'অভিনব বিদ্যাটা ভালই শিখেছ। এক এক সময়ে ইচ্ছে যায় তোমাকে আমার পার্টনার করে নিই।'

'তাই তো নিয়েছ', সুন্দর চোখে, সুন্দর হেসে বলত ভারতী। সে চোখে হিমালয়ের অপার শান্তি।

অট্টহেসে বলত ভার্গব, 'দূর! এতো হাফ পার্টনারশিপ।'

'ফুল পার্টনারশিপ দিলেই হয়।'

'না। তাহলে যে ভার্যাট কথাটা সত্যি হয়ে যাবে। পেয়ে বসবে ভাস্কর।'

'ও তো আমার জীবনে আর নেই।'

'না থাকুক। এই পৃথিবীতে তো আছে। কিন্তু ভার্যাট শব্দটার যা মানে, তা হতে দেব না। আমি বলছি অন্য পার্টনারশিপের কথা।'

'যেমন?'

'আমার এই কারবারে তোমার অভিনয় বিদ্যেটাকে কাজে লাগাতে পারলে—'

'ছেলেমেয়েদের তাহলে দেখবে কে?

ভারতীর সঙ্গে রহস্যময়ী নেফারতিতির তুলনাটা এই কারণেই বারবার মাথায় আসে ইন্দ্রনাথের। আশ্চর্য মেয়ে বটে। প্রহেলিকায় প্রাণবন্ত।

বাগানে বসে অনেক দূরের রোপওয়ের ঝুলন্ত কামরার যাতায়াত দেখছিল ভারতী। এমনিতেই দুধে আলতা গোলা তার গায়ের রং। দীর্ঘদিন পাহাড়ী জায়গায় থাকার ফলে গালদুটো এখন টুকটুকে আপেলের মত রাঙা। দুই চোখ কিন্তু মিশমিশে কালোজামের মত কালো। একটু ঠাহর করলে কালো চুলের মধ্যে দু-একটা রুপোলি রেখাও আবিষ্কার করা যাবে। কিন্তু যৌবন যেন এখনো তার দেহের তটে তটে ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। লাস্যময়ী ললনা সে কোনকালেই নয়। তার রূপে আগুনের দাহিকাশক্তি নেই, আছে অমৃতবারির স্নিগ্ধতা। হিমালয়ের হাওয়া তাকে আরও অপরূপা এবং বুঝি অনন্তযৌবনা করে তুলেছে।

আশেপাশে কেউ নেই। এই তল্লাটেই কেউ নেই। কটেজ শূন্য। ছেলেমেয়েরা কালিম্পঙের ডক্টর গ্রাহাম হোমে। ভারতী আজ একা। বড় একা। মনের মধ্যে মহাকাশের শূন্যতা। এরকম শূন্যতা তার মনে আগেও এসেছে বহুবার। কিন্তু প্রতিবারই যেন আশ্চর্যভাবে হিমালয় জীবন্ত হয়ে উঠে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে তাকে—একা একা বেরিয়ে পড়েছে ভারতী। হিমাচলের হিম হাওয়ার স্নিগ্ধ প্রলেপ বুকের মধ্যে নিয়ে ফিরে এসেছে।

কিন্তু আজ আর সে ইচ্ছে করছে না। হিমালয়ের হাতছানি তার প্রাণে আর সাড়া জাগাচ্ছে না। কেননা, খবর এসেছে দুদিন আগে—ভার্গব বসু আর নেই।

হিমালয় গ্রাস করেছে মহাভয়ঙ্কর ভার্গবকে। বর্ডার পুলিশের গুলি এড়িয়ে আর পালাতে পারে নি। মাদক দ্রব্যের বোঝা সমেত লাশ গড়িয়ে গেছে খাদের মধ্যে।

ভার্গব আর আসবে না। টাকাও আর আসবে না। সংসার চলবে কেমন করে?

ভারতী তাই আজ এত উন্মনা। স্বয়ং হিমালয়ও যেন হাহাকার করে উঠছে মাঝে মাঝে তার বুকের হাহাকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বহমান বায়ু আকারে।

ভার্গব—যে ভার্গব ভারতীকে দিয়েছে নিরাপত্তা, মাতৃত্বের স্বাদ, নারীত্বের সম্মান, সে ভার্গব বিদায় নিয়েছে চিরকালের জন্যে।

ঝাপসা হয়ে আসে ভারতীর দু চোখ।

গলা খাঁকারিটা শুনল ঠিক সেই সময়ে। পেছনে।

চমকে উঠেছিল ভারতী। পেছন ফিরে দেখেছিল অতি বৃদ্ধ এক তিব্বতী লামাকে? অষ্টাবক্র

মূর্তি বললেই চলে। হাতের যষ্ঠিও তথৈবচ। লোলচর্মের আড়ালে তির্যক চক্ষু প্রায় অদৃশ্য। চোখ পিটপিট করে নির্নিমেষে দেখছে ভারতীকে।

নিঃশব্দে কখন এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে—ভারতী টেরও পায় নি।

বিস্মিত চোখ মেলে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিল ভারতী। পরক্ষণেই উবে গেছিল বিস্ময়। কৌতুক-তরল হাসিতে সমুজ্জ্বল হয়েছিল মুখচ্ছবি।

বলেছিল বীণাঝঙ্কৃত স্বরে, 'রাসবিহারী বসুও এমন ছদ্মবেশ ধরতে পারতেন কিনা সন্দেহ। অগ্নিযুগে যদি জন্মাতে, বৃটিশরাজ নাজেহাল হয়ে যেত তোমাকে নিয়ে। খাদের মধ্যে থেকে উঠে এলে কি করে? ক'টা গুলি লেগেছিল গায়ে?'

'ভানুমতী—' ভণিতা না করে বললে ছদ্মবেশী ভার্গব বসু, 'এই জন্যেই তোমাকে বলি মায়াবিদ্যায় নিপুণা। কি করে বুঝলে আমি অশরীরী প্রেত নয়?'

'ঢং দেখে আর বাঁচি না!' উঠে পড়ে ভারতী। 'রোপওয়েতে এলে নিশ্চয়? চিনতে পারে নি?'

পাহাড়ের গায়ে গায়ে অট্টহাসি ছুঁড়ে দিয়ে বললে ভার্গব বসু, 'ক্ষিদে পেয়েছে।'

বাইরে থেকে কটেজটাকে মনে হয় ছোট। দোতলা। কিন্তু ভেতরে ঢুকলে বোঝা যায় ছোটখাটো একটা প্যালেস।

দোতলার বিরাট হলঘরটা আজ গমগম করছে অনেকের আবির্ভাবে। ভারদ্বাজ ভায়োলেট অনেকদিন পর ড্যাডিকে দেখে খুশিতে কলকল করছে। ভারতী এঁটো বাসনকোসন সরাচ্ছে টেবিল থেকে। উজ্জ্বল চোখে বারবার তাকাচ্ছে যার পানে, এই কটেজে সে এসেছে এই প্রথম।

ভাস্কর। তার বিয়ে করা স্বামী।

ভাস্করের সামনেই বসে ভার্গব। স্মিতমুখে শুনছে ভাস্করের বক্তৃতা।

আগের চাইতে আরও কদাকার হয়েছে ভাস্কর। কুঁজো পিঠ যেন আরও নুয়ে পড়েছে বয়েসের ভারে। মুখ আর সারা দেহের আঁচিলগুলো লোমশ হয়ে ওঠায় এখন তাকে মূর্তিমান ইয়েতি বললেও চলে।

এক বিঘত লম্বা একটা পাথরের নারীমূর্তি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাতে দেখাতে বলছিল ভাস্কর, 'প্রস্তর যুগের ভেনাস। ফ্রান্স থেকে আনিয়েছি। আহা, মুণ্ডুর যা ছিরি! বুকে পিঠে নিতম্বে এত চর্বিও থাকত সেকালের মেয়েদের? হাউ আগলি!'

ভার্গব বললে, 'শুনেছি, হিমযুগের ঠাণ্ডা থেকে বাঁচবার জন্যে তখনকার মানুষদের গায়ে চর্বির আস্তরণ থাকত একটু বেশি। ভাস্কর, স্টোনএজের ভেনাস নিয়ে আলোচনা করার জন্যে তোমাকে ডাকি নি। ভারদ্বাজ, ভায়োলেট, ভারতী—তোমরাও শোন।'

ঘর এখন নিস্তব্ধ।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল ভার্গব বসু, 'তোমরা জানো পুলিশের চোখে আমি এখন মৃত। মৃতই থাকব বাকি জীবনটা। এখানেই থাকব—আর কোথাও যাব না।'

খুশিতে ফেটে পড়ে ভারদ্বাজ আর ভায়োলেট। প্রথমজনের বয়স চোদ্দ। দ্বিতীয়জনের বারো।

সঙ্কুচিত হয় কেবল ভাস্করের একটা চোখ—পাথরের চোখটা নির্ভাষ, নিষ্কম্প।

ভার্গব বলে চলে, 'আমার রোজগারের উৎস ছিল অনেক। কোটি কোটি টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছি, বিরাট দলের সর্দারি করেছি। কিন্তু আর নয়। এবার আমার ছুটি। শান্তিতে জীবনযাপনের পালা।'

'সুবুদ্ধি হল এতদিনে।' ভারতীর মন্তব্য।

সামান্য হাসল ভার্গব। বলল, 'কিন্তু মিতব্যয়ী হতে হবে এখন থেকে। কারণ....'

বলে একটু থামল ভার্গব। তারপর বলল, 'এই কটেজে জমানো টাকা ছাড়া আর কোথাও একটা পয়সাও আমার নেই।'

যেন শ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছে ঘরের প্রত্যেকে।

বড় নিশ্বাস ফেলে বলল ভার্গব, 'আমার দেহ নিপাত্তা হয়েছে, এ খবরটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার যে-যে ডেরায় যত নগদ টাকা ছিল, সব লুঠ করে নিয়ে গেছে আমারই স্যাঙাৎরা।'

'বেশ করেছে।' ঈষৎ কঠিন শোনাল ভারতীর গলা।

কিন্তু যেন হাহাকার করে ওঠে ভাস্কর, 'কিন্তু আমার তাহলে চলবে কি করে?'

ঘৃণার আগুন জ্বলে ওঠে ভারতীর কালো চোখে। এত বছর পরে স্বামীর সঙ্গে দেখা, একটা কথাও সে বলে নি। ভার্গব কেন তাকে এই লুকোন আস্তানায় কৌশলে এনে ফেলেছে—তাও জানতে চায় নি। কিন্তু এই মুহূর্তে লোভী মানুষটার কদর্য মন যেন বিবমিষার বিষ ঢেলে দিল তার সারা অঙ্গে।

প্রশান্ত হাসি হাসব ভার্গব বসু, 'সে ব্যবস্থা করব বলেই এসেছি এখানে, ডেকে এনেছি তোমাকে। ভাস্কর, ভারদ্বাজ আর ভায়োলেট এখন বড় হয়েছে। সব জানে। তোমার স্ত্রী এখন তাদের মা। কিন্তু তোমার ঘর খালি করেছি আমি। তার গুণগার দিয়ে এসেছি মাসে মাসে—'

'সেই সঙ্গে একটা জঘন্য চিঠি—'

'ভায়রার সঙ্গে ঠাট্টা বলেই ওটাকে ধরে নিও। ভারতী নিষ্কলঙ্ক আজও। সন্ন্যাসিনী বলতে পার। ছেলেমেয়ে ছাড়া কেউ ওর গা ছোঁয় নি এত বছরেও।'

জানলা দিয়ে হিমালয়ের পাহাড় চুড়োগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল দুই ভাইবোন। দুজনেই দুটো বিউটি।

চোখ নামিয়ে রয়েছে ভারতী। সেদিকে একবার তাকিয়েই রুক্ষ কণ্ঠে বললে ভাস্কর, 'সাফাই গাওয়ার দরকার নেই। আমার জন্যে কি ব্যবস্থা করেছ বল।'

ভার্গব বসুর ভয়ঙ্কর চোখদুটো একটু শুধু ছোট হল। কণ্ঠস্বর রইল অবিকৃত। বললে, 'কৃষ্ণনগরে তোমার স্টুডিওর আশেপাশে অনেক গাছ আছে। একটা গাছের তলায় রূপোর বাক্সে সোনার বাট রাখা আছে—বর্তমান বাজার দাম প্রায় তিন লাখ টাকা।'

'তি-ন-লা-খ!' যেন দম আটকে আসে ভাস্করের।

'ওই সোনা তোমার।'

'কি-কিন্তু কোথায় আছে?'

'সেটা তোমাকে খুঁজে বার করে নিতে হবে।'

'কিন্তু গাছ তো অনেক—লোকজন তো দেখে ফেলবে সব গাছের তলা খুঁড়তে গেলে—'

'সমাধানটা তোমাকেই করতে হবে। যেমন এখানকার সমাধান করবে ভানুমতী।'

'আমি!' চমকে ওঠে ভারতী। 'সমস্যাটাই বা কী?'

'আমার পেছনে এই যে সিন্দুকটা দেখছ,' দেওয়াল ঘেঁষা ইস্পাত-সিন্দুক দেখিয়ে বলে ভার্গব বসু, 'এর মধ্যে আছে ত্রিশ লাখ টাকার সোনা। তোমার, ভারদ্বাজের আর ভায়োলেটের জীবন তাতে চলে যাবে।'

'ও।' সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ভারতীর। 'কিন্তু সমস্যাটা কী?'

'সিন্দুকটা ডবল দাম দিয়ে করিয়ে এনেছিলাম বোম্বাই থেকে। কপাটের ওপর শিবমূর্তিটার চারপাশে গোল সার্কেলের মধ্যে স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জনবর্ণের সব ক'টা হরফই লেখা রয়েছে দেখতে পাচ্ছ। আমি ছাড়া সিন্দুক খোলার কায়দা কেউ জানে না। তোমাকে সেই কৌশল আবিষ্কার করতে হবে—যদি হঠাৎ আমি মারা যাই।'

'হঠাৎ মারা যাবে কেন?' উদ্বিগ্ন স্বর ভারতীর।

'কারণ আমার হার্টের অবস্থা ভাল নয়। বর্ডার পুলিশের গুলিতে অক্ষত ছিলাম না, ভারতী। যাক সেকথা, সোনা ছাড়াও সিন্দুকে আছে একটি থলি বোঝাই হীরে। তার বাজার দাম এখন কত— বলতে পারব না। তোমার বড় আদরের ভাস্বতী আর ভাস্করাচার্যের জন্য রইল এই থলি। কিন্তু সিন্দুকের মধ্যে থেকে আবিষ্কার করতে হবে তোমাকেই।'

বিচ্ছিরি হাসি শোনা গেল এই সময়ে। চমকে উঠল প্রত্যেকেই।

হাসছে ভাস্কর।

বললে, সিন্দুকটা আগুনে পুড়িয়ে ভেঙ্গে ফেললেই ল্যাটা চুকে যাবে—সিক্রেট জানবার দরকার কী?

'বিচিত্র হাসি ভেসে ওঠে ভার্গবের ঠোঁটের কোণে, 'সেই সঙ্গে উড়ে যাবে এই কটেজ। হাতুড়ির ঠোকা পড়লেও তা হবে। কারণ, ওর মধ্যে বসানো আছে পাওয়ারফুল এক্সপ্লোসিভ।'

আঁতকে ওঠে ভাস্কর।

নির্দয় চাহনিটা এতক্ষণে ফুটে উঠতে দেখা যায় ভার্গব বসুর পাথর-কঠিন চক্ষুতারকায়।

বলে নির্মম স্বরে, 'ভাস্কর, ভার্গব বসু কোন কাজেই ফাঁক রাখে না। এতদিন তোমাকে এ বাড়িতে আনি নি তোমার এই লোভী মনটার জন্যেই—কুবেরের সম্পত্তি এখানে আছে তুমি জানতে পারলে কি-কি করবে, তাও আমি জানি। কিন্তু পার পাবে না—পরলোক বলে যদি কিছু থাকে, প্রেতাত্মা বলে যদি কিছুর অস্তিত্ব থাকে— আমি সেই প্রেতাত্মা হয়ে অভিশপ্ত করে তুলব তোমার জীবনকে।'

সন্ধ্যা নামছে পাহাড়ের গায়ে। সূর্য আর দেখা যাচ্ছে না।

কথা শেষ করে হাঁফাচ্ছে ভার্গব বসু। হঠাৎ এক ঝলক রক্ত উঠে এল মুখ দিয়ে।

'ভার্গব!' চকিত কণ্ঠ ইন্দ্রনাথের।

হাত তুলে তাকে নিরস্ত করে ভার্গব, 'আমার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

ভেবেছিলাম ভানুমতীকে বলে যাব সিন্দুক খোলার গুপ্তরহস্য—কিন্তু আর সময় নেই। ডাক এসেছে, চললাম।'

মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে ভার্গবের।

ধরে ফেলে ইন্দ্রনাথ। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে জোর গলায়, 'কিন্তু আমাকে শোনালেন কেন এই কাহিনী?'

ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দেয় ভার্গব, 'সিন্দুক আপনি খুলে দেবেন বলে।'

প্রাণবায়ু মিলিয়ে গেল শূন্যে শেষ শব্দটা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

রহস্য সিন্দুকের সামনে বসে আছে ইন্দ্রনাথ রুদ্র। কমল হীরের মত চোখদুটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে সিন্দুকের প্রতিটি অংশ।

ওর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ভারতী আর ভাস্কর, ভারদ্বাজ আর ভায়োলেট।

ইন্দ্রনাথ দেখছে, সিন্দুকটা দামী ইস্পাত দিয়ে তৈরী। চওড়ায় ছ'ফুট, লম্বায় তিন ফুট। কপাটটার প্রায় সবটুকু জুড়ে গোলাকার হাতল। হাতলের ওপর একটা শিবের মূর্তি। মূর্তির মাথায় অর্ধচন্দ্র। বাঁকা চাঁদের খোঁচাদুটো ফেরানো রয়েছে হাতল ঘিরে খোদাই করা স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জনবর্ণের হরফগুলোর দিকে। গোল হাতলের ওপরের কিনারায় একটা তীর চিহ্ন। লাল রঙের। অর্থাৎ এই তীর চিহ্ন ঘুরিয়ে সঠিক হরফগুলোর দিকে ফেরালেই খুলে যাবে সিন্দুক।

'বুঝলাম।' যেন নিজের মনেই বলল ইন্দ্রনাথ।

'কি বুঝলেন?' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল ভারতী।

'গোল হাতলের ওই তীরটা ফেরাতে হবে এমন কয়েকটা হরফের দিকে যা জানা ছিল কেবল ভার্গব বসুর।'

বিরক্ত স্বরে বলল ভাস্কর, 'ওটা আমরাও বুঝেছি। কিন্তু হরফগুলো কি, তা কি বলে গেছে আপনাকে?

'না।' শান্ত স্বরেই বলল ইন্দ্রনাথ, 'সময় পেলেও বলত না। কেননা, ভার্গব আমাকে চিনত হাড়েহাড়ে।'

'আমাদের যদি সেইভাবে চেনবার সুযোগ দিতেন—'

ভাস্করের মুখের কথা আটকে গেল ইন্দ্রনাথ ফিরে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে। হিমেল চোখ। গা পর্যন্ত হিম হয়ে গেল ভাস্করের। সুপুরুষ, অমায়িক মানুষটার চোখ যে পলকের মধ্যে বরফ কঠিন হয়ে উঠতে পারে, আগে তা ভাবে নি।

ওই একবারই চাইল তার পানে ইন্দ্রনাথ। আবার মুখ ফিরিয়ে নিল সিন্দুকের দিকে। বলল, 'ভার্গব বসু শুধু তস্কর সম্রাট ছিল না, রসিক সম্রাটও ছিল। রহস্য ওর জীবনের পাতায় পাতায়। কোনটা ভয়ঙ্কর রহস্য, কোনটা মজার রহস্য। এই সিন্দুক ওর মজার রহস্যপ্রবণতার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সারা জীবন ধরে ওর অনেক রহস্যের সমাধান করেছি, মৃত্যুর আগে তাই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গেল শেষ রহস্যটা উপহার দিয়ে। জানি না, পরলোক আছে কিনা, প্রেতাত্মার অস্তিত্ব আছে কিনা—যদি থাকে, তাহলে এই রাতের অন্ধকারেই বাইরে থেকে ঘরের আলোয় চেয়ারে এসে বসুক! দেখুক, তার বুদ্ধি বড়, না আমার বুদ্ধি

বড়।'

'মাই গড!' গা শিরশির করে ওঠে বোধ হয় ভাস্করের। ভারতীর দু'হাত ধরে গা ঘেঁসে দাঁড়ায় ভারদ্বাজ আর ভায়োলেট।

এসব ঘটল ইন্দ্রনাথের পেছনে। সে চেয়ে আছে সামনে সিন্দুকের দিকে। দু'চোখ জ্বলছে নক্ষত্রের মত। একটু একটু করে কণ্ঠে জাগ্রত হচ্ছে দুন্দুভি নিনাদ। যেন বিদেহীদের আবাহন করার সুরে কথাগুলো বলে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সিন্দুকের দিকেই। তারপর সেই দিকে চেয়ে থেকেই বলল,'ভারতী দেবী!'

'বলুন।'

'ভার্গব বসুর রসিক মনের পরিচিতি রয়েছে এই ফ্যামিলির প্রত্যেকের নামকরণের মধ্যে। 'ভা' দিয়ে নাম শুরু হয়েছে প্রত্যেকের। আপনার, ভাস্করবাবুর আর ভার্গববাবুর নামের আদ্যক্ষরে মিল কাকতালীয়। ওই মিল দেখেই ছেলেমেয়ের নামের গোড়ায় 'ভা' লাগিয়েছিলেন উনি। তাই না?'

'হ্যাঁ। আমিও ওদের যে দুটো নাম দিয়েছি, তাও 'ভা' দিয়ে শুরু। ওঁর পছন্দ হবে জেনেই করেছিলাম। আমাকেও তো ভানুমতী নামে ডাকতেন।'

'তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমি বাদে এখানে যারা রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের নামের আগে রয়েছে 'ভা'। এই সিন্দুকে যা কিছু আছে, তা ভাস্করবাবু বাদে বাকি তিনজনের জন্যে। তিনটে 'ভা'ওলা নামের জন্যে। তাহলে তিনবার হাতলের তীর 'ভা'য়ের দিকে ঘোরানো যাক।

বলেই, উঠে গিয়ে দু-হাতে গোল হাতল চেপে ধরে লাল তীরটাকে প্রথমে 'ভ'য়ের দিকে ঘোরালো ইন্দ্রনাথ, তারপরে 'আ'য়ের দিকে।

'একবার 'ভা' হল। আরও দুবার হোক।' বলে পর-পর একই ভাবে হাতল ঘুরিয়ে দুবার 'ভা' রচনা করল ইন্দ্রনাথ। 'মোট হল তিনবার। তিনজনের 'ভা'—সিন্দুক, এবার হও তো চিচিং ফাঁক।'

হাতল ধরে টান দিল বটে ইন্দ্রনাথ। কপাট রইল অনড়।

ব্যঙ্গের হাসি শোনা গেল পেছনে। হাসছে ভাস্কর।

মাই ডিয়ার ডিটেকটিভ, আমাকে বাদ দিতে গিয়ে ভুলটা করলেন। এই ফ্যামিলির আমিও একজন। চারজনের ফ্যামিলি। চারবার 'ভা' হবে। আবার করুন—গোড়া থেকে।'

কথার জবাব না দিয়ে যেন আপন মনেই বলে গেল ইন্দ্রনাথ, 'ভার্গব বসুর প্রেতাত্মা যদি হাজির থাকেন, তাহলে যেন এইরকম বিচ্ছিরি ভাবে হেসে উঠবেন না—ছেলেমেয়েরা ভয় পাবে। আপনার অতিরিক্ত হুঁশিয়ারি আগেই আঁচ করেছিলাম। তবুও পেরিয়ে এলাম ফার্স্ট স্টেপ। এবার সেকেণ্ড স্টেপ। আপনাদের প্রত্যেকের নাম দুটো। ভারতী আর ভানুমতী, ভারদ্বাজ আর ভাস্করাচার্য, ভায়োলেট আর ভাস্বতী। মোট ছ'টা 'ভা'।

'আজ্ঞে না, মোট আটটা 'ভা'। ভাস্কর আর....আর....'

'ভার্যাট!' কঠিন স্বরে পেছন না ফিরেই বলল ইন্দ্রনাথ। 'মানেটা ছেলেমেয়েদের সামনে আর বললাম না।— যাক, মোট ছ'বা 'ভা'য়ের দিকে তীর ঘোরানো যাক।'

ঘুরল হাতল। খুলল কপাট। ভেতরে ঠাসা সোনার বাটও দেখা গেল।

কিন্তু হীরের থলি কই?

বিদ্রূপের ছুরি ঝলসে ওঠে ভাস্করের কণ্ঠে, 'ব্লাফার!'

বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়ায় ইন্দ্রনাথ, 'কে? ভার্গব বসু? তার নখের যোগ্যও আপনি নন। কথাটা রিপিট করবেন না—প্রেতাত্মা হাজির থাকতে পারে।'

মুখ সাদা হয়ে গেল ভাস্করের। থরথর করে কাঁপতে লাগল মুখের আঁচিলগুলো।

নিরক্ত মুখে ভারতী শুধু বললে, 'কিন্তু হীরের থলি—'

'সিন্দুকেই আছে।' চকিতে কণ্ঠস্বর সহজ করে বলল ইন্দ্রনাথ। 'এবারে আসা যাক থার্ড স্টেপে।'

'থার্ড স্টেপ?' ভারতী বিস্মিত, 'সিন্দুকে তো থলি নেই।'

'সিন্দুকেই আছে, ভারতী দেবী!' স্নিগ্ধকণ্ঠ ইন্দ্রনাথের, 'ভার্গব বসু, অন্তত আপনার সামনে মিথ্যে বলেন নি। কারণ আপনাকে তিনি মনে মনে পুজো করতেন, মনের সিংহাসনে আপনাকে দেবীর আসনে বসিয়েছিলেন। ভারতীর চেয়ে ভানুমতী নামটা তিনি অকারণে দেন নি—ভানুমতীর ভেল্কি শুধু আপনিই দেখাতে পারবেন, এই বিশ্বাস এই আস্থা নিয়ে আপনার জিম্মাতেই রেখে গেছেন ছেলেমেয়ের হীরে।'

'আমি। আমার....কাছে....' হঠাৎ চিকচিক করে ওঠে ভারতীর চোখ। 'বুঝেছি।'

নীরবে ঘাড় হেলায় ইন্দ্রনাথ, 'হ্যাঁ, ভানুমতী নামটাতেই এবার হাতল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তীর ছোঁয়াতে হবে।'

সিন্দুকের কপাট আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিল ইন্দ্রনাথ। হাতলের তীর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছুঁয়ে গেল ভানুমতী শব্দটাকে।

কিন্তু কপাট আর খুলল না।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল ভাস্কর, 'দূর মশায়! শুধু অর্ধাঙ্গিনীর নামে কোন শুভ কাজ হিন্দু শাস্ত্রের বিধানে আছে? যত্ত সব। আমার নামটাও যোগ করুন....'

নির্বিকার ভাবে বললে ইন্দ্রনাথ, 'এবার ফোর্থ স্টেপ। ভারতী দেবী, ভালে চন্দ্র যার, তার নাম কি?'

'শিব।' বললে ভারতী ঈষৎ বিমূঢ় কণ্ঠে।

'হাতলে রয়েছে শিব, মাথায় রয়েছে চন্দ্র—নিশ্চয় অকারণে নয়। কাছে আসুন। কি দেখছেন? চাঁদের একটা খোঁচার ওপর ছোট্ট বিন্দু। ওই বিন্দুটাই হোক এবার আমাদের চিচিং ফাঁক সঙ্কেত।'

বলেই দুহাতে অর্ধচন্দ্র চেপে ধরল ইন্দ্রনাথ। চাপ দিতেই আস্তে আস্তে ঘুরে গেল শুধু বাঁকা চাঁদটা। কালো বিন্দুটাকে দিয়ে ভানুমতী শব্দটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল ইন্দ্রনাথ।

খুলে এল শিবমূর্তি সমেত পুরো হাতলটা। ভেতরে একটা খুপরি। খুপরির মধ্যে একটা মখমলের থলি।

আলতো হাতে থলে বার করে এনে টেবিলে উপুড় করে দিল ইন্দ্রনাথ।

হাজারটা সূর্য যেন ঠিকরে গেল অজস্র ছোট বড় হীরে থেকে।

স্খলিত স্বরে বললে ভানুমতী, 'বুঝলেন কি করে বলবেন?'

'সিন্দুকের ডবল দাম শুনে। ডবল দাম দেওয়া মানেই ডবল কাজ করা হয়েছে সিন্দুকে।

মানে, ডবল সিন্দুক। সিন্দুকের ভেতরে সিন্দুক। ভার্গব বসুর প্রেতাত্মা এবার উর্ধ্বলোকে যেতে পারেন—যাকে যা দেবার, তা দিয়ে গেলাম।'

'কই দিলেন? আর্তনাদ করে ওঠে ভাস্কর, 'আ-আমার তিন লাখ টাকার সোনা কোন গাছের তলায় আছে?'

নিষ্ঠুর গলায় বললে ইন্দ্রনাথ দরজার দিকে যেতে যেতে, 'ওটা আপনিই বার করুন আপনার কুটিল ব্রেন খাটিয়ে।'

'সে তো করবই। কিন্তু সময় তো লাগবে—ভার্গবের, ইয়ে, মানে প্রেতাত্মাটা কষ্ট পাবে—'

হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল ভারতী। ইন্দ্রনাথের দু হাত জড়িয়ে ধরল।

বলল চোখে চোখ রেখে গাঢ় কণ্ঠে, 'দাদা!'

'দাদা?'

'হ্যাঁ, আমি আপনার বোন। আমার একটা কথা রাখুন।'

বিরাট নিশ্বাস ফেলে ইন্দ্রনাথ বললে, হায়রে বাংলার বধূ...গাছের সন্ধানটা বলে দিতে হবে, কেমন?'

'হ্যাঁ, দাদা।'

'এই হিমালয়ে বসে?'

'আপনি পারবেন। ফিফথ স্টেপ নিশ্চয় ভেবে রেখেছেন।'

হেসে ফেলল ইন্দ্রনাথ, 'দুষ্টু মেয়ে। তোমার মহাপণ্ডিত ভার্যাট স্বামীকে জিজ্ঞেস করো তো ভাণ্ডীর মানে কী?

'ভাণ্ডীর!'

'সবই তো ভা'য়ের খেলা। কৃষ্ণনগরের চুর্ণিতে এতদিন ছিলে, বটগাছ দেখো নি অজস্র?'

'বটগাছ? হ্যাঁ, হ্যাঁ ওর স্টুডিওর দক্ষিণ দিকেই তো একটা বুড়ো বট—'

'ভাণ্ডীর মানে বট গাছ। ডবল নাম তো এখানেও।' ভাস্কর, ভার্যাট, ভাণ্ডীর—বটগাছের তলা খুঁড়লেই—'

'তিন লাখ টাকার সোনা—!' সোল্লাসে কুঁজটাকে প্রায় সিধে করে ফেলল ভাস্কর।

ইন্দ্রনাথ ততক্ষণে চৌকাঠ পেরিয়ে গেছে। কিন্তু বাড়ীর বাইরে যাওয়ার আগেই দৌড়ে নেমে এল ভারদ্বাজ আর ভায়োলেট।

দু জোড়া নীল চোখ মেলে বললে, 'আঙ্কল, পুলিশে খবর দেবেন নাকি?'

দু হাতে দুজনের থুতনী ধরে বললে ইন্দ্রনাথ, 'নির্ভয়ে থেকো। আমি পুলিশের লোক নই। সবচেয়ে বড় কথা, তোমাদের ড্যাডি তো এখন বড় পুলিশের কাছে। এখানকার পুলিশ সব খবর নাই বা জানল?'

বৃষ্টির আভাস দেখা দিয়েছিল চার টুকরো নীল আকাশে।

ইন্দ্রনাথ আর দাঁড়ায় নি। □

* 'রোমাঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত।

প্রতিবিম্ব স্মৃতি

গোলপার্কের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা যাদবপুরের দিকে গেছে, অবনীশ ফিরছিল সেই পথ দিয়ে। বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা মারা শেষ হয়েছে, এখন ধরবে শিয়ালদার যে কোনো বাস। তাই হাঁটছে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার-এর পাশ দিয়ে ফুটপাত ধরে।

জায়গাটা বেশ অন্ধকার। প্রদীপের নিচেই অন্ধকার থাকে জানা ছিল অবনীশের। সাধন ভজন-সংস্কৃতি-কেন্দ্র এই ভবনের ঠিক পাশের রাস্তাটি কেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন, তা বুঝতে পারেনি। পারল একটু পরেই।

রাস্তার সবকটা ল্যাম্পপোস্টের আলো নিভনো। ওপাশের ফুটপাতের দোকান থেকে বিচ্ছুরিত আলোর আভাস পড়েছে এদিকের ফুটপাতে। লোহার রেলিং-এ পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে একটি তরুণী।

মেয়েটির দিকে অবনীশের চোখ আকৃষ্ট হওয়ার কারণ আছে। প্রথমত ওই রকম আঁধারঘেরা নিরালা জায়গায় মেয়েটি একেবারে একা। দ্বিতীয়ত, মেয়েটির অঙ্গে ঝলমলে পোশাক। ক্ষীণ আলোয় ঝলসে উঠছে নাকের নাকছাবি। ঝলসে উঠছে এই কারণে যে মেয়েটি একদৃষ্টে চেয়েছিল অবনীশের দিকে। চোখাচোখি হতেই এক ঝটকায় মুখখানা ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে-যেন দেখেও দেখছে না। পরক্ষণেই অবশ্য ঘাড় কাত করে চেয়ে রইল অবনীশের দিকে। বুকটা আরও একটু চিতিয়ে শরীরটাকে লীলায়িত ভঙ্গিমায় এনে যেন লাস্যময়ী হয়ে উঠল নিমেষমধ্যে।

দুহাত সামনে দিয়ে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে এগিয়ে গেছিল অবনীশ। মনের পটে ছাপ কিন্তু থেকে গেছে। ধবধবে ফর্সা রঙ। কাজলটানা কালো চোখ, নাসিকালঙ্কারের দ্যুতি, কর্ণাভরণের ঝিলিক এবং সব মিলিয়ে ছিপছিপে দেহবল্লরীর মধ্যে কামনা-উদ্ধত তেজীয়ান ভঙ্গিমা আর গ্রীবা বেঁকিয়ে একদৃষ্টে অবনীশের দিকে চেয়ে থাকার মানে একটাই হয়।

মেয়েটি কলগার্ল। বেশ বড় ঘরের মেয়ে বলেই মনে হয়। কিন্তু দক্ষিণ কলকাতায় এদের দাপটই তো এখন বেশি। লেকের মাঠে সন্ধ্যার পর একা বসা যায় না, বেড়ানো যায় না। পাশে এসে জুটবেই। বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা। রক্তে এদের বিদ্রোহ-প্রকাশ বিপথে কুপথে।

অবনীশ ধোয়া তুলসীপাতাটি নয়। ডাক্তারি পড়তে গিয়ে সহপাঠিনী এবং নার্সদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জমিয়েছে একাধিকবার। নিজেও দেখতে সুপুরুষ। দীর্ঘকায়। গৌরবর্ণ। টান টান চাবুকের মত চেহারা। বন্ধুরা ওকে হিরো বলে ডাকে। বান্ধবীরা বলে লেডিকিলার।

সুতরাং সুন্দরী মহিলা সঙ্গকামনা জানালে ছুঁৎমার্গের ধার্ ধারে না অবনীশ কোনকালেই। রেলিং-এ হেলান দিয়ে বিজয়িণী ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে থাকা এই মেয়েটি অবশ্য অভিজাত বহুবল্লভা ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু চেহারার চমক, নিরালা পরিবেশ আর যৌবন-উষ্ণ রুধির ক্ষণেকের জন্য বিহ্বল করে তোলে অবনীশকে।

ক্ষণেকের জন্যেই বটে। মনোবিশারদরা একেই বলে ঝোঁকের মাথায় অসম্ভব কাণ্ড করে ফেলা। ক্ষণিক ভাবাবেগে আত্মহারা হয়ে কেউ চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কেউ গলায় দড়ি দেয়, কেউ বিষ খায়।

আদিমতম পেশায় রত এ কামিনীকে দেখেও রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল অবনীশের।

মহিলাসান্নিধ্য চিরকালই প্রীতিকর তার কাছে—স্কুল-কলেজে কো-এডুকেশন ক্লাসে পড়ার সময় থেকেই।

এমনকি কলগার্লদের সঙ্গসুখ উপভোগ করেছে মন মেজাজ শরীফ থাকলেই। আসলে ওর মধ্যে কোনো ভণ্ডামি নেই। খোলা চোখে দুনিয়াটাকে দেখে, ভাবাবেগবর্জিত বলেই ওর ইনটেলেকচুয়াল ম্যাচুইরিটি এত ঊর্ধ্বে। ইমোশনালি ইমম্যাচিওর্ড হলে যা কখনোই সম্ভব হত না। ওর কাছে নরনারীর নিবিড় সান্নিধ্য নেহাতই প্রাকৃতিক ব্যাপার-বায়োলজিক্যাল লাভ ছাড়া কিছুই নয়।

মেয়েটিকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়েও তাই থমকে দাঁড়াল অবনীশ। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল ঘাড় বেঁকিয়ে এখনও সে চেয়ে আছে তার দিকে। আলো-আঁধারির মধ্যে দিয়ে অনুভব করা যাচ্ছে তার কালো চোখের আকর্ষণ—চুম্বকের আকর্ষণের মতই যা অদৃশ্য, কিন্তু অমোঘ।

পায়ে পায়ে মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল অবনীশ। চোখ এবার রূপসীর দিকে। ষোড়শী বলেই তো মনে হয়। মাদকতা আছে বটে শরীরে। বেশবাস মূল্যবান—কিন্তু স্বল্প। দেহতটরেখাকে সযত্ন প্রয়াসে পরিমিতির মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে জানে। সংস্কৃতিসম্পন্না মেয়ে নিঃসন্দেহে।

শিকার জালে পড়েছে বুঝেছে অপরূপা। অবনীশের দিকে আর ফিরেও তাকাচ্ছে না। সটান চেয়ে আছে সামনের দিকে। গ্রীবাভঙ্গিমা কিন্তু গর্বোদ্ধত। দুহাত দুপাশে ছড়িয়ে রেলিং ধরার মধ্যে বেপরোয়া মনোভাব।

অবনীশ এবার মন্ত্রমুগ্ধ। মেয়েরা বুঝি চিরকাল এইভাবেই খেলিয়ে তোলে মনের মানুষদের। যারা এই শিল্পটিকে রপ্ত করেছে, তারা পারে আরও সুচারুভাবে। সম্পূর্ণ অপরিচিতা এই মেয়েটির লালসা-মদির আচরণ তাই বিহ্বল করে তোলে অবনীশের মত খ্যাতিমান লেডিকিলারকেও।

আবার ফিরে আসে অবনীশ। এবার দাঁড়ায় মেয়েটির সামনেই। সামনেই চেয়েছিল রাতের রূপসী। ভ্রূক্ষেপ নেই অবনীশের দিকে। সাহস সঞ্চয় করে সুস্পষ্ট স্বরে অবনীশ বললে, 'ফ্রী আছেন?'

'কি বললেন?' ঝট করে মুখ ফিরিয়ে অবনীশের চোখে চোখে তাকাল মেয়েটি। কালো চোখে যেন দামিনী খেলছে। নাকের পাটা স্ফীত। ঝিলিক দিয়ে উঠছে নাকছাবি। হীরের নাকি?

মুহূর্তের মধ্যে ইনটেলেকচুয়ালি ম্যাচিওর্ড অবনীশ বুঝে ফেলল, ভুল হয়ে গেছে। এ-মেয়ে সে-মেয়ে নয় কলগার্ল বলে যাদের কৃপা করা যায়। এর ধমনীতে অভিজাত শোণিত। তাই গোখরোর মত ফণা মেলে ফোঁস করে উঠেছে। ছোবল মারার আগেই চম্পট দেওয়া দরকার।

কিন্তু অবনীশের অভিজ্ঞতার ঝুলিতে তখন আরও কিছু সঞ্চয়ের বাকি ছিল।

ঝটিতি জবাব দিয়েছিল অবনীশ, 'সরি।'

বলেই আর দাঁড়ায়নি। লম্বা লম্বা পা ফেলে যেই দূরত্ব বাড়াতে গেছে মেয়েটির কাছ থেকে অমনি দুপাশের দুটি ল্যাম্পপোস্টের আড়াল থেকে তীর বেগে ধেয়ে এল দুটি মূর্তি।

'কি হয়েছে? কি হয়েছে?'

চিৎকার শুনে ঘাড় বেঁকিয়ে অবনীশ দেখলে, রেলিং থেকে সরে এসেছে রাতের রহস্যময়ী।

কিছুই বলছে না। শুধু চেয়ে আছে অবনীশের দিকে।

ছেলেদুটি ছুটে আসছে অবনীশের দিকে—'ও মশাই কী বলছিলেন—'

কেন ল্যাম্পপোস্টের আলো নিভনো এবং কেন ঠিক এই জায়গাটিতে মেয়েটি নিজেকে লোভনীয় করে দাঁড়িয়ে আছে, অবনীশ তা বুঝে নিলে চকিতের মধ্যে। ল্যাম্পপোস্টের আড়ালে গা মিলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মস্তান দুটি। উদ্দেশ্য একটাই। অবনীশকে টেনে-হিঁচড়ে আড়ালে নিয়ে যাওয়া, মারধর করে সর্ব্বস্ব কেড়ে নেওয়া। সর্ব্ববল্লভাটি তাদের টোপ, গ্যাং-এর অন্যতমা সদস্যা।

অভিনব ফাঁদ। উর্বর মস্তিষ্ক বটে এই তিনজনের।

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই নিজের দশা কী হতে চলেছে কল্পনা করে নিল অবনীশ। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কাজ দিল বিস্ময়করভাবে। মাঝ রাস্তা দিয়ে একটি বাস যাচ্ছে গোলপার্কের দিকে। ছুটে গিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল অবনীশ। কণ্ডাক্টর ধরে ফেলল একহাত বাড়িয়ে।

পেছনে মস্তান দুটো ছুটে আসছে। 'ধর ধর' করে চেঁচাচ্ছে। এই বাসে তারা উঠবেই।

কণ্ডাক্টর পাদানিতে দাঁড়িয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখল ধাবমান দুজনকে। বাস ছুটছে, তারাও ছুটছে।

শুধলো অবনীশকে, 'কি হয়েছে?'

'বদমাস।'

বাসশুদ্ধ লোক চেয়ে আছে অবনীশের দিকে। ভাবলেশহীন মুখ। কেউ যদি কাউকে তাড়া করে এবং ধরে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে, কারও কিছু এসে যায় না। বরং নির্লিপ্ত থাকাই ভাল।

বাস থামাল না কণ্ডাক্টর। পরের স্টপ গোলপার্কের সামনে। পেছনে মস্তান দুটি এসেও চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে আসছে। এই স্টপে বাসে তারা উঠবেই। তারপর কী হবে ভাবতেই আবার উপস্থিত বুদ্ধি খেলে গেল অবনীশের মাথার মধ্যে।

বাসে উঠেছিল পেছনের দরজা দিয়ে। স্টপে বাস থামতে না থামতেই নেমে পড়ল সামনের দরজা দিয়ে। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ফুটপাত ঘেঁষে। ড্রাইভার বসে সিটে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখছে কিসের এত শোরগোল।

বাস থেকে লাফ দিয়ে নেমেই ট্যাক্সির রাস্তার দিকের দরজা এক হ্যাঁচকায় খুলে ভেতরে ঢুকে গেল অবনীশ। সংযত স্বরে বললে, 'শিয়ালদা।' ট্যাক্সি ড্রাইভার বোধহয় ওয়াকিবহাল এই ধরনের ফাঁদ সম্পর্কে। তিলমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করল না। একটা কথাও বলল না। স্টার্ট দিল ইঞ্জিনে।

মস্তান দুটি তখন ট্যাক্সির ঠিক পেছনে—'বেঁধে! বেঁধে!' কিন্তু বাঁধল না ট্যাক্সি ড্রাইভার। সে কারবার করতে বসেছে, শিয়ালদার প্যাসেঞ্জার ছাড়তে যাবে কেন? অথবা হয়তো কোনো ঝামেলায় জড়াতে চায় না। নয়তো স্রেফ মানবিকতা। ফাঁদ কেটে সুদর্শন কিন্তু অনভিজ্ঞ একজন তরুণকে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যাওয়ার উদারতা।

মুহূর্তে বাঁ দিকে টার্ণ নিয়ে গোলপার্ক ঘুরে গড়িয়াহাটার মোড়ের দিকে ছুটল ট্যাক্সি।

ডক্ট বোস ঠক ঠক করে ছাইদানিতে পাইপ ঠুকে ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে টেবিলের দিকে চোখ নামিয়েই বললেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডক্টর কাঞ্চন ঘোষকে, 'তুলে এনেছ?'

'ইয়েস স্যার।'

'খুব ট্রাবল দিয়েছে নাকি?'

'খুবই। চারজনে হিমসিম খেয়ে গেছি। গোড়ালি আর কবজি চেপে না ধরলে খাট থেকে নামানো যেত না।'

'কী করছিল?'

'ঘুমোচ্ছিল।'

'ঠিক কটা বাজে তখন?'

'ঠিক একটা।'

'এই দুপুরে ঘুম। কেস-হিসট্রি অবশ্য তাই,' চোখ তুললেন ডক্টর বোস।

'অবসেশনাল ডিসঅর্ডার। চোদ্দ ঘণ্টা খালি স্নান আর পায়খানা। নিজেকে নোংরা বোধ করে। সন্ধ্যে পর্যন্ত গরম লেবুর জল আর নুন খায় চারবারে চার লিটার। তারপর কলতলা। দশটা থেকে শুরু হয় খাওয়া। তিন লিটার দুধ, আমসত্ত্ব আর জোলাপ। তোমার কী মত, কাঞ্চন?'

'যা শুনেছি আর যা দেখলাম, তাতে মনে হয় হয় ইসিটি শক দিতে হবে—তাতেও না হলে ব্রেনের নার্ভ পাথওয়ে কেটে দিতে হবে।'

হাসলেন ডক্টর বোস। পাইপ এখন দাঁতের ফাঁকে। ধোঁয়া বেরোচ্ছে নাকমুখ দিয়ে। 'কাঞ্চন, ইউ নো ভেরি ওয়েল, ওই দুটো পথ আমি মাড়াতে চাই না। ইসিটি শক রিমার্কেবল কাজ দেয় ঠিকই—কিন্তু কীভাবে, নোবডি নোজ। ব্রেনের নার্ভ পাথওয়ে কেটে দিতে হলে ভেলোর যেতে হবে—রেজাল্ট ইজ আননোন। নো কাঞ্চন, নো সব ব্যাপারের কজ অ্যাণ্ড এফেক্ট আছে। মেয়েটির এই উৎকট ছুঁচিবাই রোগেরও মূলে যে ঘটনা বা ঘটনাগুলো আছে—আমাদের তা জানতে হবে। যেদিন ও তা কবুল করবে, ওর ইমোশনাল টারময়েল চলে যাবে। এভরিথিং উইল বি নরম্যাল।'

'তা ঠিক। বিহেভিয়ার থেরাপির ম্যাজিক তো অনেকেই দেখে গেল। আমিও আপনার কাছে এসে দেখছি,' হাসল কাঞ্চন। পাতলা পাকানো চেহারা। পাতলা হয়ে এসেছে মাথার চুলও। শ্যামবর্ণ। চাহনি কঠোর। মনের রুগীদের কাছে চাহনি আর কথার ম্যাজিক যে কি অদ্ভুত ফল সৃষ্টি করে, তা সে শিখেছে ডক্টর বোসের কাছে। 'টক থেরাপি' ইদানীং পাশ্চাত্যের বহু মনোরোগ-বিশেষজ্ঞকে চমৎকৃত করেছে। কোনো ওষুধ না দিয়ে, শক না দিয়ে, অথবা নামমাত্র ওষুধ দিয়ে দিনের পর দিন গ্রুপ ডিসকাশন আর নানারকম কাজকর্মের মধ্যে বছরের পর বছর ধরে পাগল হয়ে থাকা মানুষকেও উনি সুস্থ করে তুলেছেন।

চার্জ অবশ্য খুব বেশী। এই যে মেয়েটিকে এইমাত্র অভিজাত পল্লী থেকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে এল কাঞ্চন, এর জন্যেও প্রথম মাসে দিতে হবে চার হাজার। তারপর তিন হাজার। তারপর দু হাজার। তারপর দেড় হাজার। জটিল কেস বলেই নার্সিং হোমে আনতে হয়েছে—এখানকার রেট তো বেশি হবেই। এত ডাক্তার, নার্স আয়া—অথচ কম পেশেন্ট—যাতে ওয়ান টু অয়ান অবজার্ভ করা যায়। চব্বিশ ঘণ্টা নানাভাবে ওয়াচ করা যায়। কম

জটিল কেসে কম খরচেই টক থের‍্যাপি এবং অ্যাডভাইস চালিয়ে যান ডক্টর বোস অন্য চেম্বারে।

বিলেতের বড় হাসপাতালে ভাল চাকরিতে ছিলেন। কেন যে ইণ্ডিয়ায় এলেন। এত বেশি দক্ষিণায় ধনী পেশেন্ট ছাড়া পেশেন্ট পাওয়া যায় না। অন্যান্য মেন্টাল হোমে এক চতুর্থাংশ টাকায় চিকিৎসা হয়। নামেই চিকিৎসা অবশ্য। সমাজ থেকে একটা পাগলকে তুলে এনে অনেক পাগলের সঙ্গে খাঁচায় পুরে রাখা।

জানলা দিয়ে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিলেন ডক্টর বোস। তাই এতক্ষণ কথা বলেনি কাঞ্চন। এবার তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। ঈষৎ লালাভ মুখখানায় অজস্র অভিজ্ঞতার ছাপ। কপালের বলিরেখা তারই পদরেখা। সামান্য ধূসর চোখের তারায় চাপা ধীশক্তির রোশনাই। মাথায় বেশ লম্বা। মেদ নেই সারা শরীরে,—সেই সঙ্গে বিস্তর চুলও অদৃশ্য হয়েছে মাথার সামনের দিক থেকে।

পাইপটা হাতে নিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত কিন্তু আত্মনিমগ্ন চোখে কাঞ্চনের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন ডক্টর বোস। কতই বা আর বয়স। বড় জোর চল্লিশ। সে তুলনায় অনেক ভারিক্কি, আবার যখন হাসেন, প্রাণখোলা হাসিতে ঘর ফাটিয়ে দেন। জবাব নেই সেই হাসির—দমকে দমকে অট্টহাস্য যেন আর থামতেই চায় না।

ডক্টর বোসকে তাই ভয় করে, শ্রদ্ধাও করে কাঞ্চন। ওঁর কথার মধ্যে, চাহনির মধ্যে, আচরণের মধ্যে নাটকীয়তা আছে, আছে জাদুশক্তি—অ্যানিম্যাল ম্যাগনেটিজম। যেকোনো মানুষকে নিজের মতে নিয়ে আসতে পারেন অল্পসময়ের মধ্যে—কখনো ধমকে, কখনো ধারালো যুক্তি দিয়ে, কখনো হেসে, কখনো আশ্চর্য বচনমালা দিয়ে।

টক থেরাপিস্ট! ইণ্ডিয়ায় ইনিই একমাত্র টক থের‍্যাপিস্ট। সনাতনী মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের তাই বিদ্বেষ এঁর ওপর। আড়ালে বলেন, 'ও তো বড়লোকদের দোহন করে চলেছে ম্যাজিক দেখিয়ে—যেমন মেসমার করত মেসমেরিজম দিয়ে, কিন্তু টিকেছিল কী?'

ডক্টর বোসের ভেতরের যন্ত্রণা সেইখানেই। বিয়েও করলেন না। সুস্থ মস্তিষ্কদের সুস্থ করে তোলার সমাজসেবায় ব্রতী হয়েছেন ইণ্ডিয়ায় ফিরেই। বাঁধাধরা চাকরির অফার পেয়েও যাননি—রুগীদের মধ্যে একটা টোটালিটি খুঁজে পাওয়ার সুযোগ বা সময় তো সেখানে নেই। নারী মনোরোগ বিশেষজ্ঞরাই তাঁকে অ্যাডভাইস দিয়েছেন, 'কি ছেলেমানুষী করছ? চেম্বারে কনসাল্টেশন ফি নিয়ে রোজ দশ বারোটা রুগী দেখ। অর্ধেক ভাল হবে, অর্ধেক রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে। মাসে দশ বারো হাজার টাকা তোমার এসে যাবে।'

কর্ণপাত করেননি ডক্টর বোস। এও যেন তাঁর এক পাগলামি। প্রতিভাধরদের ম্যাডনেস। কাঞ্চন তাই এত ভক্ত এই অদ্ভুত মানুষটির। অনেক মাসে পুরো মাইনে পায় না—নতুন জামা প্যান্ট কিনতে পারে না—তবুও শেখবার, জানবার উদগ্র বাসনা তাকে ধরে রেখে দিয়েছে ডক্টর বোসের কাছে। যে মাটিতে গাছ বাড়ে, সেই মাটিই তো গাছকে নিজের কাছে ধরে রাখে।

চেয়ে আছেন ডক্টর বোস। মনে মনে প্ল্যান করছেন নিশ্চয়। দুচোখের কোণ কুঁচকে গেছে। এক-একটা পেশেন্টকে তো এক-একরকমভাবে হ্যাণ্ডল করতে হয়।

শুধোলেন হঠাৎ, 'মেয়েটা কোথায়?'

‘সেলে।’

‘কেন? ভায়োলেন্ট? এখনো?’

‘ভীষণভাবে।’

‘চলো তো দেখি।’

খাটের সঙ্গে চার হাত পা বাঁধা মেয়েটির চুল ছড়িয়ে পড়েছে মুখে বুকে চারপাশে। বিস্রস্ত বেশ। ভারী গড়ন। খুব ফর্সা, কটমট করে তাকাচ্ছে এদিক সেদিকে আর বাঁধন খোলার চেষ্টা করছে প্রাণপণে।

পাইপ টানতে টানতে লম্বা পদক্ষেপে ঠিক তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ডক্টর বোস। কাঞ্চন রইল বাইরে। প্রথম অবজার্ভেশন ডাক্তারবাবু একাই করেন।

পলকহীন চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছেন ডক্টর বোস। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া উঠছে সরু ফিতের মত।

বছর পঁচিশ বয়স হবে মেয়েটির। সুন্দরী নিঃসন্দেহে। অতিরিক্ত মেদ জমায় ভোঁতা হয়ে গেছে বরতনুর ধারালো অংশগুলো।

কটমট করে ডাক্তারের দিকে চেয়ে প্রথমে হিসহিসিয়ে গর্জন করে উঠেছিল সুন্দরী পেশেন্ট। পরক্ষণেই স্থির চোখে চেয়ে রইল। চোখের পাতা আর পড়ে না। দুই তারারন্ধ্রের গহনে জ্বলছে দুটি নিষ্কম্প প্রদীপশিখা।

চোখ কুঁচকে চেয়ে রইলেন ডক্টর বোসও। কী দেখছেন তিনি? অসম্ভব স্মৃতিশক্তির অধিকারী ডক্টর বোস কেন দিশেহারা হয়ে যাচ্ছেন?

মেয়েটির কনীনিকা আরও ছোট হয়ে এসেছে। বেড়েছে দৃষ্টির সূচাগ্রতা। করোটির মধ্যে মগজের কোষে কোষে যেন প্রচণ্ড আলোড়ন চলছে, এনার্জির বিস্ফোরণ ঘটেছে। অনিমেষ তারারন্ধ্রে তারই কেন্দ্রীভূত প্রকাশন ঘটছে.....

কিন্তু এ তো চেতনার স্ফুলিঙ্গ.....স্বাভাবিকতার উন্মেষ!

পরক্ষণেই অতিশয় স্মার্ট ডক্টর বোসকে হতবুদ্ধি করে দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে চাপা বজ্রনাদের মত শুধু কটি কথা বলল মেয়েটি—‘গোলপার্ক....রাত...পালিয়েছিলে.....ট্যাক্সিতে.....আমি নোংরা? তাই না? বড় নোংরা? হাঃ হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ!

বসবার ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন ডক্টর বোস। মাথার পাতলা চুলে আঙুল চালাচ্ছেন। আঙুল কাঁপছে।

কাঞ্চন দাঁড়িয়ে ছিল পেছনে। বিমূঢ় অবস্থা। ডাক্তারবাবুকে এরকম বিচলিত কখনো সে দেখেনি।

‘কাঞ্চন,’ খোলা জানলা দিয়ে শুধু মাঠ আর দূরের দিগন্তের দিকে চেয়ে বললেন ডক্টর বোস।

‘স্যার।’

‘মেয়েটিকে আমি একা ট্রিট করব। বুঝেছ?’

‘হ্যাঁ, স্যার।’

‘আর কী বুঝেছ?’

সবেগে ঘুরে দাঁড়ালোন ডক্টর বোস। থিরথির করে কাঁপছে মুখের পেশী। পেশেন্টের সামনে, তাদের গার্জেনদের সামনে ডক্টর বোসকে নাটক করতে এর আগেও দেখেছে কাঞ্চন। কিন্তু এখন তো ঠিক নাটক বলে মনে হচ্ছে না।

'কাঞ্চন,' বজ্রগর্ভ কণ্ঠস্বর ডক্টর বোসের—'এর আগে তোমাদের ফটোগ্রাফিক মেমারির কথা বলেছিলাম মনে আছে?'

'প্রতিবিম্ব স্মৃতি?'

'হ্যাঁ। সোনার গয়নাভর্তি সুটকেস সমেত চলে গেছিল ট্যাকিস—পরে খেয়াল হতেই বাড়িময় কান্নাকাটি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ট্যাক্সির দিকে চেয়েছিল যে বাচ্চা মেয়েটি, সে এসে বলেছিল—মা, কাঁদছ কেন? ট্যাক্সির নাম্বার তো আমার মনে আছে। ট্যাক্সি পাওয়া গিয়েছিল। প্রতিবিম্ব স্মৃতি....প্রতিবিম্ব স্মৃতি! চোখে যা দেখে, ব্রেনে তার পারমানেন্ট ইমপ্রিন্ট পড়ে। —কাঞ্চন, আজকের এই মেয়েটির আছে সেই বিশেষ ক্ষমতা।'

'কীভাবে বুঝলেন?'

'কী ভাবে বুঝলাম? হাঃ হাঃ হাঃ......হাঃ হাঃ হাঃ.....হাঃ হাঃ হাঃ.....সেটা না হয় তোমার কাছে সিক্রেটই থাক কাঞ্চন, ডক্টর অবনীশ বোসের অতীত আর নাই বা জানলে? হাঃ হাঃ হাঃ.....হাঃ হাঃ হাঃ......হাঃ হাঃ হাঃ!'

তিন মাস পরে একমনে বিয়ে বাড়ির খানা খেয়ে চলেছে কাঞ্চন। সামনে এসে দাঁড়ালেন বর-বউ।

'আর কিছু চাই?'

মুখ তুলল কাঞ্চন, 'হ্যাঁ, স্যার, চাই।'

'কি বলো? ফ্রাই না বিরিয়ানি।'

'একটা প্রশ্নের জবাব।'

'বটে!' চোখ ছোট হয়ে গেল ডক্টর অবনীশ বোসের।

'কী প্রশ্ন?'

'প্রতিবিম্ব স্মৃতি কী ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ঘটায়?'

'শাট আপ!'

গভীর চোখে তাকিয়ে জবাব দিলে নতুন বউ, 'ঘটায়।' □

* 'সুকন্যা' পত্রিকায় প্রকাশিত। শারদীয় সংখ্যা, ১৩৯৩।

আমার মনের মরীচিকা

অনেক দূরে চলে এসেছি মৃগাঙ্ক, কিছুদিন আমার কোন খবর পাবে না। বন্ধুভাগ্য আমার ভাল বলেই তোমার মত বন্ধু পেয়েছি, কবিতাবৌদির মত বন্ধু স্ত্রী পেয়েছি। আমার এই নিঃসঙ্গ জীবনটাকে তোমরা দুজনে স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে ভরিয়ে তুলেছ। ভালোবাসো বলেই আমার এত দিনের আনন্দ এই পেশাবদ্ধ অভিজ্ঞতা নিয়ে কত গল্পই না লিখেছ। সেদিন 'ভবিষ্যৎ বঙ্গ সাহিত্য' সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মন্তব্য পড়ছিলাম। যেদিন আনন্দের ভেতর দিয়ে লিখতে পারা যাবে, সেই দিন আবার সাহিত্য সৃষ্টির দিন ফিরে আসবে। ওঁর মনে হয়েছিল,

বড় সাহিত্যিক আমাদের দেশে এখন আর জন্মাবে না। মৃগাঙ্ক, তুমি বড় সাহিত্যিক নও। নিজেকে সাহিত্যিক বলে কখনো দাবীও করো নি। কিন্তু তুমি যা লিখেছ, তা আনন্দের ভেতর দিয়েই লিখেছ। সে আনন্দ আমার ক্ষুদ্র কীর্তিকে পাঁচজনের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে থেকেই পেয়েছ। আনন্দ আমিও পেয়েছি। নইলে আর পাঁচটা বঙ্গসন্তানের মত চাকরিবাকরি না করে অপরাধী-শিকারে মত্ত হলাম কেন। বহু বছর ধরে এই মৃগয়ায় আনন্দ পেয়েছি মৃগাঙ্ক, এখন আমি ক্লান্ত। বিষাদ কাটিয়ে ওঠার জন্যে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করার প্রেসিক্রিপশন করেন ডাক্তাররা—আমি বোধ হয় নিজে থেকেই তাই এই সৃষ্টিছাড়া পেশায় তন্ময় হয়েছিলাম এতগুলি বছর। মৃগয়া-মত্ত হয়েছিলাম ইচ্ছে করেই। ভুলে থাকার জন্যে। মনের ভেতরে চাপা পড়ে থাকা বেদনাকে এড়িয়ে থাকার জন্যে। কিন্তু মনের সঙ্গে ছলনা দীর্ঘদিন করা যায় না। মরীচিকার স্বরূপ একদিন না একদিন ধরা পড়েই। আমার এই আত্মবঞ্চনা আজ আমাকে পীড়া দিচ্ছে। আনন্দের অন্বেষণে এই পেশায় এসে আমার মনে হচ্ছে, অনেকের নিরানন্দের কারণ আমি হয়েছি। এতদিন আত্মশ্লাঘা অনুভব করেছিলাম দেশ আর দশের মঙ্গল করছি। ভুল, ভুল, এই অহঙ্কারই আমাকে অন্ধ করে রেখেছিল এতদিন। দেশ আর দশের সেবা করতে হয় কি করে, তা আটপৌরে মানুষদের কাছেই জেনে নেওয়া উচিত ছিল। সরাসরি তাদের মুখের মধ্যিখানে তাকিয়ে তাদের মনের মানদণ্ডে বুঝে নেওয়া উচিত ছিল তারা কি চায়। তাদের জীবনধারার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে গিয়ে তাদের ছোট ছোট মঙ্গলের পথগুলিকেই আবিষ্কার করতে পারলেই 'শ্রীবাস্তব কল্পস্বর্গ' এই মর্ত্যেই হয়তো রচনা করা যায়। কিন্তু আমরা কেউ তা করি না। তাই চুরাশিতে অরওয়েলের বিভীষিকাবর্ষের মত আমিও আমার বিভীষিকাবর্ষ যাপন করেছি। মরীচিকার পেছনে ছুটে ছুটে ক্লান্ত হয়ে পালিয়ে এসেছি অনেক দূরে.....নিরালায় নির্জনে আত্মসমীক্ষা করে চলেছি। কি পেয়েছি বলতে পারো, এতগুলো বছর ধরে এত অপরাধী শিকার করে? ক'টা মানুষের প্রাণে আনন্দ দিতে পেরেছি? ক'জনকে সুখী করতে পেরেছি? ক'টা জীবনে আশার প্রদীপ জ্বালতে পেরেছি? ক'টা সংসারে শান্তিসমীরণ বওয়াতে পেরেছি? বরং ঠিক তার উল্টোটাই ঘটিয়েছি। আমার মনের এই মরীচিকা আর অস্পষ্ট নয় আমার কাছে।

ভাষার স্থপতি তুমি নও। গল্প-উপন্যাসের যে বিষয়বস্তু তুমি নির্বাচন করেছ, সেখানে এই স্থাপত্য দেখানোর সুযোগও নেই। ভাষার স্পন্দমায়া তাই তোমার লেখায় কখনো ফুটে ওঠে নি। ভাষাশিল্পের সুরম্য শিবিরে আবদ্ধ হয়ে থাকাটাও তোমার লক্ষ্যমাত্রা নয়। সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়াটাই আমার নেশা, অঘটনের মধ্যে মিশে যাওয়াটাই আমার আনন্দ। তুমি তোমার সরল ভাষার দীপাধার নিয়ে আমার এই নেশা আর আনন্দকেই উদ্ভাসিত করেছ দশজনের সামনে। তোমার গল্পে আমি কখনো হয়েছি রঙমহলের রাজা, কখনো দেখিয়েছ আমার হিরণ হাসির কিরণ। কিন্তু কখনো ভাবো নি, আমার কুটিল হাসিও ঘটিয়ে তোলে জটিল সর্বনাশ। তুমি রুদ্রের ডম্বরধ্বনি শুনিয়েছ তোমার পাঠকপাঠিকাদের, কিন্তু তার জীবনের স্থূল মিথ্যার খেলাকে কখনো ধরতেও পারো নি। তুমি লিখেছ তার শান দেওয়া খর খড়্গাসম ললাটে বুদ্ধি দিচ্ছে পাহারা, কিন্তু শান দেওয়া প্রতারণার ছুরিটা তোমার নজর এড়িয়ে গেছে। তুমি দেখেছ তার তীক্ষ্ণ সজাগ আঁখি, দেখেছ কটাক্ষে তার ধরা পড়ে কোথায় কার ফাঁকি— কিন্তু দেখ নি তার নেশাভ্রান্ত চরিত্রের ঝড়ের কলোল্লাস, বিদ্যুতের অট্টহাস। তুমি দেখেছ তার

উড়োপাখির ডানার মত যুগল কালো ভুরু, কিন্তু কখনো কি খেয়াল করেছ, কি তীব্র তার হাস্য?

মৃগাঙ্ক, আমিই সেই ইন্দ্রনাথ রুদ্র। তোমার কপট প্রতারক প্রবঞ্চক বন্ধু ইন্দ্রনাথ রুদ্র। আমাকে তুমিও ধরতে পারো নি। ঘরে ঘরে সর্বনাশের বহ্নিশিখা জ্বালিয়ে আজ আমি ক্লান্ত, অনুতপ্ত, বিমর্ষ। আমার চোখ খুলে দিয়েছে একটি মেয়ে। ছোট্ট একটি মেয়ে।

অহল্যা যেমন মুনির শাপে পাষাণ হয়ে গিয়েছিল, মাঝে মাঝে মনে হত, আমিও বুঝি কারো শাপে পাষাণ হয়ে পড়ে আছি জীবনের সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর বক্ষের ওপর দিয়ে। আমার শাপান্ত ঘটিয়েছে বোধ হয় এই মেয়েটিই। আমার মনের কঠিন শুষ্ক শয্যার ওপর একটি মাত্র কচি স্নিগ্ধ শ্যামল ঘাস বলা যায় এই মেয়েটিকে। নামটিও তার মিষ্টি—শ্রাবণী। নীলবর্ণের বনফুল সেন।

শ্রাবণীকে কিছুদিন হল অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিয়েছিলাম আমার ঘরদোর মোছা আর বাসন মাজার কাজে। স্বপাকে আহার এখনো করি—বরাবরের অভ্যেস। ওই কাজটি কারও হাতে তুলে দিতে মন চায় না। প্রেসারকুকারে বেশিক্ষণ সময়ও লাগে না। কিন্তু ঘরদোর বাসনপত্র পরিষ্কার রাখতে ইদানীং বড়ই আলস্যবোধ করছিলাম।

মাসান্তে মাত্র পনেরো টাকা বেতনের বিনিময়ে শ্রাবণী আমাকে এই ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি দিয়েছে। খুবই গরীব। মাথার চুলে কোনদিন তেলের ছোঁয়া লাগে বলে মনে হয় না। রুখু লালচে চুল চিরুণী দিয়ে আঁচড়ে রাখে। একটাই লাল ফ্রক রোজ পরে। রোজ ভোর পাঁচটায় আসে। আমি ঘুম থেকে উঠি কাক ডাকবারও আগে—বেড়িয়ে ফিরি কাক ডাকবার সময়ে। শ্রাবণী আসে তারপর। রোজ শিউলিতলা থেকে ফুল কুড়িয়ে আনে। প্লেটে করে সাজিয়ে রাখে টেবিলে। ডালশুদ্ধ ফুল এনে রাখে ফুলদানিতে। জল পাল্টে দেয় নিজেই। আমাকে কিছু বলতে হয় না।

একদিন সে যাবার সময়ে বলে গেল, 'কাকু, আজ বিকেলে আসতে একটু দেরি হবে।'

রোজ বিকেলে শ্রাবণী আসত চারটে বাজলেই—সেদিন এল ছ'টায়। ঘর মুছতে মুছতে হাসি-হাসি মুখে নিজেই বললে, 'দাদার কাছে গেছিলুম, কাকু। দাদা বললে, আজকে থেকে যা। তোমার কষ্ট হবে বলে চলে এলুম।'

আমি বললাম, 'বেশ করেছিস। দাদার কাছে গেছিলিস কেন? বেড়াতে?'

'না। টাকা আনতে।'

'টাকা আনতে কেন?'

'পাঁচ-ছ'দিন খাওয়া হয় নি যে।'

'সেকী! পাঁচ ছ'দিন খাস নি?'

'না।'

'টাকা পেয়েছিস?'

'না।'

'আজ তাহলে খাবি কী?'

হাসল শ্রাবণী। ঘর মুছতে লাগল মাথা নিচু করে।

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'আমাকে বলিস নি কেন? না খেয়ে থাকতে কষ্ট হয় না?'

শ্রাবণী কথা বলল না।

আমি মানিব্যাগ খুলে দশটা টাকা দিয়ে বললাম, 'আবার দরকাল হলে বলবি।'

শ্রাবণী আর বলে নি। দাদার কাছ থেকেই নাকি টাকা এনেছিল। চার-পাঁচটা ছোট ভাইবোন আর মা'কে নিয়ে কখনো একবেলা কখনো দু'বেলাই না খেয়ে থেকেছে। দাদা সেই কারণেই একা থাকে। বাবা নেই। শ্রাবণীর বয়স বড়জোর বারো।

এর দিন কয়েক পরেই ট্যাক্সি ড্রাইভার বলবন্ত সিং খুন হল আমাদের পাড়াতেই। ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাসের ধারে—নোংরা জলের নালার একটু দূরে।

বেলেঘাটা সি-আই-টি বিল্ডিংস তুমি দেখেছ। বাইপাসটা গেছে তার গা ঘেঁষে। কিছুদিন আগেও এই বিল্ডিং ছিল কলকাতার পুব অঞ্চলের শেষপ্রান্ত—তারপরেই চব্বিশ পরগণা। ধূ ধূ মাঠ আর ভেড়ি। এখন সেখানে সল্ট লেক স্টেডিয়াম তৈরী হচ্ছে, ফ্ল্যাটবাড়ির পর ফ্ল্যাটবাড়ি উঠছে। চিরনিদ্রিত সুদীর্ঘ অজগর সাপের মত ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস এই দুইয়ের মাঝ দিয়ে যেন জড়শয়নে শুয়ে রয়েছে। স্থির, অবিচল, ধুলোয় লুণ্ঠিত। রাত্রিদিন তার ওপর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ছুটে যাচ্ছে চাকা, হেঁটে যাচ্ছে চরণ। অহর্নিশ দুঃস্বপ্নের মত বিচিত্র শব্দ আবর্তিত হয়েই চলেছে। চরণের আর চাকার স্পর্শে হৃদয় পাঠ করার বিদ্যে যদি এই মহাপথের জানা থাকত, তাহলে বলতে পারত কে বাড়ি যাচ্ছে, কে এয়ারপোর্টে যাচ্ছে, কে দক্ষিণের বালিগঞ্জ-পার্কসার্কাসে যাচ্ছে, কে জিরোতে যাচ্ছে, কে শ্মশানে যাচ্ছে। জানে না বলেই ধরতে পারে নি গভীর রাতে বলবন্ত সিং ট্যাক্সি চালিয়ে এসেছিল তার বুকের ওপর দিয়ে নিয়তির নির্দেশে দেহপিঞ্জর ত্যাগের লিখনকে সত্য করে তুলতে।

মৃগাঙ্ক, গল্প লিখতে বসে তুমি অনুপুঙ্খ বর্ণনা দাও সারস্বত উদ্দেশ্যে। আমি দেব কেবল প্রতিবেদন। সি-আই-টি বিল্ডিংয়ের শেষপ্রান্তে যেখানে খাল বুজিয়ে ওপর দিয়ে সড়ক নির্মিত হয়েছে, সেই জায়গাটা ছাড়িয়ে ধাপা লক পাম্পিং স্টেশনের পাশ দিয়ে দক্ষিণে একটু গেছিলে মনে আছে? দুর্গন্ধে প্রাণ আইঢাই করে উঠেছিল, নাকে রুমাল চাপা দিয়েছিলে? এখান থেকেই সড়কটা সোজা গিয়ে একটু বাঁয়ে বেঁকে চলে গেছে ধাপা-বানতলার আবর্জনা স্তূপের দিকে। সি-এম-ডি-এর স্বপ্ন একদিন এই রাস্তা আড়াইশো ফুট চওড়া হবে, মাঝখানে সবুজ মধ্য-পটি থাকবে, ছ'টি ছ'রকমের পথ থাকবে এই আড়াইশো ফুটের ওপর, সুভাষ সরোবরের ধারে কাদাপাড়া টিলার মত টিলা উদ্যানও গড়ে উঠবে, গড়িয়ার কাছে কসবা-বৈষ্ণবঘাটা পাতুলির পূর্ব কলিকাতা নগরী গড়ে উঠবে, পুরো সড়কটাই আলো ঝলমলে থাকবে।

আপাতত, এ রাস্তায় হাঁটলে অথবা গাড়ি চালালে পদে পদে গরু মোষের সঙ্গে ধাক্কা লাগে, পায়ের তলায় সাপ কিলবিল করে উঠে নেমে যায় দু'পাশের ভেড়ির জলে, রাত্রে গাড়ি চালাতে গিয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করে অন্ধকারে। হেঁটে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। কলকাতার সীমান্ত—নিঝুম নির্জন। রাতে অন্ধকারের হিমস্পর্শ, দিনে প্রখর রোদ্দুরে বাতাসের উহু-হুহু দীর্ঘশ্বাস। সুখ-দুঃখ, জরা-যৌবন, হাসি-কান্না, জন্ম-মৃত্যু, ধনী-দরিদ্র সমস্তই ওই নিশ্বাসে ধুলোর স্রোতের মত উড়ে যায় সুদীর্ঘ নিস্তব্ধ এই সড়কের ওপর দিয়ে।

কলকাতা পুলিশের সজাগ দৃষ্টি থাকে এই দিকে। এই সেদিন পর্যন্ত পুলিশ-চৌকি ছিল

বিল্ডিংসয়ের মোড়ে। তখন পার্টিতে পার্টিতে বোমাবাজি হত, দিবালোকে মানুষ খুন হত—পুলিশ প্রহরীর তর্জনি শাসনে তা কমে আসে। পুলিশ চৌকিও উঠে যায়। কিন্তু রাতের আঁধারে কালো জীপ টহল দিয়ে যায় জোরালো হেডলাইট জ্বালিয়ে। কেননা, পুরোন বিল্ডিংসয়ের এককোণে গড়ে ওঠা নতুন বিল্ডিংসয়ে গভীর রাতে নাকি ট্যাক্সি ঢোকে কলকাতার দিক থেকে—কিছুক্ষণ পরে সড়ক বেয়ে চলে যায় সল্ট লেক বা গড়িয়ার দিকে। পুরো সড়কটাই এখন বেআইনী কারবারের সড়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নোংরা জলের খালের পাশে কালো জীপটার হেডলাইটে হঠাৎ দেখা গেছিল দুমড়ে মুচড়ে পড়ে থাকা একটা দেহ। কালো পিচের রাস্তা থেকে একটু দূরে—ঘাস-জমির ওপর। ঘাড়টা অস্বাভাবিকভাবে বেঁকে রয়েছে পেছনে।

দাঁড়িয়েছিল কালো জীপ। রাতের প্রহরীরা নেমে গিয়ে পেয়েছিল বলবন্ত সিংকে। পকেট থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স উদ্ধার করতেই পাওয়া গিয়েছিল তার পরিচয়। ট্যাক্সিটা কিন্তু দেখা যায় নি। ঘাস-জমির ওপর চাকার দাগ ছিল।

হেডলাইট আর অনেকগুলো টর্চবাতির আলোয় দেখা গেছিল চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে বলবন্ত সিংয়ের। লড়েছে প্রাণপণে—টেরিন শার্ট ছিঁড়ে ঝুলছে দুপাশে। রঙিন সুতির মাফলারটা মুখ আর নাকের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে টেনে তিনটে গিঁট দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে পেছনে। গলার ওপর আঙুলের ছাপ। নিষ্ঠুরভাবে শ্বাসরোধ করা হয়েছে সব দিক দিয়েই।

বেলেঘাটা থানার বড়বাবুর সঙ্গে আমার হৃদয়ের সম্পর্ক আছে। কি জানি কেন ভদ্রলোক আমাকে ভালবাসেন। কারণে অকারণে বাড়ি আসেন, পকেটভর্তি চুরুট বের করে আমাকে খেতে দেন, নস্যির ডিবেও বাড়িয়ে দেন। শীর্ণকায় এবং দীর্ঘকায় এই ভদ্রলোকই বলতে গেলে আমাকে চুরুট আর নস্যিতে রপ্ত করে ছেড়েছেন। অট্টহেসে বলেন, দিনে অন্তত একবার—'চার্চিল....চার্চিল....ক্যালকাটার চার্চিল মশায়.....চুরুট আর নস্যি দুটোতেই মজা পেতেন—দুটো দিয়েই ব্রেন সাফ রাখতেন।'

এঁর নাম ধরণী ঘোষাল। কৃষ্ণকায় হাস্যমুখ সদাশয় আড্ডাবাজ পুরুষ। উনিই আমাকে দেখালেন বলবন্ত সিংয়ের লাশটা। শুনলাম, পকেটে গোটা পঞ্চাশ টাকা ছিল—দিনের শেষে ওই রকম রোজগারই হত রোজ। টাকা নেই। ট্যাক্সিও নেই। ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির মত ট্যাক্সি ছিনতাই আরম্ভ হয়েছে দিল্লীর পর কলকাতাতেও। কিন্তু ট্যাক্সি ড্রাইভারকে খুন করতে গেল কেন? ফেলে পালালেই তো হত।

অটোপ্সি রিপোর্ট দেখলাম। ডেথ বাই স্ট্র্যাংগুলেশন। শ্বাসতন্ত্র একেবারেই জখম। নাক আর মুখের পেছনে সাড়ে চার ইঞ্চি লম্বা ফাঁদলসদৃশ ফ্যারিংক্স বা ভয়েস বক্সের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। কঠিন কার্টিলেজ দিয়ে গড়া ফ্যারিংক্স-গাত্র সব সময়ে খোলা থাকে—কিন্তু প্রচণ্ড চাপ দিয়ে তা থেঁতলে দেওয়া হয়েছে।

বলবন্ত সিংয়ের অনামিকায় আংটি পরার কোন দাগ দেখলাম না। কিন্তু ঘড়ি পরার দাগ আছে বাম মণিবন্ধে। ঘড়ি পাওয়া যায় নি।

ধরণীবাবু জানালেন, ট্যাক্সি ড্রাইভারদের অ্যাসোসিয়েশন ওয়ান ডে স্ট্রাইক করতে চলেছে। হত্যাকারীকে ধরতে না পারলে আরো জল গড়াবে। অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ক্ষমতাবান

ব্যক্তি—মেম্বার অফ পার্লামেন্ট। চাকরি নিয়ে না টানাটানি পড়ে। কলকাতা নামক মনুষ্য অরণ্যে গাড়ি চাপা পড়ে আর অনাহারেই রোজ কতজন অক্কা পাচ্ছে—কেউ মাথাও ঘামায় না। একটা ট্যাক্সি ড্রাইভার না হয় জীবনসংগ্রাম থেকে ছাড়ান পেল—তা নিয়ে এত হৈ-চৈ করার কি আছে?

শুনতে শুনতে শ্রাবণীর মুখটা মনে পড়ে গেছিল। সত্যিই তো, চার-পাঁচদিন না খেয়ে হাসিমুখে আমার খিদমৎ খেটে গেছে বাচ্চা মেয়েটা—কেউ তো খবর রাখে নি।

'নিন, নিন, খান,' হাতে একটা চুরুট গুঁজে দিয়ে বলেছিলেন ধরণী ঘোষাল, 'ব্রেনটাকে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে দেখুন না হোমিওসাইড স্কোয়াডকে হেলপ করতে পারেন কিনা। লাখ লাখ লোকের মধ্যে থেকে কীলার খুঁজে বার করতে গিয়ে শালা নিজেই না কীলড হয়ে যাই।'

বলতে বলতেই এসেছিল টেলিফোন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিই ধরণী ঘোষাল...তরণী এবার ডুবল বলে..... পাওয়া গেছে ট্যাক্সিটা?.....অ্যাবান্‌ডন্‌ড্‌?....আমহার্স্ট স্ট্রীট থানার সামনে?...ফুয়েল মিটারের ইণ্ডিকেটর 'E'য়ের দাগে?....নো ক্লু?....গুড।'

ঠকাস করে রিসিভার নামিয়ে রেখে ধরণী ঘোষাল জানালেন, বড় জবর পরিহাস করে গেছে হত্যাকারী। খালি ট্যাক্সি রেখে গেছে থানার সামনেই—বুকের পাটা তো কম নয়! পুলিশকে চ্যালেঞ্জ!

আমি বলেছিলাম, তা নয়। চ্যালেঞ্জের ব্যাপারই নয়। থানার সামনে ট্যাক্সি ফেলে যাওয়ার দরকার হলে কাছাকাছি থানাগুলো ছেড়ে গিয়ে আমহার্স্ট স্ট্রীট থানা পর্যন্ত যাওয়া কেন? আসলে তেল ফুরিয়ে গেছিল। জিজ্ঞেস করেছিলাম, গাড়ির মুখটা কোন্ দিকে ছিল বলেছে? ধরণীবাবু বললেন, 'উত্তর দিকে। রাজা রামমোহন রায়ের বাড়ির দিকে। কিন্তু ইন্দ্রনাথবাবু, সন অভ সোয়াইনটাকে এখন কোথায় পাই বলুন তো?'

'সন নয়, বলুন, সন্স। একজন হত্যকারী নয়—একাধিক। দুজন তো বটেই, তিনজন হওয়াও বিচিত্র নয়। বলবন্ত সিং শক্তিশালী যুবক। লড়েওছে প্রাণপণে। কিন্তু পারে নি অতজনের সঙ্গে।'

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ধরণীবাবু বললেন, 'অবভিয়াসলি।'

আমি বললাম, 'বলবন্ত সিংয়ের ডেরায় হানা দিয়েছেন?'

'এই যাবো বলেই তো আপনাকে পাকড়াও করে নিয়ে এলাম। চলুন।'

ভবানীপুরে বলবন্ত সিংয়ের আস্তানায় উল্লেখযোগ্য কিছুই পাওয়া যায় নি। ব্যাচেলার। একা থাকত একটা ছোট্ট ঘরে। মদের খালি এবং ভর্তি বোতল আর ফিল্মস্টারদের ছবিতে বোঝাই ঘর। দেওয়ালে সাঁটা বিশেষ একটি নায়িকার বুকের ওপর কলম দিয়ে আঁকা হরতন—তীরবিদ্ধ।

'স্যাডিস্ট,' একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে আছি দেখে, নাক কুঁচকে বলেছিলেন ধরণী ঘোষাল, 'আপনি নন—বলবন্ত সিং।'

আমি ওঁকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পাশেই টায়ারের দোকানে ঢুকেছিলাম। টেলিফোন যন্ত্রটা দেখিয়ে জানতে বলেছিলাম, বলবন্ত সিংয়ের নামে টেলিফোন আসত কিনা। শিখ দোকানদার খালিস্তানি মেজাজ দেখিয়ে বলেছিল, আসত বৈকি—এখনো আসে। দিল চৌচির করার মত

সব টেলিফোন।

দিল চৌচির করার মত টেলিফোনই আশা করছিলাম। খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতেই খবরটা পেয়ে গেলাম। একটি নারীকণ্ঠ প্রায় ডেকে দিতে বলত বলবন্ত সিংকে। বলবন্তও তাকে ফোন করত। তার ঠিকানা? আবার উগ্র হয়ে উঠেছিল খালিস্তানি টেম্পার। আমি ধীরে-সুস্থেই ঠিকানা উদ্ধারের পথ বাতলে দিয়েছিলাম। উল্টোপাল্টা টেলিফোনের বিল আসার জন্যে অনেকেই আজকাল খাতায় লিখে রাখে রোজ কোন নম্বরে টেলিফোন করা হল। সেরকম খাতা নেই কি দোকানে? সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিল খাতাখানা। উগ্র শিখ আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিল, তিনদিন আগে বলবন্ত সিংয়ের ফোন করা নাম্বারটা। একই নাম্বার দেখলাম আগেও লেখা রয়েছে খাতায়।

ওইখানে দাঁড়িয়েই ফোন করলাম ওয়ান নাইন সেভেনে। ডাইরেক্টরী এনকোয়ারি। পেয়ে গেলাম আলিপুরের একটা ঠিকানা।

গিয়েছিলাম সেখানে। বাড়িটা এক বিলেত ফেরত ব্যারিস্টারের। এখন অবশ্য ব্যারিস্টার সম্মান আর কাউকে দেওয়া হয় না—সবাই অ্যাডভোকেট। তাহির আমেদ কিন্তু মার্বেল প্রস্তর ফলকে এখনো সেই ঘোষণাই করে চলেছেন।

ভদ্রলোক মাঝবয়সী। পুলিশ দেখেই পাইপ নামিয়ে বললেন, 'খবরটা পেলেন কি করে?'

আকাশ থেকে পড়লেন ধরণী ঘোষাল, 'কিসের খবর?'

'সাকিনা দুদিন হল পালিয়েছে—পুলিশকে জানাই নি কেলেঙ্কারির ভয়ে, বাট হাউ....'

সাকিনা তাঁর একমাত্র মেয়ে। পঞ্চদশী। স্কুল গার্ল। ঘর তার দোতলায়। পেছনের বারান্দা থেকে নেমে যাওয়া যায় একতলার বাগানে—সেখান থেকে দরজা খুলে দু'দিন আগে রাত্রে পালিয়েছে সাকিনা। মায়ের হীরে-জহরৎও নিয়ে গেছে। প্রায় লাখ টাকার জুয়েল। বলা বাহুল্য, বেশির ভাগই কালো টাকায় কেনা। তাই চেপে গেছিলেন তাহির আমেদ।

সাকিনার পড়ার টেবিলে নিজের একটা ছবি ছিল কাচের তলায়। এককোণে ছোট করে একটা টেলিফোন নাম্বার লেখা—খালিস্তানী শিখের টায়ারের দোকানের টেলিফোন নাম্বার।

সাকিনা দেখতেও বিশেষ সেই ফিল্ম নায়িকার মত—যার ছবির বুকের হরতন আঁকা দেখে এসেছি বলবন্ত সিংয়ের ঘরে।

প্রেমের সম্পর্ক ছিল দুজনের মধ্যে। সাকিনা জহরৎ নিয়ে পালিয়ে গেছে তাহলে বলবন্ত সিংয়ের কাছেই।

তক্ষুনি গেলাম টায়ারের দোকানে। বলবন্ত সিং কি সাদী-টাদি করব বলেছিল ইদানীং? বলছিল বৈকি। টাকার পাহাড়ে নাকি বসবে শীগগিরই—ট্যাক্সি চালাতে আর হবে না—টায়ারের দোকান দেবে। ক্যাপিটাল? কুছপরোয়া নেহি—ওভি হো যায়গা।

কিন্তু বলবন্ত সিংয়ের একখানা মাত্র ঘরে তালা ঝোলে না কেন? আমরা তো ভেজানো দরজা খুলেই ভেতরে ঢুকেছিলাম। তালা কোথায়?

আশপাশের ঘরের বাসিন্দাদের জিজ্ঞেস করে জানা গেল, ব্যাচেলার বলবন্ত ওই রকমই কাছাখোলা। এই তো দিন কয়েক আগেই ভোররাতে বন্ধুবান্ধব নিয়ে এসেছিল। কেউ উঠে অবশ্য দেখে নি, বলবন্ত তাদের মধ্যে ছিল কিনা। ভোরবেলা দেখা গেল দরজা দু'হাট করে খোলা—বলবন্ত নেই, বন্ধু-টন্ধুও নেই। নিশ্চয় চাবি দিতে ভুলে গেছে।

তালাটা পাওয়া গেল ঘরের মধ্যে। যা খুঁজছিলাম, সেটা কিন্তু পাওয়া গেল না—জহরতের বাক্সটা। যে রাতে বন্ধুদের নিয়ে বলবন্ত এসেছিল বলে প্রতিবেশীদের বিশ্বাস, সে রাতেই খুন হয়েছিল বলবন্ত। পকেট থেকে চাবি নিয়ে বন্ধুরা এখানেই এসেছিল জহরতের বাক্স সরাতে।

হত্যাকারীরা তাহলে বলবন্তের বন্ধু। বাড়ির ঠিকানা জানত। কিন্তু ট্যাক্সি নিয়ে উত্তর কলকাতার দিকে যাচ্ছিল কেন? সটান ভবানীপুরে এল না কেন?

খুনটার মোটিভ তাহলে ট্যাক্সি ছিনতাই নয়—জহরৎ লুঠ।

শুনে নিশ্চিন্ত হলেন ধরণী ঘোষাল—ট্যাক্সি ড্রাইভারদের হামলা এবার রোখা যাবে।

আমার মনটা কিন্তু খচখচ করতে লাগল। বলবন্তর বন্ধুরা অত রাতে বেলেঘাটাতেই বা এল কেন, খুন-টুন করে ভবানীপুরের দিকে না গিয়ে আমহার্স্ট স্ট্রীট থানার সামনেই বা গেল কেন?

ধরণী ঘোষালকে নিয়ে এলাম আমহার্স্ট স্ট্রীট থানায়। দেখলাম ট্যাক্সিখানা। পেছনের ট্রাঙ্ক খুলে দেখলাম, থরে থরে সাজানো টায়ার। অনেকগুলো মোটর সাইকেলের টিউবও রয়েছে ভেতরে। টায়ার আর টিউব, দুটো থেকেই বেরোচ্ছে দিশি মদের গন্ধ। চোলাই মদ। টিউবে ভরে টায়ারের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। সব ক'টা টিউবই খালি। অর্থাৎ ট্যাক্সি করে মাল পাচার করে ফিরছিল বলবন্ত সিং। কোথায় ফিরছিল?

ধরণী ঘোষালকে নিয়ে চলে এলাম বেলেঘাটায়। চোলাই মদের ডিপো এখানে একটা নয়—একাধিক। ডোবায় পোঁতা থাকে বোতল, জালা। ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাসের ধারে ধারে ধাপা-বানতলা পর্যন্ত চলছে এই ব্যবসা। দিনদুপুরেও দূর থেকে দেখা যায় ঝোপের মধ্যে জলা-জায়গায় ধোঁয়া উঠছে। ধরণী ঘোষাল দেখলাম আমার চাইতেও বেশি খবর রাখেন। মার্কামারা কয়েকটি আড়তে হানা দিলেন সবার আগে। অভয় দিতে এক জায়গায় বললে, বলবন্ত সিং খুন হয় যে রাতে, সেইদিন একগাড়ি মাল নিয়ে গেছিল। সঙ্গে ছিল তিনজন পাঞ্জাবী দোস্ত। শিখ।

ধরণী ঘোষাল উল্লসিত হলেও আমি হইনি। এত বড় শহরে তিনজন শিখ খুনেকে খুঁজে বার করা সম্ভব নয় কোনমতেই। কিন্তু তাই বলে তো হাল ছেড়ে দেওয়াও যায় না। একগাড়ি মাল ডেলিভারী দিয়ে বলবন্ত বন্ধুদের নিয়ে আবার আসছিল নিশ্চয় আর একগাড়ি মাল নিতে—অন্তত বন্ধুরা তাই বুঝিয়েছিল বলবন্তকে। তারপর বচসা হয়েছে—খুন হয়েছে বলবন্ত। কিন্তু কলহটা কি নিয়ে? সাকিনাকে নিয়ে নয়তো? উপপত্নীর ভাগ তো দোস্তরাই চায়। সাকিনা তাহলে কোথায়? ট্যাক্সি পাওয়া গেছে উত্তরমুখো অবস্থায়। বলবন্তকে সরিয়ে দোস্তরা প্রথমেই সাকিনা সন্ধানেই যাচ্ছিল নিশ্চয়—ভেবেছিল রূপ আর রূপো এক জায়গাতেই পাওয়া যাবে। তেল ফুরিয়ে যাওয়ায় ফিরে এসেছে বলবন্তের ঘরে। জহরৎ পেয়েছে কিনা জানা যাচ্ছে না—কিন্তু সাকিনাকে পেয়েছে কী?

বলবন্তর যা চরিত্র, তা থেকে বোঝা যায় উত্তর কলকাতার একটা নিষিদ্ধ পল্লীতে তার যাতায়াত থাকা স্বাভাবিক। সোনাগাছিতে। চোরাই মদের কারবারটাও সেখানে চলে ভাল। ট্যাক্সি নিশ্চয় যাচ্ছিল সেই দিকেই। বলবন্ত নিজের ঘরে তোলে নি সাকিনাকে—হয়তো রেখে এসেছে নিষিদ্ধ পল্লীরই কোন নিশ্চিন্ত ডেরায়।

গেলাম সোনাগাছিতে। হেদিয়ে পড়েছিলেন ধরণী ঘোষাল। কিন্তু ঘনঘন নস্যি নিচ্ছিলেন আর দিচ্ছিলেন আমাকেও। 'চার্চিল....চার্চিল' স্বগতোক্তি শুনে যাচ্ছিলাম সমানে। মৃগাঙ্ক, তুমি সোনাগাছি কখনো যাও নি আমি জানি। কিন্তু আমার লাইনটাই খারাপ। সব খবরই রাখতে হয়। বারবনিতাদেরও ক্যাটেগরি আছে। রূপ আর পশার অনুযায়ী এক-এক বাড়িতে এক-এক দলের নিবাস। 'নতুন'দের তোলা হয় আবার বিশেষ বিশেষ জায়গায়। বাঙালী, হিন্দুস্থানী, মুসলিম, চাইনিজদের এলাকা আলাদা আলাদা। নিয়মিত খদ্দেররা মোটামুটি খবর রাখে দালালদের দৌলতে—দালালরও সব খবর ভাঙে না। পুলিশের ভয়ে। কিন্তু রামকেষ্ট আমার হাতের লোক। কোন্‌কালে তার একটা উপকার করে ফেলেছিলাম—আজও সেই উপকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে সে এক পায়ে খাড়া। ধরণী ঘোষালকে জীপে বসিয়ে এই রামকেষ্টকই খুঁজে বার করলাম। কথা ফুরোনোর আগেই সে শুধু সাকিনার ডেসক্রিপশন শুনে বলে দিলে, 'মালটা' ক'দিন আগেই এসেছে বটে—কিন্তু বাজারে নামে নি এখনো। প্রাইভেট মাল। প্রাইভেটদের এলাকায় আছে বহাল তবিয়তে। সোনাগাছির অলিখিত নিয়ম অনুযায়ী সেখানে কাউকে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

কিন্তু রামকেষ্ট তো আমাকে চেনে। সোনাগাছির সততা সম্বন্ধে আমাকে সমঝে দেওয়ার পর নিয়ে গেল সাকিনার ঘরে। পঞ্চদশী মেয়েটা যেন আগুন দিয়ে গড়া। হেলেনের জন্য ট্রয়, পদ্মিনীর জন্যে চিতোর ধ্বংসের পর সাকিনার জন্যেও কলকাতা ধ্বংস হয়ে গেলে আশ্চর্য হব না। বলবন্ত তো গেলই—এবার যাতে তার হত্যাকারীরা।

আমাকে দেখেই ভুরু কুঁচকেছিল সাকিনা। রামকেষ্ট অভয় দেওয়ার পর ভুরু সরল হয়েছিল। বলবন্ত যে আর নেই, প্রথমে তা ভাঙি নি। শুধু দুটো প্রশ্ন করেছিলাম—জহরতের বাক্সটা কোথায়?

বলবন্তর কাছে, বলেছিল সাকিনা। অত দামী বাক্স এ অঞ্চলে রাখতে চায় নি। কিন্তু আজ এলেই বলবে বাক্স ফিরিয়ে আনতে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটা করতেই বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনব না কেন? আমারই দেওয়া তো।'

দ্বিতীয় প্রশ্নটা কি যদি আঁচ করতে পারো, মৃগাঙ্ক, তাহলে বুঝব তুমি বড় গোয়েন্দা-লেখক। আর যদি না পারো, ধৈর্য ধরো।

তখন সন্ধ্যে হয়েছে। সোনাগাছির মদের আড্ডায় ভিড় শুরু হয়েছে। রামকেষ্টকে দিয়ে দোকানদারকে ম্যানেজ করিয়ে কাউণ্টারের পেছনে সাকিনাকে বসিয়ে রাখলাম বোরখা পরিয়ে। সাকিনা এসেছিল—বলবন্ত আর ফিরবে না শুনে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে এসেছিল। মদ খেতে আসবে শুনে এক কথাতেই রাজী হয়ে গেছিল।

ভেবেছিলাম একরাত্রে হবে না—অনেক রাত অপেক্ষা করতে হবে। সোনাগাছিতে মদের কারবারে এবং মেয়েদের কারবারে যাদের যাতায়াত নিয়মিত, কিছুক্ষণের জন্যেও এখানে তাদের আসতেই হয় গলা ভিজিয়ে নেওয়ার জন্যে। জহরতের বাক্স পেয়েও যারা জহরতের মালকিন্‌কে পায় নি, সাকিনার সন্ধানে তারা আসবেই আসবে। সাকিনার সন্ধানে না হলেও টাকা ওড়াতে, ফুর্তি করতে আসবেই। এখানে বসে মদ যারা খায় না, বোতল বগলে করে নিয়ে যায় তারা। মোট কথা, আসতেই হবে। অপরাধীদের চরিত্রের এদিকটা আমার ভালভাবেই জানা।

মৃগাঙ্ক, ভাগ্য সহায় হয় উদ্যোগীদের। বরাবর তাই দেখেছি। সেই সন্ধ্যাতেও তাই দেখলাম। তিনজন শিখ-পাঞ্জাবী ঢুকল ঘরে। চনমনে চোখ। বেপরোয়া ভাবভঙ্গি।

চোখের ইশারা করল সাকিনা। বোরখার আড়ালে দেখলাম চোখ জ্বলছে তার।

ধরণী ঘোষাল তৈরি ছিলেন। তিনজনকেই তুললেন আগে থেকে এনে রাখা ভ্যানে।

তিনজনেই কবুল করেছিল বলবন্ত-হত্যার অপরাধ। ওরা ছিল চারবন্ধু। মদ সাপ্লাই ওদের মেন বিজনেস। ট্যাক্সি রেখেছিল বলবন্ত সেই কারণেই। কিন্তু একদিন সাকিনাকে প্যাসেঞ্জার তুলে তাকে গেঁথে ফেলেছিল ছিপে। বাড়ি থেকে বার করে জহরতের বাক্সও তুলেছিল বাড়িতে। মতলব ছিল বোম্বেতে পিঠটান দেওয়ার—সাকিনাকে নিয়েই। ফিল্ম হিরোইন বানাতো। কিন্তু তিন দোস্ত বাগড়া দিয়েছিল মদের কারবার লাটে উঠবে দেখে। দেখতে চেয়েছিল সাকিনাকে। দেখায় নি বলবন্ত। বেলেঘাটায় ওই জন্যেই ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হয় সাকিনা আর জহরতের ভাগ দাও—নইলে জানে মরো। লড়ে গেছিল বলবন্ত—কিন্তু...

তিনজনের একজনের দিকে আমি একদৃষ্টে চেয়েছিলাম। অনেকক্ষণ থেকেই। মাথায় সে ছোটখাটো, শিখদের মত লম্বা চওড়া নয়। কথাও বলছে না। চুপচাপ।

ধরণী ঘোষালকে আড়ালে ডেকে বলতেই তাকে ছাড়া বাকি দুজনকে সরিয়ে নিয়ে গেছিলেন তিনি ঘর থেকে।

ঘরে তখন সে আর আমি।

আমি চোখে চোখে চেয়ে বলেছিলাম, 'তুমি বাঙালী?'

চমকে উঠেছিল সে।

'এ পথে এলে কেন?'

কর্কশ গলায় বলেছিল সে, 'পেটের জ্বালায়।'

'কিন্তু এখন তো ইণ্ডিয়ান পিনাল কোডের ৩০২ ধারা অনুযায়ী, ফাঁসি হবে তোমাদের। ৩৯০ ও ৪০২ ধারা অনুযায়ী রবারি আর ডেকয়টি চার্জেও ফেঁসে যাবে।'

নীরবে চেয়ে রইল সে। ভয় পেয়েছে।

'দাড়ি গোঁফ রেখেছ কেউ যাতে চিনতে না পারে—কেন? আরও খারাপ কাজ করেছ?'

কথা নেই।

'বিয়ে করেছ?'

'হ্যাঁ।'

'বউ আছে?'

'হ্যাঁ।'

'ছেলেমেয়ে?'

'আছে।'

'এদের ভাসিয়ে দিয়ে যেতে তো হবে এবার।'

'ভাসিয়ে দিয়েছি অনেকদিন।'

'বাড়ি ছাড়া?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

‘খেতে দিতে পারি না।’

‘এখন তারা খেতে পাচ্ছে?’

‘মাঝে মাঝে টাকা পাঠাই—মুখ আর দেখাই না।’

‘কোথায় থাকে তারা?’

জবাব নেই।

‘তাদের জন্য মন কাঁদে না? দেখতে ইচ্ছে যায় না?’

পকেট থেকে একটা ফটো বার করল সে। কোণ দুমড়ানো, মলিন। বললে, ‘এইটাই দেখি রোজ।’

‘দেখি।’

ইতস্তত করে বাড়িয়ে দিল সে।

আমি দেখলাম এবং চমকে উঠলাম। ছ’জনের পরিবারের একজনকে আমি চিনি। শ্রাবণী।

মৃগাঙ্ক, তাই আমি পালিয়ে এসেছি। খেতে না পাওয়া মেয়েটাকে এবার আমি বাপহারাও করলাম জন্মের মত। তাকে টাকা দিয়েছি, খাবারের বন্দোবস্ত করে এসেছি—কিন্তু শুধু আমিই জানি—ইহজীবনে সে আর বাবাকে ফিরে পাবে না।

সাকিনাকে ফিরিয়ে দিয়েছি তার বাবার কাছে। সে ঘড়িটা চিনিয়ে না দিলে, বলবন্ত সিংয়ের হত্যাকারীকে ধরতে পারতাম না। ধরণী ঘোষালরা একদম মাথা খাটান না—এইটাই ওঁদের বড় দোষ। বলবন্ত সিংয়ের কব্জিতে ঘড়ি পরার দাগ ছিল। কিন্তু ঘড়িটা নিয়ে একদম মাথা ঘামান নি। টাকা-পয়সাসমেত হত্যাকারীরা সেই ঘড়িটাও তো খুলে নিয়ে গেছিল। একজন না একজন হাতেও নিশ্চয় পরেছিল—নিশ্চয় দামী বলেই নিয়ে যাওয়ার লোভ হয়েছিল। সাকিনাই চিনিয়ে দেয় ঘড়িটা। ক্যাসিয়ো কোয়ার্জ ঘড়ি—মাস, তারিখ, বার, অ্যালার্ম—সব আছে সেই ঘড়িতে। এই একটিমাত্র সূত্র সন্ধানেই সাকিনার সঙ্গে দেখা করেছিলাম এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটা করেছিলাম।

যাক সেকথা, শ্রাবণীকে পিতৃহীন করার অপরাধ বুকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি এই পাহাড়-বনের নির্জনতায়। বিবেককে জিজ্ঞেস করছি বারবার, সমাজের ভাল করতে গিয়ে নির্দোষদের সর্বনাশ করার কোন অধিকার কি আছে আমার? শ্রাবণী তো নিষ্পাপ—কেন তার এত বড় ক্ষতি আমি করলাম? খ্যাতি? যশ? কৃতিত্বের অহঙ্কার? মরীচিকার পেছনে আর কতদিন ছুটে চলব, মৃগাঙ্ক, বলতে পারো? □

* ‘রোমাঞ্চ’ পত্রিকায় প্রকাশিত।

গন্ধর্বলোক

ঈশানীর চিঠি ঈশান কোণের মেঘের মতই আমার ছুটির দফারফা করে ছাড়ল। নামডাক এমনিতে হয়নি। বোম্বাইয়ের রূপোলী পর্দার তারকা-রাণী আমি। কাজেই আবেগ বস্তুটার মাত্রা আমার মধ্যে একটু বেশীই। স্নায়ুর ওপরেই আমাকে বাঁচতে হয়। জানি, সব চিত্রতারকাদের মতোই চল্লিশ ছুঁয়ে আমাকেও গ্যাসট্রিক আলসারে ভুগতে হবে—স্নায়ুর ওপর

অত্যধিক চাপ দেওয়ার শাস্তি পেতে হবে। শিলাদকুমারও এই নিয়ে ঠাট্টা করে আমাকে।

বছরে পাঁচ ছটা বড় বড় ছবিতে আমাকে নায়িকা হতেই হয়। দ্বিতীয় ছবির শুটিং শেষ হবার পর শিলাদকুমার ফিরল কাম্বোডিয়া থেকে। দুজনেই বেশ কাহিল। কেননা, সাতমাস একটানা কাম্বোডিয়ার ছবির কাজ করেছে শিলাদ। তাই প্রস্তাব করেছিল, আর একবার হানিমুনে বেরোনো যাক।

শিলাদের কথা শুনে হাসি পেয়েছিল বইকি। আর একবার হানিমুন, কথাটার কোনো মানে নেই আমার কাছে। কোনো হানিমুনই হয়নি আমাদের। বিয়ে হলে তো হবে। বিয়ে করার সময় পেলাম কখন? ফিল্মদুনিয়ার গন্ধর্বলোকে বিয়ে করার সময় কটা ভাগ্যবানের হয়?

সে যাই হোক, মধুচন্দ্রিমা যাপনের প্রস্তাব লুফে নিয়েছিলাম।

বাইরে বেরোনো নিরাপদ নয়। ভক্তদের জ্বালায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে। তাই যেমন তেমনি ঘরে শুয়ে রইলাম। বাইরে বাজতে লাগল টেলিফোন। নীচে খটাখট শব্দে ব্যস্ত রইল অফিস টাইপরাইটার। ফ্যান-ক্লাব কর্মীরা ফুরসৎ পেল না চিঠির বস্তা থেকে মুখ তোলবার। ডিটেকটিভরাও রোজকারমত টহল দিয়ে ফিরতে লাগল বাড়ী আর বাগানের প্রতিটি বর্গ ইঞ্চিতে।

আমি আর শিলাদ এয়ার-কণ্ডিশনড ঘরে শুয়ে বিভোর হয়ে রইলাম পরস্পরকে নিয়ে। এক-এক রাতে এক-এক ফুলশয্যার রোমান্সে মশগুল হয়ে রইলাম দুজনে দুজনকে নিয়ে। ব্রেকফাষ্ট আসত সূর্য যখন মধ্যগগনে। আমি ক্রীম খেতে ভালবাসি বলে শিলাদকুমার কত ঠাট্টাই না করত। বলত, দুদিনেই অ্যায়সা মোটা হবে যে ছবির কাজ আর জুটবে না। আমি শুনতাম না। ক্রীম আমার ভীষণ ভালো লাগে। এতদিনেও যখন মুটিয়ে যাইনি—তখন আর যাবোও না।

সেদিনও ব্রেকফাষ্ট এলে ক্রীম খাচ্ছি। খেতে খেতে আমার চিঠির তাড়া থেকে একটা খাম বেছে নিলাম। খুলতেই দেখলাম ঈশানীর চিঠি।

শ্রীযুক্তা মদালসা দেবী

মান্যবরেষু,

আমি আর পারছি না। আপনার হয়ে জাল অটোগ্রাফ দিতে দিতে হাঁপিয়ে উঠেছি। রেহাই পাবার জন্য চুল ছেঁটে ফেললাম। তবুও মুক্তি নেই। আপনার ভক্তের দল এখনও রাস্তায় দেখলেই আমার পেছনে ছোটে। মনে করে আমিই মদালসা। বলে, কেন চুল ছাঁটলাম। অমন লম্বা চুল ছেঁটে কেন ববছাঁট করলাম। মদালসা দেবী, আমি সত্যিই আর পারছি না। সারাটা জীবন নকল মদালসা দেবী হয়ে কাটাবার বিড়ম্বনা আর সইতে পারছি না।

বিনীতা

ঈশানী দত্ত

চিঠি পড়েই মাথা গরম হয়ে গেল। চিঠির বক্তব্যর জন্য নয়। এ চিঠি আমার কাছে এল কি করে? সেক্রেটারীদের পই-পই করে বলে দিয়েছি, ভক্তবিটেলদের কোনো রকম স্তুতি-পত্র যেন আমার সামনে না পৌছোয়। ফ্যান-ক্লাব খুলেছি কি এমনি-এমনি? খোশামুদে চিঠি প্রথম-প্রথম ভালই লাগত। ভাবতেও অবাক লাগে, এসব চিঠির জবাবও দিতাম। কিন্তু

ডাউইয়ের মত খ্যাতির আকাশে উঠে পড়ার পর স্তুতি-পত্র দেখলেই মেজাজ খিঁচড়ে যায়।

একেই বলে খ্যাতির বিড়ম্বনা। খ্যাতি যখন থাকে না, তখন খ্যাতির পেছনে দৌড়োই। খ্যাতি যখন আসে, তখন খ্যাতিকে এড়িয়ে চলি। শিলাদকুমার অবশ্য এর ব্যতিক্রম। গোড়া থেকেই ও কারো ধার ধারে নি। গন্ধর্বলোকে হিরো রূপেই ওর প্রবেশ; প্রস্থানও ঘটবে হিরোর মত।

তাই সেক্রেটারীদের ওপর ঢালাও হুকুম আছে, সব চিঠিই খুলে দেখবে। ব্যক্তিগত চিঠি আসবে আমার সামনে—বাদবাকী সব যাবে ফ্যান-ক্লাবে। বাঁধা ছকের টাইপকরা চিঠিতে জবাব যাবে। এমনকি আমার সইকরা যে ফটোগ্রাফ পাঠানো হবে, তার সইটিও নিজে করব না—ওরাই আমার হয়ে করে দেবে।

মোট কথা, কোনো ধরনের ফ্যান-লেটার যেন আমার ত্রিসীমায় না আসে। এই হল আমার অর্ডার। তা সত্ত্বেও ঈশানীর চিঠি আমার কাছে পৌঁছোয় কি করে?

বিরক্তি নিশ্চয় কণ্ঠেও প্রকাশ পেয়েছিল। কেননা, কাগজ পড়তে পড়তে মুখ তুলল শিলাদ—"হল কী?"

"ফ্যান লেটার। হাজারবার বলেছি এ সব চিঠি যেন আমার কাছে না পৌঁছোয়।"

বলে, চিঠিটা ছুঁড়ে দিলাম ওর বিছানায়। এক হাতে তুলে নিল শিলাদ। ভারী সুন্দর হাতটা সিল্কের চাদরের পটভূমিকায় নতুন করে দেখলাম। হাত দেখে মানুষের চরিত্র ধরা যায়। অন্তত আমার তাই বিশ্বাস। তা না হলে যার চেহারা অমন অসুরের মত, তার মন অমন মিষ্টি, অমন নরম, অমন শিল্পীসুলভ হবে কেন? ওর হাতে সে চিহ্ন আছে।

চিঠিটা পড়ল শিলাদ। পড়ে হেসে ফেলল—"ঈশানী দত্ত! বেশ নাম। চিঠিটাও। ভক্তের চিঠি তো এ রকম হয় না। ইণ্টারেস্টিং!" বলে, অপাঙ্গে তাকাল। "চিঠিটার মধ্যে রহস্য আছে।"

"রহস্য! রহস্য আবার কি? এ চিঠি এখানে পৌঁছোলো কি করে, এ ছাড়া আর কোনো রহস্য তো দেখছি না।"

"হাতের লেখাটা যে তোমার হাতের লেখার মত। রহস্য সেইটাই।"

কথাটা সত্যি। ঈশানী দত্তর হাতের লেখা অবিকল আমার হাতের লেখার মতই।

সেকেণ্ড কয়েকের মধ্যেই মতলবটা মাথায় এল আমার। খাট থেকে নামতে নামতে বলাম—"চললাম।"

"কোথায়?"

"ঈশানীকে দেখতে।"

"কিন্তু এ যে হানিমুনের সময়! এই দ্যাখো কাগজেও তাই লিখেছে। এখন কি বাইরে বেরোয়?"

"নকল মদালসারও তো হানিমুনের ইচ্ছা যায়।" বলে মুচকি হাসলাম আমি। বিধাতাও তখন হেসেছিলেন—অলক্ষ্যে।

"বেশ তো, খাবার নেমতন্ন করো; বর্তে যাবে," শিলাদ বলেছিল।

"উঁহু। থার্ডক্লাস যে কোনো একটা হোটেলে শুধু দুজনে দেখা করব, কথা বলব। এই হল আমার আজকের অ্যাডভেঞ্চার।'

সেই ব্যবস্থাই হল। প্যারাডাইজ হোটেল। বিকেল চারটে। ঘর 'বুক' করার পর ঈশানী দত্তর প্যারেলের ঠিকানায় খবর পাঠালাম—আমি আসছি।

স্নান সেরে নখরঞ্জন করে চুল আঁচড়ে যখন আমার হেয়ার-ড্রেসারের চেম্বার থেকে বেরোলাম, তখন আমাকে নায়িকা-শ্রেষ্ঠা মদালসা বলে চেনা মুস্কিল। প্রসাধন এবং কেশবিন্যাস আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতই।

প্যারাডাইজ হোটেলের সিঁড়ির ধাপে পা দিয়ে হঠাৎ মনটা অন্যরকম হয়ে গেল। নকল মদালসাকে দেখে লাভ কী? খামোকা এনার্জি নষ্ট...ধাপ থেকে পা নামিয়ে ফিরতে যাচ্ছি, মনে পড়ল শিলাদকুমারের মুখ...ঠাট্টা...টিটকিরি...ভক্তের ভয়ে পলায়ন? নাঃ, ফেরা হল না। সোজা গেলাম অফিসরুমে। নাকের ডগায় চশমা এঁটে বুড়ো ম্যানেজার এমন ভাবে তাকাল আমার পানে যেন আমি মেয়েটা তেমন সুবিধের নয়। দুই চোখে বেশ সন্দেহ...বারান্দা দিয়ে এগোতে এগোতে বিড়বিড় করে কিঞ্চিৎ জ্ঞানদানও করা হল। এ হোটেল নামী হোটেল, কুঅভিসন্ধি নিয়ে এখানে কেউ আসে না। হোটেলের দুর্নাম মালিক একদম সইতে পারে না। বলতে বলতে 'বুক' করা কামরার সামনে পৌঁছোলাম। দরজা ভেজানো ছিল। ঠেলে ঢুকলাম। প্রায়ান্ধকার। একটা টেবিল। দূরপ্রান্তে গোটাতিনেক চেয়ার। কে যেন সেখানে বসে রয়েছে।

পেছন ফিরে দেখলাম বুড়ো নেই। বললাম—"অন্ধকারে কি মুখ দেখা যায়?" বলেই খট করে সুইচ টিপলাম। আলোয় ভরে উঠল ছোট্ট ঘরটা।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম নকল মদালসার দিকে। চেয়ারে বসা মেয়েটি যেন আর একটা আমি।

তফাৎ শুধু পোশাক। আমি যা পরেছি, তা দামী না হলেও পরিচ্ছন্ন। কিন্তু নকল 'আমি' যা পরেছে, তা রীতিমত নোংরা। যেমন ব্লাউজের ছিরি, তেমনি শাড়ীর অবস্থা। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুল। তা সত্ত্বেও আমার সঙ্গে তার মুখের আদলের হেরফের ঘটেনি। থুৎনি সুডৌল। টানা টানা চোখ। কামনার দুটি ডিপো। আমার ভক্তরা যে যে দেহশ্রীর জন্য আমাকে নিয়ে পাগল, সবই দেখলাম রয়েছে নকল 'আমি'র মধ্যে।

ঈশানী নির্ভয়ে তাকিয়েছিল। নিঃশঙ্ক চোখ। বলল—"বসুন।" কণ্ঠস্বর আমার মতই। ঈষৎ ঘষা, ঈষৎ ধরা, ঈষৎ তীক্ষ্ণ। শুনেছি, পুরুষের রক্তস্রোত নাকি উদ্দাম হয় আমার এই কণ্ঠস্বরে। নকল 'আমি' বহু চেষ্টায় এ স্বরও নকল করেছে।

আমি অভিনেত্রী। বিস্ময় চোখমুখ থেকে সরিয়ে রাখলাম। ঈশানী কিন্তু দেখলাম, মোটেই ঘাবড়ায়নি। মদালসার সামনে এসে বহু বাঘা রিপোর্টারও কেঁপে ওঠে। কিন্তু ঈশানী দত্ত বিন্দুমাত্র নার্ভাস হয়নি।

নৈঃশব্দ্য আমি ভাঙলাম। গৌরচন্দ্রিকার ধার দিয়েও গেলাম না। বললাম।—"কি মনে করে?"

"কিছুই মনে করে নয়।" বলল ঈশানী আমারই গলায়। "আগে বসুন। অতদূরে নয়—আমার পাশে।" ঈশানী যেন হুকুম করছে। যেহেতু তাকে আর আমাকে দেখতে যমজ বোনের মত, অতএব আমার ওপর তার যেন একটা অধিকার জন্মে গিয়েছে। "কত লম্বা আপনি?"

প্রশ্নটা আকস্মিক। সুরটাও যেন কেমন-কেমন। কিন্তু গায়ে মাখলাম না। বললাম—"সাড়ে পাঁচ।"

"আমারও তাই। ম্যাগাজিনেও তাই দেখেছিলাম। বাজিয়ে নিলাম।"

"কেন? বাজিয়ে নেবার দরকার কি?" কিছু একটা বলা দরকার, তাই বললাম।

কোলের ওপর রাখা কালো হ্যাণ্ডব্যাগটা খুলল ঈশানী। একটা কালো রঙের সাইলেন্সার ফিট করা রিভলভার বার করে বলল—"একটু পরেই আপনাকে খুন করব, তাই জেনে নিলাম। মরবার আগে কিছু বলবার থাকলে বলতে পারেন।"

নিস্তব্ধ ঘরে ঈশানীর কথা ফুরোলো। আবেগ নেই, উত্তাপ নেই, ঘৃণা নেই, দ্বেষ নেই। শুধু একটা ঘোষণা—আমাকে মরতে হবে। শুটিংয়ের সময়ে এরকম সংলাপ শুনলে মনে হত নাটকীয় মুহূর্ত তৈরী হচ্ছে। কিন্তু ঈশানীর কণ্ঠে নাটক নেই।

বিক্ষিপ্ত মনটাকে জড়ো করবার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। শুধু মনে হল, অফিস ঘরের বুড়ো ম্যানেজার একটু আগেই হোটেলের সুনাম নিয়ে লম্বা-চওড়া বচন ঝেড়েছে; মনে পড়ল রাস্তার মোড়ে গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ড্রাইভার, এয়ারকণ্ডিশনড ঘরে আমার প্রতীক্ষায় বসে আছে শিলাদকুমার। ইচ্ছে হল খামচে নিই রিভলভারটা। ফিল্ম হলে তাই করতাম। কিন্তু এটা বাস্তব। সব শেষ হতে চলেছে।

ধরা গলায় বললাম—"কি করেছি আমি? কেন খুন করবে?"

জবাব দিল না ঈশানী। রিভলভারটা দোলাতে দোলাতে শুধু চেয়ে রইল।

রাগ হয়ে গেল—"ফাঁদটা ভালই।"

"ফাঁদ আপনার। আপনিই আমাকে ডেকেছেন।"

কথাটা সত্যি। অ্যাডভেঞ্চারের লোভে নিজের ফাঁদ নিজেই পেতেছি। চোখ ফেটে জল এল। কিন্তু কাঁদতে পারলাম না। শুধু বললাম ছেলেমানুষের মত— "কিন্তু কি অপরাধ করেছি আমি?"

এ প্রশ্নের জন্য তৈরী ছিল ঈশানী। বল্লমের মতই জবাবটা ছুঁড়ে দিল আমাকে লক্ষ্য করে—"অপরাধ! শেষ নেই অপরাধের। প্রথম অপরাধ, হুবহু আমার চেহারা নিয়ে কেন এসেছিলেন পৃথিবীতে? দ্বিতীয় অপরাধ, এসেই ছিলেন যদি ফিল্মস্টার হতে গেলেন কেন? কেন আমার জীবন বিষিয়ে তুলেছেন? নিশ্চিন্ত মনে আমি কোথাও বেরোতে পারি না। বেরোলেই মদালসা মনে করে আমায় তাড়া করে, ছিঁড়ে খায়। কেন? কি অপরাধে? বছরের পর বছর কেন এই নির্যাতন? আপনার হয়ে মিথ্যে অটোগ্রাফ দিতে দিতে হাত ব্যথা হয়ে যায়, জানোয়ার লোকগুলোর জ্বালায় অলিগলি দিয়ে মুখ ঢেকে পালিয়ে বেড়াই। কেন? কি অপরাধে? আজ সুযোগ এসেছে শোধ তুলবার, এই অত্যাচার বন্ধ করবার। শুধু তাই নয়, এবার আমার পালা। বহু বছর মদালসার ছায়া হয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি, এবার হবো আসল মদালসা। হাঃ, হাঃ, হাঃ।"

পাগল? না। স্থির সংকল্পে বজ্রকঠিন মুখ। দীর্ঘ ক্লেশের শেষ হতে চলেছে। তাই আনন্দ জ্বলজ্বলে আনন। দুই চোখে কেবল ঘৃণা, অপরিসীম ঘৃণা।

ফিসফিস করে শুধু বললাম—"আসল মদালসা হবে? আমাকে মেরে? পারবে না।"

"পারব না? কেন?"

“দেখতে আমার মত হলেও সত্যি সত্যিই তো তুমি নও। আমার চালচলনই আলাদা। সে জিনিস রপ্ত করা মুখের কথা নয়। যেমন ধরো, এ হোটেল থেকে কতদূরে ঠিক কোনখানে গাড়ী পার্ক করেছি, তা তোমার জানা নেই।”

“বারান্দা থেকে তাও দেখেছি। মোড়ের কাছে বাস-স্টপেজের সামনেই গাড়ী পার্ক করেছেন।”

“ড্রাইভারের নাম? কি বলে ডাকবে?”

“কমলবাহাদুর। ডাকব শুধু কমল বলে।”

“যাবে কোথায়? কমলবাহাদুরকে বলবে কি?”

“ব্লু-টেম্পল,” অবিকল আমার গলায় বলল ঈশানী।

“কমল ধরে ফেলবে। এখান থেকে বেরিয়েই যে বাড়ী ফিরছি না, কমল তা জানে। আজ বিকেলে অনেক প্রোগ্রাম নিয়ে তবে রাস্তায় বেরিয়েছি।”

“বলব, কমল, আর পারি না। প্রোগ্রাম বাতিল। চলো ব্লু-টেম্পল। ছুটির সময়ে যতটা পারি জিরিয়ে নিই।”

শুনতে শুনতে বেশ বুঝলাম কমলবাহাদুরের ক্ষমতা নেই একথা শোনার পর নকল মনিবানিকে চেনে। গলার খোঁচগুলো পর্যন্ত নকল করেছে ঈশানী। বলবার কায়দায় কোনো ফারাক নেই। শুধু পোশাক পাল্টে নিলেই হল। আমার পোশাক ও পরবে—নিজের পোশাক আমাকে পরাবে। কমলবাহাদুর কেন, স্বয়ং শিলাদকুমারও চিনতে পারে কিনা সন্দেহ।

উপায় নেই। কোনো উপায় নেই। আমার জীবনে গোপনতা নেই। আমি যে গন্ধর্বলোকের অপ্সরী। আমার চালচলন, খাওয়া-দাওয়া, কথাবার্তা, হাবভাব—সবকিছুই পাবলিক প্রপার্টি। ভক্ত জনগণ মুখস্থ করে রেখেছে আমার অষ্টপ্রহরের পাঁচালী। ঈশানী আমাকে নিয়ে লেখা প্রবন্ধ পড়েছে, আমার অভিনয় করা ফিল্ম দেখেছে, আমার সঙ্গে ফিল্ম সমালোচকের সাক্ষাৎকার মুখস্থ করেছে; ফলে আমার সব কিছুই তার নখদর্পণে। যে কোনো মুহূর্তে আমার জায়গায় এসে দাঁড়ানোর সব পর্বই তার কণ্ঠস্থ। কী ভয়ানক!

অভিশপ্ত গন্ধর্বলোকের পরী আমি। এই তো আমার জীবন। আমার কথা বলার রেকর্ডে বাজার ছেয়ে গিয়েছে। বিখ্যাত এক ইণ্টারভিউয়ের সে-রেকর্ড আমার ভক্তবৃন্দ বারংবার শুনেছে। ঈশানীও শুনেছে। ভক্তিতে গদগদ হয়ে নয়—আমার সর্বনাশ কামনায়। রেকর্ডের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে রপ্ত করেছে মদালসার সেই বিখ্যাত কথা বলার ভঙ্গি।

ঠাণ্ডা গলায় বললাম—“বিয়ে করেছো নিশ্চয়। স্বামী তো তোমায় ছাড়বে না।”

“স্বামী আমায় নেয় না।”

আশ্চর্য মিল! আমার স্বামীও আমাকে নেয়নি।

“ছেলেপুলে?”

অবাক চাহনি মেলে তাকায় ঈশানী—“সেকি! ভুলে গেলেন? আমাদের তো ছেলেপুলে নেই?”

চমকে উঠেছিলাম কথা বলার ধরনে। প্রথমে ভেবেছিলাম, ‘আমাদের’ বলতে ঈশানী আর স্বামীর কথা বলা হচ্ছে। পরক্ষণেই বুঝলাম, তা নয়। ঈশানী আর আমি ‘আমাদের’ বলতে এই দুজনে। বছরের পর বছর এইভাবেই ভেবে এসেছে ঈশানী। মজ্জায় তার এই

চিন্তাই পাকা আসন পেতে বসেছে। মদালসা মানেই ঈশানী—ঈশানী মানেই মদালসা। লোকে তার পিছু নিয়েছে মদালসা ভেবে—চিন্তাটা আরো কায়েমী হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে মদালসার অভিনয় করতে করতে ঈশানী নিজেও কখন মদালসা হয়ে গিয়েছে। সত্যিই তো আমি সন্তানহীনা। এখন প্রয়োজন কেবল পট পরিবর্তনের। আসল মদালসা নিহত হবে নকল মদালসার বেশে। আর, নকল মদালসা গিয়ে বসবে আসল মদালসার সিংহাসনে।

সফল হবে এক উন্মাদ ছন্নছাড়ার অপ্রকৃতিস্থ স্বপ্ন। তিল তিল করে খ্যাতির যে সৌধ আমি গড়ে তুলেছি, বহু বছরের সাধনায় যে বৈভব, যশ, প্রতিপত্তি অর্জন করেছি, কালো রিভলভারের একটিমাত্র গুলিতে তা চলে যাবে নোংরা পোশাকের ওই মেয়েমানুষটার দখলে। আর, খ্যাতিহীন হোটেলের প্রায়ন্ধকার ঘরে যথাসময় আবিষ্কৃত হবে নামগোত্রহীন একটি লাশ!

ঈশানী চেয়েছিল আমার পানে। চোখ তুলতেই বলল—''একটা কথা জানার ছিল। শিলাদকুমার লোকটা কিরকম?''

কনকনে বরফ-খণ্ডের মত কথাটা কানের পর্দায় গিয়ে আঘাত হানল। সঙ্গে সঙ্গে ভাবনার স্রোত বইল অন্যদিকে। জানি শিলাদ কি বলবে। আমাকে নিকেশ করে ঈশানী আমার বেশে ব্লু-টেম্পলেল ফিরলেই শিলাদ শুধোবে—''কিগো পরী, ঈশানীকে দেখলে?''

ঈশানী নতুন ঢং শুরু করবে। বলবে, চুলটা হঠাৎ ছাঁটতে হল। শুনে শিলাদ সাদাসাদা ঝকঝকে দাঁত বার করে অট্টহাসি হাসবে। কাছে টেনে নেবে ঈশানীকে।

লুঠ হয়ে যাবে শিলাদকুমার! আমার জীবনের সবচাইতে দামী, সবচাইতে আদরের, সবচাইতে গোপনীয় মণিকোঠায় ধুলো পায়ে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করবে শয়তানী ঈশানী। হীরে জহরৎকেও ছড়িয়ে রাখি, কিন্তু সন্তর্পণে সরিয়ে রাখি যে মানুষটিকে—সেই শিলাদকুমারকে কেড়ে নিয়ে যাবে ঈশানী—কিন্তু কেউ কোনোদিন জানতেও পারবে না! শিলাদের নিঃশ্বাসে উত্তপ্ত হবে ঈশানী, শিলাদের আদরে বিহ্বল হবে শয়তানি!

ভাবতে ভাবতেই লক্ষ লক্ষ অগ্নিশিখা যেন উদ্দাম নৃত্যে আগুন ধরিয়ে দিল শিরায় শিরায়, মগজের প্রতি স্নায়ুকোষে। যা হবার নয়, তাই হতে চলেছে—অসম্ভব সম্ভব হতে চলেছে। সেই মুহূর্তে দুর্বিসহ এই সম্ভাবনা নিঃশেষে মুছে নিয়ে গেল আমার সমস্ত ভয়, আতঙ্ক, আশঙ্কা। ইচ্ছে হল....প্রচণ্ড ইচ্ছে হল চুলোয় যাক রিভলভারের তপ্ত বুলেট....ইচ্ছে হল লাফিয়ে গিয়ে ঝাঁপিড়ে পড়ি কুচক্রী ঈশনীর ওপর...আঁচড়ে কামড়ে চড়িয়ে পিটিয়ে কেড়ে নিই নিকষ হাতিয়ার....খামচে খুবলে ছিঁড়ে মেরে বিচূর্ণ করি ওর আকাশ-কুসুম আশার....কিন্তু না....মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে.....শয়তানী বুদ্ধি দিয়েই কব্জায় আনতে হবে।

অকস্মাৎ পরিকল্পনাটার আবির্ভাব ঘটেছিল মগজে। মস্তিষ্কের সেই মুহূর্তের উর্বরতায় পরে বিস্মিত হয়েছিলাম। মিথ্যে....একটা ডাহা মিথ্যেকে বলতে হবে সত্যির মত করে....পারবো না? নিশ্চয় পারবো.....আমি যে অভিনেত্রী....মিথ্যের বেসাতিতে বড় কারবারী!

''ঈশানী,'' আবেগের পুঞ্জ মেঘ গলার মধ্যে সঞ্চয় করে বললাম—''ঈশানী, শিলাদকুমারের সব কথাই তোমাকে বলতে পারি। যা জানি—স-ব। তারপর তুমি আমাকে খুনও করতে পারো। কিন্তু আমার ভাগ্যে যা লেখা, তা রোধ করার ক্ষমতা আমার নেই। ঈশানী, তোমারও নেই।''

বলে থামলাম। সেকেণ্ড কয়েক শব্দহীন সাসপেন্স সৃষ্টি করলাম। তারপর একই সুরে

কথার খেই টেনে বললাম—''ঈশানী, আমার পরিণতি রোধ করবার ক্ষমতা তোমারও নেই। নিয়তির লিখন, ঈশানী, নিয়তির লিখন। একথা কেউ জানে না, কাউকে বলিনি। কাগজে কোথাও বেরোয়নি। জানো আমার শেষ কোথায়? কি অবস্থায়?''

উৎকণ্ঠা। নৈঃশব্দ্য। ঈশানীর নির্নিমেষ চাহনি।

''আর মাত্র ছমাস। ছমাস পরেই আমাকে যেতে হবে অ্যাসাইলামে....রাঁচির পাগলাগারদে....দুরারোগ্য ব্যাধিতে দিনে দিনে পাকিয়ে যাচ্ছি আমি.....এত খাই কিন্তু গায়ে মাংস লাগে না (ব্রেকফাস্টে ক্রীম খাওয়া নিয়ে শিলাদকুমারের রঙ্গ পরিহাস আমার মিথ্যেকে অনেকটা সত্যির বনেদ জোগালো)....আর মাত্র ছমাস, ছমাস বাইরে থাকার অনুমতি দিয়েছে ডাক্তার....এই ছমাস শেষ বিশ্রাম নিচ্ছি ব্লু-টেম্পলে....কাগজে কে না সে খবর পড়েছে.....কিন্তু এ বিশ্রাম যে শেষ বিশ্রাম তা কেউ জানে না....জানে না শিলাদকুমার আমাকে শেষ সঙ্গসুখ দিচ্ছে বহু অর্থের বিনিময়ে....''

এইখান থেকেই আমার অভিনয় প্রাণবন্ত হল। শিলাদকুমার যে দেহ মনে একটা অসুর ছাড়া কিছু নয়—এ সত্য বলতে বলতে আমি কেঁদে ফেললাম। শিলাদকুমার যে বহু অভিনেত্রীর শয্যায় অংশ নিয়েছে, এ ঈর্ষা আমার অন্তর সেই মুহূর্তে বিষিয়ে তুলল। শিলাদকুমারের সাতমাস কাম্বোডিয়া-প্রবাস যে অনেক গোপন রঙ্গের মুখরোচক ইতিহাস, এ কল্পনা চোখের জল আরও বৃদ্ধি করল। ফলে, অশ্রু যেন বন্যার মত উপচে পড়ল দু'গাল বেয়ে। রমণীমোহন শিলাদকুমার তুমি আমার যৌবন-সুধার শেষ বিন্দুটিও লুঠে নিতে এসেছো.....তারপর যাবে নতুন ফুলে, নতুন মধুর লোভে। এ ফুল যাবে ঝরে...ছমাস পরে রাঁচির পাগলাগারদে শুরু হবে অনিশ্চিত জীবন। ডাক্তাররা? চেষ্টার ত্রুটি করেনি। কিন্তু শেষ ঘনিয়ে এসেছে....কেউ জানে না....জানি শুধু আমি আর শিলাদকুমার....

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার আমার ভাগ্যে একাধিকবার জুটেছে। কিন্তু সেদিনের অভিনয় বুঝি সব রেকর্ডকেও ম্লান করে দিয়েছিল। তিল তিল করে আমার দীপ নিভে যাওয়ার কাহিনীর শেষে আমি অঝোর ধারে কাঁদতে লাগলাম।

ঘর নিস্তব্দ। আমার উচ্ছ্বাস এবার নীরব অশ্রুধারায় পর্যবসিত। দুহাতে মুখ ঢেকে বেশ কিছুক্ষণ ডুকরে কাঁদলাম। মনের চোখ দিয়ে দেখলাম, কালো রিভলভারের মিশমিশে নলটা আমার ব্রহ্মরন্ধ্রে তাগ করেছে....অন্তিম নির্ঘোষের প্রত্যাশায় কাঠ হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ।

কিন্তু কোন শব্দ নেই। নিস্তব্ধ ঘরে কেবল আমার ফোঁপানি যেন শ্মশানপুরীর হাহাকার সৃষ্টি করে চলেছে। দু হাত নামিয়ে মাথা তুললাম। অবাক হয়ে গেলাম ঈশানীকে দেখে।

ঈশানী কাঁদছে। চেয়ারের পেছনে মাথা হেলিয়ে দিয়ে কাঁদছে। রিভলভারের নলচে নির্মমভাবে চেপে ধরেছে চিবুকের নীচে।

''আপনিও.....আপনিও....'' ফুঁপিয়ে উঠল ও।

''ঈশানী!'' আমার আর্ত চীৎকারে আমি নিজেই চমকে উঠেছিলাম। ''ঈশানী!'' না....না....!'' বলতে বলতে ছিটকে গিয়েছিলাম চেয়ার ছেড়ে। এক, ঝটকায় ওর শিথিল মুঠি থেকে কেড়ে নিয়েছিলাম রিভলভার। ঈশানী হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল আমার ওপর। দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে সেকী কান্না!

সেকেণ্ডকয়েক গেল ওকে সামলাতে। অবশ্য রিভলভার হাতছাড়া করলাম না। সিধে

হয়ে বসল ঈশানী। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে যা বলল, তা সত্যিই মর্মন্তুদ।

দৈব সহায় না হলে এরকম কাকতালীয় বড় একটা ঘটে না। কি করে যে এ কাণ্ড ঘটল, তা এখনও ভাবলে আমার অবাক লাগে। আমার অজান্তেই ওর এমন একটা টনটনে জায়গা ছুঁয়ে ফেলেছিলাম যে নিমেষে ভেঙে পড়েছিল ঈশানী। হয়ত ঈশানীর করাল ব্যক্তিত্বের প্রভাব সাময়িকভাবেও আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল। অলৌকিক ঘটনাও ঘটে। নইলে ওর মনের গোপন ক্ষতে এভাবে আমার হাত গিয়ে পড়বে কেন?

অদ্ভুত কাকতালীয়। ঈশানী নিজেই এই একই ব্যাধিতে ভুগছে। যেদিন ও আমাকে চিঠি লিখে, তার আগের দিন ডাক্তার ওকে যে প্রেসক্রিপশন লিখেছে, তারও অর্থ ছমাস পরে পাগলাগারদে গিয়ে মগজ পরীক্ষা করা। এই ছমাস খোলা বাতাসে ঘুরেও যদি ঈশানীর দুরারোগ্য ব্যাধির উপশম না ঘটে, তাহলে পথ ঐ একটাই!

ঈশানী তাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। বছরের পর বছর নকল মদালসা থেকে একলাফে আসল মদালসা হবার প্ল্যানটা তখনি মগজে এসেছিল। এছাড়া বাঁচবার আর পথ নেই। প্রেসক্রিপসনের লিখনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানোর জন্যেই ও আমাকে মেরে আমার জীবনে প্রবেশ করতে চেয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস! আমিও সেই ব্যাধিতে আক্রান্ত? আমারও সেই শোচনীয় পরিণতি?

কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলে উঠেছিল ঈশানীর। আমি আমার রমাল দিয়ে ওর চোখ মুছিয়ে দিলাম। ও উঠে দাঁড়িয়ে ধরা গলায় বলল—"জানি না আর দেখা হবে কিনা। পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলাম। অভাবের যন্ত্রণা আর সইতে পারছিলাম না। কিন্তু নিয়তির চাইতে বড় আর কিছু নেই।"

সেই মুহূর্তে আমার মনটা কিরকম হয়ে গেল। যে মেয়েমানুষটা কিছুক্ষণ আগেই কশাইয়ের মত আমার হৃদযন্ত্র স্তব্ধ করার পণ করেছিল, সহসা তার অসহায় চাহনি নিঃসীম অনুকম্পায় ভরিয়ে তুলল আমার অন্তর। আমি আর একটি কথাও বললাম না। হ্যাণ্ড-ব্যাগ থেকে ফাউন্টেন পেন আর চেকবই বার করে দশ হাজার টাকার একটা বেয়ারার চেক লিখে দিলাম ঈশানীকে।

ও চেক নিয়ে আমার আগেই বিদায় নিল। সজল চোখে শেষবার আমার পানে তাকিয়ে ধীরে ধীরে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। নোংরা শাড়ী ব্লাউজের আড়ালে ছ'মাসের পরমায়ু নিয়ে প্রেতচ্ছায়ার মত অদৃশ্য হল নকল মদালসা—আমার তারকা-জীবনের দুষ্টগ্রহ!

শিলাদকুমার সব শুনে অট্টহাসিতে ঘর কাঁপিয়ে তুলল।

—"এরকম সুপারফাইন ব্ল্যাকমেলিং এর আগে কখনো ঘটেছে বলে শুনিনি। ওগো কন্যে, তোমার কপাল ভাল, ঈশানী এখনো ফিল্মে নামেনি। নামলে কি কাণ্ড ঘটতো বলো তো? তুমি আর এ তুমি হতে না।"

কথাটা একদম উড়িয়ে দিতে পারি না। কেননা, ঈশানীর রিভলভারটা ব্লু-টেম্পলে এনেছিলাম। খুলেওছিলাম। কার্তুজের খুপরিতে একটা কার্তুজও পাইনি। □

* 'রহস্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত।

নিয়োগ প্রথা

প্রথাটা নতুন কিছু নয়। অনেক প্রাচীন। নিয়োগ-প্রথার বহু নজীর আছে ভারতের পৌরাণিক ইতিবৃত্তে। বিবাহিতা নারী পরপুরুষের সাহচর্যে সন্তানসম্ভবা হতে পারে এই প্রথায়।

পুরাণে যা আছে, তা কি সামাজিক কদর্যতা হতে পারে? বিদুর এবং পাণ্ডুর মত ব্যক্তিরা যদি নিয়োগ প্রথা অনুযায়ী পরভৃত সন্তান হয়েও সমাজ শিহরামান হতে পারেন, তবে একালেও তা সম্ভব হবে না কেন?

ভয়ঙ্কর সেই অ্যাকসিডেন্টের পর থেকেই এ চিন্তা যেন উর্ণনাভের মত জাল বুনে চলেছে আমার মগজে। চিন্তার জট যতই জটিল হয়েছে, নিয়োগ প্রথা ততই উঁকি ঝুঁকি মেরেছে মস্তিষ্কের কোষে কোষে।

অভিশপ্ত সেই দুর্ঘটনায় মানুষ বাঁচে না। কিন্তু ভোগান্তি আমার কপালে আছে। নইলে বেঁচে গিয়ে মরে থাকব কেন?

ভাবছেন বুঝি হেঁয়ালি করছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ও জিনিসটা আমার চরিত্রে নেই। তাই কাগজ কলম নিয়ে বসেছি বিচিত্র এই আত্মকাহিনী লিখতে।

পড়তে পড়তে আপনার মনে হতে পারে উদ্ভট, অলীক, অবিশ্বাস্য। মনে হতে পারে, ভয়াবহ সেই দুর্ঘটনায় মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গিয়েছে আমার। তাই অসম্ভব কাহিনীর অবতারণা করে ইন্ধন জোগাচ্ছি পঙ্গু কল্পনাকে।

পঙ্গু! সত্যিই আমি আজ পঙ্গু। কিন্তু কল্পনায় নয়। হাত-পা-চোখের মত কোনো প্রত্যঙ্গও পঙ্গু নয়। পঙ্গু কেবল আমার পৌরুষ।

হ্যাঁ, আমার পৌরুষ। যে পৌরুষ প্রতিটি নারীর কাম্য। আজ তা অনুপস্থিত আমার মধ্যে। সংক্ষেপে বংশরক্ষায় আমি অক্ষম। বীজশূন্য আমার পুরুষ দেহ। তাই তো বলছিলাম, ভয়ঙ্কর সেই দুর্ঘটনা আমাকে নবজীবন দেয়নি—দিয়েছে জীয়ন্ত-মৃত্যু।

তা সত্ত্বেও বিয়ে করেছিলাম অলকানন্দাকে। কারণ অলকানন্দা এমনই মেয়ে যাকে দেখলেই বিয়ে করতে সাধ যায়। আমি প্রচণ্ড নাস্তিক। ঈশ্বর মানি না। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালের অস্তিত্ব স্বীকার করি না। কিন্তু শুধু আপনাকেই বলি, স্বর্গ বলে যদি সত্যিই কোনো দেবলোক থাকে এবং সেখানকার দেবসভায় উর্বশী কি তিলোত্তমাকে বিউটি-কনটেস্টে টেক্কা দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে স্বচ্ছন্দে আমার বউ অলকানন্দাকে আপনারা নিয়ে যেতে পারেন। ইন্দ্র প্রমুখ বহু সৌন্দর্য-রসিকের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবার মত রূপ নিয়ে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করেছিল মানবী অলকানন্দা।

তবে হ্যাঁ, এই মুহূর্তে তাকে খুঁজে পাওয়াই মুস্কিল। কেন, তা বলার জন্যেই এই উদ্ভট আত্মকাহিনীর অবতারণা।

অলকানন্দার জন্ম গরীবের ঘরে। কিন্তু আমার আবির্ভাব অতি ধনী পরিবারে। সেইসঙ্গে ছিল আমার প্রয়াস এবং নাস্তিকতাবাদ। আমার বিশ্বাস, প্রকৃত নাস্তিক না হলে খাঁটি অসৎ হওয়া যায় না। আমার বিবেকেও ও সবের বালাই নেই।

ফলে যাবতীয় অপকর্মে আমি হাত পাকিয়েছি। বিবেককে টাকার আফিং খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি। তা না হলে পৌরুষ হীন হয়েও অলকানন্দাকে বিয়ে করলাম কি করে?

টাকার জোরে তো বটেই। মেয়েদের চরিত্র যতই দুর্জ্ঞেয় হোক না কেন, একটা ব্যাপারে তারা অতিশয় অকপট। সেটি হল অর্থ। রৌপ্যমুদ্রার পর্বত এদেরকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে।

তাই অতি সহজেই অলকানন্দা আমার ঘরণী হল। জেনে শুনেই হল। তার নারী জীবনের চরম সাধ মেটাতে আমি অপারগ জেনেও হাসিমুখে সে বরমাল্য দিল আমার গলায়। চোখে চোখ রেখে হেসেও ফেলল।

আরও আছে। অলকানন্দা আমার চাইতে কত বছরের ছোট জানেন? তিরিশ বছরের। আমি পঞ্চাশ ছাড়িয়েছি। কোথায় বানপ্রস্থ অবলম্বন করব, তা না পাণিপীড়ন করে বসলাম অলকানন্দার। হঠাৎ ওকে চোখে পড়ায় মাথার মধ্যে যেন দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। সারা জীবনে অনেক মেয়ে মানুষ ঘেঁটেছি। কিন্তু এমন আহা মরি রূপ তো দেখিনি।

প্রেম? উঁহু। এ শর্মার অন্তর পাথর দিয়ে বাঁধানো। এ সব মেয়েলী ছেনালীপনা আমার আসে না। প্রেম-টেম নয় মশায়। বড়লোকের সংগ্রহবাতিক বলতে পারেন। হীরে মুক্তোর মত দামী দুষ্প্রাপ্য জিনিস দেখলেই ছোঁ মেরে এনে কোষাগারে রাখার বদখেয়াল। এ খেয়াল আমারও আছে। কারণ আমিও বড়লোক। অর্থের জাদু বলে সমাজের শীর্ষস্থানীয়। কাজেই ঠাটবাট বজায় রাখার জন্যে একজন অনিন্দ্য সুন্দরী প্রয়োজন বই কি।

অলকানন্দাকে সংগ্রহ করলাম সেই কারণেই। দামীদামী ফার্ণিচারের মতই তাকে সাজিয়ে রাখলাম আমার সাজানো ঘরে। কেউ মুগ্ধ হল, কারো চোখ টাটাল, কেউ ঘনঘন যাতায়াত আরম্ভ করল আমার প্রাসাদে।

আমি কিন্তু নির্বিকার রইলাম। বিকার দেখিয়েই বা লাভ কি আমার? ভোগস্পৃহা থাকলেও ভোগক্ষমতা তো আমার নেই।

কিন্তু অলকানন্দার ছিল। অলকানন্দা বিশ বছরের পূর্ণ যুবতী। আজন্ম দারিদ্র্য ভোগ করার পর সহসা ঐশ্বর্যের আলোয় তার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছে। ভোগকামনার সকল উপাদানই তিলতিল করে প্রলুব্ধ করেছে তাকে।

না, না, আপনারা যা ভাবছেন, এ গল্প সে-গল্প নয়। ভাবছেন এরপর সব সংসারে যা হয় এ সংসারেও বুঝি তাই হল। অলকানন্দা যুবক প্রেমিক সংগ্রহ করে হয় চম্পট দিল, অথবা, ভোগের পথে গা ভাসালো।

কিন্তু অলকানন্দা সে সবের ধার দিয়েও গেল না। সে দরিদ্র ছিল বটে, কিন্তু বুদ্ধিহীনা ছিল না। সে জানত ওসব পিচ্ছিল পথে একবার পা দিলে সামলানো বড় মুস্কিল। আমাকে ছাড়া যায়, কিন্তু আমার বিপুল বৈভবকে হাত ছাড়া করা যায়?

ঐ যে বললাম, নারীজাতি যতই দুর্জ্ঞেয় হোক, একটি বিষয়ে তারা নেহাৎই অকপট। সেটি অর্থ। তারা সব ত্যাগ করতে পারে, পারে না কেবল অর্থ। কারণ, এই অর্থর বনেদেই তো সংসার। অর্থ থাকলেই প্রেম থাকে, কর্তব্য থাকে, সংসারেও টান থাকে।

পাঠিকারা নিশ্চয় ভ্রূকুঞ্চন করছেন। মুণ্ডপাতও করছেন। কিন্তু আত্মকাহিনীতে মিথ্যে বলতে নেই। আমার কথা আমি বলে যাই। সত্যি মিথ্যে বিচারের ভার আপনাদের।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। অলকানন্দা কোনদিন তার যৌবনের ক্ষুধা নিয়ে অশান্ত হয়নি। অস্থির হয়নি। বাইরে মন দেয়নি।

তাই ধীরে ধীরে আমার মনের মধ্যে যে চিন্তাটার অঙ্কুর দেখা দিল, তা আমি আত্মকাহিনীর গোড়াতেই বলেছি।

নিয়োগ-প্রথা। পুরাকালে যা ঘটেছে। একালে তা ঘটবে না কেন? পরপুরুষের বীজ গ্রহণ করে নারী সন্তানবতী হয়েছে সেকালে—একালে হলে দোষ কি? হলেই বা পরভৃত সন্তান। আমার বিপুল বৈভবের একজন উত্তরাধিকারী তো প্রয়োজন।

তাছাড়া পুরাণ তো আমাদের শেখায়। সমস্যায় সুরাহার পথ দেখায়। নিয়োগ-প্রথাও কি আমার পারিবারিক জীবনে সমাধানের পথ নয়? স্ত্রী-কে সন্তানবতী করা অপারগ স্বামীর পক্ষেও সম্ভব এবং সে বিধান তো প্রাচীন পুরাণেই রয়েছে।

পাঠক পাঠিকার মধ্যে যাঁরা মনোবিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করেন, তাঁরা বোধকরি অন্য সন্দেহ করে বসেছেন। ভাবছেন, আমি Sadist। বিকৃত রুচির দাস। নইলে ঘরের বউকে নিয়োগ-প্রথার রাস্তা দেখাবো কেন?

আবার বলি, আত্মকাহিনীতে মিথ্যে বলতে নেই। তাই বলি, এজাতীয় একটা কেতাব অনেকদিন আগে আমার হাতে এসেছিল। নানারকম বিকৃতি আর অপরাধের ঘটনা পড়তে মন্দ লাগেনি। শুনেছি, তরুণী ভার্যাদের অনেক বৃদ্ধ উৎসাহিত করে তরুণমহলে গা ভাসাতে। গোপনে সেই দৃশ্য দেখে নাকি আবেশে বিহ্বল হয়ে পড়ে অক্ষম স্বামী পুঙ্গবরা।

মিথ্যে বলব না। নিয়োগ-প্রথার কল্পনা ঠিক এই জাতীয় না হোক, বিচিত্র একটা অনুভূতি বারংবার জাগ্রত করেছে আমার সর্বদেহে। আমি পঙ্গু। আনি নির্বীজ। কিন্তু যখনি অন্তরের কন্দরে লালন করেছি নিয়োগ প্রথার সুখাবহ চিন্তাকে, মনের সিনেমায় ছবি দেখেছি অলকানন্দার স্বেদসিক্ত আবেশ বিহ্বল তন্বীরূপকে, তখনি প্রতিটি লোমকূপে অদ্ভুত একটা শিহরণ অনুভব করেছি। অনাস্বাদিতপূর্ব এ শিহরণের ব্যাখ্যা আমি জানি না। কিন্তু এ রোমাঞ্চর সঙ্গে যেন তুলনা হয় না কোন কিছুর।

বিকৃতি? হতে পারে। কথায় বলে, কানা, খোঁড়া, কুঁজো—তিন চলে না উজো। মানে, এই তিন পঙ্গু কখনো সোজা পথে চলে না। আর আমার মত পঙ্গু বেঁকা পথে চলব, এ আর আশ্চর্য কি। দেহ-বিকৃতি থেকেই যে মন-বিকৃতি।

সে কথা থাক। অলকানন্দার কোল জোড়া হবে, অলকানন্দা সুখী হবে, আমার উত্তরাধিকারী আসবে, এই কল্পনাই হয়ত বিচিত্র সুখানুভূতিতে আমার মগজ ভরিয়ে তুলত—এমন একটা ব্যাখ্যাও তো হতে পারে?

তাই নিয়োগ-প্রথার কল্পনা প্রতিবারেই আনন্দ দিয়েছে আমাকে। উন্নাসিক ব্যক্তিরা হয়ত শিউরে উঠবেন। ছিঃ ছিঃ, এযে সামাজিক কদর্যতা।

কিন্তু আমি মানুষটাই যে কদর্য। বাইরে নয়। বাইরে আমি সুপুরুষ, মহান এবং উদারচেতা। কিন্তু আমার ভেতরে যে কদর্যতা মৌচাকের মত বাসা বেঁধে আছে। সংসারে হেন কদর্য কাজ নেই, যাতে আমি হাত পাকাই নি। সুতরাং, নিয়োগ-প্রথার কল্পনা আমাকে উল্লসিত করবে, এইটাই হয়ত স্বাভাবিক।

সব চাইতে আশ্চর্য কি জানেন? আমি কদর্য হতে পারি, কিন্তু অলকানন্দা নিশ্চয় নয়। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। অতএব তার মত ডানাকাটা রূপসীর ভেতরটাও দেবীজনোচিত হবে—এইটাই কি আপনারা ধরে নিয়েছেন।

আশ্চর্য সেইখানেই। অলকানন্দাকে নিয়োগ-প্রথার প্রস্তাব বেশীক্ষণ বুঝাতে হয়নি। যুক্তিতর্কের জাল বিছিয়ে বসেছিলাম ওর মস্তিষ্কধোলাই করব বলে। নিয়োগ-প্রথার দাওয়াই গুলে না খাওয়ালে সাড়া দেবে কেন মেয়েটা?

হায়। হায়। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, অলকানন্দা আমার চাইতেও স্মার্ট। প্রথমে হাঁ করে শুনছিল। তারপর চোখ কপালে তুলে মুখখানা সিঁদুরের মত লাল টকটকে করে ফেলল। তারপর ফিক করে হেসে ফেলে বললে—"যাঃ!"

আমি আবার সেই শিহরণটা অনুভর করলাম মেরুদণ্ডের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত। ওকে বুকের কাছে টেনে নিলাম। তুলতুলে গালদুটো টিপে দিলাম। কালো জামের মত কালো-কালো চোখ দুটোর পানে তাকিয়ে নিবিড়কণ্ঠে বললাম—"ঠাট্টা নয় অলকানন্দা। মহাভারতে যা আছে, তা কি খারাপ?"

বলে, আবার বোঝাতে শুরু করলাম কি ভাবে বিদুর পাণ্ডু এবং আরও অনেকে পরভৃত সন্তান। এই ভারতবর্ষের পুণ্য মাটিতে যুগ-যুগ ধরে চলে এসেছে নিয়োগ-প্রথা। বহু পুণ্যবতী সন্তানবতী হয়েছে এই প্রথায়। মোটেই ক্ষুণ্ণ হয়নি সতীত্বের আদর্শ। কেন হবে? পতির নির্দেশেই তো পরপুরুষের সঙ্গসুখ গ্রহণ করেছে। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা.....

ছলনা জিনিসটা নাকি মেয়েদের একচেটিয়া। সুতরাং অলকানন্দাও যৎসামান্য ছলনা করল বইকি। সতীত্বপনা না দেখালে স্বামীর মন রাখা যায় না যে। তা ছাড়া, এ প্রস্তাব অলকানন্দার কাছে মেঘ না চাইতেই জল পাওয়ার সামিল। ঐশ্বর্য, স্বামী কোনটাই হাত ছাড়া হচ্ছে না। কিন্তু হাতের মুঠোয় আপনা হতে এসে যাচ্ছে একটা বাড়তি সুখ।

দেহসুখ।

কাজেই রাজী হল অলকানন্দা। ঠিক হল দয়িত নির্বাচনের ভার অলকানন্দার। বল্লভ-বরণ করবে সে কেবল সন্তানবতী হওয়ার জন্যে—তারপর আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

সাধারণ গৃহস্থের কাছে এ-জাতীয় দাম্পত্যচুক্তি সত্যিই কল্পনাতীত। রক্ষণশীল পাঠক-পাঠিকা নিশ্চয় এই মুহূর্তে আমার মুখে নিষ্ঠাবন ত্যাগ করতে পারলে পরম উল্লসিত হতেন। কিন্তু আমি নিরুপায়।

তা ছাড়া অলকনন্দার কথাটা ভাবুন। আমার অতি-কদর্য প্রস্তাব সে ফেলতে পারেনি। সাদরে গ্রহণ করেছে। যৌবন-নিপীড়িত দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু দিয়ে ভোগ করেছে। ....তারপর!

তারপরের কথা পরে বলব।

আপাততঃ শুনুন অলকানন্দার কাহিনী। আমি তাকে গ্রীন-সিগন্যাল দেবার পর অলকানন্দা প্রজাপতির মতই উড়তে শিখল। তার ওড়ার বিবরণ মাঝে মাঝে কানেও এল। কিন্তু আমি কর্ণপাত করলাম না, বরং সেই গোপন শিহরণে রোমাঞ্চিত হলাম। রঙীন সে-সব কাহিনী দিয়ে এ কাহিনী ভরাতে চাই না। অলকানন্দা রূপসী, অলকানন্দার স্বামী ধনবান, অলকানন্দা সমাজের শীর্ষস্থানীয়া—সুতরাং অভাব ঘটল না মধুমক্ষিকা বাহিনীর। অলকানন্দা পরমানন্দে বিভোর হল।

এই গেল আমার আত্মকাহিনীর প্রথম পর্ব। এবার শুনুন দ্বিতীয়পর্ব।

অলকানন্দা যথারীতি পার্টিতে গিয়েছে। আমি সারাদিনের কাজকারবার সেরে বাড়ী ফিরেছি। রোজকার অভ্যেস মত সুরার পাত্র নিয়ে বসেছি। সারা পৃথিবী চষে আনা সেরা-সেরা মদিরা পাবেন আমার আলমারীতে। নেমন্তন্ন রইল। যে দিন খুশী আসতে পারেন।

খুব মন দিয়ে একটা নতুন ককটেল পাঞ্চ করছিলাম। পাঁচরকম সুরা মিশিয়ে, তাতে বরফখণ্ড ভাসিয়ে, বিটার আর লেমনজুসের ছিটে দিয়ে অপূর্ব এক গেলাস ককটেল বানালাম। এক চুমুক টেনে এত ভাল লাগল যে "আঃ" ধ্বনিটা পরম আমেজেই বেরিয়ে এল সরল কণ্ঠ দিয়ে।

ঠিক তখনি পেছন থেকে কে যেন বললে—"হয়েছে? এবার ফিরুন। আর কতক্ষণ দাঁড়াবো?"

মিথ্যে বলব না। আচমকা কণ্ঠস্বর আমাকে রীতিমত চমকে দিয়েছিল। কিন্তু কি জানেন, গুরুর দয়ায় আমার মন চমকালেও বাইরেটা কখনো চমকায় না। তাই ধীরস্বরে পেছন ফিরলাম।

ফিরে দেখলাম, একটা কিম্ভূতকিমাকার মানুষ দাঁড়িয়ে আমার পাঁচ হাত পেছনে। হাতে একটা রিভলভার।

লোকটাকে কিম্ভূতকিমাকার বললাম অন্য কারণে। আজকাল কি এক ফ্যাসান হয়েছে মোটা মোটা জুলপী রাখার। মানাক আর না মানাক, মুখ সরু হোক কি চেহারা লিকপিকে হোক—জুলপী রাখতেই হবে। জুলপীধারী ভাবে না জানি কি খোলতাই হয়েছে মুখশ্রী। আর আমি ভাবি, চিড়িয়াখানার বনমানুষ, না, সার্কাসের সঙ?

তা, সেদিন যা দেখলাম, তাকে জুলপী না বলে গালপাট্টা বলা উচিত। দু'গাল জুড়ে ইয়া মোটা দাড়ি। চিবুকে একটাও চুল নেই। গোঁফও নেই। চুলের বহর কেবল দুগালে। ফুলো ফুলো গাল। মাথার মাঝখানটা গড়ের মাঠের মত পরিষ্কার। কানের ওপর কয়েকগাছি চুলের সংখ্যা গুনে বলা যায়। সার্সির কাঁচে নাক চেপে ধরলে ডগাটা যেরকম বিচ্ছিরি থ্যাবড়া দেখায়, এর নাসিকাগ্রও তাই। চোখ দুটোতে ডাহা বোকামি মাখানো।

এহেন মানুষকে কিম্ভূতকিমাকার বলব না তো কাকে বলবো?

বোকা হোক, গাধা হোক, সঙ হোক, বিদঘুটে হোক—একটা বিষয়ে আনাড়ি নয় আগন্তুক। রিভলভার ধরার কায়দা দেখলেই মালুম হয়, জিনিসটা ও হাতে ভালই চলে। আগুন নিয়ে খেলাটা যেন জলভাত তাঁর কাছে।

তাই একটু ভাবিত হলাম বৈকি। যার চোখে ডাহা বোকামি মাখানো, চেহারাখানা গালফুলো গোবিন্দমার্কা, তার হাতে মানুষ-মারার যন্ত্র বিপজ্জনক নয় কি?

কিন্তু ঐ যে বললাম গুরুর দয়া। তাই ভাবনাটাকে চোখের ধারে কাছেও ঘেঁষতে দিলাম না। বরং একটু মোলায়েম হাসলাম। গেলাস দুলিয়ে ককটেল মেশাতে লাগলাম। ফলে, কাঁচের গেলাসে বরফ লাগায় টুং টাং বাজনা বাজতে লাগল। মিষ্টিচোখে এমন ভাবে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলাম নাড়ুগোপাল আগন্তুকের যেন কন্দর্পকান্তি উত্তমকুমারের আবির্ভাব ঘটেছে আমার সামনে।

আর একটা চুমুক দিলাম গেলাসে। না, মশাই না। হাত কাঁপেনি। কাঁপবে কেন? কুকাজে আমিও কি কমপোক্ত?

ধীরে সুস্থে বললাম—"কি ব্যাপার? খুন করা হবে নাকি আমাকে?"

গালপাট্টাধারী ফ্যাসফেসে গলায় বললে—"তবে না তো কি জামাই আদর করবো?"

"বেশ, বেশ," বলে, ফের চুমুক দিলাম তারিয়ে তারিয়ে। তারপর মিষ্টি মিষ্টি করে বললাম—"কেন মরবো, সেটা না জেনে মরাটা কি ঠিক হবে? কে পাঠিয়েছে?"

গালপাট্টার মুখে আর কোন কথা নেই। রিভলভারের নলচেটা অবশ্য আমার বুকের দিকেই ফেরানো। নলচের অন্ধকার গর্তের সঙ্গে কেন জানি না পাতালের সুড়ঙ্গর সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে হল। জগতে পাপপুণ্য বলে কোনো বস্তু যদি থাকে, পরকালের অস্তিত্ব যদি মেনে নিতে হয়। তাহলে পাতালের পথই তো আমার পথ। নরকের কুণ্ডই তো আমার শেষ পরিণতি। কীর্তির কাহিনী আজ শোনাতে বসেছি।

আবার বললাম—"তোমার নাম জানি না। ভাই মস্তান, বলেই ডাকা যাক। রাগ করলে নাকি? করলেই বা কি। করলেও গুলি করবে। না করলেও গুলি করবে। শোনো মস্তান, আমার শত্রুদের নাম আমি জানি। আমি পটল তুললে লাভ কার-কার, তাও জানা। তাই অনুমান করতে পারি, কার ভাড়া খাটছো তুমি। বলবো?"

গালপাট্টা নীরব।

"আমার বউয়ের," বললাম আমি। হাসিমুখেই বললাম। অবাক কাণ্ড তাই না? আরে মশাই, গালপাট্টা নিজেও তাজ্জব বনে গেল আমার হাসি দেখে, আমার ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলা দেখে। বেচারী জানবে কি করে যে বাঁদুরে বুদ্ধিতে জুড়ি নেই আমার?

তাই সেকেণ্ড কয়েক হাঁ করে তাকিয়ে রইল গালপাট্টা। তারপর ফুলো গালে টোল ফেলে ফ্যা-ফ্যা করে হেসে ফেলল। বলল—"ধরেছেন ঠিক। কেন জানেন?"

"কেন আবার। আমার টাকা।"

গালপাট্টার বোকা বোকা চোখেও এবার যেন একটা বিরাট কৌতুক দেখা গেল—"শুধু তাই?"

"আবার কি?"

"মশায়ের বয়সটা খেয়াল আছে?"

"তা আছে বইকি। এ বছরের বসন্তকালে বাহান্ন হবে।"

"বসন্ত!" বলে, এমন একটা নোংড়াচুমকুড়ি ছাড়ল গালপাট্টা যে এই প্রথমে একটু রাগ হল আমার। ছেড়ে বলল—"বউটার বয়স কত?"

"বাইশ।"

"আই-আই!" আবার সেই হলদে হাসি ইডিয়ট! "বাহান্নর সঙ্গে বাইশ। আর কি চান স্যার? শুধু—এই দোষেই তো নেড়িকুত্তা দিয়ে খাওয়ানো উচিত আপনাকে। বুড়ো বয়েসে মেয়ের বয়সী মেয়েকে নিয়ে শুতে লজ্জা করে না?"

মহাবাচাল খুনে তো। রিভলভারটা হাতে না থাকলে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াতাম শূয়ারকে। তাও তো আসল ব্যাপারটা জানে না হতভাগা। আমি ঢেঁড়া পুরুষ—একথা জানা থাকলে না জানি কি খিস্তিটাই শুনতে হত।

ককটেলটা মন্দ মেশেনি। আর এক চুমুক খেলাম। জিভ দিয়ে ঠোঁট মুছে নিয়ে বললাম—"মস্তান, কথাটা খাঁটি বলেছো। বছর খানেক পরে ডাইভোর্স করার প্ল্যান নিয়ে বিয়েটা

করেছিলাম। রফা একটা করতাম। মোটা টাকার রফা।"

গালপাট্টা বলল—"চেখে চেখে বেড়ানোর সখ আছে মনে হচ্ছে?"

"টাকা থাকলেই থাকে। আমার টাকা আছে, মেয়ে মানুষের সখ আছে। মদ খাওয়ার সখ আছে। কিন্তু মরবার সখ নেই।"

"সখ আপনার ডবকা বউটারও আছে। ফুর্তির সখ। দেখেন নি কেন অ্যাদ্দিন?"

আমি মিশমিশে রিভলভারের অন্ধকার ফুটোর দিকে চেয়ে বললাম—"মস্তান, জীবনে কটা খুন করেছো?"

"ডজন ডজন।"

"ফাইন। খুন করাটা কারো পেশা, কারো নেশা। তোমার কোনটা?"

"নেশা। ভীষণ আলো লাগে খুন করতে।"

সুরার নেশায় চোখে রঙ ধরলেও মন আমার হুঁশিয়ার। ঐ একটা কথার মধ্যেই গালপাট্টার চরিত্র জানা হয়ে গেল আমার। সেকেণ্ড কয়েক নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম ওর নির্বোধ কিন্তু অটল চাহনির পানে।

তারপর হেসে বললাম—"দু মিনিট তো হয়ে গেল হে। গুলি করো।"

"করব, করব। তাড়াহুড়ো করলে ভাল্লাগে না।"

"তাই বল। তিলে তিলে মারতে চাও। সেইটাই তোমার আসল আনন্দ, ঠিক কিনা?"

"ওরে আমার গণৎকার রে।"

"গণৎকার নয় হে। রতনে রতন চেনে। যাক, তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কি? না, আমি যতক্ষণ না ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তোমার পায়ে ধরছি, ততক্ষণ আমাকে জীইয়ে রাখবে।"

"তাতো বটেই, তবে তারও একটা সীমা আছে তো।"

"তা আর বলতে। লোহার নার্ভকে টলানো যায় না। বরং গুলি করা ভাল। যাক, এক গেলাস চলবে নাকি?"

"চলবে। তবে আমার সামনে ঢালুন গেলাস।"

"সাবাস মস্তান। হুঁশিয়ার খুনে তুমি ভাবছো বিষ মিশিয়ে দেব?"

"দিতেও তো পারেন।"

কথা বাড়ালাম না। আর এক গেলাস ককটেল পাঞ্চ করলাম ওর সামনেই। গালপাট্টা কড়া নজর রাখল আমার নড়াচড়ার ওপর। বেচাল দেখলেই ট্রিগার টিপতে দ্বিধা করবে না।

বরফ ভাসিয়ে এগিয়ে দিলাম গেলাস। হাত বাড়িয়ে গেলাস ধরল না মস্তান। বলল—"টেবিলে রাখুন। ঠিক আছে। চেয়ারে বসুন।"

আমি বসলাম। মস্তান এগিয়ে এল। গেলাস নিয়ে বসল ইজি চেয়ারে। এক চুমুকে না খাওয়া পর্যন্ত কোনো কথা বললাম না।

এক চুমুকেই মেজাজ শরীফ হবে জানতাম। এ জিনিস মস্তানের চোদ্দ পুরুষও খেয়েছে কিনা সন্দেহ।

তারপর বললাম—"অলকানন্দা এখন কোথায়?"

"কে?"
"অলকানন্দা। আমার বউ।"
"পার্টিতে। ডজন খানেক ছেলেবন্ধু নিয়ে হয়ত ঢলাঢলি করছে এই মুহূর্তে। দেখলেও ভালো লাগে। তা না আপনি....বুড়োহাবরা....।"
"তার মানে, আমি যখন গুলি খাব, অলকানন্দা তখন পার্টি নিয়ে মশগুল।"
"কষ্ট হচ্ছে?"
"মোটেই না। ভাবছি প্ল্যানটা ফাইন। ডজনখানেক ইয়ার সাফাই দেবে ওর হয়ে। পুলিশ অলকানন্দার ডগাও ছুঁতে পারবে না।"
"ঠিক ধরেছেন। বুদ্ধিটা আমার।"
গোবর গণেশের বুদ্ধি! মনে মনেই বললাম আমি। মুখে বললাম—"ব্রিলিয়াণ্ট প্ল্যান। পুলিশ আসবে। আমার ঝাঁঝরা লাশ দেখবে। দেখে কি বলবে? খুনে ডাকাতের কাণ্ড? তাই তো?"
"তা তো বটেই," গেলাসটা সামনের ককটেল টেবিলে রাখল মস্তান।
"আপনার হার্টটা ফুটো করবার পর গেলাসটা ধুয়ে রেখে দেব মদের আলমারীতে। আমার আঙ্গুলের ছাপ যেখানে লেগেছে, যাবার আগে সব মুছে দিয়ে যাব রুমাল দিয়ে। লেগেছে তো শুধু দরজার হাতলগুলোয় আর এই গেলাসে।"
"দামী দামী দু চারটে জিনিস সঙ্গে নেবে নিশ্চয়? নইলে পুলিশ বলবে কেন ডাকাত পড়েছিল?"
"ও সব ছ্যাঁচড়ামোর মধ্যে আমি নেই। কিছুই নেবো না আমি। পুলিশ ভাববে, ভয়ের চোটে পালিয়েছে ডাকাত। গুলি করেই এমন প্যানিক হয়ে ছিল যে জিনিস নেবার সময় পায়নি।"
দেওয়ালের ছবিটা দেখে নিল মস্তান।
"ন্যাংটা ছবি," ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিয়েই বলল।
"ফ্রান্সের নামকরা পেণ্টারের আঁকা ছবি। দাম কত জানো?"
গালপাট্টা নীরব।
"চল্লিশ হাজার টাকা," বললাম আমি।
শুনেই, গালপাট্টার নির্বোধ চাহনি চকিতের জন্যে ফের নিবদ্ধ হল অয়েল পেণ্টিংয়ের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে পিচ্ছিল চাহনি পিছলে ফিরে এল আমার ওপর।
বলল—"লোভ দেখাচ্ছেন? চল্লিশ হাজার টাকা চাট্টিখানি কথা নয়। তবে কি জানেন, আগে আমার জান, পরে টাকা। ছবি নিয়ে ফ্যাসাদে পড়ি আর কি। ও ছবি যেখানে নিয়ে যাবো, আপনার চিহ্নও সঙ্গে সঙ্গে যাবে। তারপর? ফাঁসি কাঠ? না, স্যার না।" একটু থামল গালপাট্টা। হাসল। টোল পড়ল ফুলো গালে—"বুঝেছি।"
"কি বুঝেছি।"
"ছবি দিয়ে প্রাণটা ফেরৎ চাইছেন?"
"ক্ষতি কি?"
গালপাট্টা সবেগে ঘাড় নাড়ল বাচ্চা ষণ্ডের মত—"দেখুন স্যার, খুন করাটা আমার

ব্যবসা। ব্যবসায় বেইমানি করলে আর কেউ কাজ দেবে?"

শূন্য গেলাসটা নামিয়ে রাখলাম ককটেল টেবিলে। ঠাণ্ডা গলায় বললাম "মস্তান, কি চাও তাহলে? ভয়ে কাঁপছি দেখলে খুশী হবে?"

"কাঁপতে আপনাকে হবেই। ঢের ঢের হেঁক্কর দেখেছি। শেষকালে তো কেঁদে কুল পায় না।"

"কাঁদলেই গুলি করবে বুঝি?" ঈষৎ শক্ত হল গালপাট্টার বোকা চাহনি—"কেন মিছে কেরদানি দেখাচ্ছেন? বুক তো টিপ টিপ করছে। এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন কলির ভীম আর কি।"

"বাঃ, বেশ গুছিয়ে বলো তো মস্তান। দেখে তো বোঝা যায় না এত কথা পেটে আছে। যাক, তুমি কি ভাবো তোমার হুমকি শুনেই ভ্যাঁ করে কাঁদবো?"

"ভ্যাঁ না করলেও চ্যা তো করবেন। মরার আগেই আধখানা প্রাণ বেরিয়ে আসবে। কত তালেবরকে কাৎ করলাম এইভাবে।"

"সর্বস্ব দিয়েও কেউ যদি প্রাণ ভিক্ষা চায়?"

"বৃথা।"

"মানুষ হিসেবেও তো মানুষকে দয়া করা যায়?"

"আমি অমানুষ। আমার ছেলেবেলায় আমাকে কেউ দয়া করেছিল? মানুষের মত কেউ বাঁচতে দিয়েছিল?"

"মস্তান, ছবিটা আর একবার দেখো। ছবির পেছনে কি আছে জানো?"

"বলুন না।" ঘাড় না ফিরিয়েই বলল মস্তান।

"দেওয়াল সিন্দুক।"

গালপাট্টা ঘাড় ফিরালো না।

"নগদ দেড়লাখ টাকার নোট পাবে সিন্দুকে।"

"দেড়লাখ!"

"হ্যাঁ, দেড়লাখ। সারা জীবনেও যা রোজগার করতে পারবে না।"

বলে, গেলাস হাতে নিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। গেলাম অয়েল পেন্টিংয়ের সামনে। গোপন বোতাম স্পর্শ করতেই কব্জার ওপর ঘুরে গেল অতবড় ছবিটা যেন দরজার পাল্লা।

দেওয়াল সিন্দুকের ঠিক মাঝখানে নম্বরী হাতল। পাক দিলাম গুনে গুনে। সিন্দুক খোলার কোড নম্বর আমি ছাড়া কেউ জানে না। অলকানন্দাও নয়।

খট করে আওয়াজ হল। সবুজ আলোটা জ্বলে উঠেছে। অর্থাৎ চিচিং ফাঁক। আলিবাবা আর চল্লিশ দস্যুর সেই রত্নগুহার দ্বার যেন উন্মোচিত।

হাতল ধরে টান দিলাম। নীচের খুপরি থেকে বার করলাম বড় খামটা। হাতের গেলাসটা রাখছিলাম সিন্দুকের ভেতরে। পাল্লা বন্ধ করে নম্বরী হাতল ঘুরিয়ে দিতেই পুট করে নিভে গেল সবুজ আলোটা। যার অর্থ, সিন্দুক বন্ধ হয়ে গেছে। কামান দাগলে যদি খোলে।

ফিরে দাঁড়ালাম। দেখি, পলকহীন চোখে আমার প্রতিটি মুভমেণ্ট লক্ষ্য করছে গালপাট্টা। তর্জনী চেপে বসেছে মিশমিশে হাতিয়ারের ট্রিগারে।

বিচলিত হলাম না। এগিয়ে এসে খামটা ফেলে দিলাম ওর সামনে।

কিছুক্ষণ যেন বোবা হয়ে রইল গালপাট্টা। তারপর ফ্যাসফেসে গলায় বললে—"কিনতে চান আমাকে?"

সিগারেট কেস তুলে নিয়ে একটা সিগারেট বাছলাম অনেকক্ষণ সময় নিয়ে। তারপর গম্ভীর গলায় বললাম—"না।"

"তবে টাকা আনলেন কেন?"

"একেবারেই উচ্ছন্নে যে যায়, তাকে টাকা দিয়েও কেনা যায় না।"

'টাকার খাম আনলেন কেন তাহলে?" কঠিন স্বল গালপাট্টার।

জবাব দিলাম না। লাইটার টিপে সিগারেট জ্বালালাম। একমুখ ধোঁয়া সিলিং লক্ষ্য করে ছাড়লাম। তারপর খামটা তুলে উপুড় করে ধরলাম ককটেল টেবিলের ওপর।

ভেতরে থেকে যা বেরুলো, তা নোটের তাড়া নয়—কাগজের তাড়া।

"বোগাস পেপার," ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট নাচিয়ে নাচিয়ে বললাম একই রকম গম্ভীর গলায়। সেই সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যেন একটা ধাক্কা খেল গালপাট্টা। নির্বোধ চাহনিতে এই প্রথম দেখলাম ইস্পাতের ছুরী।

"খানিকটা সময় নিলেন বুঝলাম," আরক্ত মুখ মস্তানের। "কেন?"

"তোমার গেলাসটা রেখে এলাম সিন্দুকের ভেতর। টাকা আনার অছিলা না করলে পারতাম না।"

"ওটা আপনার গেলাস—আমার নয়।"

আবার হাসলাম আমি—"নাহে, ওটা তোমারই গেলাস। পুলিশ এসে যখন দেখবে, ফাঁকা সিন্দুকে শুধু একটা খালি গেলাস, টনক নড়বেই। আঙুলের ছাপও নেবে। কারণ, খুনের তদন্তে মদের গেলাস থাকাটার মানে অনেক।"

চোখ ছোট করে তাকিয়ে রইল গালপাট্টা—"অসম্ভব। সমানে নজর রেখেছি আপনার ওপর। গেলাস সরাতেই পারবেন না।"

আবার হাসলাম আমি—"বার দুয়েক ছবিটার দিকে ঘাড় ফিরিয়েছিলে মনে আছে?"

"সে তো দু'এক সেকেণ্ডের জন্যে।"

"দু'এক সেকেণ্ডেই যথেষ্ট। গেলাস পাল্টাপাল্টি করতে কতক্ষণ লাগে?"

"অসম্ভব" দেখলাম, কপালে ঘামের আভাস দেখা দিয়েছে গালপাট্টার।

বললাম—"পুলিশ আসবে। গেলাসও পাবে। আঙুলের ছাপের ছবি উঠবে। তোমার ঠিকানাও মিলবে। তারপর? যথা সময়ে দুলবে ফাঁসির দড়িতে। পরকালে ফের দেখা হবে আমাদের। তখন না হয় শোনা যাবে ফাঁসিকাঠে দাঁড়ানোর যন্ত্রণা কাহিনী। এর চাইতে গুলি খেয়ে মরা ভাল, তাই না? ভাল কথা, ফাঁসিতে ঝোলার গল্প-টল্প এর আগে শুনেছো?"

মস্তানের তর্জনীর দিকে নজর গেল। আঙুল কাঁপছে। আঙুল চেপে বসেছে ট্রিগারের ওপর।

সিগারেটে আবার একটা জম্পেস টান দিলাম। বললাম—"তোমার শেষ অবস্থা দেখে শেয়াল কুকুরেও কাঁদবে হে। তোমার ধারণা নিশ্চয় অন্য রকম। ভেবেছো অনেক টাকা পাবে। পায়ের ওপর পা তুলে কাটাবে শেষ জীবন। সবাই তাই ভাবে। মরীচিকার পেছনে সবাই দৌড়োয়। তোমার কপালে যে কি দুর্গতি—"

গলায় এতটুকু ঝাঁঝ দেখালো না গালপাট্টা। সহজভাবে বলল—"সিন্দুক খুলুন। নইলে মরবেন।"

আমি আওয়াজ করেই হেসে উঠলাম—"মরবার সময়ে আর ঠাট্টা করো না, মস্তান। সিন্দুক খুললেও মরতে হবে, না খুললেও মরতে হবে। তাই না?"

আধ মিনিটটাক চেয়ে রইল গালপাট্টা। তারপর বলল—"কি করতে চান গেলাস নিয়ে?"

"আমি জানি, এখন তুমি আমাকে মারতে পারবে না। ছেড়ে দেবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে গেলাস সমেত হাজির হব প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিতে। গেলাস থেকে ফটো তুলে নেব তোমার আঙ্গুলের ছাপের। সেই ফটোর সঙ্গে একটা কাগজে লিখে রাখব আজকের ঘটনার বিবরণ। চেহারার বর্ণনা। আরও অনেক কিছু। আঙুলের ছাপ আর তোমার কীর্তি কাহিনী লেখা কাগজটা একটা খামে ভরে গালা দিয়ে মুখ এঁটে দেব। আমার অ্যাটর্নীকে বলে রাখব, যদি কখনো আমার শোচনীয় মৃত্যু ঘটে এবং মৃত্যুর কারণ অ্যাকসিডেন্ট বলেও মনে হয়, যেন খামটা পুলিশ দপ্তরে পৌঁছে দেওয়া হয়।"

একই ভাবে চেয়ে রইল গালপাট্টা। তারপর বুকভর্তি শ্বাস নিয়ে বললে—"দরকার কি অত হাঙ্গামার? আমি চলে যাচ্ছি। জীবনে আমার ছায়াও আর দেখবেন না।"

মাথা নেড়ে বললাম—"তা হয় না। আমার ভবিষ্যৎ আমাকেই দেখতে হবে তো। গায়ে যাতে আঁচড়টি না লাগে, তার জন্যেই এই প্ল্যান।"

কি যেন ভাবল গালপাট্টা। বলল—"সোজা পুলিশের কাছে যাচ্ছেন না কেন?"

"কারণ আছে বই কি।"

দুশ্চিন্তায় কালো হয়ে এল গালপাট্টার মুখ। চোখ নামাল হাতের রিভলভারের ওপর। আপন মনেই ঘাড় নাড়ল একবার। তারপর রিভলভার রেখে দিল প্যান্টের পকেটে। বলল—"আমি না হয় যাচ্ছি। কিন্তু আপনার বেবুশ্যে বউটা তো ছাড়বে না। আবার কাউকে টাকা খাইয়ে পাঠাবে আপনাকে খতম করার জন্যে।"

"তা তো পাঠাবেই।"

"মারবে অন্য লোক, আর ফাঁসিতে ঝুলবো আমি?"

"তাই তো হবে।"

গালপাট্টার মুখে আর কথা নেই।

"অবশ্য নাও হতে পারে," বললাম আমি। "ধরো যদি অলকানন্দা আর নতুন খুনে জোটাতে না পারে।"

"ভাড়াটে খুনের কি অভাব আছে কলকাতায়? ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। আর আপনার গোলগাপ্পা বউটা তো মুড়িমুড়কির মত টাকা ছড়ায়।"

"যদি আর ছড়াতে না পারে?"

'টাকা তো আপনার....ওঃ!" বলেই একদম চুপ মেরে গেল গালপাট্টা।

মিষ্টি মিষ্টি হাসলাম আমি—"মাথায় ঢুকেছে?"

গালপাট্টা জবাব দিল না। তবে ডুবন্ত মানুষ খড়কুটো দেখলেও যেন আকুল হয়—এর চোখেও দেখলাম সেই আলো—আশার আলো।

বললাম—"অলকানন্দা এখন কোথায়, তুমি জানো?"

"জানি। 'রেডনাইট' ক্লাবে। রাত এগারোটা পর্যন্ত ওখানেই থাকবে।"

"রাত এগারোটা? ফাইন। ভাল সময়। তার ওপর অমাবস্যার রাত। অন্ধকারে কাছের মানুষও দেখা যাবে না। 'রেডনাইট' ক্লাবের ঠিকানা জানো?"

"না।" গালপাট্টার চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল।

"সদর স্ট্রীটে," বাড়ীর নম্বরটা বললাম। "চার তলার ফ্ল্যাটে কুখ্যাত নাইট ক্লাব। তোমার চেনা উচিত ছিল।"

আধ মিনিট দুজনে তাকিয়ে রইলাম দুজনের পানে।

বললাম খুব মিষ্টি করে—"তোমার জান বাঁচানোর জন্যে আর একটা জান নিতে হবে। অলকানন্দা বেঁচে থাকলে তুমি মরবে।"

"এগারোটার সময়ে আপনাকে কোথায় পাবো, স্যার?" উঠে দাঁড়িয়ে বলল গালপাট্টা।

"আমার ক্লাবে। চার পাঁচ জন বন্ধুকে নিয়ে তাস পিটব। খবর যখন পৌছোবে, সবাই মিলেই শুনব।" একটু থেমে ফের বললাম—"কি খবর মস্তান?"

"আপনার বউ গুলি খেয়ে মরেছে।" নেকড়ের মত হেসে ফেলল গালপাট্টা। "একটা কথা জিজ্ঞেস করব, স্যার?"

"করো।"

"বউকে ভালবাসেন?"

ককটেল টেবিলে জেড পাথরের ভারী সুন্দর একটা নারী মূর্তি সাজানো ছিল। মূর্তিটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে বললাম—"অনেক দাম দিয়ে অনেক শখ করে কিনেছিলাম এটা। এখন শখ মিটে গেছে। আর ভাল লাগে না। ভাবছি ফেলে দেব। নতুন মূর্তি কিনব।"

বিদায় হল গালপাট্টা। হাতে অনেক সময়। ক্লাবে যাওয়ার আগে মদের গেলাসটা ডিটেকটিভ এজেন্সীতে জমা দিয়ে এলাম।

সিন্দুকে যে গেলাস রেখেছিলাম—সেটা নয়। সে গেলাসে আমার আঙুলের ছাপ ছাড়া আর কোনো ছাপ ছিল না।

যে গেলাসটা গালপাট্টা ককটেল টেবিলে রেখে বিদায় নিল—নিলাম সেই গেলাস। গেলাসের কাঁচে শুধু চোখেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল মস্তানের আঙুলের ছাপ। □

* 'রহস্য' পত্রিকায় প্রকাশিত।

নেবুচাডনেজারের শীলমোহর

"ইন্দ্রনাথ, শার্লক হোমস তো চুরুটের ছাই নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছে, তুমি বরং লেখ পায়ের ছাপ নিয়ে। আখেরে কাজ দেবে।" বললাম আমি।

ইন্দ্রনাথ গম্ভীর হয়ে বললে—"লিখব না এমন কোন কথা নেই। লিখলেই বুঝবে সময় আর এনার্জি ব্যয় করে গোয়েন্দা গল্প লেখার নামে ছাইভস্ম না লিখে এদিকে মন দিলে কাজের কাজ করতে।"

উত্তপ্ত স্বরে বললাম—"লিখলেই পারো। গোয়েন্দা গল্প যদি এতই অপাঠ্য হত, তাহলে—"

"গোয়েন্দা গল্প যে অপাঠ্য, তা আমি বলিনি। আমি শুধু বলছি, দুর্বল কলমে ভাল ভাল কেসগুলো সস্তার রোমাঞ্চ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। 'ডিটেকশন' একাধারে আর্ট এবং সায়ান্স। সে জন্যে দরকার শাণিত পর্যবেক্ষণ শক্তি। তা না হলে নামকরা আর্টিস্ট আর সায়াণ্টিস্টরা নামকরা ডিটেকটিভ হতে পারত। কিন্তু তোমাদের লেখায় অতি-উন্নত 'ডিটেকশনে'র বাষ্পটুকুও থাকে না, থাকে খানিকটা সস্তার চমক আর সাসপেন্স। পায়ের ছাপ নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে বলে আমাকে ঠাট্টা করছ, কারণ হাঁটতে হাঁটতে পায়ের ছাপের দিকে নজর রেখেছি। কিন্তু বন্ধু, ছাপগুলো তো তোমার সামনেও আছে। চোখ তোমারও আছে। পায়ের মালিকদের সম্বন্ধে কিছু বলো দেখি শুনি।"

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে শর্টকাট করতে গিয়ে ভিজে মাটির ওপর অগণিত পদচিহ্ন ঘাড় হেঁট করে দেখতে দেখতে যাচ্ছিল ইন্দ্রনাথ। তাই টিপ্পনী কাটতে গিয়ে সত্যি সত্যিই চটিয়ে দিলাম বন্ধুবরকে। জঙ্গলের পথে না এলেও চলত। কিন্তু স্টেশনের এক কুলিই পথটা বাতলে দিলে। আর শুরু হল ওর পদচিহ্ন পর্যবেক্ষণ। মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল ছোটখাট গর্তের সামনে। পথসঙ্গী যদি এভাবে পথ চলে, তাহলে বিরক্ত হওয়া স্বাভাবিক। ইন্দ্রনাথের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ ছিল না তাতে। তন্ময় হয়ে পদচিহ্ন দেখতে দেখতে যেন মনে মনে আঁকছিল পায়ের মালিকদের চেহারা আর চরিত্রের ছবি।

বিব্রত হয়ে বললাম—"খালি পা হলে বলা যেত। কিন্তু জুতো পরলে অসুবিধে আছে। যেমন এই ছাপটা। ঢেউতোলা রাবারের সোল। এর বেশি আর কিছু বলা সম্ভব নয়।"

"ভুল। জুতো পরলে বরং আরও তথ্য জানা যায়। এ জন্যে শুধু ভাবলে চলে না, চোখ দিয়ে খুঁটিয়ে দেখার ক্ষমতাকে ট্রেনিং দিয়ে ধারালো করতে হয়। এখানকার মাটি সামান্য ভিজে, ছাপগুলো মোমের ছাঁচের মতই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। ঢেউতোলা রাবার শোলের জুতো দামী জুতো। আঙুলের ডগা থেকে গোড়ালী পর্যন্ত সমস্ত ছাপটা সমানভাবে পড়েছে অর্থাৎ জুতোটার তলায় স্পঞ্জ লাগানো অ্যামবাসাডর সু। এ জুতো সাধারণ লোকে পরে না। সঙ্গীর সম্বন্ধে কিছু বলতে পারো?"

"সঙ্গী! পাশাপাশি দুজোড়া ছাপ রয়েছে বলেই কি একজন অপরজনের সঙ্গী?"

"পায়ের ছাপ তাই বলছে! প্রথম থেকেই যদি ছাপগুলো লক্ষ্য করতে, তাহলে বুঝতে কেন এ কথা বললাম। প্রথমেই ধরা যাক পদক্ষেপ। দুজনেই খুব লম্বা—সেটা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে জুতোর মাপ থেকে, কিন্তু লম্বা হওয়া সত্ত্বেও দুজনেই ছোট ছোট পা ফেলে হেঁটেছে। কেন?"

"কেন?" প্রতিধ্বনি করলাম আমি।

"যার পায়ে চামড়ার জুতো, তার ছোট-ছোট পা ফেলার একটা কারণ আছে। কারণটা বোঝা যাচ্ছে ছড়ি ফেলার ধরন দেখে। ছড়িটা ধরা হয়েছে আড়ষ্টভাবে—প্রতিবারই ছড়ির ওপর একটু ভরও দেওয়া হয়েছে—যেন পথ চলতে ছড়িটা বিলক্ষণভাবে সাহায্য করেছে। ছড়ির দাগ রয়েছে প্রতি দু'পা অন্তর। যখনই বাঁ পা মাটিতে পড়েছে, তখনই ছড়িও পড়েছে বাঁ পায়ের উল্টোদিকে। যার সোজা মানে এই যে, পায়ের মালিক বয়েসে প্রবীণ, কাহিল অথবা অক্ষম। কিন্তু রাবার-সোল জুতো যার পায়ে, সে সাধারণ ভাবেই হেঁটেছে—প্রতি চার পা অন্তর একবার মাটি ছুঁয়েছে ছড়ি। অস্বাভাবিক ছোট পদক্ষেপে হাঁটার কারণটা শারীরিক নয়, সঙ্গীর পায়ে পা মিলিয়ে চলতে হচ্ছে বলেই।

"তারপর দেখো, দুজোড়া পা সাধারণ পাশাপাশিই চলেছে, কেউ কারও পায়ের ছাপ মাড়িয়ে যায় নি। কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটেছে পথ যেখানে সরু। তখন দুজনকে আগেপিছে চলতে হয়েছে। এই রকম দুটো ক্ষেত্রে একবার দেখলাম রাবার সোলের ছাপ মাড়িয়ে গেছে চামড়ার সোল। আরেকবার দেখলাম, চামড়ার সোলের ওপর পড়ছে রাবার সোল। এই থেকেই পাকাপাকি সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে যে দুজনেই একসঙ্গে পথ চলেছে, মধ্যে মধ্যে আগেপিছে হলেও সঙ্গ ছাড়েনি।"

"খুবই সোজা," বললাম আমি। "তুমি যা বললে, তা হল থিওরীর ব্যাপার। পায়ের ছাপ আর তার মানে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কতকগুলো থিওরী আওড়ালে। কিন্তু এর মধ্যে পর্যবেক্ষণ বা চোখকে ট্রেনিং নেওয়ার প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে?"

তিক্তকণ্ঠে ইন্দ্রনাথ জবাব দিলে—"বুঝিয়ে দিলে সবই সোজা। আর চোখের ট্রেনিং না থাকলে এটুকুও যে জানা যায় না, তার প্রমাণ তো তুমি নিজেই। বেশ তো, দু-দুটো ছড়ির ছাপ তোমার সামনেই রয়েছে। ভালো করে দ্যাখো, দেখে বলো দেখি আশ্চর্য কিছু দেখতে পাচ্ছো কিনা।"

বললাম, "সবগুলোই তো একই রকম মনে হচ্ছে। রাবার-সোল লোকটার ছড়ি অবশ্য একটু বেশি লম্বা। আর চামড়ার-সোল লোকটার ছড়ির গর্ত একটু বেশী গভীর। কারণটা খুব সম্ভব ছড়িটা ছোট হওয়ার ফলেই চাপ বেশি পড়ছিল ছড়ির ওপর—তাই গর্তও হয়েছে গভীর।"

বিদ্রূপের হাসি হেসে ইন্দ্রনাথ বললে—"আসল পয়েন্টটাই 'মিস্' করে গেলে। চাক্ষুষ প্রমাণগুলো দেখবার ক্ষমতা তোমার নেই বলেই এই ব্যর্থতা। পরিষ্কার পয়েন্ট, বিশেষ কয়েকটা ক্ষেত্রে তা রীতিমত দরকারীও বটে।"

"বটে? শুনতে পারি পয়েন্টটা কি?"

"অবশ্যই পারো। তোমাকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্যেই আমার এত লেকচার দেওয়া। কিন্তু সিদ্ধান্তে তোমাকে নিজেকেই পৌঁছোতে হবে, আমি বলব না।"

"পয়েন্টটা বলবে তো?"

"বলছি। প্রথমেই দ্যাখো, ছোট ছড়ির ছাপগুলো ছড়িধারীর ডানদিকে পড়েছে। দ্বিতীয়, প্রতিটি ছাপই সামনের দিকে আর ডাইনের দিকে সব চাইতে কম গভীর।"

উবু হয়ে বসে আবার দেখলাম ছাপের সারি। ইন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছে।

বললাম—"কিন্তু তাতে কি প্রমাণিত হয়?"

আবার সেইরকম গা-জ্বালানো হাসি হেসে ইন্দ্রনাথ বললে—"চাক্ষুস প্রমাণ সামনেই আছে। সবজান্তা বন্ধু, চোখ দিয়ে তার চুলচেরা বিচার কর, তাহলেই পাবে উত্তর।"

"কিন্তু তোমার হেঁয়ালীটাই তো ধরতে পারলাম না," খেঁকিয়ে উঠে বলি আমি। ছাপগুলো একদিকে কম গভীর, তার কারণ ছড়ির ফেরুলটা সেইদিকেই বেশি ক্ষয়েছে। কিন্তু আবার বলছি, তাতে কি কিছু প্রমাণিত হয়? কেন ছড়ির মালিক ছড়ির ফেরুল একদিকে বেশি ক্ষইয়েছে, এটাই কি তোমার সিদ্ধান্ত?"

"শান্ত হও বন্ধু, শান্ত হও। এত অল্পে ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে গোয়েন্দা হওয়া যায় না। দার্শনিকের মত নির্বিকার থেকে দাগটার কম গভীরতা নিয়ে মাথা ঘামাও। পয়েন্টটা রীতিমত ইন্টারেস্টিং।"

"গোল্লায় যাক তোমার ছড়ির ছাপ। ছড়ি আমার নয়, ছড়ির মালিককেও আমি চিনি না। সুতরাং তা নিয়ে অত রিসার্চেরও দরকার নেই। আরে, ত্রিপুরারিবাবু যে!"

জঙ্গল যেখানে শেষ হয়েছে, সেইখানেই ফ্রেমে আঁটা ছবির মত দাঁড়িয়ে ছিলেন সলিসিটর ত্রিপুরারি আঢ্যি। আমাদের দেখেই হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এলেন।

"নমস্কার ইন্দ্রনাথবাবু! নমস্কার মৃগাঙ্কবাবু! আমি জানতাম সময় বাঁচাতে এ পথই ধরবেন আপনারা। তাই এগিয়ে নিতে এলাম।"

ইন্দ্রনাথ নমস্কার ফিরিয়ে দিয়ে বললে—"আপনার টেলিগ্রামে দেখলাম মৃত্যুটা সন্দেহজনক আত্মহত্যা বলে মনে হচ্ছে। তদন্তের সুযোগ আছে তো?"

"আছে কিনা বলতে পারব না। সে আপনারা এক্সপার্টরা বুঝবেন। নিহত ব্যক্তির পঞ্চাশ হাজার টাকার লাইফ ইন্সিওর‍্যান্স ছিল। মৃত্যুটা যদি আত্মহত্যা বলেই প্রমাণিত হয়ে যায়, তাহলে এসটেটের পঞ্চাশ হাজার টাকা লোকসান হয়ে যাচ্ছে। সেইজন্যেই ভাবছিলাম উপযুক্ত ফি দিয়ে এক্সপার্টকে দিয়ে যদি কিছু প্রমাণ করা যায় মৃত্যুটা নেহাতই দুর্ঘটনা, তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকা এসটেটে চলে আসে।" বলে ধূর্ত চোখ নাচিয়ে অর্থব্যঞ্জক হাসি হাসলেন ত্রিপুরারি আঢ্যি।

প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটা এড়িয়ে গেল ইন্দ্রনাথ। উৎকোচ-প্রস্তাবে কঠিন হয়ে উঠল চোয়ালের রেখা।

বললে নীরস স্বরে—"কেসটার আদ্যোপান্ত বলুন।"

"যেতে যেতেই বলছি। মৃত ব্যক্তির নাম প্রহ্লাদ চক্রবর্তী। আমার বন্ধু সলিসিটর কৃষ্ণদাস চক্রবর্তীর ভাই। আজ সকালে অফিসে গিয়ে খবর পেয়েই আমার কাছে দৌড়ে আসে কৃষ্ণদাস। ওর সঙ্গেই এসেছি এখানে। কৃষ্ণদাস বাড়ির মধ্যে অপেক্ষা করছে আপনাদের জন্যে।

"গত রাতে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে এক চক্কর বেড়াতে বেরিয়েছিল প্রহ্লাদ। গরমকালে খাওয়ার পর বেড়ানো ওর চিরকালের স্বভাব। চাকরবাকররা দেখেছে তাকে বেরিয়ে যেতে। তারপর আর কেউ তাকে জীবিত অবস্থায় দেখেনি। কখন যে সে ফিরে এসেছে, তা কেউ জানে না। সেটা অবশ্য স্বাভাবিক। কেননা, প্রহ্লাদের বৈঠকখানা, ছোট্ট কারখানা, পড়ার ঘর আর মিউজিয়াম বাড়ি থেকে আলাদা। লাগোয়া হওয়ার ফলে একটা দরজা খুললেই এবাড়ি ওবাড়ি এক হয়ে যায়। বৈঠকখানায় ঢোকার আলাদা দরজা আছে।

সাধারণত রাত্রে বেড়িয়ে ফিরে এই দরজা দিয়েই বাড়ির মধ্যে ঢুকে সিধে শুতে চলে যেত প্রহ্লাদ—চাকরবাকররা জানতেও পারত না।

"গত রাতেও তাই করেছে প্রহ্লাদ। কিন্তু আজ সকালে শোবার ঘরে গিয়ে ওর বিধবা পিসী দেখলে বিছানা নিভাঁজ, কেউ শোয় নি। প্রহ্লাদেরও পাত্তা নেই। এ বাড়ি থেকে বৈঠকখানায় যাওয়ার দরজা ঠেলে দেখা গেল ওদিক থেকে বন্ধ। অগত্যা চাকর নারাণকে ডাক দেয় পিসী। বাইরে গিয়ে দেখে সেদিককার দরজাও বন্ধ। হাঁকহাঁকি করেও যখন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন নারাণ দেখতে লাগল জানলা খোলা আছে কিনা। কিন্তু জানলাগুলোও বন্ধ। শেষকালে কারখানা ঘরে একটা বড় স্কাইলাইটের রড খুলে ফাঁক দিয়ে কোনমতে ভেতরে ঢোকে নারাণ। তারপর বৈঠকখানায় ঢুকে দেখে টেবিলের পাশে চেয়ারে বসে প্রহ্লাদ। মারা গেছে আগেই। টেবিলের ওপর একটা হুইস্কির বোতল, সোডার বোতল, একবাক্স চুরুট, ছাইদানীতে একটা আধপোড়া চুরুট আর একবাক্স পটাসিয়াম সায়ানাইট বড়ি।

"তৎক্ষণাৎ ডাক্তারকে খবর পাঠানো হয়। খবর যায় কৃষ্ণদাসের অফিসেও। নটা নাগাদ ডাক্তার এসে বললেন, সায়ানাইড পয়জনিং। তবে পোস্টমর্টেম না করলে খুঁটিনাটি বলা সম্ভব নয়। চাকরবাকররা ধরাধরি করে চেয়ার থেকে প্রহ্লাদকে নিয়ে শুইয়ে দিয়েছে সোফার ওপর। না দিলেই ভালো করত। কেন না, প্রহ্লাদ মরে কাঠের মত শক্ত হয়ে গেছে।"

"পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে?" জিজ্ঞেস করে ইন্দ্রনাথ।

"না। প্রহ্লাদ আত্মহত্যাই করেছে—সন্দেহজনক মৃত্যু নয়। তা সত্ত্বেও সবাই ভাবলাম আপনার মত একজন এক্সপার্টকে ডাকা ভাল—বিশেষ করে মৃত্যুটা যদি আকস্মিক হয়—"

"শুনে তাই মনে হচ্ছে। পরিষ্কার আত্মহত্যা। কৃষ্ণদাসবাবুর কাছে নিশ্চয় প্রহ্লাদ চক্রবর্তীর মনের অবস্থার খবর পাওয়া যাবে?"

"তা পাবেন। যা শুনলাম, সম্প্রতি বড় উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল প্রহ্লাদ। এসে গেছি।"

সামনেই পুরোনো আমলের সাদাসিদে একটা একতলা বাড়ি। বাগানের ফটক পেরিয়ে ভেতরে পা দিলাম আমরা। সদর দরজা খুলে গম্ভীরমুখে বেরিয়ে এলেন এক ভদ্রলোক। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। সাদা গোঁফ। সোনার চশমা। আলাপ হল। প্রহ্লাদ চক্রবর্তীর দাদা সলিসিটর কৃষ্ণদাস চক্রবর্তী।

বাড়ির মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে কৃষ্ণদাসবাবু বললেন—"প্রহ্লাদ যে আত্মহত্যা করবে ভাবাই যায় না। সেরকম ছেলে তো ও নয়। আমাদের বংশেও আত্মহত্যা কেউ কখনো করে নি। কিন্তু কেন যে ও—"

কথা বলতে বলতে হলঘরে প্রবেশ করলাম এবং এক প্রান্তের দরজা পেরিয়ে প্রহ্লাদ চক্রবর্তীর বৈঠকখানায় এসে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল এক ভয়ানক দৃশ্য। সোফার ওপর কিম্ভূতকিমাকার ভঙ্গিমায় শায়িত এক মৃতদেহ। কিম্ভূতকিমাকার এই কারণে যে মৃতদেহ শুয়ে রয়েছে চেয়ারে বসার ভঙ্গিতে—দুপা হাঁটু মুড়ে সে এক আশ্চর্য 'পোজে'। পরিধানের বুশসার্ট, ট্রাউজার্স, আর জুতো। দূর থেকেই জুতোর শুকতলা লক্ষ্য করে চমকে উঠলাম আমি।

সোলটা রাবার সোলের, ঢেউ তোলা! ঠিক যেমনটি একটু আগেই ভিজে মাটিতে দেখে

এসেছি।

টেবিলের ওপর পোড়া চুরুট সমেত ছাইদানী, হুইস্কির বোতল, সোডার বোতল, চুরুটের বাক্স আর পটাশিয়াম সায়ানাইডের প্যাকেট।

স্থির চোখে মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে ছিল ইন্দ্রনাথ। জুতোর শুকতলা দেখে আমিও উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম। দামী জুতো, তলায় 'ফোম রাবারের' স্তর লাগানো অ্যামবাসাডর মোকাসিন।

ত্রিপুরারিবাবু বললেন—"আপনার দেখুন। আমরা পাশের ঘরে আছি। দরকার পড়লে ডাক দেবেন।"

বলে, দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ভেতর বাড়িতে উধাও হলেন দুই প্রৌঢ় বন্ধু।

সঙ্গে সঙ্গে আমি চাপা গলায় বললাম—"ইন্দ্র, দেখেছো?"

"দেখেছি।" সোফার সামনে দাঁড়িয়ে জবাব দিল ইন্দ্রনাথ।

"অবিকল সেই জুতো। কে জানে হয়তো ইনিই কাল রাতে হেঁটেছিলেন জঙ্গলের রাস্তায়।"

"হ্যাঁ ইনিই। তাতে কোনো সন্দেহ নেই," বলে, বাঁ পায়ের শুকতলার খাঁজে গাঁথা একটা কাঁটা পেরেক দেখিয়ে বলল, "তখনি লক্ষ্য করেছিলাম পেরেকের ছাপ। কিন্তু বলিনি পাছে আবার তর্ক আরম্ভ করে দাও বলে।"

"কিন্তু পায়ের ছাপটা যদি এই ভদ্রলোকেরই হয়, তাহলে তো সঙ্গের সেই আশ্চর্য ছড়িওলা লোকটিকেও আমাদের দরকার। ভাবছি, কে হতে পারে লোকটা। পাড়ার কেউ নয় তো?"

"তা হতে পারে। ছাপগুলোও খুব টাটকা, খুব সম্ভব কাল রাতের। আর তা যদি হয় তাহলে ভদ্রলোককে আমাদের প্রয়োজন। কেননা, প্রহ্লাদ চক্রবর্তীকে সবশেষে জীবিত অবস্থায় তিনিই দেখেছেন। অবশ্য তা নির্ভর করছে কোন্ সময়ে মাটির ওপর পায়ের ছাপ পড়েছে, তার ওপর।"

বলে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লাশটা পরীক্ষা করতে আরম্ভ করল ইন্দ্রনাথ। মৃতদেহ পরীক্ষার বিশেষ কয়েকটা পদ্ধতি আছে আমার এক ডাক্তার বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম। ইন্দ্রনাথ দেখলাম বিদ্যেটায় বেশ ওস্তাদ। তীক্ষ্ণ চোখে দেখল মুখের ভেতর আর তালুর ওপর। তারপর ঘরটা মোটামুটি পরীক্ষা করে নিয়ে গেল পাশের ছোট্ট ওয়ার্কশপে। ল্যাবোরেটরী বেসিনের কোণ-টোণগুলোয় অনেকক্ষণ ধরে উঁকিঝুঁকি দিল। তাক থেকে নামিয়ে আনল একটা খালি গেলাস। আলোর সামনে ধরে উল্টেপাল্টে দেখে আবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করল তাকের ওপর। ভিজে গেলাস উলটো করে শুকোতে দেওয়া হয়েছিল, তাই একটা আবছা জলের রেখা গোল হয়ে ফুটে রয়েছে তাকের ওপর। ফিরে এল বৈঠকখানায়। বাইরের দরজার ছিটকিনিটা দেখল নেড়ে।

তারপর বলল নিরাশ মুখে—"নাঃ, কিচ্ছু নেই। পটাসিয়াম সায়ানাইডের বড়িগুলো দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, মৃত্যুটা হঠাৎ নয়, দুর্ঘটনা নয়—প্ল্যানমাফিক। চুরুটের বাক্সটা দেখছি আনকোরা, দুটো চুরুট নেই। একটা আধপোড়া অবস্থায় অ্যাসট্রেতে পড়ে—কিন্তু ছাই যা জমেছে তা একটা চুরুটের পক্ষে অনেক বেশি। চল, কৃষ্ণদাসবাবুকে দু-চারটে প্রশ্ন করা যাক।"

হলঘরে প্রবেশ করতেই সাগ্রহে চোখ তুললেন দুই প্রৌঢ়।

ত্রিপুরারিবাবু জিজ্ঞেস করলেন—"কিছু পাওয়া গেল?"

"আপাতত না।" জবাব দিল ইন্দ্রনাথ। "আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। আচ্ছা কৃষ্ণদাসবাবু, বাইরের দরজাটায় দেখলাম মাঝে খিল আর তলায় ছিটকিনি। প্রহ্লাদবাবু কোনটা বন্ধ করেছিলেন?"

"ছিটকিনিটা। খিল খোলা ছিল।"

"ও। ত্রিপুরারিবাবুর মুখে শুনলাম, সম্প্রতি একটু উদ্বিগ্ন ছিলেন আপনার ভাই। কারণটা জানেন?"

"তেমন কিছুই নয়। ওর চাইতেও অনেক বড় উদ্বেগের মধ্যে ওর দিন গেছে। প্রহ্লাদ শক্ত নার্ভের ছেলে, আত্মহত্যার মত দুর্বলতা ওর ছিল না। যাই হোক, আমি যা শুনেছি, বলছি।

"কিছুদিন আগে ভূপর্যটক নীলমাধব রাউত মেসোপটেমিয়া থেকে ফিরে ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের কিউরিও দোকানী জন মার্টিনকে একটা ছোট্ট সোনার সিলিণ্ডার শীলমোহর বিক্রী করেন। শীলমোহরটা নাকি নীলমাধববাবু বাগদাদের মাইলখানেকের মধ্যেই কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। কি ভাবে পেয়েছিলেন তা জানি না। কিন্তু সিলিণ্ডার সমেত উনি কলকাতায় ফিরে এসেই ছোটেন মার্টিনের কাছে কিছু টাকার আশায়। জন মার্টিন আটশো টাকা দিয়ে কিনে নেয় শীলমোহরটা।

"নীলমাধববাবু জানতেন সিলিণ্ডারটা সোনার, তার বেশি কিছু জানতেন না। জন মার্টিনও বিশেষ কিছু জানত না। যদিও পুরোনো জিনিস কেনাবেচাই তার ব্যবসা, কিন্তু এক্সপার্ট নয়। তবে জন মার্টিনের একটা মহৎ গুণ আছে—নকল করার গুণ। পুরোনো জিনিসকে ঘষে-মেজে এমন নিখুঁত করে তোলে যে মাথা ঘুরে যায় কিউরিওলোভীদের। কাজটা অবশ্য বেআইনী নয়। জন মার্টিন আগে জুয়েলারের দোকানে কাজ করত। ঘড়ির কাজও মোটামুটি জানে। হাতের কাজে জুড়ি নেই তার। তাই ধরেছে এই লাভজনক ব্যবসা। ভাঙাচোরা পুরোনো দুষ্প্রাপ্য বস্তু জোগাড় করে জোড়াতালা দিয়ে ঠিক আগের মতই করে দ্যায়—তারপর হাঁকে কড়া দাম। এর মধ্যে জোচ্চুরি কিছু নেই। সুতরাং জন মার্টিনকে জালিয়াত বলাটা ঠিক হবে না। কিন্তু কিউরিও সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নয় জন মার্টিন। তাই নীলমাধব রাউতের কাছে পাওয়া সোনার সিলিণ্ডারের মাথামুণ্ডু কিছু বোঝেনি। শুধু বুঝেছে জিনিসটা অত্যন্ত প্রাচীন আর নকল নয়। অতএব সোনার যা দাম, তার ডবল দাম দিয়ে কিনে নিয়েছে।

"দিন পনেরো আগে প্রহ্লাদ গেছিল জন মার্টিনের দোকানে কি একটা মেরামতের কাজ নিয়ে। মার্টিন জানত আমার ভায়াটির ব্যাবিলনের দুষ্প্রাপ্য জিনিসপত্র সংগ্রহের বাতিক আছে। এ ব্যাপারে প্রহ্লাদ সত্যিই জিনিয়াস, ভাই বলে বলছি না। তাই শীলমোহরটা ওকে দেখায় মার্টিন। দেখেই প্রহ্লাদ বোঝে, জিনিসটা আদৎ—নকল নয়। শুধু তাই নয়, রীতিমত প্রাচীন এবং ইন্টারেস্টিং কিউরিও। তাই আর না ভেবেই, এমন কি চোঙাটা আসলে কি, তা খুঁটিয়ে না দেখেই বারোশো টাকার চেক দিয়ে বাড়িতে নিয়ে যায়। প্রহ্লাদ জানত, কিউরিও হিসেবে সোনার সিলিণ্ডারটা সত্যিই মূল্যবান এবং বারোশো টাকা অনায়াসেই দেওয়া যায়। বাড়ি এসে মোমের ওপর সিলিণ্ডারটা গড়িয়ে ছাপ নিয়ে পরীক্ষা করতেই চক্ষুস্থির হয়ে গেল ভায়ার। চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার। মোমের ছাঁচে ফুটে উঠেছে খোঁচা খোঁচা উঁচু উঁচু কতকগুলো

হরফ....তুরাণী হরফ— যেমনটি প্রাচীন ব্যাবিলনে আর পারস্যে দেখা যেত। নিদারুণ উত্তেজিত হয়ে তৎক্ষণাৎ লিপিটার পাঠোদ্ধার করে ফেলে প্রহ্লাদ। আর তখনই বোঝা গেল এ শীলমোহর যে-সে লোকের নয়—স্বয়ং নেবুচাডনেজারের।

চোখের সামনে সেই সুপ্রাচীন শীলমোহর দেখেও নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেনি প্রহ্লাদ। এ যে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে পড়া! সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ালো ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে। ব্যাবিলোনিয়ান এক্সপার্ট চমকে উঠল শীলমোহর দেখে। কিনতে চাইল মিউজিয়ামের জন্যে। কিন্তু এমন দুষ্প্রাপ্য মহামূল্যবান বস্তু হাতছাড়া করার পাত্র নয় প্রহ্লাদ। তবে এক্সপার্টের অনুরোধে শীলমোহরটার ওজন, মাপ আর কাদামাটির ওপর একটা গড়ানে ছাপ রেখে দিলে মিউজিয়ামে দর্শনার্থীদের জন্যে।

"এখন হয়েছে কি, শীলমোহরটা হাতছাড়া করার আগে নীলমাধব রাউত নিজেও কাদামাটির ওপর কয়েকটা গড়ানে ছাপ তুলে রেখেছিলেন। সেইগুলোই জন মার্টিনের কাছে আবার নিয়ে আসতেই মার্টিন সাহেব কয়েক টাকা দিয়ে সবগুলো কিনে কিউরিও হিসাবে সাজিয়ে রাখল শো-কেসে।

"একজন আমেরিকান অ্যাসিরিওলজিস্ট শো-কেসের ছাঁচগুলো দেখেই ঢুকে পড়ে দোকানে। বিনাবাক্যব্যয়ে কিনে নেয় কয়েকটা ছাঁচ। তারপর জন মার্টিনকে জেরা করতে থাকে কোত্থেকে এসেছে কিউরিওগুলো। মার্টিন অতশত না ভেবে নাম ঠিকানা দেয় নীলমাধব রাউতের। শীলটা সম্বন্ধে অবশ্য তখনো কিছু বলেনি। কেননা শীলমোহরের সঙ্গে মাটির ছাঁচের যে সম্পর্ক আছে, তা-ই তো জানত না মার্টিন। নীলমাধববাবু ধাপ্পা দিয়েছিলেন, কাদামাটির ছাঁচগুলোও নাকি খাস মেসোপটেমিয়া থেকে আমদানী। আমেরিকান এক্সপার্টের পাক্কা চোখে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়েছিল, মাটির ছাঁচটা সদ্য তৈরী। আর আসল শীলমোহরটাও নিশ্চয় এখনো নাগালের বাইরে যায় নি।

"তাই নীলমাধব রাউতের সঙ্গে দেখা করে আবার পেট থেকে কথা বার করবার চেষ্টা করতে থাকে অ্যাসিরিয়ান এক্সপার্ট। তখনই সন্দেহ হয় নীলমাধবের। শীলমোহরটা যে তার কাছেই ছিল, তা স্বীকার করেন নীলমাধব। কিন্তু এখন তা কোথায় আছে, তা কিছুতেই বলতে রাজী হলেন না এক্সপার্ট। অদ্ভুত চেহারার সোনার চোঙাটা নেবুচাডনেজারের শীলমোহর আর তার দাম দেড় লাখ থেকে দু লাখের মধ্যে শুনে মাথা ঘুরে গেল রাউতমশায়ের। সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকান এক্সপার্টকে নিয়ে দৌড়লেন জন মার্টিনের দোকানে।

"এবার কিন্তু মার্টিন সাহেবের মনেও সন্দেহ দেখা দিল। কিছুতেই বলতে চাইল না কার কাছে শীলটা। উপরন্তু, কাদামাটির ছাঁচটা যে আসলে সোনার শীলমোহর থেকেই, এ সন্দেহ হওয়ায় একটা ছাঁচ নিয়ে দৌড়োলো ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে। যেতেই ফাঁস হয়ে গেল সব কিছু। ব্যাপার আরো ঘোরালো হয়ে দাঁড়ালো আমেরিকান অ্যাসিরিওলজিস্ট প্রফেসর কিটম্যানের পেট আলগা হওয়ায়। হোটেলে ফিরে বন্ধুবান্ধবের কাছে নেবুচাডনেজারের সোনার শীলমোহরের গল্প করায় সাড়া পড়ে গেল কিউরিও-পাগলদের মধ্যে। দলে দলে আমেরিকান গোছা গোছা নোট নিয়ে রোজ হানা দিতে লাগল জন মার্টিনের দোকানে—দাম নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই—শীলমোহর চাই-ই চাই। কিন্তু জন মার্টিনের পেট থেকে যখন কিছুই বার করা গেল না, তখন ছুটল ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে। সেখানে যেতেই তারা বললে, হ্যাঁ

শীলমোহরটা আছে আমার ভাই প্রহ্লাদ চক্রবর্তীর কাছে। ঠিকানাও দিলে। কিন্তু প্রহ্লাদের কলকাতার ঠিকানা বলতে টেম্পল চেম্বার্সে আমারই অফিসের ঠিকানা। ফলে, শুরু হল পত্রাঘাতের পর পত্রাঘাত। সমানে চিঠি মারফৎ অনুনয় বিনয় পৌঁছতে লাগল জন মার্টিন আর নীলমাধব রাউতের কাছেও।

"পাগল হতে বসলেন নীলমাধব রাউত। তিনি হামলা করতে লাগলেন জন মার্টিনের ওপর। মার্টিন সাহেব নাকি তাঁকে ঠকিয়েছে। হয় সে শীলমোহরটা ফেরৎ দিক, আর নইলে উপযুক্ত দাম দিক। জন মার্টিনের অবস্থাও তাই। সে-ও সমানে তর্জন গর্জন শুরু করে দিলে আমার ভায়ার ওপর। আর কোটিপতি কিউরিও-পাগলরা লাখ লাখ টাকা নগদে দেওয়ার লোভ দেখাতে লাগল দিনের পর দিন। বেচারা প্রহ্লাদের মনের অবস্থা তখন কহতব্য নয়। একদিক দিয়ে ওর সহানুভূতি ছিল নীলমাধব রাউতের ওপর। আপনারা তো জানেন, ভদ্রলোক কি পরিশ্রম করে সারা পৃথিবী ঘুরেছেন। যেখানে গেছেন, বাংলার আর ভারতের নামগান করে পাথেয় সংগ্রহ করেছেন। জন মার্টিনের সম্বন্ধে ওর কোন মাথা ব্যথাই ছিল না। মার্টিন যদি তার ব্যবসা না বোঝে তো কার কি। কোন্ জিনিসের কত দাম, তা মার্টিনের জানা উচিত ছিল। সব চাইতে জ্বালাতন আরম্ভ করল আমেরিকানরা। অবর্ণনীয় সেই উৎপাত। উৎপাতটা বসতবাড়ি পর্যন্ত পৌঁছোতো যদি না গোড়া থেকেই ঠিকানাটা গোপন করে যেত প্রহ্লাদ।

"শেষ পর্যন্ত নেবুচাডনেজারের শীলমোহর নিয়ে যে কি করত প্রহ্লাদ, তা আমি জানতাম না। তবে একদিনের জন্যে আমার প্রাইভেট অফিসটা ধার নেয় ও। সারাদিন ধরে ইন্টারভিউ নেয় নীলমাধববাবু, জন মার্টিন, প্রফেসর কিটম্যান আর অন্যান্য কিউরিও প্রেমিকদের। ইন্টারভিউ হয়েছে তিন দিন আগে। সারাটা দিন মশাই জালিয়ে মেরেছে লোকগুলো। যত্তোসব বদ্ধ উন্মাদের দল। একজন তো যাবার সময় নিজের ছড়ির বদলে আমার ছড়ি নিয়েও উধাও হল।"

"তাই নাকি? বেড়াবার ছড়ি?"

"হ্যাঁ। বড় শখের ছড়ি। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া।"

"তার বদলে কি ছড়ি রেখে গেছে বলুন তো?"

"দেখলে কোনো তফাৎ বুঝবেন না। হুবহু একই রকম। ভুলটা হয়েছে যদিও সেই জন্যেই। হাতে নিয়েই আমার কিরকম সন্দেহ হল। তারপর হাঁটতে গিয়েই বুঝলাম এ ছড়ি সে ছড়ি নয়।"

"অস্বাভাবিক ছড়ি বলুন?"

"এক রকম তাই।"

"লম্বায় খাটো বুঝি?"

"না না, তা নয়। তফাৎটা ঠিক বলে বোঝাতে পারব না। আমি আবার ল্যাংড়া মানুষ তো। বাঁহাতে ছড়ি নিয়ে না হাঁটলে ঠিক মৌজ আসে না, হয়তো সেইজন্যেই....সে যাক মশাই, আমার পুরোনো ছড়ি ফিরে পেলেই খুশি হই আমি। আপনি একটু বসুন, ছড়িটা দেখাচ্ছি।"

ভেতরবাড়ি গেলেন কৃষ্ণদাসবাবু। ফিরে এলেন অনতিকাল পরেই। হাতে একটা সেকেলে

ফ্যাশনের মালাক্কা বেতের ছড়ি। হাতলটা হাতীর দাঁতে সুন্দরভাবে বাঁধাই। বহু ব্যবহারে বিরঙ হলেও তাক লেগে যায় কারুকাজের সূক্ষ্মতা দেখে। হাতীর দাঁত আর মালাক্কা বেতের জোড়মুখ চওড়া রূপোর পটি দিয়ে বেড় দেওয়া।

দুই চোখে অপরিসীম আগ্রহ নিয়ে কৃষ্ণদাসবাবুর হাত থেকে ছড়িটা তুলে নিল ইন্দ্রনাথ এবং দুহাতে ধরে চোখের একদম কাছাকাছি এনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমনভাবে দেখতে লাগল যে অবাক হয়ে গেলাম আমি। একটা ছড়ি বই তো নয়, তা সে যত সুন্দরই হোক না কেন, কিন্তু খুনের সঙ্গে যার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই তা নিয়ে অযথা মাথাব্যথা কেন ভেবে আশ্চর্য হলাম। ইন্দ্রনাথ কিন্তু একাগ্রমনে তীক্ষ্ণ চোখে একে একে দেখতে লাগল হাতীর দাঁতের হাতল, রূপোর পটি আর পেতলের ফেরুলটা। বিশেষ করে ফেরুলটা নিয়েই ও এত বেশী তন্ময় হয়ে রইল যেন জিনিসটা অতি দুষ্প্রাপ্য অতি দুর্লভ কোনো চমকপ্রদ বস্তু।

বিচিত্র হেসে ত্রিপুরারিবাবু বললেন—"ওহে কৃষ্ণদাস, ইন্দ্রনাথবাবুকে ভার দাও, তোমার ছড়ি নির্ঘাত ফেরৎ পাবে।"

ছড়িটা ফিরিয়ে দিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে—"তা পাবেন। সেদিন ইন্টারভিউতে কারা এসেছিলেন, তার একটা লিস্ট দিলেই হবে।"

"লিস্ট আমার অফিসেই আছে, দেওয়া যাবে'খন। কিন্তু যা বলছিলাম। সেদিন শীলটা নিয়ে ওদের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছে, তা জানি না। আদৌ প্রহ্লাদ বিক্রী করবে কিনা, তাও আমাকে বলেনি। তবে কতকগুলো নাম ঠিকানা ইত্যাদি নাকি লিখে রেখেছিল। কাগজগুলো খুঁজে বার করা দরকার। কেননা, অভিশপ্ত শীলমোহরটা বিদেয় না করা পর্যন্ত শান্তি নেই আমার।"

"শীলটা কোথায়?" জানতে চাইল ইন্দ্রনাথ।

"কেন, যেখানে থাকার কথা সেখানেই, মানে আয়রন সেফে। কিন্তু আর ওখানে রাখা চলবে না। ব্যাঙ্কে সরাতে হবে।"

"সেফে আছে তো?"

"না থাকার কোন কারণ নেই" বলেই সহসা উঠে দাঁড়ালেন কৃষ্ণদাসবাবু। "এখনো পর্যন্ত অবশ্য আমি খুলে দেখিনি। দেখাই যাক না আছে কিনা।"

বৈঠকখানা ঘরের দিকে পা বাড়ালেন কৃষ্ণদাসবাবু। আমরাও পিছু পিছু এলাম। চৌকাঠেই থমকে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। আড়ষ্ট লাশটার দিকে তাকিয়ে আমতা আমতা করে বললেন—"চাবীটা রয়েছে কিন্তু ওর পকেটে।" তারপর বেশ অনিচ্ছাসত্ত্বেও পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালেন সোফার সামনে। পকেট-টকেট হাতড়ে অনেকক্ষণ পরে বার করলেন একগোছা চাবী।

"পেয়েছি। কিন্তু সিন্দুকের চাবি....খুব সম্ভব এইটা," বলে একটা চাবী আলাদা করে গিয়ে দাঁড়ালেন লোহার সিন্দুকের সামনে। চাবী ঢুকিয়ে ঘোরাতেই কড়াৎ করে খুলে গেল ভারী ডালাটা।

"বাঁচা গেল! আছে শীলটা। আপনার কথায় বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল ইন্দ্রনাথবাবু। প্যাকেটটা খোলার দরকার আছে কি?" স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন কৃষ্ণদাসবাবু। ইন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিলেন ছোট্ট একটা পুলিন্দা। ওপরে ইংরাজীতে লেখা 'নেবুচাডনেজারের শীলমোহর।'

মৃদু হেসে ইন্দ্রনাথ বললে—"একেবারেই নিশ্চিন্ত হওয়াই ভাল।"

"তা মন্দ বলেন নি।" বলে সুতো কেটে গালামোহর ভেঙে পুলিন্দা খুলে ফেললেন কৃষ্ণদাসবাবু।

ভেতর থেকে বেরুলো একটা ছোট্ট কার্ডবোর্ডের বাক্স। ডালা খুলে হাতের তেলোয় বাড়িয়ে দিলেন এতটুকু একটা সিলিণ্ডার—ফিনফিনে সেলোফেন পেপারে মোড়া।

মোড়ক খুলে বস্তুটা তুলে ধরলেন কৃষ্ণদাসবাবু। সওয়া ইঞ্চি লম্বা একটা সোনার সিলিণ্ডার। ব্যাস আধ ইঞ্চির মত। একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটা লম্বালম্বি ছিদ্র।

সিলিণ্ডারে আগাগোড়া ছোট্ট অথচ অতি সূক্ষ্ম কারুকাজ। আপাতদৃষ্টিতে তা অর্থহীন। কিন্তু বিশেষজ্ঞের চোখে এরই মধ্যে ধরা পড়েছে সারি সারি হরফে সাজানো এক সাংকেতিক লিপি—যুগযুগান্ত পূর্বে যে লিপিকারের মৃত্যু হয়েছে, ধরণীর বুক থেকে মুছে গেছে যার রাজ্যপাট।

কার্ডবোর্ডের বাক্স থেকে বেরুলো ভাঁজ করা আর একটা ছোট্ট কাগজ। ভাঁজ খুলে কৃষ্ণদাসবাবু বললেন—"মাপজোক ওজনগুলো এতেই লিখে রেখেছে প্রহ্লাদ। থাক, কাজে লাগবে।"

চঞ্চল তীক্ষ্ণ চোখে শীলমোহরটার দিকে তাকিয়ে ছিল ইন্দ্রনাথ। এখন সন্তর্পণে দুই আঙুল দিয়ে ধরে সিলিণ্ডারটা আনল চোখের ইঞ্চি কয়েক দূরে। ধীরে ধীরে দুই চোখে ফুটে উঠল বিচিত্র বিস্ময়। আমিও যেন আবিষ্ট হয়ে পড়ছিলাম সোনার চোঙার সূক্ষ্ম লিপি দেখে। কত ছোট অথচ কত অর্থবহ। একবার দেখলেই মনের মধ্যে গভীর দাগ কেটে যায়। হাজার হাজার বছর আগে সুদূর সেই পৌরাণিক যুগে মহাপরাক্রমশালী এক নৃপতির হাতে শোভা পেয়েছে এই শীল, হয়তো তিনি সর্বক্ষণ অঙ্গে ধারণও করেছেন। কত সহস্র হতভাগ্যের জীবনদীপ নিভে গেছে এই শীলাঙ্কিত আদেশের বলে, কত সহস্রের ভাগ্যের চাকা সুদিনের মুখ দেখেছে এরই নির্দেশে।

আমি যখন আবেগবিহ্বল, ইন্দ্রনাথ তখন বৈজ্ঞানিক তন্ময়তায় বিভোর। চুলচেরা বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে শীলটির প্রতিটি বৈশিষ্ট্য। তাতেও সন্তুষ্ট হল না। নিত্যসঙ্গী 'রিসার্চ কেস' থেকে বেরুলো ম্যাগনিফাইং গ্লাস। প্রান্তদুটো অনেকক্ষণ দেখার পর কেন্দ্রের ছিদ্রের মধ্যে দিয়েও চোখ চালাল।

অবশেষে কৃষ্ণদাসবাবুর হাতে ধরা কাগজের টুকরোটায় চোখ বুলিয়ে বললে—"দেখছি একটা ডায়ামিটারেরই মাপ রয়েছে, খুব সম্ভব এক্সপার্ট ভদ্রলোক ভেবেছিলেন শীলটা অরিজিনাল, তাই দুটো মাপ নেননি। কিন্তু আমি তো তা দেখছি না। এর ডায়ামিটার এক এক জায়গায় এক এক রকম। চোঙা যেরকম পরিষ্কার গোলাকার হওয়া উচিত, এটা সেরকম নয়। দু পাশও সমান্তরাল নয়।"

বলতে বলতে রিসার্চ কেসের আরেক পকেট থেকে ইন্দ্রনাথ বার করল 'ক্যালিপার' মাপকাঠি। সিলিণ্ডারের এক প্রান্তে দুপাশে ক্যালিপারের চোয়াল দুটো ঠেকিয়ে মনে মনে হিসেব করে নিলে ভারনিয়ার স্কেলের রিডিংটা। তারপর সিলিণ্ডারের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে সরিয়ে অপর প্রান্তে ক্যালিপার নিয়ে যেতেই শুধু চোখেই দেখা গেল, চোয়াল দুটো আর সিলিণ্ডারের গা স্পর্শ করছে না, খানিকটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে।

মাপকাঠির মুখ দুটো সিলিণ্ডারের পাশে ঠেকিয়ে আবার রিডিং নিল ইন্দ্রনাথ। তারপর বললে—"দু মুখে তফাৎ প্রায় দু মিলিমিটারের মত।"

ত্রিপুরারিবাবু বললেন—"মিউজিয়ামের এক্সপার্ট ভদ্রলোকের আপনার মত অত হিসেবী চোখ নেই। অঙ্ক-টঙ্কও নিশ্চয় কম জানেন। তাছাড়া এত নিখুঁত মাপজোকে কিছু আসে যায় না।"

"আমি বলব, আসে যায়," ঝটিতি জবাব দিল ইন্দ্রনাথ। "ভুল মাপজোকেই বরং কোনো প্রয়োজন নেই।"

সবার দেখা হয়ে যাবার পর শীলটা আবার কাগজে মুড়ে প্যাক করে ফেললেন কৃষ্ণদাসবাবু। তারপর আয়রন সেফের যথাস্থানে রেখে সদলবলে ফিরে এলাম হলঘরে।

ত্রিপুরারিবাবু জিজ্ঞেস করলেন—"ইন্দ্রনাথবাবু, সব তো দেখলেন। এখন বলুন তো ইন্সিওরেন্সের প্রশ্নটার কিছু সুরাহা হল কিনা।"

"না।"

"তবে?"

যতক্ষণ পুলিশী তদন্ত শেষ না হচ্ছে, ততক্ষণ এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সমীচীন হবে না। এখন আমরা চলি। সারাদিন অনেক ঝামেলা পোহাতে হবে আপনাদের।"

"তা ঠিক," নিরাশমুখে বললেন ত্রিপুরারিবাবু। "আমি আর এগোলাম না।"

"ঠিক আছে, আমরা নিজেরাই যাচ্ছি।" অত্যন্ত বিনীতভাবে এগিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ফটকের বাইরে পা দিল ইন্দ্রনাথ।

দু পা এগিয়ে আমি বললাম—"বড় গোলমেলে কেস। কোনো সুরাহাই হল না। অবশ্য সব সময়েই যে লক্ষ্য ভেদ করা যাবে, এমন কোনো কথা নেই।"

"ঠিক বলেছ। আমাদের প্রাথমিক কাজ হল চোখ কানের সদ্ব্যবহার করে 'ফ্যাক্ট'গুলো মনে মনে সাজিয়ে নেওয়া। অঙ্ককষা সিদ্ধান্ত আসবে পরে। সেই জন্যেই আবার জঙ্গলের শর্টকাট ধরতে হবে আমাদের।"

"কেন বলো তো! ট্রেনের এখনো অনেক দেরী।"

"সেইজন্যেই তো। পায়ের ছাপগুলোর ছাঁচ নিয়ে যেতে চাই। কাজে লাগতে পারে।"

"বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?"

"নিশ্চয় না।"

বাধা দিলাম না। জানি তো, ইন্দ্রনাথ রুদ্রের গাণিতিক মন উদ্দেশ্য ছাড়া কখনো এনার্জি ব্যয় করে না। সুতরাং অচিরেই পৌঁছোলাম জঙ্গলের সেই কাদামাটি অঞ্চলে এবং সবচাইতে স্পষ্ট দুজোড়া পদচিহ্ন বেছে নিয়ে রিসার্চ কেস থেকে ইন্দ্রনাথ একে একে বার করল প্লাস্টার টিন, জলের বোতল, চামচে আর ছোট্ট একটা অ্যালকাথিন বাটি।

উদ্যোগপর্ব দেখে কৌতুক অনুভব করলাম। শেষ পর্যন্ত বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া না হয়। অ্যামবাসাডর জুতোর চিহ্ন নিঃসন্দেহে মৃত ব্যক্তির। কিন্তু তাতে কি? আরেক জনের পায়ের ছাপের ছাঁচ তুলেও কোন লাভ আছে কি? লোকটা এখনো অজ্ঞাত। এখানে তার হাজির থাকাটাও এমন কিছু সন্দেহজনক নয়—অন্তত এখনো পর্যন্ত।

দুজোড়া পদচিহ্নের ওপর তরল প্লাস্টার ঢেলে দিল ইন্দ্রনাথ এবং তারপর যা করল

তা রীতিমত দুর্বোধ্য।

বাটির মধ্যে আরো খানিকটা প্লাস্টার গুলে অজ্ঞাত ব্যক্তির পায়ের ছাপের পাশেই ছড়ির দুটো গর্তে ঢেলে দিল। তারপর রিসার্চ কেস থেকে একরীল সুতো বার করে গজ দুয়েক ছিঁড়ে নিয়ে দুহাতে টান করে এমনভাবে ধরল যাতে সুতোটা গর্তদুটোর ঠিক মাঝখান দিয়ে যায়। আস্তে আস্তে প্লাস্টার জমে যেতে সুতোও আটকে রইল তার মধ্যে।

কিন্তু এখনো গর্ত থেকে তোলার মত শক্ত হয়নি প্লাস্টার ছাঁচ। তাই এবার পায়ের ছাপের ছাঁচগুলো তুলে নিয়ে রাখলে কেসের মধ্যে। তারপর আস্তে আস্তে তুলল ছড়ির গর্তের ছাঁচদুটো। একই ছড়ির দু-দুটো তুষারশুভ্র ফেরুল ছাঁচের দিকে অনিমেষ নয়নে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে পেন্সিল দিয়ে একটা ছাঁচের ওপর কি চিহ্ন দিতে লাগল ইন্দ্রনাথ।

আমি বললাম—"দুটো ছাপের মধ্যে ফাঁকটুকু সুতোর মাপ থেকেই জানা যাবে, তাই না?"

"এত কাণ্ড অবশ্য সেজন্যে করিনি," বলল ইন্দ্রনাথ। "এ থেকে বোঝা যাবে ঠিক কোন দিকে হেঁটেছে লোকটা, ছড়ির সামনে পেছনটাও জানা যাবে।"

খুবই উচ্চস্তরের মৌলিক পদ্ধতি, কোনো সন্দেহই নেই তাতে। কিন্তু লাভটা কি? এত কাণ্ড করে কিছু প্রমাণ করা গেলেও না হয় বুঝতাম।

কৌতূহল চাপতে না পেরে দু-চারটে প্রশ্ন করেছিলাম। কিন্তু চিরাচরিত পন্থা অবলম্বন করল ইন্দ্রনাথ, অর্থাৎ হঠাৎ মৌন হয়ে গেল। একবার শুধু বললে, ক্ল্যাইম্যাক্সে না পৌঁছোনো পর্যন্ত টুকটাক সাক্ষ্য জোগাড় করতেই হবে। কিন্তু ক্লাইম্যাক্সটা কোথায়, তার জবাব পেলাম না।

হাওড়ায় পৌঁছে ইন্দ্রনাথ একটা ট্যাক্সি নিয়ে গেল লালবাজারে। বলে গেল—"সন্ধ্যেবেলা মেসে এসো। অনেক কথা আছে।"

সন্ধ্যেবেলা যেতেই দেখি চিৎপাত হয়ে শুয়ে ইন্দ্রনাথ কাঁচি টানছে আর কড়িকাঠ নিরীক্ষণ করছে। আমাকে দেখেই বলে উঠল—"এসো মৃগ, এস। কিন্তু কোনো প্রশ্ন নয়। কেসটা এখনো ধোঁয়াটে। একদিকে ঢিল ছুঁড়েছি, দেখি লাগে কিনা। কাল সকালে হাতে কাজ আছে?"

"না। কিন্তু কখন?"

"কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটায় এখানে চলে এস। শীলমোহর-রহস্য নাটিকার শেষ অঙ্কটা দেখবার সৌভাগ্য হলেও হতে পারে। নাও হতে পারে। সবটাই তোমার কপাল আর আমার হাতযশ!"

পরের দিন সকাল। ফ্রী স্কুল স্ট্রীট।

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটার সময়ে ইন্দ্রনাথের মেসের সামনে হাজির হয়ে দেখেছিলাম একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। সিঁড়িতে পা দিতে না দিতেই বন্ধুবর নিজেই তরতর করে নেমে এসেছিল নিচে।

ট্যাক্সি সঙ্গে সঙ্গে ছেড়েছে এবং যথা সময়ে এসে দাঁড়িয়েছি ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে।

ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে একটা মস্ত কালো ঢাকা গাড়ির পাশে আসতেই ওদিক থেকে উঁকি দিল সহাস্য মুখ। আমাদের প্রিয় বন্ধু ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর জয়ন্ত চৌধুরী। পরনে আদ্দির

পাঞ্জাবী। মুখে বর্মা চুরুট।

ইন্দ্রনাথ বললে—"রিপোর্ট কি?"

"কাল সন্ধ্যে থেকেই তোমার কথামত সাদা পোশাকে দুজন গোয়েন্দা পাহারা দিচ্ছে। এখনও কিছু ঘটেনি।"

"ঘটবেই যে এমন কোন কথা নেই। যুক্তির সিধে সড়কে চলেছি, যা সম্ভাব্য তা যদি সত্য হয়, তাহলে কেল্লা ফতে। নইলে ফস্কাগেরো।"

"এরকম কথা এর আগেও তোমার কাছে হাজার খানেক বার শুনেছি। কিন্তু....ঐ যে....ঐ যে....এসে গেছে তোমার লোক।"

একটা দোকানের পাল্লা খুলে ফুটপাতে নামল এক প্রৌঢ়। নেমে দরজায় তালা দিয়ে এগোলো ফুটপাত ধরে। লোকটা মাথায় দিব্বি লম্বা। শীর্ণ। ট্রাউজার্স ঢাকা লম্বা লম্বা বকের মত পা। চলার ধরনটা কেমন জানি অদ্ভুত। বোধহয় শিরদাঁড়ায় কোনো ব্যারাম আছে। তাই ডান হাতের ছড়িতে ভর দিয়ে হাঁটছে আড়ষ্টভাবে মন্থর চরণে। অপর হাতে ঝুলছে একটা কাঠের চৌকোণা বাক্স।

মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ শিহরণ বয়ে গেল ছড়িটা দেখে। হাতীর দাঁতের হাতল। চওড়া রূপোর পটি। শক্ত মালাক্কা বেত। ঠিক যেমনটি দেখে এসেছি কৃষ্ণদাস চক্রবর্তীর হাতে। হুবহু একই রকম।

আমরা কথা বলতে বলতে যে রকম হাঁটছিলাম হাঁটতে লাগলাম। ধীর চরণে আমাদের পেরিয়ে গেল জন মার্টিন (নিঃসন্দেহে লোকটা জন মার্টিন, তা নাহলে ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের দোকান থেকে বেরোবে কেন?)। আমরা পেছনে এসেই ঘুরে গিয়ে অনুসরণ করলাম। ঠিক তখনি লক্ষ্য করলাম দুজন পালোয়ান গোছের শক্তসমর্থ পুরুষ দূর থেকে পাছু নিয়েছে জন মার্টিনের। দমকল স্টেশনের সামনে এসেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল মার্টিন। সঙ্গে সঙ্গে চাপাকণ্ঠে বলল ইন্দ্রনাথ—"জয়ন্ত, আর দেরী নয়। গাড়ি কই?"

মুখের কথা খশতে না খশতেই সেই ঢাকা মস্ত কালো গাড়িটা নিঃশব্দে ব্রেক কষলো পাশে। টপাটপ ভেতরে লাফিয়ে উঠলাম আমরা তিনজনে। মুশকো চেহারার লোকদুটোও যেন তৈরী ছিল, দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে টুক করে উঠে বসল ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় নিঃশব্দে পিছলে সামনে এগিয়ে গেল গাড়ি।

সামনের ট্যাক্সিটা তখন লিণ্ডসে স্ট্রীট দিয়ে চলেছে সিধে চৌরঙ্গী রোডের দিকে। রেড সিগন্যাল থাকায় সামান্যক্ষণ দাঁড়াতে হল। তারপরেই ডান দিকে মোড় নিয়ে চলল এসপ্ল্যানেডের দিকে। সুরেন ব্যানার্জী রোডের কাছাকাছি গিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে ঢুকে পড়ল রাণী রাসমণি রোডের মধ্যে। তারপর সুভাষ বোসের স্ট্যাচু প্রদক্ষিণ করে তীরবেগে এসে দাঁড়াল গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের সামনে।

জন মার্টিন ভাড়া মিটিয়ে নামবার আগেই আমরা হোটেলের হলে ঢুকে বসে পড়লাম দেওয়াল ঘেঁষা সোফাসেটে। মিনিটখানেকের মধ্যেই লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে ঢুকল জন মার্টিন। ঢুকে থমকে দাঁড়াল। ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল যেন কারো আশায়।

হলের এককোণে একজন শ্বেতকায় ব্যক্তি বসে ম্যাগাজিন দেখছিল। লাল মুখ। কদমছাঁট সোনালী চুল। পরনে সিনথেটিক ফাইবারের ট্রাউজার্স আর বুশশার্ট। দশাসই চেহারা।

জন মার্টিনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ম্যাগাজিন রেখে এগিয়ে এল শ্বেতকায় পুরুষ। আর ঠিক তখনি, সোফা ছেড়ে উঠে জন মার্টিনের কাঁধে হাত রাখল জয়ন্ত।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ঘুরে দাঁড়াল জন মার্টিন। তার চোখের তারায় নিবিড় শঙ্কা।

কর্তব্যকঠিন স্বরে জয়ন্ত বললে—"মিঃ মার্টিন। আমি একজন ডিটেকটিভ অফিসার।"

বলতেই, ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল জন মার্টিন। চোখে চোখ রেখে শক্ত গলায় বললে জয়ন্ত—"আপনার হাতে যে ছড়িটা দেখছি, তা তো আপনার নয়।"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জন মার্টিন। বলল—"ঠিক বলেছেন। কার ছড়ি, তা জানি না। আপনার জানা থাকলে ফিরিয়ে দিতে পারেন। আসলে ভুল করে ছড়ি বদলাবদলি করে ফেলেছি। দয়া করে আমারটা যদি আমাকে ফিরিয়ে দেন তো উপকৃত হব।"

বলে, ছড়িটা এগিয়ে দিল জন মার্টিন। জয়ন্ত সেই ছড়িটা নিয়ে এগিয়ে দিলে ইন্দ্রনাথের হাতে। আমরা দুজনেই ততক্ষণে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম জয়ন্তর দুপাশে।

"এইটাই তো?" বললে জয়ন্ত।

নিরুত্তরে ছড়িটার আগাপাশতলা দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ। তীক্ষ্ণ সন্ধানী এক্স-রে চোখ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিলে প্রতিটি বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে পরীক্ষা করল ফেরুলটা। পকেট থেকে 'ক্যালিপার গজ' বার করে দু জায়গার ব্যাসের মাপও নিলে এবং নোটবই খুলে আগে থেকেই লেখা কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে নিলে ফলাফলটা।

অধীর হয়ে পড়েছিল জন মার্টিন। আঙুল মটকাতে মটকাতে এখন বললে—"আরে মিস্টার, খামোকা দাঁড় করিয়ে রেখেছেন কেন আমাকে? এত মাপজোকের দরকার আছে কি? বললাম না আমার ছড়ি নয়।"

"সত্যি কথাই বলেছেন," বললে জয়ন্ত। "সেই কারণেই আপনার সঙ্গে কিছু প্রাইভেট কথা আছে। কথা ছিল এই ছড়িটা সম্বন্ধেই।"

এই সময়ে উদ্বিগ্নমুখে ছুটতে ছুটতে এল হোটেল ম্যানেজার। পেছন পেছন সাদা পোশাক পরা একজন গোয়েন্দা। জয়ন্ত ঘুরে দাঁড়াতেই ম্যানেজার জানালে, কথাবার্তাগুলো প্রাইভেট অফিস রুমে হলেই ভাল হয়। প্রকাশ্য ভাবে হওয়াটা হোটেলের মর্যাদার পক্ষে হানিকর।

জয়ন্ত বললে—"তাই ভাল। চলুন।"

আমরা পা বাড়িয়েছি, এমন সময়ে শ্বেতকায় ভদ্রলোক নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল জন মার্টিনের সামনে। বাক্সটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে—"দিন আমাকে।"

মাঝখানে এসে দাঁড়াল জয়ন্ত—"এখন নয়। মিঃ মার্টিন আপনার সঙ্গে পরে কথা বলবেন।"

"বাক্সটা আমার। আপনি কে?"

"পুলিশ অফিসার। বাক্সটা যদি আপনারই হয়, তাহলে বরং আমাদের সঙ্গে এসেই নজর রাখুন।"

শুনেই আমসির মত শুকিয়ে গেল শ্বেতকায় পুরুষের মুখ। চোখে মুখে ফুটে উঠল রীতিমত অস্বস্তি। জন মার্টিনের মুখের রক্তও আবার যেন ব্লটিং পেপার দিয়ে নিমেষে কে শুষে নিল।

ম্যানেজারের পেছন পেছন আমরা এলাম নিভৃত একটা সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে। দরজা

ভেজিয়ে দিয়ে বিদায় নিল ম্যানেজার।

জয়ন্ত বলল—"মিঃ জন মার্টিন, বাক্সটার মধ্যে কি আছে আমি জানতে চাই।"

জবাব এল শ্বেতকায় আগন্তুকের দিক থেকে—"উত্তরটা আমি দিচ্ছি। ওর মধ্যে আছে ভারতীয় মূর্তিশিল্পের একটা নিদর্শন। জিনিসটা আমার।"

"খুলে দেখান।"

টেবিলের ওপর বাক্সটা রেখে দড়ির বাঁধনটা আস্তে আস্তে খুলতে লাগল জন মার্টিন আর কপাল থেকে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরে পড়তে লাগল বাক্সের ওপর। আলতারাপ খুলে ডালা খুলতেই দেখা গেল একটা প্লাস্টারের ছাঁচ। দেখেই চিনতে পারলাম আমি। শ্রবণবেলাগোলার গোমতেশ্বরের নগ্নমূর্তি। ষাট ফুট লম্বা গোমতেশ্বরের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ছ ইঞ্চি প্রতিমূর্তির মধ্যে।

খড় আর কাগজের দলা দিয়ে প্যাক করা ছিল মূর্তিটা। দলাগুলো একে একে বার করে আনতে লাগল জন মার্টিন। স্পষ্ট দেখা গেল, আঙুলের ডগাগুলো কাঁপছে থর থর করে। সবশেষে মূর্তিটা সন্তর্পণে বাইরে এনে তুলে দিল জয়ন্তর হাতে।

শূন্য বাক্সটার মধ্যে সন্ধানী চোখ বুলিয়ে মূর্তিটা হাতে নিল জয়ন্ত। বলল—"ভিজে ভিজে মনে হচ্ছে।"

ইন্দ্রনাথ পাশেই দাঁড়িয়েছিল। তন্নিষ্ঠ হয়ে তাকিয়েছিল সাদা গোমতেশ্বরের দিকে। এখন আস্তে আস্তে মূর্তিটা তুলে নিলে নিজের হাতে, তারপর হাতের তালুতে আলতো করে বসিয়ে অনুভব করতে লাগল মনে মনে। এই সময়ে আমার চোখ পড়ল জন মার্টিনের ওপর। অবাক হয়ে গেলাম তার মুখচ্ছবি দেখে। নিঃসীম আতঙ্কে বিস্ফারিত তার দুই চক্ষু। স্নায়বিক উত্তেজনায় কাঁপছে ঠোঁটের পাশের মাংসপেশী। শ্বেতকায় ভদ্রলোক কিন্তু একেবারেই নির্বিকার।

নির্বিকার ভাবটা ঘুচে গেল আচমকা। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে উঠল বিকট গলায়—"করছেন কি, করছেন কি! পড়ে যাবে যে!"

বলতে বলতেই ইন্দ্রনাথের তালু থেকে খসে পড়ল গোমতেশ্বর এবং ধেয়ে গেল পাথরে বাঁধানো মেদিনী লক্ষ্য করে। দুর্ঘটনা যে ইচ্ছাকৃত, তা ওর হাতের চেটো উপুড় করা ভঙ্গিমা দেখেই বুঝলাম।

মেঝের ওপর দমাস করে পড়েই টুকরো টুকরো হয়ে গেল গোমতেশ্বর প্রতিমূর্তি। তুষারশুভ্র অংশগুলো ছিটকে গেল দৃষ্টির আড়ালে।

আর, ধ্বংসাবশেষের মধ্যে থেকে ছোট্ট একটা হলদে রঙের ধাতুর সিলিণ্ডার ধীরে ধীরে গড়িয়ে গেল মেঝের ওপর।

তৎক্ষণাৎ বাঘের মতই সেদিকে ঝাঁপ দিল আগন্তুক এবং ততোধিক ক্ষিপ্রতায় তারও আগে হেঁট হয়ে চট করে মেঝে থেকে সিলিণ্ডারটা কুড়িয়ে নিল জয়ন্ত।

বলল—"ওহে ইন্দ্রনাথ, জিনিসটা কি বলো তো?"

"নেবুচাডনেজারের শীলমোহর।"

"কার সম্পত্তি?"

"প্রহ্লাদ চক্রবর্তীর।"

"কিন্তু তিনি তো—!"

"পরশু রাতে খুন হয়েছেন!"

কথাটা শেষ হতে না হতেই অস্ফুট চীৎকার করে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল জন মার্টিন—বুঝলাম জ্ঞান হারিয়েছে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা লক্ষ্য করে অবিশ্বাস্য বেগে ধেয়ে গেল শ্বেতকায় পুরুষ। কিন্তু চৌকাঠেই মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়ে গেল গাঁট্টাগোট্টা গোয়েন্দা দুজনের সঙ্গে এবং পরমুহূর্তেই ক্লিক শব্দে মণিবন্ধে এঁটে দিল লৌহবলয়।

বাড়ি ফিরলাম হাঁটাপথে। হাঁটতে হাঁটতে ইন্দ্রনাথকে বললাম—"পায়ের ছাপ আর ছড়ির ডগার ছাঁচগুলো তাহলে কোনো কাজেই এল না। মিছে পণ্ডশ্রম করলে।"

"উঁহু। এর পরেই তো প্রয়োজন ওদের। জন মার্টিনকে ফাঁসি দেওয়ার পক্ষে শীলমোহরটা যদি যথেষ্ট প্রমাণ না হয়, তখন এই ছাঁচগুলোই হবে অকাট্য প্রমাণ।"

সত্যিই তাই হয়েছিল। মামলা চলার সময়ে কেটে বেরিয়ে গেল জন মার্টিন—শীলমোহরটা নাকি একজন এসে দোকানে বিক্রী করে গেছিল। লোকটাকে সে চেনে না। ঠিক সেই মুহূর্তে জন মার্টিনের পা আর ছড়ির ছাঁচ হাজির করা হল আদালতে এবং অবিসম্বাদিতভাবে প্রমাণ হয়ে গেল যে হত্যার রাত্রে প্রহ্লাদ চক্রবর্তীর বাড়ির কাছেই হাজির হয়েছিল জন মার্টিন। এরপর স্বীকারোক্তি আদায় করতে বেশি বেগ পেতে হয় নি।

যাই হোক, আমি জিজ্ঞেস করলাম—"কিন্তু মার্টিনকে তুমি সন্দেহ করলে কি করে বলো তো? জঙ্গলের মধ্যে ছড়ির গর্ত দেখে কি? আমি তো সন্দেহ করার মত অদ্ভুত কিছুই দেখতে পেলাম না।"

"অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য একটাই ছিল। গর্তগুলো যে ছড়ির সে ছড়ির প্রকৃত মালিক ছড়িধারী নয়।"

"ইন্দ্রনাথ, তুমি নিশ্চয় জ্যোতিষী নও? সামান্য কতকগুলো ছড়ির ছাপ দেখে ছড়ির আসল মালিক কে, তা কি বলা সম্ভব?"

"সম্ভব। আর সেইটাই হল অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। সমস্ত ব্যাপারটাই নির্ভর করছে কি ভাবে ছড়ির ফেরুল ক্ষয়েছে তার ওপর। যে ছড়ির হাতলটা সাদাসিদে গোল মত, তার ফেরুল সমান ভাবে চারদিকে ক্ষয়ে যায়। কিন্তু যে ছড়ির হাতলটা বেঁকা, তার ফেরুল ক্ষয়ে যায় হাতলটা যে দিকে বেঁকা ঠিক তার উল্টো দিকে, অর্থাৎ ছড়ির সামনের দিকে। তার কারণ, হাতল বেঁকা ছড়িকে একটা বিশেষ কায়দায় একই দিকে বাগিয়ে ধরতে হয়—ফলে একই অবস্থায় ক্রমাগত ছড়ি ধরার ফলে ফেরুলের বিশেষ একটা দিকই সমানে ক্ষইতে থাকে। কিন্তু সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টটা কি জানো? ক্ষওয়াটা কিন্তু ঠিক হাতলের উল্টো দিকে হয় না, সামান্য একদিকে ঘেঁষে। কারণ? ছড়ি নিয়ে হাঁটার সময়ে হাতলটা আমরা পেছনে দুলিয়ে হাঁটি। যখন এগিয়ে যাই, ছড়িটাকে দুলিয়ে পেছন থেকে সামনে নিয়ে আসি—আপনা হতেই ছড়িটা তখন পায়ের কাছ থেকে বাইরের দিকে সরে গিয়ে সামনে এগিয়ে যায়। আসবার সময়ে আবার পা ঘেঁষেই আসে। ফলে ছড়ির ফেরুল সব সময়েই ভেতর দিকে একটু বেশি ক্ষয়। সেই কারণেই, ডান হাতে ছড়ি নিয়ে যে হাঁটে, তার ফেরুল ক্ষয় সামান্য বাঁদিকে। আর বাঁহাতে ছড়ি নিয়ে যে হাঁটে, তার ফেরুল ক্ষয় সামান্য ডান দিকে। কিন্তু ডান হাতে

ছড়ি নিয়ে হাঁটা যার অভ্যাস, সে ল্যাটা মানুষের ছড়ি নিয়ে হাঁটলে জমির ওপর যে ছাপ পড়বে, তাতে দেখা যাবে ফেরুলটা ক্ষয়েছে ডান দিকেই বেশি—ডান দিক দিয়ে দুলিয়ে ছড়ি পেছন থেকে সামনে আনার ফলে ক্ষয়টা আরো বেশি মনে হবে। তখনই বুঝতে হবে, ছড়ির মালিকেরা ছড়ি বদলাবদলি করেছে। আমি যে ছাপ দুটো কাল তুললাম, তাতেও দেখা গেল এই বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ ফেরুলটা ক্ষয়েছে ডান দিকেই। অতএব ছড়িটা যার সে ল্যাটা মানুষ। তা সত্ত্বেও ছড়ি নিয়ে ডান হাতে হাঁটা হয়েছে। অতএব, ছড়ির মালিক অন্য কেউ।

লোকটাকে যখন চিনিই না, তখন ছাপটার বৈশিষ্ট্যটুকু নিয়েই শুধু মাথা ঘামালাম, তার বেশি না। কিন্তু প্রহ্লাদ চক্রবর্তীর পা দেখার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম, জঙ্গলের মধ্যে যে জুতোর ছাপ দেখেছি, সে জুতো আর ও জুতো একই। অর্থাৎ প্রহ্লাদবাবু জঙ্গলের রাস্তায় হেঁটেছিলেন। সুতরাং সঙ্গের ছড়িধারী লোকটিকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ মাথা ঘামানোর দরকার হয়ে পড়ল। তারপরেই কৃষ্ণদাসবাবু তাঁর ছড়ি হারানোর কাহিনী বললেন। ছড়িটাও দেখালেন। কি দেখলাম জানো? দেখলাম, ছড়িটা যার সে ডান হাতেই ছড়ি ব্যবহারে অভ্যস্ত—প্রমাণ—ফেরুলের বাঁদিক ক্ষওয়া। কৃষ্ণদাসবাবু যে ছড়ি পেয়েছেন, তার মালিক ডানহাতে ছড়ি ধরায় অভ্যস্ত। আর জঙ্গলের রাস্তায় যে হেঁটেছে, তার ছড়ির মালিক বাঁ হাতে ছড়ি ধরায় অভ্যস্ত, একেই বলে কাকতালীয়। এ থেকে কি সিদ্ধান্তে এলাম? প্রহ্লাদবাবুর অজ্ঞাত সঙ্গীটি কৃষ্ণদাসবাবুর টেম্পল চেম্বার্সের অফিসে ইন্টারভিউ দিতে এসেছিলেন অর্থাৎ শীলমোহর দখল করতে যারা উন্মাদ, লোকটি তাদের অন্যতম। কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন মাথার মধ্যে দেখা দিল—লোকটা কি শীলমোহর নিয়ে যেতে পেরেছে? আয়রনসেফ খুলে দেখলাম পেরেছে।"

"আয়রনসেফের শীলমোহরটা তাহলে—"

"নকল।"

"সর্বনাশ!"

"খুব যত্ন করে করলেও খুবই খারাপ নকল। ইলেকট্রোটাইপ। চোঙাটার সবদিকে সমতাও রাখতে পারে নি জালিয়াৎ হত্যাকারী। ব্যাবিলোনিয়ান এক্সপার্ট যে মাপজোক লিখে রেখেছিলেন, তার সঙ্গেও মিললো না, আর মাঝের ফুটোর দু প্রান্তে মাটি মাখিয়ে ময়লা করলেও মাঝখানটা সদ্য ড্রিলিংয়ের জন্য চক্ চক্ করছিল।"

"কিন্তু জন মার্টিনই যে জালিয়াৎ, তা জানলে কি করে?"

"তখনও আমি সঠিক জানতাম না। তবে অনুমান করেছিলাম। কেননা, জন মার্টিনের কাছে আছে শীলটার গড়ানো ছাপ যা থেকে ইলেকট্রো তৈরী করা সম্ভব। আর চ্যাপ্টা ইলেকট্রো গোল করে চোঙা বানিয়ে নেওয়ার মত কারিগরি জ্ঞান তার আছে। কিউরিও নকল করায় জুড়ি নেই তার। সব চাইতে বড় কথা, চোরাই শীলমোহর পাচার করার ক্ষমতা তার আছে—কেননা কিউরিও কেনাবেচাই তার ব্যবসা। অবশ্য সবটাই অনুমিতি আর যুক্তিসিদ্ধ সম্ভাবনা। তাই অপেক্ষা করতে লাগলাম সিদ্ধান্তটা বাজিয়ে নেওয়ার জন্যে। জন মার্টিনকে দোকান ঘর থেকে ডান হাতে ছড়ি ধরে বেরিয়ে আসতে দেখেই বুঝলাম কিস্তি মাৎ।"

"শীলমোহরটা যে গোমতেশ্বরের মূর্তির মধ্যে লুকানো ছিল, সেটাও কি অনুমান?"

"ইণ্ডিয়া থেকে আমেরিকায় শীলমোহরের মত ছোট্ট একটা জিনিস স্মাগ্‌ল করে নিয়ে

যাওয়ার সব চাইতে নিরাপদ পন্থা হল জিনিসটাকে প্লাস্টার ছাঁচের মধ্যে গেঁথে নেওয়া। আমি এই রকমই একটা কিছু আন্দাজ করছিলাম। মূর্তি দেখে আর সন্দেহ রইল না। হাতে নিয়ে বুঝলাম তখনও ভিজে ভিজে। অর্থাৎ মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে তৈরী ছাঁচ—প্লাস্টার এখনও শুকিয়ে খটখটে হয়নি। তাই ভেঙে ফেললাম। আমার ভুল হলেও ক্ষতি ছিল না। পাঁচ দশ টাকা দিলে ওরকম ছাঁচ অনেক পাওয়া যায়।''

''প্রহ্লাদবাবুকে জন মার্টিন কি করে বিষ খাওয়ালো বলো তো?''

''সেটা এখনো সঠিক জানি না, অনুমান করতে পারি। খুব সম্ভব, সঙ্গে করেই খানিকটা সায়ানাইড সলিউশন নিয়ে গেছিল মার্টিন। সুযোগ বুঝে মিশিয়ে দেবে হুইস্কির গেলাসে। এক চুমুক খেয়েই মিনিটখানেকের মধ্যে শেষ হয়ে গেছেন প্রহ্লাদবাবু। তবে গেলাসটা ধুয়ে তাকে রেখে যাওয়াটা ভুল হয়েছে জন মার্টিনের।''

''একটা হেঁয়ালির কিন্তু এখনো সমাধান হয় নি। দরজায় ছিটকিনি ভেতর থেকে দেওয়া ছিল। লোকটা বেরোলো কি করে?''

''খুব সহজে। খিলটা খোলা ছিল। লাগানো ছিল শুধু ছিটকিনি। লক্ষ্য করেছো নিশ্চয় ছিটকিনির ফুটোটা মেঝের ওপর। অর্থাৎ ছিটকিনিটা ঘাঁটি থেকে নামিয়ে মেঝের ওপর রেখেছে জন মার্টিন। তারপর বাইরে গিয়ে দরজা টেনে বন্ধ করে দিতেই ছিটকিনি পড়ে গেছে মেঝের ফুটোয়।''

নেবুচাডনেজারের সোনার শীলমোহরের চাঞ্চল্যকর মামলা অনেক দিন ধরে চলেছিল। শেষ পর্যন্ত ছাড়া পেয়ে যায় আমেরিকান ভদ্রলোক। কিন্তু ফাঁসি হয়ে যায় জন মার্টিনের। □

* 'প্রসাদ' (অগাষ্ট, ১৯৬৮) পত্রিকায় প্রকাশিত।

আটটা ঝিনুকের বোতাম

বন্ধুবর ইন্দ্রনাথের গুণ অনেক। সে ভারত বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ। মিষ্ট ভাষণে তার জুড়ি নেই। অনুভূতির সূক্ষ্মতায় তাকে শিল্পী বলা চলে। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় সে ইণ্ডিয়ান শার্লক হোম্‌স্।

কিন্তু চাঁদেরও কলঙ্ক থাকে। ইন্দ্রনাথেরও একটা বদ্ দোষ আছে। তা হল তার অহংভাব। পাঁচজনের সামনেই এমন টিটকিরি মেরে বসে যা শুনে কান-টান ঝাঁ-ঝাঁ করে ওঠে।

সেদিন এই নিয়ে লঙ্কাকাণ্ড হয়ে গেল আমাদের মধ্যে।

রবিবারের বিকেলে ইন্দ্রনাথের মেসে গেছিলাম আমি আর গৃহিণী কবিতা। গিয়ে দেখি লক্কা পায়রার মত এক ফুলবাবু জোড়হস্তে দাঁড়িয়ে।

ইন্দ্রনাথের ললাটে ভ্রূকুটি। এবং যেন কিছু বিব্রত।

আমাদের দেখেই বললে—'এস ভায়া এস। বসৌ বৌদি। তোমাদের কথাই হচ্ছিল।'

কালো চোখ নাচিয়ে লাল ঠোঁট বেঁকিয়ে কবিতা বললে—'কি সৌভাগ্য আমাদের।'

'কিন্তু উপলক্ষ্যটা কি?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'এই ভদ্রলোকের নাম লম্বোদর লস্কর। আর ইনিই সেই কুখ্যাত সাহিত্যিক মৃগাঙ্ক রায়।

জীবনসঙ্গিনী কবিতা রায়। যাঁদের কথা আপনাকে বলছিলাম লম্বোদরবাবু।'

নমস্কার-প্রতিনমস্কারের পালা শেষ হলে বিনয়-গলিত হেসে লঙ্কাপায়রা যুবকটি বললেন—'এজ্ঞে, আমি এসেছিলাম ইন্দ্রনাথবাবুর কাছে অ্যাপ্রেন্টিসস হতে।'

'কিসের অ্যাপ্রেন্টিস?'

'গোয়েন্দাগিরির।'

হাসি চেপে বললাম—'তা, ইন্দ্রনাথ বলে কি?'

এজ্ঞে, উনি বলেন আপনাদের দ্বারাও যখন অ্যাদ্দিনে কিছু হয় নি, তখন আমার দ্বারাও হবে না।'

'কী!'

ফস করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে—'কথাটা কি মিথ্যে বলেছি, মৃগ? এতদিন ধরে আমার সাগরেদি করে শুধু ছাইভস্ম লেখা ছাড়া আর কিছু করতে পেরেছ আজ পর্যন্ত? বৌদির কথা বাদই দিলাম, মেয়েদের দ্বারা জগতে কোন মহৎকর্ম সাধিত হয় না।'

মুখ লাল করে কবিতা বললে—'ঠাকুরপো তোমার বড় দেমাক হয়েছে।'

রেগে গিয়ে আমি বললাম—'সুযোগ এলে তোমার দর্প আমি চূর্ণ করব।'

অট্টহেসে ইন্দ্রনাথ বললে—'সুযোগ এসেছে।'

'কিরকম?'

জয়ন্ত ফোন করেছিল। 'রাঁদেভু হোটেলে' একজন খুন হয়েছে। বেরুতে যাচ্ছি এমন সময়ে এলেন লম্বোদরবাবু। তারপরেই তোমরা।'

'তাই নাকি? তাই নাকি?' জ্বলজ্বলে চোখে বললে লম্বোদর।

'চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করবে কিনা ভেবে দেখ,' বলল ইন্দ্রনাথ। 'মুরোদ থাকে চল আমার সঙ্গে। বৌদি তুমিও এস। লম্বোদরবাবু, যাবেন নাকি? গোয়েন্দা হওয়ার যোগ্যতা কার আছে আর কার নেই—তা জয়ন্তর সামনেই একটা টেস্ট কেসেই প্রমাণিত হয়ে যাক।'

গল্প-টল্প লিখে ইদানীং আমারও একটু দম্ভ হয়েছিল বোধহয়, তা না হলে লম্বোদর লস্করের সামনে ইন্দ্রনাথের টিপ্পনীতে অত অপমানিত বোধ করব কেন।

তক্ষুনি লাফিয়ে উঠে বললাম—'চল দেখা যাক কেরামতিটা কার বেশী।'

পাঞ্জাবীর দিকে হাত বাড়িয়ে ইন্দ্রনাথ শুধু বললে—'চল।'

পরে অবশ্য অনুতপ্ত হয়েছিলাম এই হঠকারিতার জন্যে।

পার্ক স্ট্রীট। রাঁদেভু হোটেল।

লবিতে গিজ-গিজ করছে পুলিশ, রিপোর্টার আর হোটেল-গেস্ট। কনক্রিট দেওয়ালের মত পথ আটকে দাঁড়িয়ে সার্জেন্ট অচল দত্তর বিপুল দেহ। পাশেই দাঁড়িয়ে খর্বকায় এক পুরুষ। উদ্বেগের কালো ছাপ চোখে-মুখে। পরনে নেভী ব্লু সার্জ সুট, সাদা শার্ট আর কালো বো-টাই।

সপারিষদ ইন্দ্রনাথকে দেখে একগাল হেসে পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে অচল দত্ত—'মিঃ পিটার ড্যানিয়েল। হোটেল ম্যানেজার।'

কাষ্ঠ হেসে করমর্দন করল পিটার ড্যানিয়েল। বলল—'ব্যাড। ভেরী ব্যাড। আপনি পুলিশের লোক?'

এমনভাবে মাথা নাড়ল ইন্দ্রনাথ যাতে হ্যাঁ-না দুই বোঝায়। লম্বোদরের মুখটা দেখলাম একটু শুকিয়ে গেছে পুলিশ দেখে। ফ্ল্যাশগান বাগিয়ে সাংবাদিকরা তাগ করছে, সুযোগ বুঝলেই শাটার টিপবে। একই রকম ধূসর রঙের শার্ট, প্যান্ট, টাই পরা হোটেল ক্লার্ক আর অন্যান্য কর্মচারীরা একযোগে প্যাট-প্যাট করে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। সব মিলিয়ে এমন একটা থমথমে পরিবেশ যে অস্বস্তি বোধ না করে উপায় নেই।

অচল দত্ত বললে—'লাশ চোখে পড়ার পর থেকে কেউ বাইরেও যায়নি, ভেতরেও আসে নি। ইন্সপেক্টর চৌধুরীর অর্ডার। এঁরা আপনার সঙ্গে যাবে তো?'

'হ্যাঁ। জয়ন্ত কোথায়?'

'তিন তলায়। রুম নং ১০৯।'

পা বাড়াল ইন্দ্রনাথ। কয়েক ধাপ উঠে এসে মুচকি হেসে বললে—'চল হে গোয়েন্দারা। এখনি নার্ভাস হলে চলবে কেন?'

কবিতা কিছু বলল না। তবে মুখ দেখে বুঝলাম সহজ হবার চেষ্টা করছে বেচারী।

১০৯ নম্বার কামরার সামনেই পেছনে হাত দিয়ে পায়চারী করছিল ডিটেকটিভ জয়ন্ত চৌধুরী—আমাদের বাল্যবন্ধু।

জয়ন্তর ললাট চিন্তাকুটিল। কবিতাকে দেখে ভ্রূকুটি করে বললে—'কি ব্যাপার, একেবারে সদলবলে যে।' লম্বোদরকে লক্ষ্য করে—'ইনি কে?'

'আমার অ্যাপ্রেন্টিস।' বলল ইন্দ্রনাথ।

'অ্যাপ্রেন্টিস? তার মানে?'

'তার মানে শিক্ষার্থী। মৃগ আর বৌদিকেও তাই বলতে পার। এইটাই হল টেস্ট-কেস। বোর্ড অফ এগ্‌জামিনারের মধ্যে থাকছ তুমি আর আমি।'

ললাট রেখা সরল হয়ে গেল জয়ন্তর। এত চিন্তার মধ্যেও ফিক্ করে হেসে বললে—'বেশ তো, ভেতরে চলো।'

চোখ পাকিয়ে তাকাল কবিতা। আমারও প্রবল বাসনা হল দুকথা শুনিয়ে দেওয়ার। কিন্তু স্থানকালপাত্র ভেবে মুখ বুজে রইলাম।

না থেকেও উপায় ছিল না। কেননা ঘরের মধ্যে যে দৃশ্য দেখলাম, তা দেখামাত্র শির-শির করে উঠল আপাদমস্তক।

পুরু কার্পেটের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে এক ব্যক্তি। দুহাত ছড়ানো দুপাশে—সাঁতারুর মত। কে যেন এক বালতি লাল রঙ ঢেলে দিয়ে গেছে মাথার ওপর.....লাল রঙ জমাট বেঁধেছে কালো চুলে....গড়িয়ে এসেছে ঘাড় বেয়ে।

নিষ্প্রাণ নিস্পন্দ দেহটির দিকে দেখলাম বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে লম্বোদর লস্কর।

আর কবিতা? মৃত ব্যক্তির পাশে রক্ষিত শয্যার সাদা চাদরের চাইতেও বুঝি সাদা হয়ে গেছে তার মুখ। রক্তহীন। রঙহীন।

এ হেন বীভৎস দৃশ্যের প্রতিক্রিয়া নিশ্চয় আমার মুখেও দেখা গিয়েছিল। তাই আমাদের তিনজনের মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বিলক্ষণ হৃষ্টচিত্তে বলল ইন্দ্রনাথ রুদ্র—'বন্ধু জয়ন্ত,

নাম-ধামগুলো এবার বলে ফেলো দিকি।'

'নাম, টংগু লিনচান। বয়স বিয়াল্লিশ। বার্মিজ খ্রিস্টান। বিয়ে হয়েছিল কলকাতায়। স্ত্রীর সঙ্গে ডাইভোর্স হয়েছে বছর দুই আগে। রিপ্রেজেন্টেটিভ। মালিকের চাল আর কাঠের কারবার আছে মান্দালয়ে। বছরখানেক সাউথ আফ্রিকায় ছিলেন। নেটিভদের মারধোর করায় বিতাড়িত হয়েছেন ব্রিটিশ আফ্রিকা থেকে। রাঁদেভু হোটেলে নাম লিখিয়েছেন হপ্তা খানেক আগে। দিন তিনেকের জন্যে ঢাকায় গিয়েছিলেন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে। আজ সকালেই ফিরেছেন। সাড়ে ন'টার সময়ে হোটেলে ঢুকেছেন। বারোটা পাঁচে মরে পড়ে থাকতে দেখেছে পারুল।'

'পারুল কে? প্রশ্ন করে ইন্দ্রনাথ।

'ঝি। মানে, ঘরদোর ঝাঁটপাট দেয়।'

'টংগু লিনচানের আগের ইতিহাস?'

'খুব অল্পই পাওয়া গেছে। মিশুকে। সামাজিক। যদ্দূর জানা গেছে, শত্রু নেই। আফ্রিকা থেকে যে জাহাজে ফিরেছেন, সে জাহাজেও শত্রু সৃষ্টির মত কিছু করেন নি। তবে হ্যাঁ, টংগু লিনচান নাম্বার ওয়ান লেডি কিলার। বউকে ডাইভোর্স করার আগে থেকেই লটঘট ছিল একটা মেয়ের সঙ্গে। কারবারের নাম করে নাকি তাকে নিয়েই পালিয়েছিলেন আফ্রিকায়। ফেরবার সময়ে ভদ্রমহিলাকে ফেলে এসেছেন। কলকাতাতেও তাঁর এক প্রেয়সী আছে।'

'কাকে সন্দেহ হয়?'

চিন্তাচ্ছন্ন চোখে বর্মী পর্যটকদের মৃতদেহর দিকে তাকিয়ে বলল জয়ন্ত—'আজ সকালেই টংগু লিনচানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তার কলকাতার প্রেয়সী। নাম, ভায়োলেট অ্যালক্যাটরা। ভায়োলেট চাকরি বাকরি করে না—অথচ ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে রাণীর হালে থাকে। টংগু যখন ঢাকায়, তখন একবার এসে খোঁজ করে গেছিল ভায়োলেট। এনকোয়ারী কাউন্টারে খোঁজ নিয়ে জেনেছিল আজ সকালেই মিঃ লিনচানের ফেরার কথা। তাই ভায়োলেট এসেছিল এগারোটা পাঁচে। রুম নাম্বার নীচ থেকে নিয়ে লিফ্‌টে করে উঠেছিল তিন তলায়। কখন বেরিয়ে গেছে কেউ জানে না। দরজায় টোকা মেরে কারো সাড়া না পেয়ে চলে যায় ভায়োলেট। বাইরেও অপেক্ষা করেনি। টংগু লিনচানের সঙ্গে নাকি তার দেখাও হয়নি।'

ঠিক এই সময়ে মৃতদেহের চুলের ডগা থেকে নখের ডগা পর্যন্ত তীক্ষ্নদৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে খাটের কিনারায় বসে পড়ল কবিতা।

সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম চাপা উল্লাসের রোশনাই ওর তমালকালো দুই চোখে। তবে কি...তবে কি সূত্রের সন্ধান পেয়েছে কবিতা?

নিরীহ কণ্ঠে বলল ইন্দ্রনাথ—'পা টন্‌টন্ করছে বুঝি?'

কর্ণপাত না করে জয়ন্তকে জিজ্ঞেস করল কবিতা—'বউ কি বলে?'

'বউ? টংগু যে আফ্রিকা থেকে ফিরে এসেছেন, তাই নাকি সে জানে না—দেখা হওয়া তো দূরের কথা। সকালে চৌরঙ্গিতে গেছিল সিনেমার টিকিট কিনতে।'

গিন্নীর তৎপরতায় আমার জড়তাও অন্তর্ধান করেছিল। জয়ন্তর কথা শুনতে শুনতে সন্ধানী চোখ বুলোচ্ছিলাম ঘরের এ কোণ থেকে সে কোণে—হঠাৎ পাওয়া কোন সূত্রের আশায়।

ঘরটা আর পাঁচটা প্রথম শ্রেণীর হোটেল ঘরের মতই। বৈশিষ্ট্যহীন। সিঙ্গলবেড।

ওয়ার্ডরোব। কাঁচের দেরাজ। নাইট টেবিল। চিঠি লেখার ডেস্ক্। আর চেয়ার। স্রেফ ঘর সাজানোর জন্যে ডামি ফায়ারপ্লেস।—ওপরের তাকে টাইমপিস আর একসারি বিভিন্ন স্বাদের ইংরেজী নভেল।

মৃতদেহর পাশে নতজানু হয়ে বসে পড়ল ইন্দ্রনাথ। ঘাড়খানা সারস পাখিব মত বাড়িয়ে ঝুঁকে পড়ল লম্বোদর। তাই দেখে চেয়ারে বসতে বসতে ফিক করে হেসে ফেলল জয়ন্ত চৌধুরী।

মৃতদেহটাকে চিৎ করে শুইয়ে দিল ইন্দ্রনাথ। রাইগর মর্টিসে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তখন আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। হিমকঠিন দেহ আর পোশাকের ওপর দ্রুত হাত চালিয়ে নিয়ে বলল—'বৌদি, মৃগ, লম্বোদরবাবু। শুরু করা যাক এবার। বৌদি, তুমিই আগে বল। বল কি দেখেছ?'

টপ করে খাট থেকে লাফ দিয়ে নেমে এল কবিতা। বোঁ করে এক চক্কর ঘুরে এল লাশটাকে।

ইন্দ্রনাথ সকৌতুকে বললে—'ব্যাপার কি? এখনও কিছু চোখে পড়ল না? এতদিন কি বৃথাই গপ্‌পো শোনালাম তোমাকে?'

লাল ঠোঁটে টুক করে জিভ বুলিয়ে নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে বললে কবিতা—'দেখছি পুরোদস্তুর বিলিতি পোশাক পরার অভ্যেস টংগু লিনচানের। পায়ে কার্পেট স্লিপার। আর হ্যাঁ—সিল্কের আণ্ডারওয়্যার।'

'ঠিক, ঠিক। এ ছাড়াও আছে কালো সিল্কের মোজা আর গার্টার। কোট-প্যান্টে ওস্তাগরের নামও রয়েছে—'ম্যাকিনসন্‌স্, জোহানেসবার্গ।' আর কি?'

'বাঁ হাতে একটা রিস্টওয়াচ। আর....আর ঘড়ির কাঁচটা চিড় খেয়ে গেছে। কাঁটা আর ঘুরছে না। দাঁড়িয়ে গেছে ১১-৫০ মিনিটের ঘরে।'

'চমৎকার! চমৎকার! জয়ন্ত, ডাক্তার কি বলে?'

'টংগু লিনচান মারা গেছেন এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে। আমার মনে হয়—'

জ্বলজ্বলে চোখে বলে উঠল কবিতা—তার মানে কি এই নয় যে—'

'ধীরে, ধীরে, বৌদি। যদি কিছু মাথায় এসে থাকে, তবে তা মাথার মধ্যেই রাখো। ঝট করে সিদ্ধান্তে পৌঁছনো ভাল গোয়েন্দার লক্ষণ নয়। ব্যস, এবার তোমার ছুটি। লম্বোদরবাবু, আপনি কি দেখলেন?'

কপাল কুঁচকে হাতঘড়ির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল লম্বোদরবাবু। চওড়া চামড়ার ব্যাণ্ডওলা পুরনো মডেলের হাতঘড়ি। তারপর বললে চিন্তাচ্ছন্ন কণ্ঠে—'পুরুষের ঘড়ি। পড়ে গিয়ে ধাক্কা লাগার ফলেই কাঁটা আর নড়ছে না। চামড়ার ব্যাণ্ডের দ্বিতীয় গর্তে একটা খাঁজ দেখা যাচ্ছে—বাক্‌ল্ আঁটা রয়েছে এই গর্তেই। কিন্তু এছাড়াও দেখছি আরও একটা খাঁজ—আরও গভীর দাগ—তৃতীয় গর্তে।'

'সাবাস! সাবাস লম্বোদরবাবু! তারপর?'

বাঁ হাতে ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়েছিল—সে রক্ত এখন শুকিয়ে গেছে। 'বাঁ হাতের তালুতেও রক্ত লেগেছিল—কিন্তু দাগটা অনেক আবছা, যেন রক্তমাখা তালু দিয়ে কিছু আঁকড়ে ধরেছিলেন টংগু লিনচান, তাই বেশির ভাগই মুছে গেছে তালু থেকে। একটু খুঁজলেই এই

ঘরেই পাওয়া যাবে জিনিসটা—টংগু লিনচানের হাতের ছাপও রয়েছে তাতে।'

'লম্বোদরবাবু, আপনার মত অ্যাপ্রেন্টিস পাওয়ায় আমি গর্বিত। ওহে, জয়ন্ত, রক্তমাখা হাতের ছাপ লাগা কিছু পেয়েছ ধারে কাছে?'

জয়ন্তর মুখের হাসি মিলিয়ে গেছিল। তীক্ষ্ণচোখে বলল—'এক্সেলেণ্ট। কিন্তু রক্তর দাগ লাগা সে-রকম কিছু তো পাইনি। কার্পেটেও তেমন ছাপ নেই। খুব সম্ভব হত্যাকারী তা সঙ্গে করেই নিয়ে গেছে।

কপাল কুঁচকে ইন্দ্রনাথ বলল—'তুমি পরীক্ষক, পরীক্ষার্থী নয়। কাজেই আর ইঙ্গিত দিও না। মৃগ, তোমার কিছু বলার আছে?'

তাড়াতাড়ি বললাম—'মাথার ক্ষত দেখে মনে হচ্ছে ভারি কিছু দিয়ে বেশ কয়েকবার চোট মারা হয়েছে। বিছানার চাদরের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ধস্তাধস্তিও হয়েছিল। আর মুখটা—'

'বটে! বটে! বটে! মুখটাও লক্ষ্য করে ফেলেছ? বল দেখি কি দেখছ?'

'সদ্য দাড়ি গোঁফ কামানো। গালে আর চিবুকে এখনো লেগে রয়েছে ট্যালকাম পাউডার। বাথরুমটায় চোখ বুলোলে হত না?'

কাঁচমাচু মুখে কবিতা বললে—'মুখটা আমিও লক্ষ্য করেছিলাম ঠাকুরপো। কিন্তু কথাই বলতে দিলে না....পাউডারটা লাগানো হয়েছে মসৃণভাবে। কোথাও বেশি, কোথাও কম নয়।'

লাফিয়ে উঠে বলল ইন্দ্রনাথ—'বৌদি, তোমার শার্লক হোম্‌স্ হওয়া রোখে কে। জয়ন্ত, অস্ত্র পাওয়া গেছে?'

'পাথরের ভারী হাতুড়ি। এক্সপার্টের মতে, আফ্রিকান কিউরিও। বেজায় ভারী, কিন্তু এবড়ো-খেবড়ো পাথর। খুব সম্ভব টংগু লিনচানের ব্যাগের মধ্যেই ছিল হাতুড়িটা—ট্রাঙ্ক তো এখনো এয়ারপোর্ট থেকে এসে পৌঁছয়নি।'

ইন্দ্রনাথ আর কিছু বলল না। আনমনা চোখে তাকিয়ে রইল শয্যার দিকে। রেক্সিনের ট্র্যাভেলিং ব্যাগটা খাটের ওপরেই বসানো ছিল। পাশেই চারকোল গ্রে কালারের ইভনিং স্যুট—পরিপাটি ভাবে ভাঁজ করা কোট আর ট্রাউজার্স। সাদা শার্ট। হাতের বোতাম। সাদা সিল্কের রুমাল। খাটের তলায় দুজোড়া কালো বুট। এত জিনিস দেখেও যেন সন্তুষ্ট হতে পারল না ইন্দ্রনাথ। বার বার চোখ বুলোতে লাগল ঘরের অন্যান্য জিনিসগুলোর ওপর। অশান্ত চোখ। যেন কিছু একটা খচ খচ করছে বুকের মধ্যে। খাটের পাশেই চেয়ারে পড়ে একটা ময়লা শার্ট, একজোড়া ময়লা মোজা, ময়লা গেঞ্জি আর আণ্ডারওয়্যার—কিন্তু রক্তের ছিটেফোঁটাও নেই ময়লা জামা কাপড়ে। চিন্তান্বিত ললাটে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রইল ইন্দ্রনাথ।

জয়ন্ত বললে—'হাতুড়িটা আমরা নিয়ে গেছি। রক্তে আর চুলে মাখামাখি হয়েছিল বলেই এক্সপার্টরা....আঙুলের ছাপ কিন্তু কোথাও পাওয়া যায়নি। যেখানে খুশি হাত দিতে পার। সব কিছুরই ছবি তোলা হয়ে গেছে, আঙুলের ছাপও খোঁজা হয়েছে।'

নিরুত্তরে একটা কাঁচি ধরাল ইন্দ্রনাথ। আমি আর লম্বোদরবাবু হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম মৃতব্যক্তির পাশে। দুজনেরই উদ্দেশ্য রিস্টওয়াচটা আরো ভালোভাবে দেখা। কবিতা দেখলাম

আঠার মত লেগে রয়েছে ইন্দ্রনাথের পেছনে।

লম্বোদরের উৎসাহ একটু বেশি। তাই ঝটিতি কব্জি থেকে ঘড়িটা খুলে নিয়ে খুট খাট শুরু করে দিলে পেছনের ডালাটা নিয়ে এবং কি কৌশলে জানি না অচিরেই খুট করে খুলে ফেললে ডালাটা। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল সোল্লাসে—'পেয়েছি! পেয়েছি!'

ডালার পেছনে খানিকটা সাদা কাগজের ছিন্ন অংশ আঠা দিয়ে সাঁটা। যেন কিছু একটা টান মেরে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে সেখান থেকে।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললে লম্বোদরবাবু—'একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে।' বলেই একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল টংগু লিনচানের নিষ্প্রাণ মুখের দিকে। সন্ধানী চোখে কি যেন খুঁজতে লাগল।

'মৃগ তুমি?' বলল ইন্দ্রনাথ।

ইন্দ্রনাথের মেস থেকে বেরুবার সময় তাক থেকে ওরই আতসকাঁচটা নিয়ে এসেছিলাম। এখন তা বার করে ঘড়িটা উল্টে পাল্টে দেখতে দেখতে বললাম—'এখন কিছুই বলব না। তবে ঘড়িটা আমার বন্ধুর ল্যাবরেটরীতে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করার অনুমতি দিলে ভাল হয়।'

ইন্দ্রনাথ জয়ন্তর দিকে তাকাতেই জয়ন্ত ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। ইন্দ্রনাথ বললে—'নিতে পার। জয়ন্ত, ঘর, ফায়ারপ্লেস, বাথরুম—সমস্ত তন্ন তন্ন করে সার্চ করা হয়েছে কি?'

আঙুল মটকাতে মটকাতে জয়ন্ত বললে—'দেখছিলাম কখন তুমি প্রশ্নটা কর। ফায়ারপ্লেসে দারুণ ইন্টারেস্টিং কয়েকটা জিনিস পাওয়া গেছে।'

ফায়ারপ্লেসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। ডামি ফায়ারপ্লেস। আগুন কস্মিনকালেও জ্বলে না—শুধু ইয়োরোপীয় পরিবেশ সৃষ্টির জন্যই তা নির্মিত। কিন্তু এ হেন চুল্লীতেই জমে খানিকটা ছাই। এবং সে ছাই অতি বিচিত্র ছাই—কেন না তা কাঠের নয়, কয়লার নয়, এমন কি কাগজেরও নয়।

যকের ধন প্রাপ্তির আশা নিয়ে ছাইয়ের গাদা খোঁচাতে শুরু করল ইন্দ্রনাথ রুদ্র এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বিচিত্র ভস্মস্তূপের মধ্যে আবিষ্কৃত হল বিচিত্রতর দশটি বস্তু।

অদ্ভুত দশটি বস্তু। ছাইয়ের গাদায় থেকে তারা ভস্মাচ্ছাদিত। তবুও চিনতে অসুবিধে হল না। আটটা চ্যাপ্টা ঝিনুকের বোতাম আর দুটো অদ্ভুত-দর্শন ধাতব বস্তু। একটা তিনকোণা, অনেকটা চোখের আকারে। আরেকটা আঁকশির মত। দুটোরই আকার খুব ছোট এবং দুটোই খাদ মিশানো কোনো সস্তা ধাতুতে তৈরি। আটটা ঝিনুকের বোতামের মধ্যে দুটো অপেক্ষাকৃত বড়। প্রতিটি বোতামের কিনারায় পল তোলা এবং কেন্দ্রে সুতো গলানোর চারটি ছিদ্র।

দশটি বস্তুই কিন্তু আগুনে ঝলসানো।

বিড়বিড় করে বলল জয়ন্ত—'ইন্দ্রনাথ, এই দশটা জিনিস নিয়ে ভাবতে ভাবতেই আমার মাথা ধরে গেল, কিন্তু সুরাহা হল না।'

নীরবে পোড়া বোতাম, তেকোণা ধাতু আর আঁকশি নাড়াচাড়া করতে করতে ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলে—'ফায়ারপ্লেস শেষবার কে সাফ করেছে খোঁজ নিয়েছ?'

'নিয়েছি। পারুলই সাফ করেছে।'

'কখন?'

'আজ সকালে সাতটার একটু পরেই। সাতটার সময়ে একজন বোর্ডার ঘর ছেড়ে দেয়। তাই টংগু লিনচান আসার আগেই ঘর সাফ করে দেয় পারুল।'

নাইট টেবিলের ওপর বোতাম, আঁকশি আর তেকোণা ধাতুটা রেখে ট্র্যাভেলিং ব্যাগের ভেতরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করল ইন্দ্রনাথ। ভেতরটা অত্যন্ত অগোছালো, যাচ্ছেতাইভাবে হাঁটকানো। চারটে লম্বা নেকটাই, দুটো ধোয়া সাদা শার্ট, মোজা, আণ্ডারওয়্যার আর রুমাল ঠাসা ব্যাগের মধ্যে। প্রতিটি শার্ট আর আণ্ডারওয়্যারের ওপর লেবেল আঁটা একই ওস্তাগরের— 'ম্যাকিনসন্স্, জোহানেসবার্গ।'

দেখে শুনে বন্ধুবরের খিঁচড়ে যাওয়া মেজাজটা কিঞ্চিৎ শরিফ হল বলেই মনে হল। খুশী খুশী মুখে গিয়ে দাঁড়াল ওয়ার্ডরোবের সামনে। টুইডের ট্র্যাভেলিং স্যুট, আর বাদামী রঙের একটা কোট ছাড়া ভেতরে আর কিছুই নেই।

সশব্দে পাল্লাটা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। সঞ্চরমান দৃষ্টি স্থির হল দেরাজের ওপরে। প্রথম তাকটা শূন্য। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ড্রয়ার খুলেও কিছু পাওয়া গেল না।

জয়ন্ত বললে—'বৃথা খুঁজছ। জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখবারও সময় দেওয়া হয়নি মিঃ লিন্চানকে। উঁহু, টেবিলেও কিছু নেই। যা আছে তা বাথরুমেই।'

যেন এই কথাটুকুর জন্যেই অপেক্ষা করছিল কবিতা। জয়ন্তর কথা ফুরোতে না ফুরোতেই জ্যামুক্ত শায়কের মত সাঁ করে ছুটে গেল বাথরুম লক্ষ্য করে। পেছন পেছন সমান বেগে ছিটকে গেল লম্বোদর লস্কর। অগত্যা আমিও পেছনে পড়ে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলাম না।

চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ঠোঁটের কোণে আলগোছে একটা 'কাঁচি' ঝুলিয়ে আমাদের কীর্তিকলাপ লক্ষ্য করতে লাগল ভারতের প্রথম কনসাল্টিং ডিটেকটিভ ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

বেসিনের ওপর খোলা রেক্সিনের টয়লেট-কিট। সাবান আর চুল লাগা আধোয়া সেফটি রেজরের পাশেই দাঁড় করানো ভিজে শেভিং বুরুশ। এক টিউব শেভিংক্রীম। ছোট্ট একটিন ট্যালকাম পাউডার আর এক টিউব টুথপেস্ট। কলের পাশেই গড়াগড়ি যাচ্ছে প্লাস্টিকের শেভিং বুরুশ রাখবার আধার—ঢাকনাটা পড়ে টয়লেট কীটের ওপর।

লম্বোদরবাবুর মুখটা লম্বা হয়ে গেল। নিরাশ কণ্ঠে বললে—'কিসসু নেই এখানে।'

আমি বললাম—'সত্যিই তাই। শুধু বোঝা যাচ্ছে, দাড়ি কামানো শেষ হতে না হতেই খুন হয়ে গেছেন টংগুমশাই। সেটটা ধুয়ে রাখবারও সময় পান নি।'

কবিতা কিন্তু কালো হীরের মত ঝিকিমিকি চোখে বলল—'তুমি কিগো, অন্ধ নাকি!' বলেই গটগট করে বেরিয়ে গেল বাইরে। পেছনে লম্বোদর লস্কর।

বিমূঢ়ভাবে জিনিসগুলো আর একবার উল্টেপাল্টে দেখলাম। শেভিং বুরুশের ঢাকনা উল্টে দেখলাম ভেতর দিকে খাপে খাপে লাগানো এতটুকু একটা প্যাড। উল্লেখযোগ্য আর কিছুই না পেয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলাম অপলক চোখে ঢাকনিটার দিকে তাকিয়ে ঘন ঘন সিগারেট ফুঁকছে ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

বেডরুমে ফিরে এসে দেখি হোটেল ম্যানেজার পিটার ড্যানিয়েল হাত-মুখ নেড়ে তর্ক করছে জয়ন্তর সঙ্গে। মুখ টিপে জয়ন্ত শুনে যাচ্ছে।

পেছন পেছন ইন্দ্রনাথ এসে বললে—'ব্যাপার কি? গোলমাল কিসের?' চারদিকে টি

টি পড়ে গেল যে। এদিকে সকাল থেকে স্টাফকে ধরে রেখেছেন আপনারা। নাইট শিফট আরম্ভ হতে চলল, বাড়ি যাওয়ার জন্য সব ছটফট করছে—আমারও সেই অবস্থা। অথচ আপনারা—'

মাঝপথেই ড্যানিয়েলকে থামিয়ে দিয়ে ইন্দ্রনাথ বলল—'জয়ন্ত, তোমরা যা দেখবার দেখেছ। আমরাও দেখলাম। এখন আর খামোকা এঁদের হয়রান করে কোন লাভ নেই।'

'অলরাইট মিঃ ড্যানিয়েল, আপনারা যেতে পারেন।' বললে জয়ন্ত।

পিটার ড্যানিয়েল উধাও হতেই ইন্দ্রনাথ ফিরে দাঁড়াল আমাদের দিকে। হিরো-হিরো কায়দায় একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে—'লম্বোদরবাবু কিছু বলবেন?'

'আমার একটা ঠিকানা চাই।'

ফস করে কবিতা বলে উঠল—'আরে, আমিও তো তা চাই।'

আমি বললাম—'আমি চাই এমন একটা জিনিস যা এই হোটেলেই আছে।'

'বেশ তো,' স্মিত মুখে বলল ইন্দ্রনাথ। 'তোমাদের যা যা দরকার, একতলায় সার্জেন্ট অচল দত্তের কাছে চেয়ে নাও। তারপর দু ঘণ্টা সময় দিলাম। দুঘণ্টা পরে সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টার সময়ে আমার মেসে এসে দেখা করো। দেখা যাক কার দৌড় কদ্দূর পর্যন্ত।'

সবার আগে ঘর থেকে বেরুলো কবিতা এবং সবার শেষে আমি। বেরুতে বেরুতে শুনলাম ইন্দ্রনাথ বলছে—'ওহে জয়ন্ত, তোমার সঙ্গে আমার কিছু সিরিয়াস আলোচনা আছে।'

দু'ঘণ্টা পর। ইন্দ্রনাথের মেস। সেই ভাঙা তক্তপোষ, নড়বড়ে চেয়ার আর টেবিল।

কলের পুতুলের মতই এতক্ষণ চা বিস্কুট খাচ্ছিল লম্বোদরবাবু আর কবিতা। আমি মৌনীবাবা হয়ে গেছিলাম সাময়িকভাবে।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ইন্দ্রনাথ বললে—'আর দেরি কেন? লম্বোদরবাবু, বলুন আপনার সিদ্ধান্ত।'

'শুধু সিদ্ধান্তই নয় ইন্দ্রনাথবাবু, তার চেয়েও এক কাঠি এগিয়েছি আমি।'

'যথা?'

'সমাধানে পৌছেছি।'

'তাই নাকি! তাই নাকি! কিভাবে পৌছলেন বলুন তো?'

'আমার একমাত্র সূত্র হল রিস্টওয়াচটা। চামড়ার ব্যাণ্ডে দুটো দাগ। যে দাগটা সবচাইতে কম গভীর—সেই দাগেই ঘড়ি পরে আছেন টংগু লিনচান। এই থেকেই সিদ্ধান্তে পৌছলাম যে ঘড়িটা আসলে তাঁর নয়।'

'তবে কার?'

'হত্যাকারীর।'

'কিন্তু অকুস্থলে হত্যাকারী নিজের ঘড়ি ফেলে যাবে কেন?'

'পুলিশকে বিপথে চালনা করার জন্যে। ডাক্তার বলছেন, মিঃ লিনচান মারা গেছেন এগারোটা থেকে এগারোটা তিরিশ মিনিটের মধ্যে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘড়ির কাঁটা দাঁড়িয়ে গেছে এগারোটা পঞ্চাশ মিনিটে। কেন?'

'কেন?'

'কারণ, হত্যাকারী খুন করার সময়টা ইচ্ছে করেই এগিয়ে দিতে চেয়েছে। অথচ নিহতর হাতে ঘড়ি নেই। তাই নিজের হাতের ঘড়ি খুলে আছড়ে মেরে কাঁচ ফাটিয়েছে, কলকব্জা বিগড়েছে—তারপর কাঁটা ঘুরিয়ে এগারোটা পঞ্চাশ মিনিটের ঘরে এনে পরিয়ে দিয়েছে মিঃ লিনচানের কব্জিতে। কিন্তু তাঁর কব্জি মোটা অথচ হত্যাকারীর কব্জি সরু—তাই ব্যাণ্ডটা লাগল অন্য ঘাঁটিতে।'

'ব্রিলিয়ান্ট। কিন্তু এটাতো সমাধান হল না। হত্যাকারী কে?'

'হত্যাকারী একজন স্ত্রীলোক। তাই তার কব্জি সরু।'

'বটে! বটে! কিন্তু কে সে?'

'টংগু লিনচানের তালাক দেওয়া বউ। খুনের মোটিভ, গায়ের জ্বালা মিটানো।'

শুনে নাকের ডগাটা সামান্য কুঁচকালো কবিতা। আমিও বিশেষ উৎসাহ বোধ করলাম না। দেশে শুনে মিইয়ে গেল লম্বোদর লস্কর। মিনমিনে স্বরে বললে—'আরো প্রমাণ আছে।'

'আছে নাকি?'

'ঘড়ির পেছনের ডালায় ভেতর দিকে খানিকটা ছেঁড়া কাগজ লেগে ছিল। যেন টান মেরে কিছু ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। ঘড়ির ভেতরে একটি জিনিসই রাখার রেওয়াজ ছিল এককালে—ফটোগ্রাফ। টংগু লিনচানের ঘড়িতেও ছিল একটা ফটো এবং সে ফোটোতেই সম্ভবত ছিল হত্যাকারীর চেহারা। তাই যাবার সময়ে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে ছবিটা। আমি রিপোর্টারের ছদ্মবেশে দেখা করলাম মিঃ লিনচানের আগের বউয়ের সঙ্গে। তার টেবিলেই একটা ফ্যামিলি অ্যালবাম দেখলাম। একটু নাড়াচাড়া করতেই পেলাম একটা ফটোগ্রাফ—একজন পুরুষ আর স্ত্রী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। কিন্তু তাদের মুণ্ডুদুটোই নেই—গোল করে কেটে ফটো থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে—রয়েছে শুধু ধড়। আর প্রমাণের দরকার আছে?'

ঈষৎ দমে গিয়ে বললে ইন্দ্রনাথ—'না, আর দরকার নেই। মৃগাঙ্ক, তোমার সিদ্ধান্ত?'

'লম্বোদরবাবুর মত আমারও সূত্র ঐ ঘড়ি,' বললাম আমি। 'তবে ব্যাণ্ড নিয়ে অযথা মাথা ঘামাইনি। ঘামিয়েছি ঘড়ির শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে।'

'ঘড়ির আবার শ্বাসপ্রশ্বাস! বলো কি হে?'

'ঘাবড়াও মৎ। জগদীশ বোসের থিওরী আওড়াচ্ছি না। তবে ঘড়িও নিশ্বেস নেয়, নিশ্বেস ছাড়ে।'

'ভারী ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো। রীতিমত গবেষণা।'

'ঠাট্টা করো না। হাতের চামড়ায় ঘড়ি লেগে থাকার সময়ে গায়ের উত্তাপে ঘড়ির ভেতরকার বাতাসও গরম হয়ে প্রসারিত হয়ে যায়। আয়তনে বেড়ে যায়। আয়তনে বেড়ে যাওয়ার ফলে বাতাস পেরিয়ে যায় কাঁচের ফাঁক দিয়ে, ছোটখাট চিড় দিয়ে। সেকেলে ঘড়ির ক্ষেত্রে এ জিনিসটা আরো বেশী দেখা যায়। টংগু লিনচানের ঘড়িও আধুনিক নয়।'

'বেশ।'

'ঘড়ি যখন হাত থেকে খুলে নামিয়ে রাখা হয়, তখন ভেতরের বাতাসও আবার ঠাণ্ডা হয়ে সঙ্কুচিত হয়। ফলে বাইরের বাতাস ফুটো কাঁচের ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ে ভেতরে। সেই সঙ্গে বাতাসের ধুলোও পথ করে নেয় ভেতরে।'

'তারপর?'

'সেই কারণেই, রুটিওলার ঘড়িতে পাওয়া যায় ময়দার ধুলো, ইঁটের পাঁজার মালিকের ঘড়িতে জমে ইঁটের ধুলো। টংগু লিনচানের ঘড়িতে কি পেয়েছি জান?'

'কি?'

'মেয়েদের ফেস্-পাউডার।'

'বটে!'

'জান তো, খুঁতখুঁতে মেয়েরা গায়ের রঙ মিলিয়ে ফেস পাউডার কেনে। ঘড়ির মধ্যে যে ফেস্ পাউডার পেলাম তা সাধারণত কালো মেয়েরাই ব্যবহার করে।'

'এবং সে কালো মেয়েটি কে?' ইন্দ্রনাথের স্বর এবার তীক্ষ্ণ।

বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে সগর্বে বললাম—'পারুল।'

ভীষণ চমকে উঠল ইন্দ্রনাথ—'পারুল কি হে?'

'কেন নয়? দুশ্চরিত্র টংগু লিনচান নিশ্চয় পারুলের গায়ে হাত দিতে গেছিল, তাই—'

খুক খুক শব্দ শুনে দেখি মুখে শাড়ির খুঁট চাপা দিয়ে ওদিকে তাকিয়ে আছে কবিতা।

গরম হয়ে বললাম—'এত হাসি কিসের?'

জবাব দিলে ইন্দ্রনাথ। বলল—'বৌদি হাসছে পর্বতের মূষিক প্রসব দেখে। সাধে কি বলি গল্প লিখলে ঘিলু কমে যায়। আরে ব্রাদার, পারুলকে দেখে মনে হয় কি ফেস্ পাউডারের বিলাসিতা করার মত সখ অথবা সাধ্য তার আছে? ঘড়ি পরা তো দূরের কথা। দূর, দূর। বৌদি, তুমিই শুধু বাকী রইলে। শোনাও তোমার থিওরী।'

সঙ্গে সঙ্গে কবিতা বললে—'ঘড়ির সূত্রটা কোন সূত্রই নয়। এ নিয়ে এতটা সময় নষ্ট করা স্রেফ আহাম্মকি।'

তেড়ে উঠে বললাম—'বাজে কথা না বলে প্রমাণ করো এটা কোন সূত্রই নয়।'

'করবই তো,' সমান তেজে জবাব দিল কবিতা। 'পাকিস্তান সময় আর ভারতীয় সময়ের তফাতটা জানা আছে?'

বিদ্রূপতরল কণ্ঠে বললাম—'তার সঙ্গে খুনের সম্পর্ক কি?'

কণ্ঠে ততোধিক শ্লেষ ঢেলে কবিতা বলল—'সেইটাই তো একমাত্র সম্পর্ক। ঘড়িটা টংগু লিনচানেরই। ঢাকায় গিয়ে তিনি পাকিস্তানের ঘড়ির সঙ্গে সময় মিলিয়েছেন। কলকাতায় এসে এখানকার সময়ের সঙ্গে ঘড়ি মিলনোর ফুরসৎ পাননি। কে না জানে, ঢাকার সঙ্গে ইণ্ডিয়ার সময়ের তফাত পুরো আধ ঘণ্টা। মানে, ঢাকায় যখন বারোটা, এখানে তখন সাড়ে এগারোটা।'

মেশিনগানের মত মোক্ষম যুক্তি বর্ষণে মুখ শুকিয়ে গেল আমার। লম্বোদরবাবুর মুখটা আবার লম্বা হয়ে গেল। আর ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ইন্দ্রনাথের চোখ।

বলল—'ক্যাপিটাল বৌদি, ক্যাপিটাল। শার্লক হোমস হওয়ার যোগ্যতা একমাত্র তোমারই আছে। এ পর্যন্ত ঠিকই বললে। তারপর?'

'খুনী কে, তা আমি জানি। না, না, টংগুর তালাক দেওয়া বউ নয়, পারুলও নয়। আগে শোনই না। সবাই দেখেছ, মিঃ লিনচানের মুখের পাউডারের প্রলেপ। খুব মসৃণ প্রলেপ।

গাল আর সেভিং সেটের অবস্থা দেখে জানা গেল খুন হওয়ার ঠিক আগেই দাড়ি কামিয়েছেন তিনি। ঠাকুরপো, দাড়ি কামানোর পর তুমিও পাউডার লাগাও।'

'লাগাই বই কি।'

'কি ভাবে লাগাও?'

'এটা আবার কি প্রশ্ন?'

'বলই না, কি ভাবে লাগাও?'

'কেন আঙুল দিয়ে লাগাই।'

'ঠিক। আমার কর্তাটিরও সেই অভ্যেস। আশা করি, লম্বোদরবাবুরও। আসলে পুরুষমাত্রই গালে পাফ লাগানোর ধার ধারে না। তাই তারা আঙুলে করে পাউডার নিয়ে গালে ঘষে দেয়। ফলে জ্যাবড়া হয়ে কোথাও বেশি কোথাও কম ভাবে লেগে থাকে পাউডার। কিন্তু মেয়েরা পাফ ছাড়া পাউডার লাগায় না। তাই তাদের মুখে পাউডার অমন মোলায়েম ভাবে মাখানো থাকে। যেমন আমার। পাউডার মেখেছি বলে মনে হয়?'

'তা হচ্ছে বই কি—'

'হলেও তোমাদের মত অত বিশ্রীভাবে মনে হয় না,' ঝটিতি জবাব দিল কবিতা। 'টংগু লিনচানের মুখে কিন্তু যেভাবে পাউডার লাগানো হয়েছে, তা পাফ ছাড়া লাগানো সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর ঘরে তন্নতন্ন করে খুঁজেও পাফ পাওয়া যায় নি।'

এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল ইন্দ্রনাথ। এবার যেন স্বস্তির নিঃশ্বেস ফেলে বললে—'তাহলে বৌদি, তুমি বলতে চাও যে, টুংগু লিনচানের দাড়ি কামানো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল একজন মেয়েছেলে, কামানো শেষ হলে আদর করে নিজের ভ্যানিটিব্যাগ খুলে পাউডারও মাখিয়ে দিলে ভদ্রলোককে এবং তারপরেই দমাস করে পাথরের হাতুড়ি মেরে গুঁড়িয়ে দিল মাথা। তাও কি সম্ভব?'

'ডাইভোর্স করা বউয়ের পক্ষে সম্ভব না হতে পারে, কিন্তু রক্ষিতার পক্ষে সম্ভব। একমাত্র তারাই আগের মুহূর্তে দেবী, পরের মুহূর্তে দানবী হতে পারে। টংগু লিনচানের কলকাত্তাই প্রেয়সী ভায়োলেট অ্যালক্যাটরার সঙ্গে ঘণ্টাখানেক আগেই দেখা করে এসেছি আমি। জ্ঞানপাপী তো, তাই কিছুতেই স্বীকার করতে চাইল না যে টংগু লিনচানকে পাউডার মাখিয়ে এসেছে আজ সকালে।'

পোড়া সিগারেটটা টোকা মেরে জানলাপথে উধাও করে দিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে—'তোমরা তিনজনেই মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছ। প্রত্যেকেই নিজের নিজের যুক্তি অনুযায়ী নিজস্ব থিওরী গড়ে নিয়েছ। সেজন্যে তারিফ করছি তিনজনকেই। তবে কি জান—'

'কি?' সমস্বরে জিজ্ঞেস করি আমরা।

'তোমরা তিনজনেই ভুল করেছ।'

কিছুক্ষণ সব চুপ।

তারপর, শাড়ি খুঁট আঙুলে পাকাতে পাকাতে বাঁকা সুরে কবিতা বলে উঠল—'তোমার মত দেমাকি মানুষের কাছ থেকে ঠিক এই কথাটাই শোনার আশায় ছিলাম এতক্ষণ।'

'আরে! আরে! আবার সেই মেয়েলী অভিমান। ঠোঁট না ফুলিয়ে আমার দুটো কথা যদি দয়া করে শ্রবণ কর, তাহলেই বুঝবে কেন বললাম তিনজনেই ভুল করেছ।'

'ভনিতা না করে বললেই হয়।'

'তোমরা তিনজনেই সেই একই ভুল করেছ। অর্থাৎ, চোখ-কান খোলা রেখে নতুন নতুন সূত্রকে কাজে না লাগিয়ে আগে থেকেই গড়ে নেওয়া থিওরীকেই খাড়া করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছ। একই সূত্র ধরে একই যুক্তির পথ বেয়ে প্রত্যেকেই চোখ-কান বুজে দৌড়েছ নিজের নিজের সিদ্ধান্তের দিকে। আশপাশে তাকাওনি। তাই ফেল করলে শোচনীয় ভাবে।

'লম্বোদরবাবু, আপনার থিওরী ঝুলছে একটি মাত্র সুতোর ওপর—গোল করে কেটে নেওয়া ফটো। কিন্তু সেটা তো নেহাতই কাকতালীয় হতে পারে। এর বশে তো কোন ভদ্রমহিলাকে খুনী সাব্যস্ত করা যায় না। যায় কি? অসম্ভব।

'মৃগাঙ্ক, তুমি যে এমন আনাড়ির মত থিওরী খাড়া করবে, আশা করিনি। রঙ মিলিয়ে ফেস্ পাউডার ব্যবহার করা অথবা হাতে রিস্টওয়াচ পরা পারুল কেন, বাংলাদেশের ঝি-শ্রেণীর কোন মেয়ের পক্ষেই সম্ভব নয়।

'আশা ছিল বৌদির ওপর। ঢাকার সময়ের সঙ্গে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইমের প্রভেদটুকু পর্যন্ত তুমি দিব্বি বললে। ভয় হয়েছিল, হয়তো টেক্কা মারবে আমার ওপর। কিন্তু যে বনেদের ওপর তোমার থিওরী খাড়া করলে, গোড়ায় গদল রয়ে গেল সেইখানেই। তুমি বলছ, পাফ দিয়ে পাউডার মেখেছেন টংগু লিনচান, অথচ ঘরে পাফ নেই। কিন্তু আমি বলব আছে।'

'কোথায়?'

'শেভিং ব্রাশ রাখার প্লাস্টিক কৌটোটা দেখেছ?'

'দেখেছি।'

'তার ক্যাপটা?'

'দেখেছি।'

'দেখোনি। দেখলে পাফটা দেখতে পেতে। ভেতর দিকে ছোট্টা একটা মখমলের পাফ লাগানো ছিল আগে থেকেই—টয়লেট-কিট যারা তৈরি করেছে, তারাই লাগিয়ে দিয়েছে। সুতরাং বৌদি, অতীব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, খুনীর কাছাকাছি এসেও পাশ কাটিয়ে গেলে। সব চাইতে মজার ব্যাপার, তিনজনেই খুনী সাব্যস্ত করলে একজন স্ত্রীলোককে। অথচ আমার হিসেব অনুযায়ী হত্যাকারী একজন পুরুষ।'

'প্রমাণ?' বন্দুকের বুলেটের মত প্রশ্ন নিক্ষেপ করলাম আমি।

'সামনেই ছিল। কিন্তু চোখের ব্যবহার করোনি—প্রত্যেকেই আগে থেকেই ভেবে নেওয়া সিদ্ধান্তকে কায়েমী করার মতলবে অমন চোখে আঙুল দেওয়া প্রমান দেখেও দেখোনি। আমি আটটা ঝিনুকের বোতাম আর ধাতুর টুকরো দুটোর কথা বলছি।

'যে ফায়ারপ্লেসে কখনো আগুন জ্বলে না, সেখানে খানিকটা ছাই পড়ে। টংগু লিনচান নিশ্চয় হাত-পা ছড়িয়ে বসার আগে কিছু পোড়ানোর জন্যে ব্যস্ত হন নি। তবে কাজটা কার? নিশ্চয়ই হত্যাকারীর। আগুন জ্বালিয়ে প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করার অপচেষ্টা। ছাইটা কাগজের নয়, কাঠের নয়, কয়লার নয়। ছাইয়ের গাদায় পড়ে আটটা পোড়া বোতাম। ছ'টা ছোট, দুটো বড়। পৃথিবীতে একটিমাত্র জিনিসই আছে যার মধ্যে থাকে এই আটটা বস্তু। শার্ট। ওপেন ব্রেস্ট ফুলশার্টের সামনে থাকে ছ'টা ছোট বোতাম আর দু-হাতায় দুটো বড় বোতাম। ছাইটা

কাপড়ের। অর্থাৎ ফায়ারপ্লেসে কেউ একটা ফুলশার্ট পুড়িয়েছে—পোড়াবার সময়ে খেয়ালই ছিল না যে ঝিনুকের বোতাম আগুনকেও কদলী প্রদর্শন করতে পারে।

'এবার ধাতুর জিনিস দুটো। একটা তেকোণা আর একটা আঁকশি। ওপেনব্রেস্ট ফুলশার্ট যে পরে, সে টাউজার্স পরে। আর টাউজার্স যে পরে, সাধারণত সে টাই পরে। ধাতুর জিনিস দুটোও এসেছে বো-টাই থেকে। রেডিমেড বো-টাই বাজারে কিনতে পাওয়া যায়—কিনলে 'বো' বাঁধার ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না।

'লম্বোদরবাবু, আপনি বললেন বটে, টংগু লিনচান রক্তমাখা হাতে কিছু একটা আঁকড়ে ধরেছিলেন। কিন্তু সেটা যে হত্যাকারীর শার্ট হতে পারে, তা বললেন না। বিছানার চাদর দেখেই তো বোঝা যায় ধস্তাধস্তি হয়েছে। মাথায় প্রথম বাড়ি খেয়ে লড়েছেন মিঃ লিনচান, খামচে ধরেছিলেন হত্যাকারীর শার্ট আর বো-টাই। কিন্তু তবুও প্রাণে বাঁচেন নি।

'লুটিয়ে পড়লেন মিঃ লিনচান। এদিকে হত্যাকারী পড়ল বিপদে। রক্তমাখা শার্ট আর বো-টাই নিয়ে বেরনো যায় কি করে? হত্যাকারী যদি হোটেলের বাইরের লোক হত অথবা হোটেলের বোর্ডার হত, তাহলে কোটের কলার তুলে বো-টাই ঢেকে বেরিয়ে গেলেই কারো সন্দেহ হত না। বো-টাই যে পরে, সে কোটও পরে। কিন্তু তা না করে হত্যাকারী রক্তমাখা শার্ট আর বো-টাই আগুনে পুড়িয়ে মিঃ লিনচানের ব্যাগ হাঁটকে সাদা শার্ট আর বো-টাই পরে বেরিয়ে গেছে। এইজন্যেই ব্যাগের মধ্যে লম্বা নেকটাই পাওয়া গেছে। কিন্তু বো-টাই পাওয়া যায়নি। ইভনিং স্যুটের পাশেও তা ছিল না।

'হত্যাকারী তাহলে বাইরের লোক নয়, বোর্ডারও নয়। তাহলে কি হোটেলেরই কর্মচারী? নিশ্চয়ই তাই। কেননা, কর্তব্যরত অবস্থায় রাঁদেভু হোটেলের প্রত্যেককেই ফিটফাট থাকতে হয়। ডিউটি ছেড়ে কোথাও যাওয়াও সম্ভব নয়। তাই নিজের শার্ট আর বো-টাই পুড়িয়ে পরের শার্ট আর বো-টাই পরে ফিরে যেতে হয়েছে তাকে ডিউটিতে।

'আমরা যখন তদন্ত করছি, হত্যাকারী তখন হোটেলেই অন ডিউটিতে রয়েছে। পরনে আছে সাদা শার্ট আর কালো অথবা সাদা বো-টাই। খুব সম্ভব কালো। কিন্তু আমরা দেখেছি রাঁদেভু হোটেলের প্রত্যেক কর্মচারীর শার্টের রঙ ধূসর, টাইয়ের রঙ ধূসর। শুধু একজনের বাদে....হোটেলে ঢুকেই তফাতটা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছিলে?

'করো নি? অন্ধ, অন্ধ, তোমরা তিনজনেই চোখ থেকেও অন্ধ। যাক্‌গে, তোমরা বিদেয় হতেই জয়ন্তকে নিয়ে সেই একজনকে জেরা করতেই সব ফাঁস হয়ে গেল। তারপর শার্ট পরীক্ষা করতেই পাওয়া গেল সেই একই ওস্তাগরের লেবেন—'ম্যাকিনসন্‌স্, জোহানেসবার্গ' অর্থাৎ সাউথ আফ্রিকায় তৈরী জামা যেখানে বছরখানেক থেকে এসেছেন টংগু লিনচান কিন্তু আমাদের সন্দেহভাজন ব্যক্তিটি যে দেশে জীবনে যায় নি।

'তিন মিনিটের মধ্যেই সবকিছু স্বীকার করে বসল হত্যাকারী। অনেক দিন আগেই তার বউকেই ভাগিয়ে নিয়ে গেছিলেন টংগু লিনচান, তারপর প্রয়োজন ফুরোতেই ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত ফেলে এসেছেন। হপ্তাখানেক আগে 'রাঁদেভু হোটেলে' নাম লিখতেই হত্যাকারী তাঁকে চিনেছে এবং প্রতিশোধ নেওয়ার প্ল্যান এঁটেছে। আজ সকালে ঢাকা থেকে ফিরতে না ফিরতেই হাতুড়ি পেটা করে যমালয়ে পাঠিয়ে শোধ নিয়েছে স্ত্রী-হরণের।'

আলোকিত চোখে বললাম—'হত্যাকারী তাহলে—'

'হোটেল ম্যানেজার মিঃ পিটার ড্যানিয়েল,' বলে 'কাঁচি'র প্যাকেট হাতড়াতে লাগল ইন্দ্রনাথ রুদ্র। □

* 'সিনেমা জগৎ' (জুন, ১৯৬৯) পত্রিকায় প্রকাশিত।

ঘড়ি বিবি

বিয়ের আগে ওর নাম ছিল রাবেয়া। বিয়ের পর নাম দিলাম রেবা।

আমি যা ছিলাম, তাই রয়ে গেলাম। মিণ্টু পাইন। সুবর্ণ বণিক।

সিকিখানা কলকাতার মালিক বলতে পারেন আমাকে। বাপঠাকুর্দার আমলে আরও প্রপার্টি ছিল। এখনো মোহর আছে, হীরে জহরৎ আছে। থাকে ব্যাঙ্কের লকারে। টাকা ফিক্সড ডিপোজিটে। সুদ যা পাই, তা শুনলে চোখ কপালে উঠে যাবে আপনার। সেই সঙ্গে বাড়ী ভাড়ার অঙ্ক যদি শোনেন, হিংসে হবেই।

তাই থাকি সাদাসিধেভাবে। সোনার বেনেদের ওপর হিংসে অনেকেরই। সপ্তগ্রামী বেনে তো। কবে কোনকালে ব্যবসা-বাণিজ্য করে আমার পূর্বপুরুষরা দেদার টাকা জমিয়েছিলেন, সুদে-আসলে তা বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে, সারা জীবন লাটসাহেবী করে কাটালেও আমার পরের সাতপুরুষ বসে খেয়ে যেতে পারবে।

আমি কিন্তু কোনরকম নষ্টামির মধ্যে যাইনি। বাবা এবং মা অকালেই স্বর্গধামে রওনা হওয়ার সময়েও আমি ব্যাচেলর। কিন্তু সাতগেঁইয়া স্টাইলে রক্ষিতা-ফক্ষিতাও রাখিনি। আমার একমাত্র নেশা সন্ধ্যে নাগাদ একটা ধনে পরিমাণ আফিং দুধ দিয়ে খাওয়া। আর কেবল দেশ দেখে বেড়ানো। পৃথিবীটাকে বারকয়েক পাক দিয়ে এসেছি।

ফ্র্যাঙ্কলি সব কথা বললাম। এরপর আমার এই আশ্চর্য কাহিনী বিশ্বাস করা না করা আপনার অভিরুচি।

মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারী দেখে বেরিয়ে আসার সময় গাছতলায় একটি পরমাসুন্দরীকে একদিন বসে বসে কাঁদতে দেখে চমকে উঠেছিলাম। আমি সাতগেঁইয়া। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেই ডাকসাইটে সুন্দরীদের দেখেছি ছোটবেলা থেকেই। রূপটুপ তাই কোনোকালেই আমাকে টলাতে পারে না। কিন্তু হাজারদুয়ারীর বাইরে সেই অনিন্দ্যসুন্দরীকে দেখে আপনা থেকেই পা থেমে গেল আমার।

বয়স তার বড় জোর বিশ। কসমেটিকসের ভড়কি একদম নেই চোখে-মুখে। সবটাই ভগবানের দেওয়া। এমন কালো চোখ আমরা সাতগেঁইয়া মহলেও কখনো দেখিনি। অমন ঘন কালো কোঁকড়া চুল, দুধে আলতায় গোলা গায়ের রঙ আর নিখুঁত গড়ন-পেটন সারা পৃথিবী ঘুরে এসেও দেখিনি।

গাছতলায় একলা বসে এমন ভুবনমোহিনীকে কাঁদতে দেখে আমার মন চঞ্চল হয়েছিল। পাশে তার একটিমাত্র বোঁচকা। পরনে সাদা জমিনের লালপাড়ের সাদামাটা শাড়ী। শাড়ীর খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছছে আর কেঁদেই চলেছে সে।

কাছে গেলাম। বৃত্তান্ত শুনলাম। আমিও পরম রূপবান। বিশ্বাস না হয়, এসে দেখে গেলেই পারেন। দুধ আফিংয়ের দৌলতে আর টাকা-টনিকের কল্যাণে সাতগেঁইয়া চেহারা দেখলে মনে হবে নিশ্চয় ধুতি-পাঞ্জাবী-পরা কোন নবাবপুত্তুর বুঝি। যদিও সাদাসিধেভাবে থাকি—

কিন্তু চেহারায় জুলুষ ঢাকা যায় না।

মেয়েটা চোখ মুছে আমাকে দেখেই প্রেমে পড়েছিল। তাই সব কথা খুলে বলেছিল। বাড়ী তার পুব-বাংলায়। বাপ-মাকে খেয়েছে অকালে। এক চাচা তাকে বর্ডার পার করে নিয়ে আসে। তারপর সোনার গয়না ভর্তি পুঁটলিটা সঙ্গে নিয়ে তাকে গাছতলায় বসিয়ে সরে পড়েছে। রেখে গেছে কেবল এই বোঁচকাটা।

আমি মেয়েটাকে নিয়ে এলাম কলকাতায়। জ্ঞাতিগুষ্ঠিদের তোয়াক্কা করলাম না। একবার মসজিদে আর একবার পুরুত ডাকিয়ে—মুসলমানি মতে আর হিন্দুমতে তাকে বিয়ে করলাম। সেই থেকে রাবেয়া হল রেবা।

এইবার আমি আসল গল্পে। রেবার বোঁচকা দিয়েই এই বিচিত্র কাহিনীর শুরু। বোঁচকার মধ্যে যেন সাত রাজার ধন আছে, এমনিভাবেই সবসময়ে তা আগলে রাখত রেবা। একদিন দেখলাম সেই সাত রাজার ধন।

বললে পেত্যয় হবে না আপনার। তবুও বলি। জিনিসটা একটা ঘড়ি। সেকেলে পেণ্ডুলাম ঘড়ি। কিন্তু বাইরের গড়নটা মামুলি ঘড়ির মত নয়। একটা মেয়েছেলের মূর্তি। ঘোমটা ফাঁক করে যেন সে উঁকি দিচ্ছে বাইরে। কিন্তু মুখের বদলে একটা ঘড়ি।

আমি এমন আজব ঘড়ি মশাই জীবনে দেখিনি। সাতগেঁইয়াদের সাতমহলা বাড়ীতে হাজার রকমের দিশিবিলিতি ঘড়ি দেখেছি এতটুকু বয়স থেকে। কিন্তু মেয়েমানুষের চেহারাওয়ালা এমন অদ্ভুত ঘড়ি লাইফে দেখিনি। মেয়েটার মুখ নেই—অথচ তাকে বেশ সুন্দরীই মনে হয়। মনে হয় ঘোমটা সরিয়ে মুখটা দেখি। তার হাঁটু বেঁকিয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গিমার মধ্যেও এমন একটা আকর্ষণ যে একবার তাকালে আবার তাকাতে ইচ্ছে যায়—একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে যায়।

আমিও চেয়েছিলাম। ঘাড়ের ওপর ফোঁস করে নিঃশ্বেস পড়তেই বুঝলাম রেবা এসে দাঁড়িয়েছে। ঘাড় না ফিরিয়েই বললাম—"চমৎকার ঘড়ি তো!"

রেবা জবাব দিল না। আমারও চোখ ফেরাতে ইচ্ছে হচ্ছিল না ঘড়ি-সুন্দরীর ওপর থেকে।

ঘাড় না ফিরিয়েই বললাম—"এমন ঘড়িকে বোঁচকায় রেখেছো কেন? ঝুলিয়ে দাও দেওয়ালে। দু'চোখ ভরে রোজ দেখি।"

রেবা তখনও জবাব দিল না।

আমিও একদৃষ্টে ঘড়ি-সুন্দরীকে দেখতে দেখতে বললাম—"সত্যিই সুন্দরী। তোমার মতই।"

"তাই বুঝি?" খুব আস্তে কানের কাছে কথাটা বলল রেবা। গলার স্বর আর বলার ভঙ্গিটা এমন যে শুনেই খটকা লাগল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম। রেবা অনিমেষে তাকিয়ে আছে সেই ঘড়ির দিকে।

"কার ঘড়ি, রেবা?"

রেবা জবাব দিল না। কোনোদিনই দেয়নি। জিজ্ঞেস করে করে মুখ ব্যথা হয়ে যাওয়ায় আমিও আর জিজ্ঞেস করিনি। শুধু বুঝেছি, ঘড়িটা তার প্রাণ। এবং ঘড়ি নিয়ে কাউকে কোনো কথা বলতেই সে রাজী নয়।

ঘড়িটা কিন্তু জোর করেই আমি আমার শোওয়ার ঘরে টাঙিয়ে দিয়েছিলাম। দিন-কতক

ঠিকমত চলেছিল, সময়ও দিয়েছিল। তারপর একদিন রাত্রে দেখলাম ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে।

মাঝ রাতে উঠেছিলাম পেট ব্যথা করছিল বলে। আফিং খেলে পেটে বড় বায়ু হয়। পেট ফাঁপে। আমারও ঘুম ভেঙে গেছে। এমনিতে বায়ুর রোগ। তার ওপর আফিং। রেবা ঘুমোচ্ছে দেখে আমি নেমে এলাম খাট থেকে। চোখ পড়ল ঘড়ির ওপর।

দেখলাম, পেণ্ডুলাম দুলছে না। তার মানে ঘড়ি থেমে আছে। দম দেওয়া হয়নি বোধহয়।

ও ঘড়িতে দম দেওয়ার ভার অবশ্য আমার নয়—রেবার। দম দেওয়া, তেল দেওয়া—সব ওর কাজ। তাই ঘড়ি বন্ধ দেখে আমি আর ঘড়িতে হাত না দিয়ে খাটের পাশ দিয়ে বাথরুমের দিকে এগোচ্ছি, এমন সময়ে টিক-টক টিক-টক আওয়াজ কানে ভেসে এল।

ঘড়ি তো বন্ধ। অথচ স্পষ্ট পেণ্ডুলাম দোলার আওয়াজ হচ্ছে। ফিরে দেখলাম পেণ্ডুলাম দুলছে না। ঘড়ি বন্ধ। অথচ, টিক-টক টিক-টক আওয়াজটা বেশ শোনা যাচ্ছে। ঘর নিস্তব্ধ বলেই স্পষ্ট কানে বাজছে।

ধুত্তোর। আফিংয়ের মৌতাত তো। বাথরুম থেকে ঘুরে শুয়ে পড়লাম। টিক-টক আওয়াজ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে উঠে চা খেতে খেতে রেবাকে ঘটনাটা বলতেই ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ও মাথায় ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল আমার পাশে। এক হাঁটু বেঁকিয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গিমাটা অনেকটা ঐ ঘড়ি-সুন্দরীর মতই। ঘাড় বেঁকিয়ে মুখের দিকে তাই চেয়েছিলাম। ঘড়ির বদলে অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানা দেখলাম। যেন সমস্ত রক্ত নেমে গেছে সেই মুখ থেকে।

"কি হল?"

ত্রস্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল রেবা। এ সম্পর্কে আর কোনো কথাও হল না পরে।

এরপরেও একদিন রাত্রে দেখলাম, আর শুনলাম সেই একই কাণ্ড। ঘড়ি তো বন্ধ কিন্তু টিক-টক আওয়াজ শোনা যাচ্ছে রেবা।

সকালবেলা কথাটা বললাম রেবাকে। আবার সেইভাবে মুখখানা ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে করে ঘর থেকে ছুটে পালালো রেবা।

তারপর থেকেই দেখতাম, রাত্রে আর রেবা ঘুমোয় না। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে দেওয়ালের ঘড়ির দিকে। ভোর হলেই ঘুমিয়ে পড়ে অকাতরে। যতক্ষণ জেগে থাকে, ঘড়িও চলে বেশ টিক-টক করে।

জোর করে ওকে নিয়ে এলাম পুরীতে। ঘড়িটা আনতে চেয়েছিল সঙ্গে। আমি রাজী হইনি। আমার মন বলছে, ঐ ঘড়িই যত নষ্টের গোড়া। ওকে দূরে রাখা দরকার।

পুরীতে রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল ঢেউয়ের গর্জনে। শুধু ঢেউয়ের গর্জনে নয়—আরও একটা আওয়াজে। টিক-টক শব্দটা যেন কানের কাছেই বাজছে।

উঠে বসলাম। ঘরে কোথাও ঘড়ি নেই। আমার হাতে ইলেকট্রনিক রিস্টওয়াচ। শব্দের বালাই নেই।

টর্চ জ্বেলে দেখছিলাম আশপাশ। হঠাৎ টর্চের আলো রেবার চুলের ওপর পড়তেই চমকে উঠলাম। ওর মাথা ভর্তি ঘন কালো চুলের মধ্যে সেই প্রথম সাদার ঝিলিক চোখে পড়ল। এর আগে ওর মাথায় পাকা চুল কখনো দেখিনি। এই বয়েসে চুল পাকার কথা ভাবাও

যায় না। উদ্বেগে অবশ্য পাকে। ঠিক করলাম, কলকাতায় ফিরেই ডাক্তার দেখাতে হবে।

সকাল হল। আমার আগে অনেক ভোরে উঠে পড়েছিল রেবা। মুখ-চোখ বড্ড ক্লান্ত দেখলাম। যেন রাতারাতি বুড়িয়ে গেছে। মাথার পাকা চুলের সংখ্যা আরও বেড়েছে।

ক্লান্ত চোখে ক্লান্ত কণ্ঠে ও বললে—বাড়ী চলো এখুনি।

সে স্বর, সে চাউনি উপেক্ষা করতে পারলাম না। ফিরে এলাম কলকাতায়। বাড়ীতে ঢোকার মুখেই দেখলাম দরজা খোলা। ভেতরে ঢুকে দেখলাম, চোর পড়েছিল, যা পেয়েছে, নিয়ে গেছে। শোবার ঘরে মেঝের ওপর আছড়ে ফেলে গেছে ঘড়ি সুন্দরীকে।

ধপ করে একটা শব্দ হল পেছনে। রেবা দু'হাতে বুক খামচে ধরে বসে পড়েছে মেঝেতে। মুখ নিরক্ত।

টেলিফোন তুললাম ডাক্তারকে ফোন করব বলে। লাইন খারাপ। বেরোতে যাচ্ছি—বাধা দিল রেবা। কোন কথা না শুনে ছুটে গিয়ে ডেকে আনলাম ডাক্তার।

শোবার ঘরে ঢুকে কিন্তু রেবাকে দেখলাম না—ঘড়ি সুন্দরীকেও দেখলাম না। এক বস্ত্রে বাড়ী ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে রেবা—সঙ্গে নিয়ে গেছে ওর প্রাণ সেই ঘড়িটাকে।

রেবাকে আজ পর্যন্ত আর দেখিনি। আপনার চোখে পড়লে কাইগুলি খবর দেবেন। আমার মন বলছে ওকে কাছে পেলে সেই অদ্ভুত রহস্যের ব্যাখ্যা ঠিক পেয়ে যাবো। নিস্তব্ধ রাতে ঘড়ি বন্ধ থাকলেও ঘড়ি চলার আওয়াজ কোত্থেকে হয়। ঠিক জানতে পারব—কানটা শুধু পাততে হবে—ওর বুকে! □

* 'ক্রাইম' পত্রিকায় প্রকাশিত, ১৯৬৩

শূন্য কলসী

এতটুকু একটা প্লেট। ফিকে গোলাপী প্লাস্টিক পেন্টের ওপর টুকটুকে লাল রঙে লেখা ঃ

ক্যালকাটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সী

রঙ নির্বাচন আর হরফের কায়দা থেকেই বোঝা যায়, এজেন্সীর কর্ণধার যতই অভাবী হোক, তাঁর রুচির অভাব নেই।

কবিতাও বলল, 'ঠাকুরপো নেমপ্লেটটি করেছে বেশ। কিন্তু এই ভাঙা মেসবাড়ি থেকে অফিস না ওঠালে, রেসপেকটেবল্ ক্লায়েন্টরা আসবে কেন?'

কথাটা ঠিক। কবিতার যুগপৎ ভ্রূকুটি আর সনির্বন্ধ অনুরোধেই শেষ পর্যন্ত কলকাতার সর্বপ্রথম প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সী স্থাপিত হল ইন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায়। কিন্তু এই কি অফিস করার উপযুক্ত জায়গা? রঙচটা দরজা আর নোনাধরা দেওয়াল দেখেই উদ্যমের অর্ধেক অন্তর্হিত হয়। তারপর দাঁত বার-করা সিঁড়ি পেরিয়ে ইন্দ্রনাথের ঘরে ঢুকে ভাঙা তক্তপোষ আর নড়বড়ে-পায়া চেয়ার দেখেই তো বাকিটুকু আস্থাও কর্পূরের মত উবে যায়।

তবে হ্যাঁ, এজেন্সীর কর্ণধারকে দেখলে তার অতীত কীর্তিকলাপের কিছু কিছু শুনলে মনে ভরসা আসে বটে। সেদিনও দুজনে ঘরে ঢুকে দেখলাম, তক্তপোষের ওপর আড় হয়ে শুয়ে 'কাঁচি' ধ্বংস করছে ইন্দ্রনাথ। দুই চোখে তার শিল্পীর তন্ময়তা, দৃষ্টির অন্দরে অতলান্ত

বিষাদ, আর ধারালো চিবুক ঠোঁট নাকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বিচ্ছুরণ।

কবিতার চুড়ির রিনিঝিনি আওয়াজেই চমকে উঠছিল ইন্দ্রনাথ। আমাদের দেখেই দু-হাত সামনে প্রসারিত করে মঞ্চ নটের কায়দায় দরাজ গলায় বলে উঠল, 'রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বীরের বীর্য, কর্মীর কর্মোদ্যম, রূপকারের কলাকৃতিত্ব প্রভৃতি সভ্যতার সমস্ত বড় বড় চেষ্টার পিছনে নারীপ্রকৃতির গূঢ় প্রবর্তন আছে।'

ভুরু কুঁচকে কবিতা বললে, 'তোমার অনেক রকম ঢং দেখেছি। কিন্তু এ-ঘরটার ভেতরে এমন কি intellectual beauty-র সন্ধান পেয়েছ যে—'

দমভোর সুখটান দিয়ে গলগল করে নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ইন্দ্রনাথ বললে, 'বসো, বসো, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'

'আরে গেল যা! কি কুক্ষণেই রবীন্দ্র-রচনাবলী তোমাকে দিয়েছিলাম। ওঠো, উঠে পড়ো।'

'কোথায়?'

'বাইরের অক্সিজেনে।'

'কিন্তু জয়ন্ত যে এখনি আসছে!'

'জয়ন্ত! এখন!'

'হ্যাঁ, খবর পাঠিয়েছে সে। একটা নতুন ঝামেলায় ডাক পড়েছে তার, তাই আমাকেও জ্বালাতে চায়। ওই তো এসে গেছে ও।'

সিঁড়িতে ভারি জুতোর আওয়াজ শুনলাম। পরক্ষণেই মসমস শব্দে পুরো পুলিশী ইউনিফর্ম পরে ঘরে ঢুকল জয়ন্ত। ঢুকেই এক চিৎকার, 'আরে, কপোত-কপোতী যে—কি ব্যাপার? এখানে তো নন্দন নিকুঞ্জবন নেই শ্বেতশিলাসনও নেই—তবে কেন বৃথা কালক্ষেপ এই দরিদ্রের কুটিরে?'

কবিতা বলল, 'আমার খুশি। কি জন্যে তুমি এসেছো, তাই আগে শুনি।'

'তারিণী সরখেল আত্মহত্যা করেছেন।'

চট করে উঠে বসল ইন্দ্রনাথ।

'ডক্টর তারিণী সরখেল?'

'হ্যাঁ।'

আলনা থেকে পাঞ্জাবীটায় টান দিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, 'চল, বেরিয়ে পড়া যাক। বৌদি ভাই, মৃগাঙ্ক, আজকের মত বিদেয় হও তোমরা।'

কপাল কুঁচকে কবিতা বললে, 'কেন, আমরাও তো তোমার সঙ্গে আসতে পারি?'

চোখ কপালে তুলে জয়ন্ত বললে, 'কি সর্বনাশ, পুলিশী তদন্তে নারীর উপস্থিতি—'

ইন্দ্রনাথ বোতাম আঁটতে আঁটতে বললে, 'রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, স্ত্রীলোকের বুদ্ধি পুরুষের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প।'

ঝঙ্কার দিয়ে উঠল কবিতা, 'থাক, থাক, আর রবীন্দ্রনাথ কপচাতে হবে না, আমরা যেতে চাই না তোমাদের সাথে।'

আকাশ-পথে নিউইয়র্ক শহরে অ্যাডভেঞ্চারে যাওয়ার সময়ে গগনচুম্বী হর্ম্যনগরী দেখে

টার্জেন মন্তব্য করেছিল—পাথরের জঙ্গল। আধুনিক কলকাতা শহর দেখলেও বোধ করি প্রকৃতিলালিত টার্জেন সেই একই ভুল করত। কিন্তু এই ইট কাঠ পাথরের জঙ্গলও এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, শুরু হয়েছে ঝিকমিকে ঝিল আর সবুজসুন্দর পত্রপুষ্পের চোখজুড়ানো শোভা। এই কলকাতারই শহরতলীতে যে এমন রমণীয় উপবন থাকতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

জায়গাটার একটু ইতিহাস আছে। আসবার পথে জয়ন্তর মুখে তা শুনেছিলাম। ইন্দ্রনাথের টিটকিরির পর অভিমানিনী কবিতা আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করেছিল, অগত্যা আমি একাই এসেছিলাম। তখনই শুনেছিলাম 'মায়াগড়ে'র ইতিবৃত্ত।

বড়িষা গ্রামের সাবর্ণ চৌধুরীর বংশের মনোহর, রামচাঁদ, রামভদ্র প্রভৃতির কাছ থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলকাতা কিনে নেওয়ারও আগে পত্তন হয় এই মায়াগড়ের। প্রাচীন গৌড়ের এক শক্তিশালী নরপতি বর্গীদের অত্যাচার থেকে রাজপ্রাসাদ সুরক্ষিত রাখার জন্যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বৃত্তাকারে পরিখা খনন করেছিলেন। পরিখার সঙ্গে ভাগীরথীর সংযোগ ছিল। মারাঠা দস্যুদের প্রবেশ রোধ করার জন্যে ইচ্ছেমত পরিখার ওপর পাতা পাটাতন টেনে তুলে ফেলা হত। এখন অবশ্য মোটা মোটা মরচে ধরা লোহার শেকল ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই। পরিখার পরেই মাটি আর ইঁটের তৈরি তোরণ। বট-অশ্বত্থের প্রতাপে তা পড়ো-পড়ো হয়েও সমুন্নত। এককালে যা বাগান ছিল, এখন তা অরণ্য। দূরে গাছপালার ফাঁকে ঝিলের ঝিকিমিকি। অন্তঃপুরবাসিনীরা অবগাহন করতেন এইখানেই। উঁচু-নিচু পথ বেয়ে বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে যাওয়ার পর জিপ এসে থামল মূল প্রাসাদের সামনে।

এক নজরেই বোঝা যায় এ সৌধের সৃষ্টি ইংরেজ আগমনের অনেক পরে। সামনের দিকটা ইংরেজী কাসল-এর অনুকরণে তৈরি। সংস্কারের অভাবে কিছুটা জীর্ণ—স্থানে স্থানে আগাছার দৌরাত্ম্যও চোখে পড়ে। এর ঠিক পেছনেই পরবর্তী যুগের তৈরি একটি বিশাল ইমারত। গাড়ি-বারান্দার নিচেই পুলিশের ট্রাক আর একটি জিপ দাঁড়িয়েছিল। দুজন কনস্টেবলকেও দেখলাম সঙীন বাগিয়ে চোখ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে।

জয়ন্ত অন ডিউটি আর এক মানুষ। স্বল্প কথায় স্থানীয় ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে মোটামুটি বিবরণ শুনে নিয়ে, সরাসরি সে এগিয়ে গেল মৃতদেহ যে ঘরে আছে—সেই ঘরে। নীরবে অনুসরণ করলাম আমরা।

একটা মাঝারি প্রকোষ্ঠ। একদিকে লেখবার টেবিল। অপর দিকে কারুকাজকরা সেকেলে কাঠের আলমারিতে সাজানো বিস্তর কেতাব। আর একদিকে দেওয়ালের গা ঘেঁষে সাজানো আরাম কেদারা আর কিউরিও।

টেবিলের ওপরেই মাথা রেখে স্থির হয়ে বসেছিল একটি নিষ্প্রাণ দেহ। কানের ওপর ন্যস্ত মাথার দু-দিকে ছড়িয়ে রয়েছে দুটি হাত। ডান হাতের শিথিল আঙুলগুলো টেবিলের বাহরে ঝুলছে। আর বাঁ-হাতের মুঠিতে ধরা একটি রিভলভার।

মৃতহে ছাড়া যে জিনিসটি সবার আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হল কালির স্রোত। দোয়াতের কালি। আধারটি উল্টেছে টেবিলের ঠিক মাঝখানে। বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় স্রোতের আকারে তা বয়ে গেছে চারদিকে। একটি ধারা এসে পৌঁছেছে মৃতদেহের মাথার ঠিক নীচেই।

জয়ন্ত নিচু হয়ে মাথাটা কাত করলে। তারপর সিধে হয়ে তাকালে ইন্দ্রনাথের পানে।

ইন্দ্রনাথও দেখেছিল। ঠোঁটের ডগায় একটা কাঁচি লাগাতে লাগাতে বললে 'এই জন্যেই আত্মহত্যার কেসে তলব পড়েছে তোর?'

'ঠিক তাই। এটা আত্মহত্যাই নয়, খুন।'

'কী করে?' ফস করে বলে ফেলি আমি।

'ওহো, তুই বুঝি দেখিস নি?'

'কি দেখব?'

'কেন, মাথার নীচে?'

'দেখেছি, কিছুই নেই ওখানে।'

'কিছু না থাকাটাই তো সমস্যা। তুই কি বলতে চাস, আত্মহত্যা করার পর মৃত ব্যক্তি হাত বাড়িয়ে দোয়াতটি উল্টে দিয়েছিলেন?'

অপ্রস্তুত হয়ে যাই আমি।

'তাই কি সম্ভব নাকি?'

'তা না হলে কালির ধারা মাথার নীচেও থাকত, মাথা ঘিরে চলে যেতো না। আচ্ছা ইন্সপেক্টর শিকদার, চিঠিটা কোথায়?'

'যেখানে ছিল, সেইখানেই রেখেছি, স্যার। ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে।' জবাব দিলেন লোক্যাল ইন্সপেক্টর শিকদার।

ঘরের মধ্যে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট ছিল শুধু একটিই, আর তা মৃত ব্যক্তির শূন্যে বেরিয়ে থাকা ডান হাতের শিথিল আঙুলের ঠিক নীচেই।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে ঝুঁকে পড়ল ইন্দ্রনাথ। দোমড়ানো-মোচড়ানো কাগজের স্তূপের ঠিক ওপর থেকেই তুলে আনল এক তা কাগজ। গোটা গোটা অক্ষরে কাগজটির ওপরে লেখা শুধু কয়েকটি পংক্তি :

'এই শেষ। আর আমি তোমাকে জ্বালাবো না। তারিণী সরখেল।'

অর্থাৎ আত্মহত্যার স্বীকারোক্তি। এরপরেও তারিণী সরখেল আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন বলতে গেলে একটু দ্বিধা হয় বৈকি। জয়ন্তকে মৃদু স্বরে এই কথাই বললাম আমি।

জয়ন্ত ঠাট্টা করল না। গম্ভীর মুখে বললে, 'বেশ, আরো প্রমাণ তোমায় দেখাচ্ছি। ইন্সপেক্টর শিকদার, ডাক্তারের রিপোর্ট কি?'

গড়গড় করে মুখস্থ বলে গেলেন ইন্সপেক্টর—

'এক, গুলিটা হৃদপিণ্ড ফুঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছে। দুই, খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে। তিন, গুলিটা একটু ওপরের অ্যাঙ্গেল থেকে করা হয়েছে। চার, গতকাল রাত্রে মারা গেছেন ডক্টর সরখেল।'

জয়ন্ত বললে, 'এছাড়াও উনি তদন্ত করে জেনেছেন, ডক্তর সরখেল ল্যাটা ছিলেন না। অর্থাৎ ডান হাত মুক্ত থাকা সত্ত্বেও বাঁ হাতে-রিভলভার ধরার কোন দরকারই ছিল না তাঁর। কাজে কাজেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ডক্তর সরখেল আত্মহত্যা করেন নি এবং আততায়ী টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ফায়ার করেছিল।'

ইন্দ্রনাথ বলে উঠল, 'আরো আছে। আততায়ী ডক্টর সরখেলের পরিচিতও বটে। কেননা, ঘরের মধ্যে ধস্তাধস্তির কোন চিহ্নই নেই। টেবিলের কাগজপত্রও সুবিন্যস্ত। আক্রান্ত হওয়ার

পূর্ব মুহূর্তেও ডক্টর কিছু বুঝতে পারেন নি—পারলে নিশ্চয় চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠতেন। তাছাড়া, ওঁর মুখ-চোখেও সেরকম কোন ভাব দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া আরাম কেদারার ওপর একটা বিলিতি ম্যাগাজিনও পড়ে রয়েছে। অর্থাৎ আততায়ী নিশ্চয় আরাম কেদারায় বসেছিল, সামনের স্তূপীকৃত ম্যাগাজিনের একটি টেনে নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিল, হয়তো ডক্টর সরখেলের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প গুজবও হয়েছিল! কেননা, আরাম কেদারার সামনে রক্ষিত ছাইদানে সিগারেটের ছাইয়ের সাথে চুরুটের ছাইও আছে। কিন্তু টেবিলের ওপর রাখা ছাইদানে যেখানে হামেশাই ডক্টর সরখেল বসতেন, সেখানে সিগারেটের ছাই ছাড়া আর কিছু নেই।'

অবাক-চোখে ইন্দ্রনাথের বক্তিমে শুনছিলেন লোক্যাল ইন্সপেক্টর শিকদার। মুখের ভাবখানা 'তুমি কোন্ তালেবড় হে!' ইন্দ্রনাথ স্তব্ধ হতেই জয়ন্ত তাই হাসি গোপন করে ভারিক্কি চালে বলে উঠল, 'ইন্সপেক্টর, এঁর নাম নিশ্চয় আপনি শুনেছেন। আমার বিশেষ বন্ধু ইনি—সত্যসন্ধানী ইন্দ্রনাথ রুদ্র। আর ইনি মৃগাঙ্ক চৌধুরী—লেখক, কবি, এবং ইন্দ্রনাথের কাহিনীকার।'

যথারীতি লাফিয়ে উঠলেন ইন্সপেক্টর। উচ্ছ্বাসে একটু স্তিমিত হয়ে আসার পর ইন্দ্রনাথ শুধোলে—'আপনি ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটটা ভালো করে দেখেছেন?'

'আজ্ঞে না। আপনারা আসবেন বলে—'

'আচ্ছা, আমিই দেখছি,' বলে উবু হয়ে বসে পড়ে ইন্দ্রনাথ। উপুড় করে দেয় বাস্কেটটা। ভেতর থেকে খুব বেশি কাগজপত্র অবশ্য পাওয়া গেল না। কতকগুলো পরিত্যক্ত ভেষজ সম্পর্কিত লিটারেচার, একটা পুরোন প্রেসক্রিপসন রেফারেন্স-বুক, আর একটা খবরের কাগজের কাটিং।

ইংরাজী দৈনিকের পাতা থেকে সযত্নে কাঁচি দিয়ে কেটে নেওয়া অংশটা হাতে নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। উল্টে-পাল্টে দেখে নিয়ে ছিন্নপত্রটা তুলে দিলে আমার হাতে।

ভাবলাম, শার্লক হোমসের মত না জানি আবর্জনা-স্তূপ থেকে অতি মূল্যবান সূত্রই আবিষ্কার করে ফেলেছে বন্ধুবর ইন্দ্রনাথ। কাগজটার একদিকে দেখলাম জুতোর পালিশের বিজ্ঞাপন। আর একদিকে শুধু দুটি লাইনঃ

T. S. FRIDAY NIGHT TEN

MOULIN ROUGE. K. L.

এক নজরেই বুঝলাম, অংশটি পার্সোনাল কলমে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল।

নীরবে কাটিংটা তুলে দিলাম জয়ন্তর হাতে। একে একে সবার পর্যবেক্ষণ শেষ হলে পর জয়ন্ত তা নোটবইয়ের ফাঁকে রাখতে রাখতে বললে, 'ইন্দ্রনাথ, ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটটা লক্ষ্য করেছ?'

'করেছি। বেতের বাস্কেট। নিউ মার্কেটে এ জিনিস এন্তার কিনতে পাওয়া যায়।'

'আর কিছু?'

'সম্প্রতি বাস্কেটটা উল্টো করে তার ওপর কেউ দাঁড়িয়েছিল। কয়েক জায়গায় সামান্য মচকে গিয়েছে। যেই দাঁড়াক, ওজন তার খুব বেশি নয়। কেননা, গুরুভার ব্যক্তি হলে অ-মজবুত বাস্কেটকে আর বাস্কেট বলে চেনা যেতো না।'

'ব্যস?'

'স্যার,' আচমকা লাফিয়ে উঠলেন ইন্সপেক্টর শিকদার, 'স্যার, আমি একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি এখান থেকেই।'

এক সঙ্গে তিন জোড়া দৃষ্টি এসে পড়ে শিকদারের উত্তেজিত মুখের ওপর।

'কি?'

'একটা লাল সুতো।'

'কোথায়?'

'বাস্কেটের কোণে; খাঁজে আটকে রয়েছে। অর্থাৎ ইন্দ্রনাথবাবু যা বললেন, তা সত্যি। বাস্কেটের ওপর যে দাঁড়িয়েছিল, তার পরিধেয়র একটা অংশ বাস্কেটের বেতের খোঁচায় আটকে গিয়েছিল। টান মেরে তা ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু সুতোটা থেকে গিয়েছে।'

'বটে,' ভুরু কুঁচকোয় জয়ন্ত, 'তাহলে এর মধ্যেই আততায়ীর চেহারার একটা মোটামুটি বর্ণনা আমরা পাচ্ছি। সে কৃশকায়, অঙ্গে লাল পোশাক, এবং সে ডাক্তার সরখেলের বিশেষ পরিচিত। ফিঙ্গার প্রিণ্ট ব্যুরোতে আমি খবর দিয়ে এসেছি, তারা এল বলে। ম্যাগাজিন, অ্যাস্ট্রে, আর এই আত্মহত্যার স্বীকৃতিপত্রে কার কার আঙুলের ছাপ আছে, তা আমাকে জানতেই হবে। তবে আপাতত এ-ঘরে আর কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। গতকাল রাত্রে এ বাড়িতে কে কে ছিল?'

'ডক্টর সরখেল, মিসেস এবং মিস সরখেল, আর পুরোন চাকর রামহরি।'

'ব্যস? এত বড় বাড়িতে মাত্র একজন চাকর?'

'ডাকব স্যার? এখনই জেরা করুন না?'

'শুধু রামহরিকে ডাকুন।'

কনস্টেবলকে নির্দেশ দিলেন ইন্সপেক্টর সরখেল। তারপর নিহত ব্যক্তির সান্নিধ্য ত্যাগ করে সবাই বেরিয়ে এলাম বাইরে। আসতেই মুখোমুখি হয়ে গেলাম পঞ্চাশোত্তীর্ণ এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে।

ইন্সপেক্টর বলে উঠলেন, 'এই যে রামহরি, তোমাকেই খুঁজতে পাঠাচ্ছিলাম, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'এজ্ঞে, উই পাশটিতে দাঁড়িয়ে ছেলেম।'

বিচিত্র চেহারা প্রৌঢ়ের। বৃদ্ধের মতই পলিতকেশ মাথা। এতটুকু কালো আঁচড়ও দেখা যায় না রুপোর মত ঝকঝকে একরাশ চুলে। চোখেমুখে নিবিড় প্রশান্তির অভিব্যক্তি। ঋষির মতই স্নিগ্ধ সে মুখ; কোন অভাব নেই, দুঃখ নেই, বাসনা নেই। অথচ তাপসিক কঠোরতার লেশমাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না তার ললাটের ভাঁজে, চোখের বহির্বিন্দুর দু-ধারের প্রজ্ঞারেখায়।

নরম সুরে ইন্দ্রনাথ কথা শুরু করলে, 'তোমারই নাম রামহরি? তোমার সঙ্গে আমাদের বিশেষ দরকার।'

'এজ্ঞে।'

'আচ্ছা রামহরি, এ বাড়িতে তুমি কতদিন আছো?'

'তা অনেক দিন হল; এট্টুকু বয়স থেকেই এবাড়িতে এসেছিলেম।'

'তুমি ছাড়া আর কোন....' কথাটা অসমাপ্ত রাখে ইন্দ্রনাথ।

কিন্তু রামহরি বুঝে নেয়। বলে, 'এজ্ঞে, আর কেউ নেই। দরকার কি বলুন? বাবু, মা'মণি আর দিদিমণি বই তো আর কেউ নেই সংসারে? বাড়িটা বড় হলে কি হবে, সংসারটি তো ছোট।'

'তুমিই তাহলে সব কাজ করো?'

'এজ্ঞে, সব। বাজার-হাট, রান্নাবান্না, ঘরদোর সাফ—সব।'

'বাবুর গাড়ি আছে তো?'

'এজ্ঞে আছে; দুটো গাড়ি।'

'ড্রাইভার নেই?'

'এজ্ঞে, না। দরকার হয় না। দিদিমণি, মা'মণি, বাবু—প্রত্যেকেই যে গাড়ি চালাতে জানেন।'

'এত বড় বাড়িতে শুধু ক'টি প্রাণী থাকে, তোমাদের ভয় করে না?'

'এজ্ঞে, ভয় কিসের? এট্টুকু বয়স থেকেই তো রয়েছি এখানে।'

'আচ্ছা রামহরি, তোমার বাবু আত্মহত্যা করলেন কেন? মানে, তুমি তো পুরোন লোক, কাজেই কোন কারণ-টারণ থাকলে নিশ্চয় তা তোমার অজানা নয়।'

মাথা নিচু করে রইল রামহরি। তারপর মৃদুস্বরে বললে, 'এজ্ঞে, এ-বড় কঠিন প্রশ্ন।'

'কেন?'

'আত্মহত্যা তো অনেকেই অনেক কারণে করে!'

'যেমন আর্থিক অভাব?'

'এজ্ঞে, বাবুর টাকার অভাব নেই।'

'সাংসারিক অশান্তি?'

'এজ্ঞে, সেরকম খিটিমিটি সব সংসারেই আছে।'

'আর কিছু?' অর্থব্যঞ্জক চোখে তাকালো ইন্দ্রনাথ।

বুদ্ধিমান রামহরি ইঙ্গিতটুকু বুঝে নিয়ে বললে, 'এজ্ঞে, সেরকম কিছু তো আমি জানি না। দিনের বেশির ভাগ সময় শহরেই কাটাতেন বাবু, বাড়ি ফিরতেন অনেক রাত্রে।'

'সেকি? এরকম নির্জন বাড়িতে!'

'এজ্ঞে, সেইটেই তো তাজ্জব কাণ্ড! আমরা কেউই কোন শব্দ শুনি নি। বাবুর শোবার ঘর নিচেই। রাত্রে তাঁকে বিরক্ত করা বারণ। তাই সকালবেলা চা নিয়ে গিয়ে দেখি এই দৃশ্য।'

পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করল ইন্দ্রনাথ ও জয়ন্ত।

জয়ন্ত শুধোলে, 'আচ্ছা, বাবুর কোন শত্রু আছে বলে জানো কি?'

'এজ্ঞে, তা তো বলা মুস্কিল।'

'বন্ধু?'

'এজ্ঞে, তা আছে নিশ্চয়। তবে এ-বাড়ি শহর থেকে এত দূরে যে, কাউকে বড় একটা আসতে দেখি না। পার্ক স্ট্রীটে বাবুর চেম্বারেই তেনারা যান।'

চুপ করল জয়ন্ত।

তারপর শুধোলে, 'তোমার মা'মণি কোথায়?'

'ওপরে। বড় কাঁদাকাটা করছেন। ডাকবো?'

'না, না, ডাকতে হবে না। তুমি নিচে থাকো, আমরাই যাচ্ছি।'

মিসেস সরখেল তাঁর ঘরেই ছিলেন। কাশ্মীরী জাজিম বিছানা শয্যায় মখমলের উপাধানে মুখ লুকিয়ে শুয়েছিলেন তিনি। দোরগোড়ায় আমাদের পদশব্দ শুনেই ত্রস্তে উঠে বসলেন।

মৃদু গম্ভীর স্বরে জয়ন্ত বললে, 'মাপ করবেন, এ সময়ে আপনাকে বিরক্ত করা যে কতখানি হৃদয়হীনতা, তা আমি বুঝি। কিন্তু কর্তব্য বড় নিষ্ঠুর, কি করি বলুন।'

ভিজে গলায় বললেন মিসেস সরখেল, 'ভেতরে আসুন।'

দেওয়ালের ধার ঘেঁষে পাতা আরাম-কেদারায় বসলাম আমরা। বিষণ্ণ চোখ মেলে তাকালেন মিসেস সরখেল। আমি কবিতা লিখি, তাই বুঝি তাঁর এমন দুঃসময়েও ভারি ভাল লাগল তাঁর চাহনি। বয়স তাঁর চল্লিশের কাছাকাছি। যৌবনকে এখনও তিতি সযত্নে বন্দী করে রেখেছেন ঢলঢলে মুখের মিষ্টি লাবণ্যের পিঞ্জরে। সজল দুই চোখে দেখলাম শ্যামল ঘাসের কান্না। সারা মুখের বিষাদাভা যেন এইমাত্র শুক্লপক্ষের চাঁদকে অস্তাচলে পাঠিয়েছে। আজন্ম আভিজাত্যের মধ্যে ললিতা হলে যে গরিমা মাখানো সৌন্দর্য নিয়ে বঙ্গললনা প্রাণতরঙ্গিনীর কূলে কূলে নৃত্য করে, তাই সম্বল করেই আজ বিধবা হয়েছেন মিসেস সরখেল।

আচমকা অত্যন্ত বেরসিকের মত একটা প্রশ্ন করে বসল ইন্দ্রনাথ, 'মিসেস সরখেল, আপনার স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর ঘরে কি জন্যে গিয়েছিলেন তা বলবেন কি?'

দারুণ চমকে উঠলেন মিসেস সরখেল। আমার চোখে মনে হল যেন বীণার তার ছিঁড়ে গেল, সঙ্গীতের তাল কেটে গেল, কবিতার ছন্দ-পতন ঘটলো। ভীষণ রাগ হয়ে গেল ইন্দ্রনাথের ওপর।

'আমি?' ক্ষীণস্বরে বললেন মিসেস সরখেল।

'হ্যাঁ, আপনি। রামহরির মুখে শুনলাম, আপনারা কেউই ফায়ারিং এর শব্দ শোনেন নি, অথচ তার মৃত্যুর ঠিক পরেই তাঁর টেবিল হাতড়ে ছিলেন কেন, তা জানতে পারি কি?

অসাধারণ সংযম বলে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করেছিলেন মিসেস সরখেল। গোলাপের ভীরু পাপড়ির মত থরথর করে কেঁপে উঠছিল তাঁর অধরোষ্ঠ—গোপন শঙ্কার কৃষ্ণছায়া এসে পড়েছিল দুই মণিকায়। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই প্রশ্ন-বাণের আকস্মিকতা কাটিয়ে উঠলেন উনি। আরক্ত থমথমে মুখে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি বলতে চান?'

অকস্থাৎ কররেখা নিরীক্ষণে তন্ময় হয়ে গেল ইন্দ্রনাথ। মুখ না তুলেই ধীর শান্ত সুরে থেমে থেমে বললে, 'দেখুন, আমি যা জিজ্ঞেস করেছি, তার মধ্যে অস্বচ্ছতা কিছুই নেই। তবুও যদি প্রশ্নটাকে পুনরাবৃত্তি করতে বলেন—'

'না আমি যাই নি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললে ইন্দ্রনাথ। এবার নখের ডগাগুলো পর্যবেক্ষণ করতে করতে বললে, 'মিসেস সরখেল, অনুমতি করেন তো একটা কথা বলি।' বলে, অনুমতির অপেক্ষা না করেই ঢিমেতালা স্বরে বলে চলে, 'আমরা এসেছি সত্যের সন্ধানে, অন্যায়ের উদঘাটনে। সেক্ষেত্রে আমাদের কাছে কিছু গোপন করার প্রচেষ্টা করা মানেই আপনার স্বামীর প্রকৃত হত্যাকারীকে আত্মগোপন করতে সাহায্য করা।'

যেন চমকে উঠলেন মিসেস সরখেল, অন্তত আমার তো তাই মনে হল।

'হত্যাকারী! কি বলছেন কি?'

'আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি আত্মহত্যা করেন নি—নিহত হয়েছেন। আমরা এ-কথাও জানি, তাঁর মৃত্যুর পর আপনি তাঁর ঘরে গিয়েছিলেন।'

'না!'

'সে সময়ে আপনার পরনে ছিল লাল শাড়ি।'

'না!'

'আপনি ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট উল্টে তার ওপর দাঁড়িয়েছিলেন।'

'না!' রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠি ভদ্রমহিলার কাগজের মত সাদা মুখ দেখে।

তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে ইন্দ্রনাথ। বিদ্যুৎবেগে সামনে এগিয়ে গিয়ে মিসেস সরখেলের ডান হাত টেনে নিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটা তুলে ধরে ইস্পাতের মত কঠিন গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে বলে ওঠে, 'তবে তাঁর টেবিলের এই কালির দাগ আপনার আঙুলে এল কি করে?'

'না, না, না!' আর্ত চিৎকার করে ভেঙে পড়েন মিসেস সরখেল। ছিন্নমূল লতার মতই শয্যার ওপর আছড়ে পড়ে কেঁদে ওঠেন অসহায়ভাবে—ফুলে ফুলে উঠতে থাকে তাঁর দেহ।

পরিস্থিতির নাটকীয়তা আর ক্লাইম্যাক্সের ধাক্কায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। ইন্দ্রনাথ কিন্তু অবিচল। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে কণ্ঠে বজ্রের বিষাণ বাজিয়ে পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণভাবে পালটে ফেলেও এখনও যে তা তার আয়ত্তের বাইরে যায় নি, তা ওর নির্বিকার মুখ দেখেই বুঝলাম। মিসেস সরখেলের হাত ছেড়ে দিয়ে মন্থর চরণে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও।

আর, আমরা নিশ্চুপ হয়ে দেখতে লাগলাম পতিবিয়োগ বিধূরা এক প্রৌঢ়ার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন।

অনেকক্ষণ পরে শান্ত হন মিসেস সরখেল। কিন্তু মুখ তোলেন না উপাধান থেকে। নিবিষ্ট মনে বাগানের দিকে তাকিয়ে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল ইন্দ্রনাথ—আমাদের অস্তিত্বই যেন ভুলে গিয়েছিল। জীবনে উপর্যুপরি আঘাত আর ব্যর্থতার গ্লানিতে বিষিয়ে উঠেছে যার অন্তর, এ যেন সেই অলস চির-ক্লান্ত ইন্দ্রনাথ রুদ্র নয়। ওর কর্তব্য-নিষ্ঠুর গ্র্যানাইট পাথরের মত কঠিন মুখচ্ছবির মধ্যে সন্ধান পেলাম আর এক ইন্দ্রনাথ রুদ্রের।

ফিরে দাঁড়ায় ইন্দ্রনাথ। পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ায় পালঙ্কের পাশে। তারপর সহানুভূতি আর সমবেদনায় কোমল-স্নিগ্ধ সুরে বলে, 'মিসেস সরখেল!'

কোন উত্তর নেই।

'মিসেস সরখেল, আপনি আমাদের ওপর আস্থা রাখুন। বিশ্বাস করুন, আমরা এসেছি আপনার মঙ্গলের জন্যেই। আমাদের উপকারী বন্ধু হিসেবেই গ্রহণ করুন। আপনার গতিবিধির অনেক খবরই আমরা সংগ্রহ করেছি, এক্ষেত্রে কোন কিছু গোপন করতে গেলেই আইনের রক্ত-চক্ষু থেকে তো আপনি রেহাই পাবেন না।'

এতক্ষণ পরে মাথা তুললেন মিসেস সরখেল। শিশিরে ভেজা পদ্ম-পলাশের মত দুই চোখ মুছে বললেন, 'কিন্তু বিশ্বাস করুন, সে ঘটনার সঙ্গে এই দুর্ঘটনার কোন সংযোগ নেই।'

'তবুও আমাদের তা জানা দরকার।'

'কিন্তু সে-কথা যে পাঁচজনকে বলার মত নয়।'

ক্ষণেক নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। তারপর বলল, 'বিশ্বাস করলাম। আচ্ছা, আমার পরিচয়টা আপনাকে এখনও দেওয়া হয় নি, আমি সরকারী গোয়েন্দা নই—বেসরকারী অর্থাৎ প্রাইভেট ডিটেকটিভ। কাজেই যে কাহিনীকে সরকারী নথিপত্রে স্থায়ীভাবে রেখে যেতে আপনার দ্বিধা, এত ভয়—তা অসঙ্কোচে আমার কাছে বলতে পারেন। আমি কথা দিচ্ছি, সে-কাহিনীর সাথে যদি আপনার স্বামীর হত্যারহস্যের কোন সংযোগ না থাকে, তবে তা কোনদিনই লোকসমাজে প্রচারিত হবে না।'

আমি বহুবার ভেবেছি, frustrated না হয়ে গিয়ে ইন্দ্রনাথ যদি অভিনয়জগতে আবির্ভূত হত, তাহলে কুশলী শিল্পী হিসেবে যশস্বী হতে ওর বেশি দিন লাগতো না। কণ্ঠের উত্থান-পতন, প্রবল ব্যক্তিত্ব আর চোখ-মুখের ভাবপ্রকাশ খুশিমত নিয়ন্ত্রণ করার ঈশ্বর প্রদত্ত গুণটি থাকার ফলে যে কোন পরিস্থিতিকে ঢেলে সাজিয়ে, নিজের আয়ত্তে আনা ওর কাছে ছেলেখেলা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন অনাত্মীয়ও পরম আত্মীয় হয়ে উঠে মনের মণিকোঠার অর্গল খুলে দিত ইন্দ্রনাথের সামনে। স্বয়ং নগর-কোটাল এবং ধর্মাবতার এলেও যা সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ, তা মুহূর্তের মধ্যে সহজ হয়ে উঠল ওর কণ্ঠের এই যাদুর জন্যে। কণ্ঠে নির্ভরতা ঢেলে মিসেস সরখেল আমাদের পানে তাকিয়ে শুধু বললেন 'কিন্তু—'

আর বলতে হল না; সর্বাগ্রে উঠে দাঁড়াল জয়ন্ত, তার পরেই আমি আর ইন্সপেক্টর শিকদার অনুসরণ করলাম তার দৃষ্টান্ত—একটি কথাও না বলে তিনজনে নেমে এলাম নিচে।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, মিনিট পনেরোর মধ্যেই ইন্দ্রনাথ নেমে এল আমাদের পাশে।

ভাবলেশহীন মুখে বললে 'এবার আর একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা বাকি।'

'মিস শকুন্তলা সরখেল। উনিও ওপরে আছেন।' বললেন ইন্সপেক্টর।

ইন্দ্রনাথ জয়ন্তর পানে তাকালে। জয়ন্ত বললে, 'চলো, সেরে আসা যাক।'

দোতলাতেই করিডরের আর এক প্রান্তে দক্ষিণ খোলা একটি ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা। দরজা খোলা। পুরু হ্যাণ্ডলুমের পর্দা ঝুলছিল সামনে। তারই ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম, জানলার সামনে আমাদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন তন্বী তরুণী। জাফরানী রঙের চোলী আর আশমানী রঙের শাড়ির ওপর ফণিণীর মত এলিয়ে রয়েছে একটি দীর্ঘ বেণী। দুই হাতে জানলার গরাদ ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি।

এ অবস্থায় সাড়া না দিয়ে ঘরে প্রবেশ করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। কাজেই জয়ন্ত হাত তুলেছে দরজায় টোকা দেওয়ার জন্যে, এমন সময়ে একটা কাণ্ড ঘটল।

তীক্ষ্ণ শিস দেওয়ার একটা স্পষ্ট শব্দ শুনলাম। শব্দটা এলো বাগানের দিক থেকেই।

শব্দটা মিলোনোর আগেই চনমনে হয়ে উঠল তন্বী মূর্তি। উদগ্র উত্তেজনায় দুই গাল চেপে ধরল গরাদের ওপর। তারপরেই একটা হাত বারবার আন্দোলিত হল শূন্যে। একটি মাত্র অর্থই সুস্পষ্ট হল এই হাত নাড়ার মধ্যে এবং তা না-বাচক!

অল্পক্ষণ পরেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে জানলার সামনে থেকে সরে এলো রহস্যময়ী নারী মূর্তি এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গলা খাঁকারি দিয়ে ভারি গলায় জয়ন্ত বলে উঠল, 'ভেতরে

আসতে পারি?'

দারুণ চমকে উঠল তরুণী মেয়েটি। সামনে ভূত দেখলেও বুঝি মানুষ এতটা চমকে ওঠে না। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে কাষ্ঠহেসে হেসে কোন মতে বলে উঠল, 'ও, আপনারা—মানে—পুলিশ—'

ধন্য নারী, ধন্য তোমার চির-অতলান্ত রহস্য আর ছলনার অপরিসীম ক্ষমতা! চমকিত না হয়ে উপায় ছিল না।

এবারেও নাটক শুরু করল ইন্দ্রনাথ স্বয়ং। জয়ন্তকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে উঠল, 'চলে গেছে তো?'

থমকে গেল সামনের পক্ক বিম্বাধরের ঋজু দেহবল্লরী। চকিতে স্ফুরিত হয়ে উঠল পাতলা নাসারন্ধ্র। কৃষ্ণশিলায় খোদিত আননের প্রসাধনকলায়, নয়নের রুচিসুন্দর কজ্জ্বললেখায়, পরনের উজ্জ্বল আশমানী রঙা অঞ্চলের বঙ্কিম রেখায় আর চারু-ললাটের কুমকুমবিন্দুর রাঙা আভায় নিমেষে স্পষ্ট হয়ে উঠল দৃপ্ত ঔদ্ধত্য। সিংহিনীর মত ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকা সুরে পাল্টা প্রশ্ন করে বসল কৃষ্ণ-সুন্দরী, 'তার মানে?'

হাসি মুখে হাল্কা সুরে জবাব দিলে ইন্দ্রনাথ, 'অত্যন্ত মামুলী প্রশ্ন। আপনার মত বিদুষী প্রগতিশীলা বুদ্ধিমতী মহিলার কাছেও কি এর বিশদ ব্যাখ্যা করতে হবে? তাছাড়া, অনেকক্ষণ ধরে ও-জানলা থেকে তাকে দেখলাম তো!'

তোষামোদের জন্যেই হোক বা ইন্দ্রনাথের 'আমি-সব-জানি' ভাবের জন্যেই হোক, ধীরে ধীরে স্তিমিত প্রদীপশিখার মতই নরম হয়ে আসে তন্বীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

এরপর যা ঘটল, তা সংক্ষেপে পূর্ব ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। অর্থাৎ ইন্দ্রনাথ একাই ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে নাটক জমিয়ে তুলে ক্লাইম্যাক্স এনে ফেললে এবং আগের মতই আমাদের বিদায় করে অশ্রুনয়না শকুন্তলা সরখেলের কাছে শুনতে বসল তার গোপন কাহিনী।

এরপরের একঘেয়ে পুলিশী তৎপরতার বিবরণ দিয়ে কাহিনীকে ভারাক্রান্ত করতে চাই না। মোটের ওপর, রাত নটার আগে শহরতলীর এই রহস্যময় উপবন 'মায়াগড়' থেকে বেরোতে পারলাম না আমরা তিন বন্ধু।

পথে পড়েই রহস্যতরল কণ্ঠে বললাম, 'কি হে ইন্দ্রনাথ, শ্যামা শিখরদশনা পীন পয়োধরার সঙ্গে কি কি গোপন কথা বলে এলে জানতে পারি কি, না কবিতাকে এ-জন্যে নিয়োগ করতে হবে?'

কাঁচির আগুনের আভায় দেখলাম, গোঁফের একপ্রান্ত বেঁকিয়ে ফিক করে হাসল ইন্দ্রনাথ। বলল, 'সেটুকু না হয় সাসপেন্সই থাকুক।'

'দেখ বন্ধু, শার্লক হোমস্‌কে নকল করো না। মা আর মেয়ের মুখে কি কি গোপন কথা শুনেছ, তা না শোনা পর্যন্ত আমি ঘুমোতেই পারব না।'

'উঁহু, এখন এত কথা বললেই কাহিনীর রসটুকুই নষ্ট হয়ে যাবে। তাছাড়া, তোমাকে দারুণ সাসপেন্সের মধ্যে রাখতে পারলে পাঠকসমাজেরই লাভ। নিজে সাসপেন্সে ছটফট না করলে লেখার মধ্যে সে সাসপেন্স আসবে কেন?'

অগত্যা মৌন হলাম।

পাঠিকাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। গৃহিণীর সাথে মতবিরোধ এবং ঘোরতর কলহের সম্ভাবনা আছে জেনেও, একটি কথা এই কাহিনীপ্রসঙ্গে নিবেদন করার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। 'রুপোর টাকা' উপন্যাস পড়ার দুর্ভাগ্য যাঁদের হয়েছে, তাঁরা জানেন পূর্বরাগের পরেই এই হতভাগাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়েছিল। এত কাণ্ডের পরেও কিন্তু নারীজাতির মনের অন্দরমহলের বিস্তর অলি-গলি সম্বন্ধে এখনো আমি পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হতে পারি নি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস বিধাতার সৃষ্ট এই ফুরফুরে জীবগুলি প্রয়োজনমত দেবী ও দানবী উভয় রূপই ধারণ করতে পারে।

প্রখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তারিণী সরখেলের হত্যা-রহস্যের গ্রন্থি মোচন করতে গিয়েও আমি সন্দেহ করে বসলাম পূর্ববর্ণিত দুই স্ত্রী-চরিত্রকে। বিশেষত প্রথম সাক্ষাতেই তাঁদের সন্দেহনজনক কার্যকলাপের যেসব নিদর্শন শুনলাম এবং দেখলাম এরপর আর কোন প্রমাণ ব্যতিরেকেই তাঁদেরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো চলে।

পরের দিন দুপুরে এ সম্পর্কে অনেক ভেবে-চিন্তে আরো তদন্তসাপেক্ষ দুটি সিদ্ধান্ত আমি মনে মনে খাড়া করে ফেললাম। সরকারী আর বেসরকারী গোয়েন্দা-বন্ধু দুজনের ক্ষুরধার বুদ্ধি যাতে আমার এই সিদ্ধান্ত-পক্ষীর পক্ষ যুক্তিশরে ছিন্নভিন্ন করতে না পারে, সেই জন্যে বসে বসে যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করছি, এমন সময়ে টেলিফোন এলো ইন্দ্রনাথের কাছ থেকে।

'আজকের স্টেটস্‌ম্যান দেখেছিস?'

'দেখেছি।'

'পার্সোনাল কলম?'

'না। কেন?'

'কাল রাত্রেই জয়ন্ত গিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে এসেছিল ওদের অফিসে। কাগজটা দয়া করে খোলোই না কলমবাগীশ।'

খুললাম। রিসিভার রেখে দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলাম মজাদার বিজ্ঞাপনগুলোর ওপর দিয়ে। এক জায়গায় এসে থমকে থেমে গেলাম।

K.L. TODAY NIGHT TEN
MOULIN ROUGE T.S.

রিসিভার তুলে নিয়ে বললাম, 'দেখেছি।'

'কি বুঝলি?'

'পণ্ডশ্রম।'

'বটে! কেন শুনি?'

'খুন যে অথবা যাঁরা করেছেন, তাঁরা ওই মায়াগড়েই রয়েছেন বহাল তবিয়তে।'

হাসির শব্দ ভেসে এল তারের মধ্যে দিয়ে।

'এ সম্বন্ধে দীর্ঘ বিতর্কের প্রয়োজন। আপাতত টেলিফোনের মধ্যে সেটা সম্ভব নয়। সংক্ষেপে বলি, এটা একটা চান্স। পেপার কাটিংয়ের K.L. নামধারী ব্যক্তিই যে হত্যাকারী, তা আমি বলছি না। তবে সে যদি হত্যাকারী হয়, তবে সে আজ রাত্রে মূলাঁ রুজে আসবে না। এলে বুঝব, সে নির্দোষ। অবশ্য তাকে চিনতে পারব কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে,

তাই মিস শকুন্তলা সরখেলও আমাদের সঙ্গে থাকছেন যদি সনাক্ত করতে পারেন, এই আশায়।'

'বুঝেছি।'

'কি বুঝেছো?'

'তুমি মরেছো।'

তাড়াতাড়ি বলে ওঠে ইন্দ্রনাথ, 'আরে না, না, তা নয়। তোমরা, এই বিয়ে-করা লোকগুলো, সব সময়ে ব্যাচেলরদের এমন সব সন্দেহ করে বসো, যে—'

আমার কাছে ওসব সাফাইয়ের দরকার নেই ভাই, আমি কবিতাকে দিচ্ছি।'

কবিতা পাশেই ছিল। রিসিভারটা আমার হাত থেকে নিয়েই তো প্রথমে বেশ করে দু কথা শুনিয়ে দিলে। তারপর লাইন কেটে দিয়ে আমার পানে ফিরে বললে, 'ঠাকুরপো কি বলছে জানো?'

'কি?'

'বলছে, তুমি তো বোম্বাই নগরীর ধনীর দুলালী, তবুও তোমাকে ৩৬০০০ টাকা খরচ করে তৈরী একটা মেয়েদের বাথরুম দেখাবো, যদি আজ ঠিক রাত দশটার সময়ে মূলাঁ রুজে আসো। তাছাড়া, বর্তমান কেসের কৌতূহলোদ্দীপক উপসংহার দেখারও আশা করতে পারি। তোমাকে বলেছে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'কই আর বললো। বৌদিঅন্ত প্রাণ তার।'

ঝঙ্কার দিয়ে উঠল গিন্নী, 'মরণ! ও আবার কি কথা!'

পার্ক স্ট্রীটের মূলাঁ রুজ রেস্তোরাঁ।

ঘূর্ণায়মান আলোক-উইণ্ডমিলের সামনে এসে যখন দাঁড়ালাম, তখন দশটা বাজতে দশ মিনিট।

ঢুকেই বাঁদিকে কোণের কেদারাগুলো রিজার্ভ করে রেখেছিল আমার আই. ডি. ডি. বন্ধু জয়ন্তকুমার। আসর জমিয়ে বসেছিল সে, ইন্দ্রনাথ আর শকুন্তলা সরখেল।

কবিতার সঙ্গে শকুন্তলার পরিচয়পর্ব সাঙ্গ হলে পর শুধোলাম, 'শুধু কি আমরাই আছি, না জয়ন্ত অন্যান্য সাঙ্গ-পাঙ্গও এনেছো?'

'প্রয়োজন আছে কি?' বললো জয়ন্ত।

লক্ষ্য করলাম, দু-বন্ধুরই সজাগ চাহনি প্রবেশ-পথের ওপর নিবদ্ধ। যতবার দরজা খুলে যাচ্ছে, ততবারই চকিত হয়ে উঠেছে দুজনে, এবং শকুন্তলা সরখেলও দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে প্রতিজনের ওপর।

কব্জি-ঘড়িতে দেখলাম, ছোট কাঁটাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে বড় কাঁটা; রাত দশটা।

অনেকেই টেবিল ছেড়ে উঠে গেল। এল নতুন যুগলমূর্তি। নতুন তান ধরল ক্যাবারে মিউজিক পার্টি। গমগমে জ্যাজ সঙ্গীত।

রাত দশটা পনেরো মিনিট।

হতাশ হয়ে তাকালাম বন্ধুদের পানে। একমাত্র শকুন্তলা সরখেলই দেখলাম অবদমিত

উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছে, হাতে ধরা কফির পেয়ালাও নিষ্কম্প নয়।

চুক চুক করে চুমুক দিতে দিতে ইন্দ্রনাথ বললে কবিতাকে 'বৌদি, ছত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে তৈরি জুলিয়েটদের বাথরুমটা দেখে এস এইবেলা—মাথা ঘুরে যাবে'খন।'

কিন্তু তার আগেই আবার খুলে গেল স্প্রিংডোর—টকটকে লাল রঙের পুরু গালিচার ওপর পা দিলেন খদ্দর পরিহিত এক প্রৌঢ়মূর্তি। চোখে পুরুলেন্সের মোটা চশমা। মুখভাব অত্যন্ত গম্ভীর।

মুখটা যেন কোথায় দেখেছি দেখেছি বলে মনে হল—বড় পরিচিত মুখ। কানের কাছে ফিসফিস করে উঠল জয়ন্ত, 'কার্তিক লাহিড়ী।'

কার্তিক লাহিড়ী! পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম জাঁদরেল মন্ত্রী কার্তিক লাহিড়ী। কেন্দ্রীয় দপ্তরে যাঁর অসীম প্রভাব, বাংলার জনগণ-মানসে যিনি বর্তমানে ধ্রুবতারার মত প্রোজ্জ্বল—সেই কার্তিক লাহিড়ী এত রাতে মূলাঁ রুজে?

পরক্ষণেই দারুণ চমকে উঠলাম আমি। হয়তো চেঁচিয়েই উঠতাম যদি না ইন্দ্রনাথ পাশ থেকে মোক্ষম চিমটি কেটে স্তব্ধ করে দিত আমায়।

কার্তিক লাহিড়ী! K. L.! ইনিই কি তাহলে স্টেটম্‌ম্যানে বিজ্ঞাপিত সেই K. L.?

অদূরেই একটা শূন্য টেবিল অধিকার করেছিলেন স্বনামধন্য মন্ত্রী কার্তিক লাহিড়ী। চারপাশের বিলাতী পরিচ্ছদ আর ফরাসী পরিবেশের মাঝে তাঁর খাঁটি গান্ধী পোশাক বেশি করে প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। কিন্তু সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ আছে বলে মনে হল না। স্টুয়ার্ড এসে অর্ডার নিয়ে যাওয়ার পর ইয়া মোটা একটা সিগার বার করে অগ্নিসংযোগ করলেন তিনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই কফির সরঞ্জাম এসে পৌঁছলো। অন্যমনস্কভাবে ধূমোদগীরণ করতে করতে কফি তৈরি করলেন। তারপর পকেট থেকে একটা শিশি বার করে খানিকটা তরল পদার্থ ঢাললেন পেয়ালার কফিতে— সম্ভবত কৃত্রিম শর্করা—চিনি খাওয়া নিষেধ স্বাস্থ্যের জন্যে।

আরও মিনিট কয়েক পরে জয়ন্ত চোখের ইঙ্গিত করল ইন্দ্রনাথকে। উঠে দাঁড়াল দুজনে। —আমিও কলের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে—তিনজনেই লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেলাম মন্ত্রীমহাশয়ের টেবিল অভিমুখে।

টেবিলের সামনে পৌঁছলাম। আসন গ্রহণ করলাম। কিন্তু ভাবগতিক দেখে মনে হল, পৃথিবীতে ওই টর্পেডোর মত চুরুট ছাড়া আর কোন বস্তু আছে বলে মন্ত্রীমহোদয়ের জানা নেই। কিন্তু আমার সন্দেহ হল আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে উনি অনেক আগে থেকেই সচেতন— বোধ করি আমাদের জোড়া জোড়া শিকারী কুকুরের মত একাগ্র দৃষ্টির জন্যেই।

গলা-খাঁকারি দিয়ে জয়ন্ত বললে, 'নমস্কার স্যার, এ সময়ে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত। আমি ডি-ডি'তে হোমিসাইড সেকশনের ইনচার্জ।'

'আমিও তাই অনুমান করেছিলাম,' সিগার না নামিয়েই এই প্রথম গুরুগম্ভীর স্বরে কথা বললেন কার্তিক লাহিড়ী।

কোনরকম গৌরচন্দ্রিকা না করে কথোপকথনকে একেবারে সংক্ষিপ্ত করে আনলে জয়ন্ত। কর্তব্যকঠিন নীরস স্বরে বলে উঠল, 'নিশ্চয় শুনেছেন গাইনিকোলোজিস্ট তারিণী সরখেল আত্মহত্যা করেছেন?'

'আত্মহত্যা করে নি; খুন হয়েছে।'

'আপনি জানলেন কি করে?'

'খুনটা আমিই করেছি।'

স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম আমি। আমার সুহৃদযুগলের অবস্থাও যে তথৈবচ, তা পাশে না তাকিয়েও বুঝলাম আমি।

ক্ষণেকের জন্যে কনসার্ট স্তব্ধ হতেই থমথমে নৈঃশব্দ্য নেমে এল চার দেওয়ালের মধ্যে।

ইন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম ফিসফিস করে বলে উঠল, 'আপনি বিষ খেলেন?'

'হ্যাঁ, খেলাম। ঘরে ঢুকেই শকুন্তলাকে দেখেছিলাম আমি। তাছাড়া, বিজ্ঞাপন পড়েই বুঝেছিলাম আমার লীলাখেলা ফুরিয়েছে। আশা করি, আমার আঙুলের ছাপও পেয়েছো তোমরা। তাছাড়া, কাজটা করার পর আমার অনুতাপের অন্ত নেই। কিন্তু সব ব্ল্যাকমেলিংয়েরই তো এই একই পরিণতি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মন্ত্রী কার্তিক লাহিড়ী। নির্মীলিত চোখে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'সময় খুব সংক্ষিপ্ত—কাজেই তোমাদের রিপোর্টের খোরাক এখুনি দিয়ে যাচ্ছি। তারিণী সিকদার আমার বাল্যবন্ধু। তার মত শয়তান, সমাজশত্রু আর নিষ্ঠুর মানুষ আর দুটি দেখি নি। ছাত্রজীবনেও তার কীর্তিকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম আমরা। কিন্তু সে মেধাবী। তাই স্ত্রীরোগ বিদ্যায় বিলেত থেকে বিশেষজ্ঞ হয়ে এল সে। আর এই বিদ্যাই হল তার পাপাচারের প্রধান হাতিয়ার। সব কথা বলার সময় নেই, শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, তার মৃত্যুতে সমাজের ক্ষতি হয় নি এতটুকু, বরং উপকার হয়েছে প্রচুর। সম্ভ্রান্ত ঘরের কত নিরীহ মহিলা আর পুরুষ নিস্তার পেয়ে গেল তার বিরাট ব্যাপক শোষক যন্ত্রের নিষ্পেষণ থেকে।

'জীবনে আমি একবারই ভালবেসেছিলাম—এবং তা যৌবনে, যখন ভোমরার গুঞ্জনকে মনে হত মোজার্টের সঙ্গীত। জীবনে তখনও আমি প্রতিষ্ঠা পাই নি—কিন্তু মেয়েটি ছিল বাংলার এক বিখ্যাত ধনীর একমাত্র কন্যা। কাজেই যা হবার, তাই হল। এই মুহূর্তে সে এখন এই কলকাতারই নাইট-খেতাব-ধন্য এক সুবিখ্যাত ধনকুবেরের ঘরণী। পূর্বরাগকালীন উচ্ছ্বাস মুহূর্তে আমাকে কয়েকটা চিঠি লিখেছিল সে। তার কয়েকটিতে দুর্বার প্রণয়াবেগের এমন নিদর্শন ছিল, এবং এমন কয়েকটি নিষিদ্ধ কথা ছিল, যার প্রতিলিপি কাগজে কাগজে ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢি-ঢি পড়ে যাবে বাংলাদেশে, এবং মেয়েটির তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।'

জীবনীশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসার জন্যেই বুঝি একনাগাড়ে এতগুলি কথা বলে বেদম হয়ে পড়েছিলেন কার্তিক লাহিড়ী। দম নেওয়ার জন্যে থামতেই ইন্দ্রনাথ শুধোলে, 'সেই চিঠিগুলো ডক্টর সরখেলের হস্তগত হয়েছে?'

'হ্যাঁ। এবং এই চিঠি কাগজে ছাপিয়ে দেওয়ার হুমকি দেখিয়ে সে এত বছর ধরে সমানে আমাকে আর সেই মেয়েটিকে শোষণ করে এসেছে। শেষ পর্যন্ত আমি মরিয়া হয়ে গেলাম; ভেবে দেখলাম, এভাবে সারাজীবন নিদারুণ উদ্বেগের মধ্যে থাকার চাইতে এরকম একটা ক্লেদাক্ত জোঁককে পৃথিবী থেকে চিরতরে মুছে দেওয়াই ভাল।

'তাই সেদিন রাতে মায়াগড়ে গিয়েছিলাম সাইলেন্সার ফিট করা রিভলভার নিয়ে। গাড়ি

রেখেছিলাম, প্রধান তোরঙ্গ থেকে অনেকদূরে। তারিণী টেবিলেই বসেছিল। অত রাতে আমাকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল ও। আমি অনেক করে ওকে বোঝালাম, কাকুতি মিনতি করলাম চিঠিগুলো নষ্ট করে ফেলে আমাদের চিরতরে রেহাই দেওয়ার জন্যে। শেষে একটা রফা হলো। চিঠি আমি ফেরৎ পাবো না; কেননা, নিরস্ত্র হয়ে রাজ্যের মন্ত্রীর হাতে নাজেহাল হওয়ার মত উজবুক নাকি সে নয়, তাই চিঠিগুলো সে নিজের কাছেই রেখে দেবে। তবে এই শেষ; একটা মোটা টাকা পেলেই আর সে আমাদের বিরক্ত হরবে না।

'আমিও তাই চাইছিলাম। বললাম, কথাটা লিখে দিতে। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হল সে। কেননা, এ-লেখার কোন মূল্যই তো নেই। কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে গিয়ে দেখে কলমে কালি নেই। দোয়াত খুলে কালি ভরে নিলে সে। তারপর লিখলে ঃ

'এই শেষ। আর আমি তোমাকে জ্বালাবো না।

তারিণী সরখেল।'

'সইটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কুচক্রী তারিণী নিশ্চয় আমার মতলবটা আঁচ করতে পেরেছিল। কিন্তু আমি আর সময় দিলাম না, ও লাফিয়ে ওঠার আগেই টেবিলের সামনে থেকে এক গুলিতে ফুটো করে দিলাম ওর হৃদযন্ত্র। টেবিলের ওপরেই মাথা রেখে চিরকালের মত ঘুমিয়ে পড়ল সমাজের জঘন্যতম অপরাধী তারিণী সরখেল। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে দু'একবার হাত ছুঁড়েছিল—তাইতেই দোয়াতটা গেল উল্টে। স্বীকারোক্তি লেখা কাগজটা পড়ল মেঝেতে। লোহার আলমারির কোন তাকে চিঠিগুলো আছে, তা জানতাম। ওরই পকেট থেকে চাবি নিয়ে আলমারি খুলে চিঠির তাড়াটা পকেটস্থ করলাম। তারপর ওর স্বীকারোক্তি লেখা কাগজটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিয়ে বাঁ-হাতের মুঠিতে গুঁজে দিলাম রিভলভারটা। সাইলেন্সারটা শুধু খুলে নিয়ে রাখলাম পকেটে।

'কিন্তু অনভ্যস্ত খুনী হিসেবে আমি চারটি ভুল করেছিলাম, মাথা ঠাণ্ডা হলে পর ভুলগুলো আপনা হতেই ধরা পড়েছিল আমার কাছে।

'প্রথম ভুল, বাঁ-হাতে রিভলভার দেওয়া। আমি নিজে ল্যাটা। উত্তেজনার মুহূর্তে আমি তাই তারিণীর বাঁ হাত-টাই তুলে নিয়েছিলাম।

'দ্বিতীয় ভুল, খবরের কাগজের কাটিংটা ফেলে আসা।

'তৃতীয় ভুল, বিস্তর আঙুলের ছাপ ফেলে আসা।

'চতুর্থ ভুল, তারিণী স্থির হয়ে যাবার পর দোয়াতের কালি ওর মাথা পর্যন্ত গড়িয়েছিল। আমার উচিত ছিল ওর মাথার নীচেও খানিকটা কালি গড়িয়ে দেওয়া।'

বুক ভরে কয়েকবার শ্বাস নিলেন কার্তিক লাহিড়ী। তারপর স্খলিত স্বরে বললেন, 'কিন্তু এত ভুল সত্ত্বেও আমি সন্দেহের বাইরে থাকতাম। কিন্তু মরেও তারিণী আমায় মেরে গেল। বাড়ি গিয়ে চিঠির বাণ্ডিল খুলতেই তারিণীরই লেখা একটা চিরকুট পেলাম। তাতে লেখা, 'আমার অনিচ্ছায় এই তাড়া যদি তোমার হাতে যায়, তাহলে জেনো তুমি ফেঁসে গেলে। কেননা, এর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ চিঠিটা যাতে যথাসময়ে প্রেসে যায়, সে ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি।'

আবার থামলেন কার্তিকবাবু। শেষবারের মত ফুসফুসে খানিকটা শক্তি সঞ্চয় করে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু সবচেয়ে বড় ভুলটা কি জানো? তোমরা একালের ছেলে, শুনে হাসবে।

কিন্তু আমি এসব খুব মানি। সেই রাত্রে তারিণীকে খুন করার জন্যে বাড়ি থেকে বেরনোর আগে দরজার পাশেই, একটা শূন্য কলসি গড়াগড়ি খেতে দেখেছিলাম। জানি না, জানো কিনা, খনার বচনেই আছে ঃ

শূন্য কলসি শুক্‌না না।
শুক্‌না ডালে ডাকে কা।।
যদি দেখ মাকুন্দ ধোপা।
এক পা যেও না বাপা।।
খনা বলে এ-ও ঠেলি।
যদি সামনে না দেখি তেলি।।'

বলে, পাণ্ডুর মুখে হাসবার চেষ্টা করলেন কার্তিক লাহিড়ী। কিন্তু সে হাসির পরিবর্তে কান্নাই মূর্ত হয়ে উঠল তাঁর পুরু লেন্সের ওপারে ঘোলাটে চোখে।

আর দেরি করা সঙ্গত নয়। উঠে দাঁড়ালাম আমরা তিন বন্ধু। ধরাধরি করে প্রৌঢ় কার্তিক লাহিড়ীকে নিয়ে এলাম বাইরে।

গাড়ির মধ্যেই চির-শান্তির দেশে রওনা হলেন তিনি।

ভাঙা তক্তপোষের ওপর পদ্মাসনে বসে মৌজ করে গঞ্জিকা সেবনের মত কাঁচিতে দমভোর এক টান দিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, 'তারিণী সরখেলের যে একদিন এই রকম শোচনীয় মৃত্যু হবে, তা আমি জানতাম। সেই জন্যেই জয়ন্তর মুখে ভদ্রলোকের আত্মহত্যার খবর শুনে লাফিয়ে উঠেছিলাম আমি। এরকম একটা জঘন্য শোষক কখনো আত্মহত্যা করে না—করতে পারে না।'

কবিতা বললে, 'খামোকা তুমি আবার মরা লোকটাকে গালাগাল দিচ্ছো কেন?'

'খামোকা নয় বৌদি, তারিণী সরখেলের কীর্তিকাহিনী অনেক আগেই আমার কানে এসেছে। মক্কেলের হয়ে তাঁর সঙ্গে আমাকেও মোলাকাৎ করতে হয়েছে। লোকটার নৃশংসতা দেখে আমার গা রী রী করে উঠলেও কিছু করতে পারি নি। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হয়ে তিনি যে কত অভিজাত মহিলার সর্বনাশ করেছেন, তারপর ব্ল্যাকমেল করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই।'

অসহিষ্ণু স্বরে বললাম, 'পাস্ট ইস পাস্ট। আমি এখুনি শুনতে চাই মা আর মেয়ে যে খুন করেন নি, এটা তুমি জানলে কখন?'

'তাঁদের মুখেই শুনলাম। হত্যার রাতে ঘুম না আসায় জানলায় দাঁড়িয়েছিলেন মিসেস সরখেল। হঠাৎ অন্ধকারে একটা ছায়ামূর্তিকে বেরিয়ে যেতে দেখেই সন্দেহ হয় ওঁর। নীচে নেমে এসেই নিহত স্বামীকে দেখে উনি মূর্চ্ছা যান। জ্ঞান ফিরে পান অনেক রাত্রে। কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধি না হারিয়ে চটপট টেবিলের ড্রয়ার থেকে কতকগুলো কাগজপত্র সরিয়ে ফেলেন। আঙুলে কালি লেগে যায় তখনই। ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট উল্টে তার ওপর দাঁড়িয়ে আলমারির তাকেও এই কাগজ খুঁজতে হয়েছে তাঁকে। সেই সময়ে দোমড়ানো বাস্কেটে একটা লাল সুতো লেগে গিয়েছিল।'

কবিতা শুধোলে 'কাগজগুলো কি সম্পর্কিত?'

ইন্দ্রনাথ বললে, 'সেটা গোপনীয়। আমি কথা দিয়েছি।'

চোখ পাকিয়ে কবিতা বললে, 'বটে, আমার কাছে আবার গোপনীয়তা!'

'আঃ, জ্বালিয়ে মারলে। তবে শোন, কিন্তু দয়া করে মেয়েমহলে আলোচনা করো না। তারিণী সরখেল তাঁর স্ত্রীকে বিয়ে করতে বাধ্য করেছিলেন।'

'কি করে?'

'বিয়ের আগেই শকুন্তলা ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। চিকিৎসার অছিলায় এই কাণ্ড করেন তারিণী সরখেল। তারপর বিবাহ এবং মায়াগড়ের মত বিশাল সম্পত্তি লাভ। মায়াগড়ের পুরোন পরিচারক রামহরির মুখেও এ-কাহিনী শুনতে পারো তুমি।'

'কিন্তু কাগজগুলো কিসের?'

'এই কেলেঙ্কারির প্রমাণ ছিল এই সব কাগজপত্রে। মেয়ে বড় হয়েছে, তাই যাতে স্বামীর মৃত্যুর পর একথা আর কেউ না জানতে পারে, বিশেষ করে নিজের মেয়ের কানেও যাতে না ওঠে, তাই অমন দুঃসাহসী হয়েছিলেন মিসেস সরখেল।'

শুধোলাম, 'এতদূর পর্যন্ত বোঝা গেল। কিন্তু বোঝা গেল না শকুন্তলা সরখেলের জানলার সামনে হাত নাড়া আর সেই শিসের অর্থ।'

মুচকি হেসে বললে ইন্দ্রনাথ, 'উঠতি বয়েসে সব জুলিয়েটদেরই ওরকম দু-একটা রোমিও জোটে।'

'ও। কিন্তু শিসটা?'

'ন্যাকামো করো না। বিয়ের আগে প্রেম করার সময়ে শিস টিস দিয়ে বৌদিকে কোনদিন ডাকোনি বলতে চাও?'

'মুখে আগুন তোমার!' বলল কবিতা। * □

*'রোমাঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত (মে-জুন, ১৯৬৪)

রক্তের শয়তান

ইন্দ্রনাথ রুদ্র প্রাইভেট ডিটেকটিভ। অতএব সে সবজান্তা। এইরকম একটা ধারণা স্বয়ং ইন্দ্রনাথের মধ্যেই উঁকিঝুঁকি মারছিল নিশ্চয়। নইলে ইদানীং কথায় কথায় নিজের জয়ঢাক নিজে পিটবে কেন?

সত্যি কথা বলতে কি, হামবাগ ভাবটা আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না। সুনাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রনাথের চরিত্রেও হামবড়া জিনিসটা আসছে দেখে মেজাজ খিঁচড়েছে কতবার।

সেদিন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলাম যখন ইন্দ্রনাথ টিপ্পনী কাটল আমার লেখা নিয়ে। এই একটি ব্যাপারে কেউ খোঁচা মারলে আমি আর শিব হয়ে বসে থাকতে পারি না। গিন্নিকেও রেয়াৎ করি না।

ফট করে ইন্দ্রনাথ বলে বসল, 'মৃগাঙ্ক হল লেখক, আর আরশুলা হল পাখি।'

বলুন দিকি, অর্ধাঙ্গিনীর সামনে এ জাতীয় কথায় মেজাজ ঠিক রাখা যায়? আমিও ঠিক

রাখতে পারলাম না।

রেগে তিনটে হয়ে বললাম, 'রবার্ট ব্লেক যদি গোয়েন্দা হয়, তুমিও তাহলে ডিটেকটিভ।'

পাল্টা আক্রমণের জন্য তৈরি ছিল না ইন্দ্রনাথ। কিন্তু মানুষটা তো মহা ঘুঘু। ভাঙবে তবু মচকাবে না। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে এমন হাসিমুখে তাকাল যেন মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের লীগ খেলা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। বলল স্মিত মুখে, 'রবার্ট ব্লেকের সঙ্গে আমার মিল কোথায়?'

'ম্যাজিক দেখানোয়। সূত্র নেই, যুক্তি নেই—কেবল ভেলকি। ছোঃ!' বলে যেন কিস্তিমাৎ করেছি এমনি একটা ভাব দেখানোর জন্যে জম্পেশ টান দিলাম সিগারেটে এবং ফুকফুক করে ছোট ছোট কয়েকটা ধোঁয়ার রিঙ ছাড়লাম কড়িকাঠের দিকে।

আড়চোখে দেখলাম, সকৌতুকে আমাকে দেখছে ইন্দ্রনাথ। একটু হুঁশিয়ারও হলাম। কেননা, ওর টানা টানা চোখে যে জিনিসটার জিমনাস্টিক দেখলাম, নাম তার দুষ্টবুদ্ধি।

কবিতা টুং-টাং করে চামচ নাড়ছিল কফির পেয়ালায়। কান খাড়া করে শুনছিল দুই বন্ধুর বাকযুদ্ধ। যেন মল্লবীরের পাঁয়তাড়া।

হঠাৎ কবিতাকেই ডাক দিল ইন্দ্রনাথ। বলল, 'ও বৌদি, করছ কি?'

'কফি। তোমার এবং আমার আরশুলা পতিদেবতার।'

বেশ বুঝলাম, কবিতা রাগাতে চায় আমাকে। বুঝেও, রেগে গেলাম। কোন অ্যাংগেলে ওকে ঘায়েল করল ভাবছি; রান্নার দিক দিয়ে, না রূপের দিক দিয়ে, এমন সময়ে ইন্দ্রনাথ ফের বলল কবিতাকে, 'বৌদি, তোমার আরশুলা পতিদেবতার চরিত্রের একটা বিবরণ শুনবে?'

আমার চরিত্রের বিবরণ? কি বলতে চায় ইন্দ্রনাথ? বিষম ভাবনা হয়ে গেল আমার। ইন্দ্রনাথের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই আমার দিকে। বলছে, 'রবার্ট ব্লেকের ঠাকুর্দা এলেও যা বলতে পারবে না, ম্যাজিশিয়ান ইন্দ্রনাথ রুদ্র এবার তাই বলবে। কি দেখে বলবে জানো?'

'মুখ দেখে?' তেরছা চোখে তাকিয়ে বলল কবিতা।

'আরে না, ও-মুখে আছে কি যে দেখব?'

আমার শ্রীহীনতা নিয়ে এত বড় একটা খোঁচাও গায়ে মাখলাম না।

উদ্বেগ আমার চারিত্রিক খোঁচা নিয়ে। ইন্দ্রনাথ রুদ্র আমার কলেজ ফ্রেণ্ড। স্কটিশ চার্চে পড়বার সময়ে সহপাঠিনীদের সাথে একটু-আধটু রঙ্গ-ইতিহাস আছে বৈকি। হতভাগা সেসব ফাঁস করলেই গিয়েছি।

ইন্দ্রনাথ কিন্তু সেসবের ধার দিয়েও গেল না। বলল, 'সিগারেট টানার স্টাইলটা দেখেছ?'

কবিতা আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে নিল, 'আবার রিঙ ছাড়া হচ্ছে!'

ইন্দ্রনাথ বললে, 'হ্যাঁ, রিঙ। ধোঁয়ার রিঙ। মানে কি জানো?'

'রিঙ মানে আংটি,' ভুরু নাচিয়ে কবিতা বলল, 'আংটি মানায় নরম আঙুলে। নরম আঙুল হয় পরী-হুরীদের। পরী-হুরীরা জন্ম নেয় ধোঁয়া থেকে। ধোঁয়ার আংটি তাদের জন্যে।'

'মন্দ বলো নি।' বলল ইন্দ্রনাথ, 'লেখকের বউ তো। কল্পনায় ম্যাজিশিয়ান। কিন্তু আমি

যা বলব, তা মনোবিজ্ঞানীদের কথা। ধোঁয়ার আংটি যারা রচনা করে, তাদের চরিত্রের একটা বিশেষ প্যাটার্ন আছে।'

'যেমন?' কবিতা বিলক্ষণ কৌতূহলী। ইন্দ্রনাথের ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি।

'এদের বিশ্বাস করা যায় না—এদের ওপর আস্থা রাখা যায় না।'

হাততালি দিয়ে কবিতা বললে, 'একদম খাঁটি কথা। আর কি?'

'ধোঁয়ার আংটি যতই দুলতে দুলতে ওপরে উঠছে, ততই যেন বুক দশহাত হচ্ছে লেখক মহোদয়ের। কিরকম তাকিয়ে আছে দেখছ আংটিগুলোর দিকে? কেন জানো? মনে মনে ফন্দী আঁটছে। সে ফন্দী নিজেকে নিয়ে।'

'নির্জলা সত্য।' কবিতা বিলক্ষণ উল্লসিত।

'আরও আছে, বৌদি। এ জাতীয় লোকেরা নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে আর কারও ব্যাপারে মাথা গলানোর গরজ দেখায় না। কারণ, এদের ভাবনার মুখ বাঁকানো থাকে ভেতর দিকে। বাইরের কারও কথা শুনে সায় দিলেও জানবে মনে থেকে সায় দেয় না।'

'এগজ্যাক্টলি!' আমার স্বার্থপর চরিত্রকাহিনী শুনে যেন আহ্লাদে আটখানা হল কবিতা। 'ঠাকুরপো, হাড়ে ঘুন ধরিয়ে আমি যা জেনেছি, পাঁচ মিনিটে তুমি তা জানলে কি করে?'

'ওই যে বললাম, সিগারেটে টান মেরে রিঙ ছাড়ার বহর দেখে। শুনলে মনে হয় যেন খড়ি পেতে গুণে বলছি। অথচ একটু পড়াশুনো থাকলেই এমনি চমক লাগানো যায়। মনে হয় যেন ম্যাজিক। রবার্ট ব্লেকের কীর্তি। তাই না মৃগাঙ্ক?'

রাগের চোটে তখন আমার মুখে কথা সরছে না। সিগারেট খাওয়াও মাথায় উঠেছে। তাই কেবল কটমট করে তাকালাম বউয়ের হাসি মাখানো বড় বড় চোখ দুটোর দিকে।

ইন্দ্রনাথ বললে, 'ভায়া, রাগ করছ কেন? পেট থেকে পড়েই কি কেউ ডিটেকটিভ হয়? নিজেকে তৈরি করতে হয়। তুমি তো জানো, আমি কলেজের বই যত না পড়েছি, তার দশগুণ পড়েছি দশরকম সাবজেক্ট নিয়ে। পড়ার নেশায় পড়েছি। আজকের ডিটেকটিভ পেশায় তা কাজে লাগছে। সুতরাং রবার্ট ব্লেক বলে আমাকে ব্যঙ্গ করা কেন বন্ধু?'

আমি কি বলব ভেবে না পেয়ে তারস্বরে বললাম, 'কফি দাও।'

মুখ টিপে হেসে কফি এগিয়ে দিল কবিতা এবং ঠিক সেই সময়ে ডিং-ডং শব্দে ঘণ্টাধ্বনি হল সদর দরজায়।

একটু পরেই একটা কার্ড এসে পৌছলো আমার সামনে। আইভরি কার্ড। উঁচু উঁচু হরফে নাম লেখা—ডক্টর জাম্বুলিঙ্গম। নামের পাশে কয়েকটা ডিগ্রী।

খিঁচড়োনো মেজাজ নিয়ে খেঁকিয়ে উঠলাম, 'জাম্বুলিঙ্গম! কে জাম্বুলিঙ্গম? আমি চিনি না। বলগে যা, দেখা হবে না।'

'ও আবার কি অসভ্যতা!' ধমকে উঠল কবিতা। 'তোমার মতো জাম্বুবানের সঙ্গে দেখা করতে জাম্বুলিঙ্গম আসবে না তো কে আসবে? বঙ্কা, পাঠিয়ে দে বাবুকে।'

বঙ্কা বিদায় হল এবং অনতিকাল পরেই ঘরে ঢুকল যেন সাক্ষাৎ জাম্বুবান। শুনেছি, ত্রেতাযুগে ভল্লুকরাজ নাকি দারুণ যোদ্ধা ছিল। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকেও একুশ দিন নাজেহাল হতে হয়েছিল জাম্বুবান কে পরাস্ত করতে।

তা জাম্বুলিঙ্গম নামধারী দৈত্যাকার পুরুষটি ভল্লুকরাজ আখ্যার উপযুক্ত ব্যক্তিই বটে। মিশমিশে রঙ। দরজায় মাথা-ঠেকে-যাওয়া তালঢ্যাঙা বপু। ছাইরঙের টেরিন সুট। হাতে ছড়ির মতো লিকলিকে একটা ছাতা। বাঁটটা মোষের শিংয়ের। দেখলে ছড়ি বলেই ভ্রম হয়।

ভল্লুকরাজকে দেখেই একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। বালি-সুগ্রীবের প্রতিবেশীরা সাধারণতঃ খর্বকায় শীর্ণ হন বলেই জানি। এমন রাবণ-বপু দেখব আশা করি নি।

তাই জাম্বুলিঙ্গম ঘরে ঢুকতেই আমি তীব্র গলায় বললাম, 'ইয়েস?'

জাম্বুলিঙ্গম মোটা মোটা লেন্সের আড়াল থেকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল আমার পানে। হাত তুলে নমস্কার করল। এবং বলল অতি বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায়, 'আপনিই মৃগাঙ্কবাবু? লেখক?'

আর একবার হকচকিয়ে গেলাম। স্নায়ুর ওপর আর এক নির্যাতন। জাম্বুবানের কণ্ঠে বাংলা ভাষা!

কাষ্ঠহাসি হেসে বললাম, 'হ্যাঁ, আমিই মৃগাঙ্ক রায়। বসুন। কি ব্যাপার বলুন তো?'

জাম্বুলিঙ্গম বসল। ছড়ির মত ছাতাটা রাখল সামনের টেবিলে। ভদ্রলোকের চেহারায়, চাহনিতে, কথায় বেশ ব্যক্তিত্ব আছে। বলল রেশমমসৃণ ভারি গলায়, 'আমি আপনার কাহিনীর বিশেষ ভক্ত।'

'আপনি?' কৌতূহল আর বাগ মানলো না।

হাসল জাম্বুলিঙ্গম, 'আশ্চর্য তাই না? যার চেহারা এমন কদাকার, যার মাতৃভাষা তামিল, বাংলা ভাষায় তার এত ব্যুৎপত্তি থাকবে কেন?'

'না, না, আমি তা বলি নি—'

'মৃগাঙ্কবাবু, শুধু বাংলা নয়, ইণ্ডিয়ার আরও চারটে ভাষা আমি অনর্গল বলতে পারি। ফ্রেঞ্চ আমার কাছে জল-ভাতের সমান। কিন্তু সেকথা যাক। আমি আপনার কাহিনীর দারুণ ভক্ত। সেই সঙ্গে পরম ভক্ত আপনার বন্ধুর।'

'আমার বন্ধু?'

'প্রাইভেট ডিটেকটিভ ইন্দ্রনাথ রুদ্র। যাঁর বিস্ময়কর কীর্তি অলীক শার্লক হোমসকেও ম্লান করে দিয়েছে।'

আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম, ক্ষীণ গোঁফ জোড়ার ওপর সগর্বে আঙুল বুলিয়ে নিল ইন্দ্রনাথ।

সুতরাং আবার কাষ্ঠহাসি হাসলাম। বললাম, 'ইন্দ্রনাথ রুদ্র আপনার সামনেই হাজির।'

চকিতে চোখ ফেরালো জাম্বুলিঙ্গম। আমি আলাপ করিয়ে দিলাম, 'ইনিই ইন্দ্রনাথ রুদ্র যাঁর কীর্তি রবার্ট ব্লেককে টেক্কা দিয়েছে। আর ইনি আমার অর্ধাঙ্গিনী।'

নমস্কার প্রতি নমস্কারের পর জাম্বুলিঙ্গম বলল, 'মৃগাঙ্কবাবু, আমি কিন্তু ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে রবার্ট ব্লেকের সঙ্গে তুলনা করি না। ওঁর সঙ্গে তুলনা চলে একমাত্র ফাদার ব্রাউন বা শার্লক হোমসের। ওঁর মস্তিষ্কই ওঁকে সে মর্যাদা দিয়েছে।'

ঢোক গিলে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলাম, 'আপনি দেখছি মস্ত বৈজ্ঞানিক।'

'মস্ত নয় ক্ষুদ্র। আমার সমস্যাটা বৃহৎ।'

'সমস্যা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি একটা সমস্যা নিয়ে এসেছিলাম আপনার কাছে। উদ্দেশ্য ছিল, ইন্দ্রনাথবাবুর ঠিকানা নিয়ে তাঁর কাছে হত্যে দেব। আমার সৌভাগ্য, এক মন্দিরেই দুই দেবতার দর্শন পাওয়া গেল।'

খোসামোদে পাথর গলে, আমিও তুষ্ট হলাম। বললাম 'সে কি কথা! অসুবিধে না থাকলে আপনার সমস্যা আমার সামনে বলতে পারেন। পুজোর লেখার খোরাক চাই তো।'

হেসে ফেললেন জাম্বুলিঙ্গম। ঝকঝকে সাদা দাঁত মিশমিশে মুখে খুব খারাপ দেখালো না। বলল, 'সমস্যাটা রক্তের শয়তানকে নিয়ে।'

'রক্তের শয়তান! সে আবার কি?'

'ব্লাড ক্যান্সার। আমি রঙ্গ করে নাম দিয়েছি রক্তের শয়তান। আপনি লেখক মানুষ, আমার কৌতুকবোধের তারিফ করবেন নিশ্চয়?'

'তা করছি,' বললাম আমি, 'ব্লাড ক্যান্সার, মানে, লিউকোমিয়ার এমন বাংলা উপাধি এর আগে শুনি নি। কিন্তু রক্তের শয়তানকে নিয়ে আপনি বিব্রত কেন?'

'কারণ, ব্লাড ক্যান্সার আমার গবেষণার বিষয়বস্তু বলে।'

'আপনি—'

'আমি ব্যাঙ্গালোর ক্যান্সার রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে আসছি। আসছি পার্সোনাল ক্যাপাসিটিতে। আমার সমস্যার গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বলতে গেলে একটু সময় লাগবে। তার আগে যদি সাউথ ইণ্ডিয়ান ড্রিঙ্ক দিয়ে গলা ভেজানো যেত—'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়!' বিষম লজ্জিত হয়ে বললাম, 'কবিতা, কফি দাও।'

জাম্বুলিঙ্গম বাগাড়ম্বরের ধার দিয়েও গেল না। বলল, 'আপনারা ১৩ই জুলাইয়ের কাগজে একটা খবর নিশ্চয় দেখেছেন। খবরটা নিয়ে সম্পাদকীয়ও লেখা হয়েছিল। খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর তো। পড়েন নি? বেশ, কাগজটা আমি সঙ্গে এনেছি। পড়ে শোনাচ্ছি।'

বলে, বুক-পকেট থেকে কাঁচি দিয়ে কাটা একটুকরো খবরের কাগজ বার করে ভারি গলায় পড়তে শুরু করল জাম্বুলিঙ্গম, 'রক্তের ক্যান্সার তথা লিউকোমিয়া নামক জটিল ও কঠিন রোগের নিরাময়কারক ঔষধ আবিষ্কার করিবার কৃতিত্ব যদি কেহ দাবী করেন, তবে বুঝিতে হইবে যে, তিনি মানব জীবনের কল্যাণ সম্ভব করিবার দুরূহ ও মহৎ একটি অঙ্গীকার সফল করিবার কৃতিত্ব দাবী করিতেছেন। দক্ষিণ ভারতের জনৈক চিকিৎসক 'সিদ্ধ' চিকিৎসা-পদ্ধতির তথ্য সম্বলিত একটি পাণ্ডুলিপি অধ্যয়ন করিয়া এবং তদনুযায়ী গবেষণা করিয়া লিউকোমিয়ার ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। তিনি ভারত সরকারের বৃত্তিধারী গবেষক। সুতরাং, ভারতের সরকারী স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের আর কালবিলম্ব না করিয়া এই কৃতিত্বের যথার্থতা বিচার ও বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য। এই ঔষধ প্রস্তুত করিবার উপযোগী গাছগাছড়ার অভাব আছে বলিয়া গবেষক-চিকিৎসক যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার গুরুত্ব ও যথার্থতা সমন্ধেও সরকারী কর্তৃত্বে অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন। কারণ দীর্ঘকালের গবেষণা ও কৃতিত্বে আবিষ্কৃত কোন ঔষধের জন্য গাছগাছড়ার অভাব থাকিলে তাহা দূরীভূত করিবার ব্যবস্থা দ্রুত গ্রহণ করিতে হইবে। সরকারের পক্ষে সবার আগে জানিয়া লওয়া প্রয়োজন যে, আবিষ্কৃত ঔষধটি সত্যই যথার্থ নিরাময়কারক ঔষধ।'

জাম্বুলিঙ্গম তামিলনাড়ুর বাসিন্দা হয়েও যেরকম স্বচ্ছন্দ গতিতে পরিষ্কার উচ্চারণে খবর

পড়ে শোনালো, তা অল ইণ্ডিয়া রেড়িওর বহু সংবাদদাতার পক্ষেও সম্ভব হয় না।

খবর পড়া শেষ হতেই এই প্রথম ইন্দ্রনাথ মুখ খুললো, 'মোদ্দা বিষয় দাঁড়াচ্ছে এই—'সিদ্ধ' চিকিৎসা-পদ্ধতির পুরোনো পুঁথিতে ব্লাড ক্যান্সারের দাওয়াই লেখা আছে। সেই পুঁথি এবং দাওয়াই এখন পাওয়া গেছে। পেয়েছেন একজন দক্ষিণ ভারতীয় ডাক্তার। এই তো?'

'হুবহু।'

'আপনিই কি সেই ডাক্তার?'

'না, আমার বন্ধু। মালুমঙ্গলম।'

'আপনার সমস্যা আপনাকে নিয়ে, না আপনার বন্ধুকে নিয়ে?'

'আমাদের দুজনকে নিয়ে।'

'যথা?'

'খবরে যা বলা হয়েছে, তা আংশিক। 'সিদ্ধ' চিকিৎসা-পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা মালুমঙ্গলম একা করে নি। আমিও ছিলাম সঙ্গে। বছর তিনেক আগে দেশে ফিরেছি আমি। মালুমঙ্গলমের সঙ্গে যোগাযোগ তখন থেকেই। রুগী দেখার ফাঁকে ফাঁকে গাছগাছড়া নিয়ে নাড়াচাড়া করার বাতিক ওর অনেকদিনের। ওর বিশ্বাস, বিধাতা মানুষ সৃষ্টি করেছেন, মানুষের রোগের ওষুধও সৃষ্টি করেছেন। এই পৃথিবীতেই তা আছে। প্রাচীন পুঁথি ঘেঁটে, উদ্যোগী হয়ে শুধু খুঁজে নিলেই হল।

'দুরারোগ্য ব্লাড ক্যান্সারের দাওয়াই আবিষ্কারের গবেষণার শুরু তখন থেকেই। মালুমঙ্গলমের রিসার্চ ব্যাকগ্রাউণ্ড নেই—আমার আছে। কিন্তু আমার প্রাচীন গাছগাছড়া সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই—মালুমঙ্গলমের আছে। ফলে, জুটি বাঁধলাম দুজনে। আমার ডিগ্রীর দৌলতে সরকারি বৃত্তিও জুটলো। গবেষণাও অনেক এগোল। পরিশেষে ব্লাড ক্যান্সারের দাওয়াইয়ের সন্ধানও পেলাম।

'সমস্যার শুরু ঠিক তার পরেই।

'আমাদের গবেষণা কেন্দ্র কিন্তু কলকাতায় নয়—ব্যাঙ্গালোরে। গান্ধীনগরে মুনলাইট সিনেমার ঠিক পেছনে। ছোট্ট ল্যাবরেটরী। আমি, মালুমঙ্গলম আর প্রভাবতী। প্রভাবতী আমাদের ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্টও বটে, সেক্রেটারিও বটে। রিপোর্ট টাইপ করা থেকে শুরু করে কেমিক্যাল সংগ্রহ করা—সমস্তই প্রভাবতীর দায়িত্ব।

'গত ১০ই জুলাই রক্তের শয়তানকে টিট করার জবর দাওয়াইয়ের সন্ধান পেলাম আমি আর মালুমঙ্গলম। ১৯৩০ সালে স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ ভারতের মুখোজ্জ্বল করেছিলেন পদার্থবিদ্যায় নোবেল প্রাইজ এনে। ১০ই জুলাই সন্ধ্যের দিকে আমি আনন্দে আটখানা হয়ে বলেছিলাম মালুমঙ্গলমকে—'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।' চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ আনব তুমি আর আমি।

'বিধাতা তখন আড়ালে দাঁড়িয়ে হেসেছিলেন। নইলে পরের দিন সকালবেলা উধাও হবে কেন মালুমঙ্গলম?'

বলে কবিতার হাত থেকে কফির পেয়ালা টেনে নিল জাম্বুলিঙ্গম।

ইন্দ্রনাথ চোখ ছোট করে শুনছিল। এখন বলল, 'উধাও হলেন?'

'হ্যাঁ।' চুমুক না দিয়েই বলল জাম্বুলিঙ্গম, 'পরের দিন সকালবেলা ল্যাবরেটরীতে এসে

দেখলাম, প্রভাবতীর টাইপরাইটারে এক তা সাদা কাগজ। তাতে লেখা—জাম্বুলিঙ্গম, কাল রাতে রিপোর্ট ঘাঁটতে গিয়ে মাথা ঘুরে গেল। 'সিদ্ধ' চিকিৎসা-পদ্ধতিতে এক জায়গায় মারাত্মক কথা লিখেছে। এ ওষুধ ব্লাড ক্যান্সার সারায় বটে, কিন্তু বছর দুয়েকের মধ্যে মাথার গণ্ডগোল দেখা দিতে পারে। আমাদের গবেষণা ব্যর্থ হয়েছে। তোমার সময় এবং সরকারের টাকা অপচয়ের কারণ আমি। বিবেকের দংশন আর আত্মগ্লানি সইতে না পেরে চললাম। শুনেছি, হিমালয় অঞ্চলে ব্লাড ক্যান্সারের ওষুধ আছে। যদি পাই, ফিরব। নইলে, এই যাত্রাই শেষ যাত্রা। এ মুখ আর কেউ দেখবে না। ইতি—মালুমঙ্গলম। এগারোই জুলাই।'

ইন্দ্রনাথ বলল, 'চিঠিটা দেখছি কণ্ঠস্থ করে রেখেছেন?'

'তা করেছি। মূল চিঠিও সঙ্গে এনেছি। এই দেখুন।'

হাত বাড়িয়ে ভাঁজ-করা কাগজটা নিল ইন্দ্রনাথ। সেকেণ্ড কয়েক চোখ বুলোলো এ-কোণ থেকে সে-কোণ পর্যন্ত।

বলল, 'টাইপ না করে হাতে লিখলেও তো পারতেন আপনার বন্ধু। টাইপ করলেন কেন? করলেনই যদি তো তলায় সই না করে টাইপ করে নিজের নাম লিখলেন কেন? আমার সন্দেহ হচ্ছে।'

'ও সন্দেহ আমার মনেও এসেছে।' বলল জাম্বুলিঙ্গম, 'এসেছে বলেই আপনার দ্বারস্থ হয়েছি।'

'কিসের সন্দেহ বলুন তো?' ইন্দ্রনাথ কৌতূহলী হল।

'চিঠিটা কি সত্যিই মালুর লেখা?'

'কারেক্ট। কাজেই প্রাথমিক তদন্ত টাইপরাইটার থেকেই শুরু করা দরকার। তার আগে একটা প্রশ্ন। আপনি পুলিশে না গিয়ে সোজা কলকাতায় এলেন কেন? তদন্ত গোপন রাখতে চাইছেন কেন?'

'গোপন রাখতে চাই সরকারী বৃত্তি এর সঙ্গে জড়িত বলে। পাবলিক কেলেঙ্কারী কে চায় বলুন? আপনি যদি তার হদিশ বার করে দেন, তাহলে তো গোল চুকেই গেল। নইলে শেষ পর্যন্ত পুলিশকেই ডাকতে হবে।'

'কলকাতায় এলেন শুধু আমার কাছে?'

'না, মালুর খোঁজে। হিমালয় যেতে গেলে এই পথই সহজ পথ। কলকাতায় কদিন ওকে থাকতেই হবে। নিশ্চয় অভিযানের কেনাকাটা করবে, ব্যবস্থা করবে। যে কটা সাউথ ইণ্ডিয়ান ডেরা আছে, তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। না পেয়ে আপনার খোঁজে এসেছি। ইন্দ্রনাথবাবু, আপনি পরের ফ্লাইটে ব্যাঙ্গালোর চলুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মালু ব্যাঙ্গালোরেই রয়েছে।'

ইন্দ্রনাথ সব শুনে কান-কাটা বেহায়ার মত জিজ্ঞেস করল, 'আপনি জানেন নিশ্চয় গোয়েন্দাগিরি আমার পেশা?'

জাম্বুলিঙ্গমও কম স্মার্ট নয়। সপ্রতিভ কণ্ঠে জবাব দিল তৎক্ষণাৎ, 'তৈরি হয়েই এসেছি আমি।' বলে, ভেতর পকেট থেকে বার করল একটা চেকবই আর কলম। 'কত লিখব বলুন?'

'হাজার।' নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিল ইন্দ্রনাথ।

সঙ্গে সঙ্গে চেক লিখতে শুরু করল জাম্বুলিঙ্গম।

চুপ করে বসে থাকা বোধহয় কোষ্ঠীতে লেখেনি ইন্দ্রনাথের। নইলে, হাত অত নিশপিশ

করবে কেন? হাঁটুর ওপর সেকেণ্ড কয়েক আঙুল বাজিয়ে টেবিলের ওপর থেকে টেনে নিল জাম্বুলিঙ্গমের ছাতাটা। মোষের শিংয়ের ছড়ি প্যাটার্নের বাঁট থেকে শুরু করে চোখ বুলানো হল লোহার ফেরুল পর্যন্ত। ইতিমধ্যে চেক লেখা শেষ করে চেকখানা এগিয়ে ধরল জাম্বুলিঙ্গম। ইন্দ্রনাথও ডান হাতে ছাতা বাড়িয়ে দিয়ে বাঁ হাতে নিল চেকটা।

বলল, 'ভারি সুন্দর ছাতা তো! দেখে মনে হয় যেন ছড়ি।'

ছাতা নিয়ে উঠে দাঁড়াল জাম্বুলিঙ্গম। ছড়ির কায়দায় একপাক ঘুরিয়ে নিল ছাতা। বলল ছোট করে, 'বিলেতে যখন মেঘ করত, তখনি এ ছাতা থাকত সঙ্গে। আজও থাকে সঙ্গে।'

কে জানত, তখন যে এই ছাতা নিয়েই ভেল্কি দেখাবে ইন্দ্রনাথ রুদ্র এবং থোঁতা মুখ ভোঁতা করবে আমার?

মেঘলোক দিয়ে সেইদিনই দুজনে এল ব্যাঙ্গালোরে। এয়ারপোর্ট থেকে সিধে গান্ধীনগরের ল্যাবরেটরিতে গেল ইন্দ্রনাথ। প্রথমেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল টাইপরাইটারের ওপর। এক তা সাদা কাগজ ঢুকিয়ে খটাখট করে নিজে কিছুক্ষণ টাইপ করল। তারপর ডাক পড়ল প্রভাবতীর।

প্রভাবতী দক্ষিণী ললনা হলেও রীতিমত চটকদার। বিজ্ঞানের সাধনা করতে এসেও রূপের সাধনায় গাফিলতি নেই বিন্দুমাত্র। চোখে কটাক্ষ এবং অধরে লালসা কিভাবে জাগ্রত করতে হয়, সে কৌশল তার করায়ত্ত।

এ হেন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট দেখে ভুরু কুঁচকে ছিল ইন্দ্রনাথ। এ মেয়েকে ক্যাবারে ড্যান্সে মানায়, ল্যাবরেটরীতে মানায় না।

কিন্তু কি আশ্চর্য, প্রভাবতীকে নিয়ে বিশদ জেরার ধার দিয়েও যায় নি ইন্দ্রনাথ। শুধু চেয়েছে, রিপোর্টের ফাইলটা। রোজকার গবেষণার প্রতিবেদন টাইপ হত প্রতিদিন। ফাইল নিয়ে নিতম্ব দুলিয়ে ভারি বুকে হিল্লোল তুলে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে প্রভাবতী। টানা টানা চোখে একবার মাত্র যৌবন বিজ্ঞাপিত তন্বীদেহ দেখে নিয়ে ফাইল খুলে বসেছে ইন্দ্রনাথ।

প্রথমেই দেখেছে ৯ই জুলাইয়ের রিপোর্ট। তারপর ৮ই জুলাইয়ের। তারপর ৭ই জুলাইয়ের। তারপর ৬ই জুলাইয়ের।

জাম্বুলিঙ্গম সামনেই দাঁড়িয়েছিল। বাংলায় বলেছে ইন্দ্রনাথ, 'ভদ্রমহিলাকে এখন যেতে বলুন। কথা আছে।'

জাম্বুলিঙ্গম তামিল ভাষায় তৎক্ষণাৎ বিদায় দিয়েছে প্রভাবতীকে। হেলতে দুলতে নিতম্বিনী অন্তর্হিত হতেই শুধিয়েছে উদগ্র কণ্ঠে, 'কিছু পেলেন?'

'পেয়েছি। এ চিঠি ডক্টর মালুমঙ্গলম টাইপ করেন নি। দু নম্বর, ১১ই জুলাই সকালে এ চিঠি টাইপ করা হয় নি। হয়েছে ৬ই জুলাই, কি তারও আগে।'

পুরু লেন্সের আড়ালে জাম্বুলিঙ্গমের চোখ দুটো বিস্ময়ে বড় হয়েই ছোট হয়ে এল, 'কি করে জানলেন?'

'৬ই জুলাই পর্যন্ত পুরোন রিবনে টাইপ হয়েছে। ৭ই জুলাই নতুন রিবন মেশিনে বসেছে। মালুমঙ্গলমের চিঠি পুরোন রিবনে টাইপ করা। তার মানে, উনি এ চিঠি এগারোই জুলাই ঝোঁকের মাথায় টাইপ করেন নি। আর কেউ ৬ই জুলাই কি তারও আগে টাইপ করে

রেখেছিল।

'উদ্দেশ্য?'

'তাঁকে সরানো। ডক্টর, আমার ভীষণ সন্দেহ হচ্ছে। উনি এখন কোথায়, স্বর্গে না মর্ত্যে?'

'আপনিই বলুন।'

'মালুমঙ্গলম থাকতেন কোথায়?'

'এই গান্ধীনগরেই। ব্যাচেলর তো। গোটা বাড়িতে একা থাকতেন। যাবেন?'

'চলুন।'

চাবি কি করে সংগ্রহ হল এবং কতক্ষণ ধরে বাড়ি তল্লাসী হল, তার বিবরণ দিয়ে অযথা গল্পকে লম্বা করতে চাই না। তল্লাসীর শেষে কি পাওয়া গেল—শুধু সেইটুকু জানলেই পাঠক-পাঠিকার কৌতূহল জাগ্রত হবে।

একটা উইল। ডক্টর মালুমঙ্গলমের বিষয়সম্পত্তির বিলিব্যবস্থার নির্দেশ। ভদ্রলোক ব্যাচেলর ছিলেন বটে কিন্তু দরিদ্র ছিলেন না। বিবিধ কোম্পানীর শেয়ার কেনাই ছিল দু-লক্ষ টাকার। এ ছাড়াও ব্যাঙ্কে নগদ টাকা আছে আড়াই লাখ। ম্যাঙ্গালোর আর ত্রিবান্দ্রামে ভূসম্পত্তির আর্থিক মূল্য কম করেও পঞ্চাশ হাজার টাকা।

এত টাকার বিষয়সম্পত্তি হেলায় ফেলে অদৃশ্য হয়েছেন ডাক্তার। সব চাইতে আশ্চর্য হল, যে-কোন মানুষ অজ্ঞাতবাস করার আগে টাকাকড়ি সঙ্গে নেয়। বনবাসে গেলে অথবা আশ্রমবাসী হলে অবশ্য পয়সাকড়ির দরকার হয় না। কিন্তু যাচ্ছেন হিমালয় অভিযানে বিশল্যকরণীর সমতুল্য দুষ্প্রাপ্য গাছগাছড়ার সন্ধানে। সেক্ষেত্রে টাকা ওড়ানো দরকার খোলামকুচির মত।

অথচ, ভদ্রলোক বলতে গেলে এক কাপড়ে অভিযানে বেরিয়েছেন। না নিয়েছেন টাকা, না নিয়েছেন সুটকেশ। ব্যাঙ্ক থেকেও টাকা তোলেন নি।

অদ্ভুত কাণ্ড! তাই না? বুদ্ধিমান পাঠক-পাঠিকা নিশ্চয় আঁচ করে ফেলেছেন ব্যাপারটা।

হ্যাঁ, ইন্দ্রনাথেরও তাই মত। জাম্বুলিঙ্গমও দ্বিমত হতে পারল না। ডক্টর মালুমঙ্গলম স্বেচ্ছায় হিমালয় যান নি। তাঁর অনিচ্ছাতেই যেতে হয়েছে। হিমালয়ে নয়—যমালয়ে!

অর্থাৎ তিনি গায়েব হয়েছেন। হয়তো গুমখুনও হয়েছেন। নোবেল প্রাইজ লাভের স্বপ্ন দেখতে দেখতেই বোধ করি পরলোকের পথে রওনা হয়েছেন।

কিন্তু কাজটা কার? তাঁর মৃত্যুতে লাভ কার? বিষয়-সম্পত্তির লোভে আকছার খুন হচ্ছে ঠিকই। উইলে যার নাম রয়েছে, যাকে ডক্টর মালুমঙ্গলম তাঁর সর্বস্ব দিয়ে গেছেন, তাঁর অবর্তমানে, সে ব্যক্তিই হঠাৎ-ধনী হওয়ার দুর্জয় প্রলোভনে মানব-হিতৈষী ডাক্তারকে যমালয়ের পথ দেখিয়েছে কি?

কার নাম ছিল উইলে? কল্পনাতীত সেই নাম দেখে জাম্বুলিঙ্গমের মত কাঠখোট্টা মানুষও শিস দিয়ে উঠেছিল কেন?

কে জানত, চিরকুমার মালুমঙ্গলমের মনেও রঙ ধরেছে। প্রেমের ফুল ফুটেছে। দিবানিশি যিনি রুগী আর ল্যাবরেটরি নিয়ে নাওয়া-খাওয়া ভুলেছিলেন, কোনদিন স্বপ্নেও ভাবা যায় নি অন্তরের অন্দরে তিনি একটি নারীকে পূজা করে এসেছেন। জাম্বুলিঙ্গম তাই বিস্ময়ে

বোবা হয়ে গিয়েছিল। কথা বলতে পারে নি অনেকক্ষণ।

ইন্দ্রনাথও কম অবাক হয় নি। শুকনো কাঠের মত মন যাঁদের, শোনা যায় সেই কঠোর ব্রহ্মচারীরাই শেষ পর্যন্ত উর্বশী-রম্ভার মত নর্তকীদের হাতে ঘায়েল হন। এক্ষেত্রেও হয়েছে তাই। মালুমঙ্গলম মনে মনে যাকে ভালোবেসেছিলেন, মনের দিক দিয়ে তার সঙ্গে তাঁর কোন মিল থাকতে পারে না।

মেয়েটির নাম প্রভাবতী। ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট ও সেক্রেটারি।

ইন্দ্রনাথ বলল, 'খটকা লেগেছে আমার মনে।'

জাম্বুলিঙ্গম বলল, 'কেন?'

'ডক্টর মালুমঙ্গলমের ধোঁকা-চিঠি টাইপ করা হয়েছে প্রভাবতীর টাইপরাইটারে। এখন দেখা যাচ্ছে, উইলেও নাম রয়েছে প্রভাবতীর। তার মানে কি?'

'প্রভাবতী সরিয়েছে মালুকে?'

'এত সহজে তা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু অমন একটা সন্দেহ মনের মধ্যে ঘুর ঘুর করে বৈকি। তাই ভাবছিলাম,' ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে উইল পরখ করতে করতে ইন্দ্রনাথ বলল, 'ইনফ্রা-রেড ছবি তুলব।'

'ইনফ্রা-রেড ছবি! কার?'

'কারও নয়। এই উইলের।'

'কেন? কেন ইন্দ্রনাথবাবু?'

'উইলে জালিয়াতি আছে কিনা দেখা দরকার। মেয়ে জাতটাকে আমি মশাই একদম বিশ্বাস করি না। যাদের গোঁফ নেই, তাদের বিশ্বাস করলেই ঠকতে হয়। তাই ইনফ্রা-রেড ছবি তুলব! ব্যবস্থা করবেন?'

'আলবৎ।'

উঠল ইনফ্রা-রেড ফটোগ্রাফ। পাওয়া গেল আরো একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য।

উইলের যেখানে-যেখানে প্রভাবতীর নাম লেখা, সেখানে-সেখানে আসলে লেখা ছিল অন্য একটি নাম। সযত্নে সে নাম উঠিয়ে লেখা হয়েছে প্রভাবতীর নাম।

ডক্টর মালুমঙ্গলমের ইচ্ছা ছিল তাঁর অবর্তমানে তাঁর বিপুল ভূসম্পত্তির ওয়ারিশ হোক ডক্টর জাম্বুলিমঙ্গম। সম্পত্তির আয় থেকে যেন ক্যান্সার নিয়ে গবেষণা চালানো হয় ব্যাঙ্গালোর ক্যান্সার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায়। বিশেষ এই লাইনটি ছিল উইলের শেষের দিকে। পুরো লাইনটি কেমিক্যাল দিয়ে মোছা হয়েছে। কিন্তু যেখানে-যেখানে ছিল জাম্বুলিঙ্গমের নাম, সেখানে-সেখানে বসানো হয়েছে প্রভাবতীর নাম।

থ হয়ে গেল ডক্টর জাম্বুলিঙ্গম।

পুলিশ এল। প্রথমেই গ্রেপ্তার হল প্রভাবতী। তারপর মালুমঙ্গলমের বাড়ি তোলপাড় করা হল। শেষকালে একতলায় যে ঘরে কাঠ আর কয়লা গাদা করা থাকে, সেইখানে গিয়ে দেখা গেল, মেঝের ওপর বেশ কিছু সিমেন্ট বালি মাখা হয়েছে। শুকিয়ে পাথর হয়ে গেলেও

দাগটা টাটকা।

কিন্তু গোটা বাড়িতে মেরামতির চিহ্ন কোথাও পাওয়া গেল না। সিমেন্ট-বালি লাগতে পারে, এমন কোন কাজ বাড়িতে হয় নি।

বিস্তর নাজেহাল হবার পর ইন্দ্রনাথ ধরিয়ে দিল রহস্যের চাবিকাঠি। বলল, 'কয়লার গাদা সরানো হোক।'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'কেন?'

ইন্দ্রনাথ বলল, 'শার্লক হোমস এক জায়গায় বলেছে, সব ক'টা সম্ভব জায়গা খুঁজেও যদি হারানো জিনিস পাওয়া না যায়, তাহলে সব চাইতে অসম্ভব জায়গায় সেটা আছে। সুতরাং সরান না কয়লা আর কাঠের গাদা।'

ইন্সপেক্টর বেশ জোরেই ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন। কিন্তু শেষমুহূর্তে সুবুদ্ধির উদয় হল। হল বলেই সমস্যার সুরাহা হল। নইলে মালুমঙ্গলমের লাশ আর পাওয়া যেত না।

কয়লার গাদা বেলচা দিয়ে পরিষ্কার করার পর দেখা গেল, সদ্য গাঁথা একটা ইঁটের কফিন। এক ফুট উঁচু। দেওয়াল থেকে এক ফুট ঠেলে এগিয়ে এসেছে। কয়লা ঢেকে ঢাকা হয়েছে এই কফিনকেই।

কফিন! হ্যাঁ, কফিন! শাবল মেরে ইঁট খসিয়ে ভেতরে পাওয়া গিয়েছিল মালুমঙ্গলমের বিকৃত মৃতদেহ।

সেই সঙ্গে একটা ছোরা। বুকের বাঁদিকে আমূল গেঁথেছিল ছোরাটা।

লোমহর্ষক কাহিনীটা শুনেছিলাম আমারই আড্ডাঘরে বসে—কলকাতায়। তেলমুড়ি চিবোতে চিবোতে যথারীতি নিজের জয়ঢাক পিটছিল ইন্দ্রনাথ। আমি আর গৃহিণী বলতে গেলে কানখাড়া করেই শুনছিলাম।

ডক্টর মালুমঙ্গলমের লাশ আবিষ্কারের নাটক শোনার পর আরও দুটো আলুর চপ চেয়েছিল ইন্দ্রনাথ। তাইতেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল কবিতা। খ্যাঁক করে বললে, 'একটাও দেব না।'

'কেন বৌদি? আমার অপরাধ?' ইন্দ্রনাথ যেন কতই আহত।

'তুফান মেলের মত গল্প বলা হচ্ছে কেন? ঘোড়ায় জিন দিয়ে আসা হয়েছে নাকি?'

'এই কথা।' আশ্বস্ত হল ইন্দ্রনাথ। 'আসল রহস্যে এখনো আসি নি বলেই তো বাঁই বাঁই করে বলছিলাম।'

'আসল রহস্যে এখনো আসো নি মানে? মালুমঙ্গলমের লাশটা কি তাহলে নকল বলতে চাও?'

'আহা লাশ নকল হবে কেন? লাশ কি নকল হয়? লাশ আসল—বিলকুল আসল। কিন্তু এ কাহিনীর মোদ্দা প্যাঁচটুকুই তো শুরু করি নি এখনো।'

'থামাও নাটক। হেঁয়ালী করবার আর জায়গা পাও নি? প্রভাবতীকে গ্রেপ্তার করালে, লাশ বার করে ফেললে, জাল উইলের জালিয়াতি ধরে ফেললে—এরপর কি জট থাকতে পারে বুঝি না।' কবিতা যেন সাক্ষাৎ দেবী চৌধুরাণী।

'আছে বৌদি, আছে। দেখবার চোখ থাকলেই দেখা যায়। আলুর চপের প্লেটটা এদিকে

না আসা পর্যন্ত সে জিনিস বলা হবে না। ফলে আধখানা গল্প শুনে আধ-কপালে হয়ে থাকতে হবে। শুনলে অবশ্য চোখ কপালে উঠবে। না শুনলে আধ-কপালে হবে। বল, কি করবে?'

'শুনব,' বলে চপের প্লেট এগিয়ে দিল কবিতা।

ইন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করল, 'প্রভাবতী তো হাজতে গেল। সে কি কান্না মেয়েটার। কাঁদতে কাঁদতে ফিট হয়ে যায় আর কি! তার বিরুদ্ধে অপরাধের ফিরিস্তি শুনে হাত-পা এমন ঠাণ্ডা হয়ে এল যে, শেষ পর্যন্ত ডাক্তার ডাকতে হল।

'জাম্বুলিঙ্গম নিজেও কেমন জানি হয়ে গিয়েছিল। দিন-রাত ঘরে বসে থাকত। বাইরে বেরোত না। শক তো বটেই। সাংঘাতিক শক্। ট্রিপল্ শক্। বন্ধুর অপঘাত মৃত্যু। রাতারাতি কুবের হওয়া এবং প্রভাবতীর মুখোশ খুলে যাওয়া। কাজেই তিন ধাক্কা সামলাতে ও যখন কাহিল, আমি তখন কয়েকটা খোঁজ-খবর নিতে লাগলাম বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে।

'কি খবর নিলাম, কোন অফিসে গেলাম, কার সঙ্গে দেখা করলাম—এসব শুনতে চাও কি? ইচ্ছে নেই। বেশ বাদ দিলাম। পুরো দুটো দিন টো-টো করে ফের গেলাম পুলিশ অফিসে।

'সেই ফাজিল ইন্সপেক্টর এবার আমাকে সমীহ করে 'স্যার' বলল। জিজ্ঞেস করল, কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কিনা।

আমি বললাম, 'ফোরেনসিক রিপোর্ট এসেছে?'

'কিসের?'

'স্ট্যাবিংয়ের।'

'এসেছে। ছোরা যে মেরেছে, সে ল্যাটা। মানে, বাম হাতে ছোরা মারতে পোক্ত। রিপোর্টের মোদ্দা কথা হল এই। আর কিছু?'

'না। আমিও এইটুকুই শুনতে এসেছিলাম। আর একটা কথা বলতে এসেছিলাম।'

'বলুন।'

'প্রভাবতীকে ছেড়ে দিন।'

'কেন?'

'ও নির্দোষ।'

'সে কি স্যার! ডক্টর মালুমঙ্গলমের ভাঁওতা চিঠি ও ছাড়া কে টাইপ করবে?'

'ও করে নি। অন্য কেউ করেছে ওর টাইপরাইটারে ওর ঘাড়ে দোষ চাপানোর জন্যে।'

ঢোক গিলল ইন্সপেক্টর ঃ 'কিন্তু উইলটা? উইলে তো প্রভাবতীই নিজের নাম লিখেছে আগের নাম মুছে।'

'সেটাও অন্য লোকের কারসাজি। দোষ চাপাতে চায় প্রভাবতীর কাঁধে।'

'তাও কি হয় স্যার। নিজের নাম নিজে ছাড়া কেউ জাল করে অন্যের উইলে?'

'করে বৈকি।'

'প্রভাবতীর নাম উইলে বসিয়ে কারও লাভ আছে?'

'আছে বৈকি।'

'কি বলছেন স্যার! আমার মাথা বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে।'

'ঘুরবে বৈকি।' বলে একখানা মার্কামারা হাসি হাসলাম। যে হাসি যুগ যুগ ধরে দুঁপি, পয়রো, হোমসরা হেসে এসেছে রহস্যের নাটকীয় পরিসমাপ্তির ঠিক আগের মুহূর্তে—হাসলাম

সেই হাসি। দেখেই তো ইন্সপেক্টর সাহেবের চক্ষু চড়কগাছ হল।

আমি বললাম, 'দরজাটা বন্ধ করে বসুন। সিগারেট খান? খান না। তাহলে আমি পাইপ ধরাই। একটু সময় লাগবে। কেননা, আশ্চর্য একটা কাহিনী আপনাকে শোনাব। শুনিয়ে আমি বিদায় নেব ব্যাঙ্গালোর থেকে। বাকি কাজ আপনার। আমি শুধু খেই ধরিয়ে দিয়ে যাব। শেষ করার পালা আপনার। নামও হোক আপনার।'

বলে পাউচ বার করলাম। একডালা টোব্যাকো নিয়ে ঠাসলাম বার্মিংহামের নতুন পাইপটায়। আর, আগাগোড়া হাঁ করে বসে রইল ইন্সপেক্টর।

বেশ কয়েকটা রাম-টান দেওয়ার পর বললাম, 'এ মামলার শুরু কলকাতায়—আমার এক লেখক বন্ধুর আড্ডাঘরে। ডিটেকটিভ জাতটা পেট থেকে পড়েই যে ডিটেকটিভ হয় না—এটাই মাথায় ঢোকাচ্ছিলাম বন্ধুবরের। এ জন্যে পড়তে হয়, চোখ-মন-কানকে তৈরি করতে হয়। নইলে অনেক সূত্রই সামনে থেকেও কলা দেখায়। যেমন সিগারেট। সিগারেট যারা খায়, তারা কিভাবে আঙুলের ফাঁকে সিগারেট ধরে, কিভাবে ঠোঁটের গোড়ায় ঝোলায়, কিভাবে ধোঁয়া ছাড়ে, বা রিঙ ছাড়ে—এই দেখেই মানুষটার চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা বলা যায়।

'এমনি ধরনের অনেক জ্ঞান দিচ্ছি বন্ধুকে—না দিলে পাঠকসাধারণ ভাল জিনিস পাবে কেন লেখকের কাছ থেকে—এমনি সময়ে আড্ডাঘরে ঢুকলেন আমাদের ডক্টর জাম্বুলিঙ্গম।

'জাম্বুলিঙ্গমের ব্যক্তিত্ব আমাদের মুগ্ধ করল। তাঁর বাচনভঙ্গি আমাদের মন কেড়ে নিল। তাঁর বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তি দেখে নিমেষে তাঁকে আপন করে নিলাম।

'জাম্বুলিঙ্গম কলকাতা গিয়েছিলেন মালুমঙ্গলমের খোঁজে। না পেয়ে আমাকে পাকড়াও করলেন। আমার হাতে গোপন তদন্তের ভার দিতে চাইলেন।

'জাম্বুলিঙ্গমের হাতে একটা বাহারি ছাতা ছিল। এমন সুন্দর ছড়ি প্যাটার্নের ছাতা সচরাচর দেখা যায় না। ছাতাটা উনি নামিয়ে রেখেছিলেন মাঝখানের উঁচু টেবিলের ওপর। ফেরুলটা ফেরানো ছিল আমার দিকে। তাই বৈশিষ্ট্যটা নজরে এসেছিল।

'অন্য কারো নজরে আসেনি। অমন যে ডাকসাইটে লেখক বন্ধু, যার গোয়েন্দা গল্প পড়ে পাঠকরা নাকি লেখককেই গোয়েন্দা বলে ধরে নেন, সেই লেখক বন্ধুরও নজরে আসে নি ছাতার তলার ফেরুলের অদ্ভুত বেয়াড়াপণা।

'ফেরুল প্রসঙ্গে পরে আসছি। জাম্বুলিঙ্গমের কথার ফাঁকে ফাঁকে ফেরুলটা দেখে নানা রকম কৌতূহল মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারতে শুরু করল। তাই নির্লজ্জ ভাবেই অ্যাডভান্স চাইলাম পারিশ্রমিক বাবদ। উনি সঙ্গে সঙ্গে চেকবই বার করলেন। আমার সামনেই চেক লিখে দিলেন। আমার যা জানবার, সঙ্গে সঙ্গে জানা হয়ে গেল।

'সব জেনেই ব্যাঙ্গালোরে এলাম। সব জেনেও ন্যাকা সেজে তদন্ত করলাম। প্রভাবতীকে নির্দোষ জেনেও তাকে ধরিয়ে দিলাম। কারণ, হাতে সময় নেওয়া। যাতে আমার গোপন তদন্তের অত্যন্ত গোপন অংশটুকু খুবই গোপনে নিজেই খুঁজে বার করতে পারি।

'এই দু-দিনে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সব জানলাম। কোন্ মন্ত্রগুপ্তির বলে এত কাণ্ড জানলাম, তা বলতে গেলে সাতকাণ্ড রামায়ণ শোনাতে হয়। সংক্ষেপে শুনে রাখুন। মালুমঙ্গলমকে খুন করেছেন এমন একজন ব্যক্তি, যাঁকে উনি সবচাইতে বিশ্বাস করেছিলেন।

ধরতে পারলেন না? ডক্টর জাম্বুলিঙ্গম।'

ভেবেছিলাম এমন একটা বম্বশেল নিউজ শুনে আঁতকে উঠবে ইন্সপেক্টর। কিন্তু অতি আঘাতে চেতনা অসাড় হয়ে যায় শুনেছি। ভদ্রলোকেরও হল তাই। চোয়াল ঝুলে পড়ল। মুখ দিয়ে টুঁ শব্দটি বেরোল না। ফ্যালফ্যাল করে কেবল তাকিয়ে রইল আমার পানে।

আমি বললাম—ইচ্ছে করেই বললাম, 'কি হল মশাই, অমন করছেন কেন?'

প্রায় খাবি খাওয়ার মত মুখব্যাদান করে বলল ইন্সপেক্টর, 'স্যার, আপনি ঠাট্টা করছেন?'

'আরে গেল যা,' একটু বিরক্ত হয়েই বললাম আমি, 'ঠাট্টা করার সময় এটা?'

'ডক্টর জাম্বুলিঙ্গম বাজে লোক নন তো।'

'আমি কি বলেছি বাজে লোক? বাজে লোক কখনো এমন উল্টো দিক থেকে কেস সাজাতে পারে? অলপ্রুফ কেস মশাই। ছুঁচ ফোটানোর জায়গা নেই। ব্রেন না থাকলে কেউ কর্ণাটক থেকে বঙ্গে দৌড়ে ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে অ্যাপয়েন্ট করে? কেন জানেন?'

'আজ্ঞে?'

'প্যাঁচের কেস বলে। ব্রেনি প্যাঁচ তো, জবর ব্রেন না হলে প্যাঁচ ধরতে পারত না। না ধরতে পারলে প্রভাবতীকে ফাঁসানো যেত না। প্রভাবতী না ফাঁসলে জাম্বুলিঙ্গম কেটে বেরিয়ে যেতে পারতেন না। বুঝলেন?'

'আজ্ঞে না।'

'বুঝিয়ে দিচ্ছি। এ কেসের প্রথম প্যাঁচ হচ্ছে টাইপরাইটারের চিঠি। ইচ্ছে করেই পুরোন রিবনে টাইপ করা হয়েছিল চিঠিটা। পরের দিন নতুন রিবন লাগানো হবে জেনেই পুরোন রিবনে টাইপ করে রাখা হয়েছিল। ফলে, ইচ্ছে করেই একটা অসঙ্গতি রেখে দেওয়া হয়েছে। অসঙ্গতিটা ধরা পড়লে প্রভাবতীকে সন্দেহ হবে। কিন্তু ধরবার মত ব্রেন তো চাই। তাই ডাক পড়ল ইন্দ্রনাথ রুদ্রের।'

আবার খাবি খেলো ইন্সপেক্টর। আমি বললাম, 'এ কেসের দ্বিতীয় প্যাঁচ হল উইলের জালিয়াতি। নাম মুছে প্রভাবতীর নাম লেখা হয়েছে ইচ্ছে করেই। ইনফ্রা-রেড ফটো তুললেই তলায় অস্পষ্ট নামটা দেখা যাবেই। ফলে, সব সন্দেহ গিয়ে পড়বে প্রভাবতীর ওপর। কিন্তু ইনফ্রা-রেড ছবি তোলার বিদ্যে বা আইডিয়া ক'জনের থাকে বলুন? যদি জালিয়াতিটা চোখ এড়িয়ে যায় স্থানীয় পুলিশের? তাই হত্যাকারীকে দৌড়তে হল কলকাতায়। আগাম টাকা দিয়ে ডেকে আনতে হল ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে। ফলে, জালিয়াতি ঠিকই ধরা পড়ল। হত্যাকারীর প্যাঁচালো ফন্দীও পূর্ণ হল।

'কিন্তু হত্যাকারী গোড়ায় ভুল করে ফেলেছিলেন ওই ছাতা সঙ্গে রেখে। বিলেত থেকে আনা ছাতা। আকাশে বৃষ্টির আভাস দেখলেই সঙ্গে রাখার অভ্যেস। তাই ছাতা নিয়ে গেলেন আমাকে দিয়ে তাঁর প্যাঁচ ধরানোর বন্দোবস্ত করতে। পরিণাম কি হল জানেন? ভদ্রলোকের পুরো প্যাঁচটাই গোড়াতে আমি আঁচ করে ফেললাম। রগড় দেখতে এলাম ব্যাঙ্গালোরে।'

ইন্সপেক্টর বিহ্বল কণ্ঠে বলল, 'স্যার, আমি কিসসু বুঝতে পারছি না।'

'কেউই পারে না। পারে না বলেই আমার নাম দেয় রবার্ট ব্লেক। যাকগে সেকথা। আপনাকে আর একটা পিলে-চমকানো খবর শোনাই। ডক্টর জাম্বুলিঙ্গম বলে যাকে আপনারা মাথায় তুলে নাচছেন, যাকে সরকার মোটা টাকার বৃত্তি দিয়ে বসে আছে ব্লাড ক্যান্সার

গবেষণার জন্যে, তিনি আসল জাম্বুলিঙ্গম নন।'

'আসল জাম্বুলিঙ্গম নন!' ইন্সপেক্টর ক্ষীণ কণ্ঠে মিনমিন করল, 'মানে?'

'মানে নকল জাম্বুলিঙ্গম। আসল জাম্বুলিঙ্গম সমুদ্রের তলায় বা হাঙরের পেটে।'

'কি বলছেন, স্যার?'

'অনেকগুলো টেলেক্স মেসেজ থেকে খবরটা জেনেছি। যে জাহাজে আসল জাম্বুলিঙ্গম দেশে ফিরছিলেন, সে জাহাজে প্রায় তাঁরই মত চেহারার আর একজন সাউথ ইণ্ডিয়ান ছিলেন। নাম তাঁর কৃষ্ণস্বামী। কৃষ্ণস্বামীকে সনাক্তকরণের বড় চিহ্ন হচ্ছে তাঁর হাত। ভদ্রলোক অসম্ভব ল্যাটা ছিলেন। বাঁ হাতেই সব কাজ করতে অভ্যস্ত ছিলেন।

'ডক্টর জাম্বুলিঙ্গম ভারতের মাটিতে কোনদিনই পৌঁছান নি। মদ খেয়ে এক ঝড়ের রাতে ডেকে মাতলামো করার সময় নাকি ভদ্রলোক সমুদ্রে পড়ে যান। আর পাওয়া যায় নি। অবশ্য কেউ তাঁকে পড়ে যেতে দেখেন নি। লোকমুখে শোনা গিয়েছিল, মদ খেয়ে টলতে টলতে তিনি পায়চারি করছিলেন ডেকের ওপর ঝড়জলের রাতে।

'জাম্বুলিঙ্গমের মালপত্র কেবিনেই ছিল—শুধু পাশপোর্ট আর ডিগ্রী সম্পর্কিত কাগজগুলো ছাড়া। ধরে নেওয়া হয়েছিল, ওগুলো পকেটে নিয়ে ঘুরতেন ভদ্রলোক। ফলে সবশুদ্ধ সলিলসমাধি হয়েছে।

'কিন্তু তা হয়নি। কৃষ্ণস্বামীর চেহারার সঙ্গে বেশ কিছু মিল ছিল জাম্বুলিঙ্গমের। ফটো তুললে তা ধরাই যেত না। তাই সস্তায় কিস্তিমাতের প্ল্যান এঁটেছিল কৃষ্ণস্বামী। জাম্বুলিঙ্গমের দীর্ঘদিনের সাধনার সিদ্ধিকে মুঠোয় আনতে সহজতম ফন্দী। ব্লাড ক্যান্সারের দাওয়াইয়ের একমাত্র আবিষ্কারক হতে চেয়েছিল একাই। ধোঁকা-চিঠিতে মিথ্যে লেখা হয়েছিল। ও ওযুধে মাথা খারাপ হওয়ার ব্যাপারটা স্রেফ বানানো।

'ঝড়জলের রাতে কৃষ্ণস্বামীই ঠেলে ফেলে দিয়েছিল জাম্বুলিঙ্গমকে। এটা আমার অনুমান। পরে মিলিয়ে নিতে পারেন। তারপর জাম্বুলিঙ্গমের নাম লেখা কাগজপত্র পাশপোর্ট হাতিয়ে নিয়ে দেশে ফিরেছিল।

'তারপর থেকেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দেখা গিয়েছে নকল ডক্টর জাম্বুলিঙ্গমকে। কথায় কথায় পাশপোর্ট খুলে ছবি দেখিয়েছে। চেহারায় ছবিতে কোন অমিল নেই। সই নকল করতে একটু সময় লেগেছে অবশ্য। ডান হাতে সই করার প্র্যাকটিশ করতে হয়েছে। কারণ কৃষ্ণস্বামী ল্যাটা। জাম্বুলিঙ্গম নন।

'বিশাল এই উপমহাদেশে জাম্বুলিঙ্গমের নাম লেখা কাগজপত্র আর পরিচয়নামা নিয়ে তাঁরই মতো কোন জুয়াচোর ঘুরে বেড়ালে তাকে ধরার সাধ্য কারোর নেই—যদি না নিজে ধরা দেয়। অতি-চালাকেরই গলায় দড়ি পড়ে। তাই ধরা শেষ পর্যন্ত পড়তেই হল। যেচে শেয়ালকে ভাঙা বেড়া দেখিয়ে নিজেই মরল।'

এই পর্যন্ত বলে আমি উঠে পড়লাম। হাঁ-হাঁ করে ইন্সপেক্টর বললে, 'স্যার, আসল কথাটাই তো বলে গেলেন না। নকল জাম্বুলিঙ্গমকে গোড়া থেকেই সন্দেহ করলেন কেন?'

'বললাম তো ছাতার ফেরুল দেখে।'

'কি ছিল ছাতার ফেরুলে?'

'কিচ্ছু ছিল না। শুধু একটা বিশেষ দিক ছিল।'

'ফেরুল ক্ষয়ে গিয়েছিল? তা তো যাবেই।'

'ওই যে বললাম, চোখ না থাকলে ডিটেকটিভ হওয়া যায় না। দরকারী অদরকারী সব কিছুই চোখে পড়া চাই। আমি দেখলাম, ফেরুলের যেদিকটা যেভাবে ক্ষয়েছে, সেদিকটা সেভাবে ক্ষইতে পারে তখনই, যদি ছাতার মালিক বাঁ হাতে ছাতা নিয়ে হাঁটে।

'ডান হাতে ছাতা নিয়ে ছড়ির মত দুলিয়ে হাঁটলে ফেরুলের যেদিকটা বেশি ক্ষয়ে যায়, সেদিকটা থাকে ফেরুলের ওপর দিকে সামান্য ডাইনে ঘেঁষে।

'কিন্তু বাঁ হাতে ছাতা বা ছড়ি রাখলে ক্ষওয়ার দিকটা থাকবে সামান্য বাঁদিক ঘেঁষে।

'নকল জাম্বুলিঙ্গমের ছাতার ফেরুলও দেখলাম সামান্য বাঁয়ে ক্ষওয়া। কিন্তু ছাতা বা ছড়ি তো সবাই ডান হাতেই রেখে পথ চলে—বাঁ হাতে হাজারে একজনও রাখে কিনা সন্দেহ। তবে কি ভদ্রলোক ল্যাটা?

'কৌতূহল হতেই পরখ করলাম। আগাম টাকা চাইলাম কায়দা করে। ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে চেক লিখলেন ডান হাতে—স্বচ্ছন্দগতিতে নয়। আড়ষ্টভাবে।

'বুঝলেন তো? অজ্ঞাতসারে দীর্ঘদিনের অভ্যাসমত যিনি বাঁ হাতে ছাতা রাখেন, তিনি যে ল্যাটা সেটা চেক লেখবার সময়ে প্রকাশ করতে চান না। কেন? কেন এই গোপনতা? কেন এত লুকোচুরি?

'মনের মধ্যে ঘোর সন্দেহ নিয়ে ব্যাঙ্গালোরে এলাম। মালুমঙ্গলমের লাশ আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত পাকা প্রমাণ পাই নি। ছোরা মারার ধরন দেখেই অনুমান করেছিলাম, হত্যাকারী বাঁ হাত চালিয়েছে। অর্থাৎ ল্যাটা। পোস্টমর্টেম রিপোর্টও তাই বলেছে।

'সুতরাং নকল জাম্বুলিঙ্গম, মানে ল্যাটা কৃষ্ণস্বামীই আসল খুনী। প্রভাবতী নয়।' বলে, পা বাড়ালাম চৌকাঠের দিকে।

ভ্যাবাচাকা ভাবে পেছন পেছন দৌড়ে এল ইন্সপেক্টর, 'স্যার, স্যার, কেস সাজাবো কি করে?'

'সে ভার আপনার। আমার ভার ছিল মালুমঙ্গলমকে বার করা। টাকাও খেয়েছি তার জন্যে। নুন খেয়ে বেইমানি করতে পারব না। যার টাকা খেয়েছি, তার বিরুদ্ধে কি করে কেস সাজাই বলুন তো?' বলে আর দাঁড়ালাম না। আমি।

কাহিনী শেষ করে সশব্দে ঢেকুর তুলল ইন্দ্রনাথ। বলল, 'বৌদির তেলেভাজা খেয়ে আমার অম্বল হয়ে গেল।'

'বেইমান!' বলল কবিতা। □

* 'রোমাঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত। শারদীয় সংখ্যা, ১৯৭১।

পায়রাকুঠীর রহস্য

আসলে বাড়িটা সাহেব বাড়ী। অনেককাল আগে যখন সাহেবরা রাজত্ব করত এদেশে, এবাড়ী তখনকার তৈরী। মোটা মোটা থাম। এত মোটা যে দুহাতেও আঁকড়ে ধরা যায় না। চুনবালির তৈরি হলেও দারুণ মজবুত, কামান দাগলেও ভাঙতে সময় লাগবে।

দুশবছরের পুরোনো বাড়ী। কিন্তু আজও যেন নতুন। সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে প্রকাণ্ড বাগান। জনসন সাহেব যদ্দিন ছিলেন, সেখানে ফুলের বাহার দেখে চোখ জুড়িয়ে যেত। এখন শুধু জঙ্গল।

জনসন সাহেবের বউ মারা যেতেই মনের দুঃখে তিনি বিলেতে চলে যান। বাড়ীটা জলের দরে কিনে নেয় নীলমাধব সিংহ। ভদ্রলোক পকেটে তামার পয়সা নিয়ে এসেছিল ব্যবসা করতে। কয়েক মাইল দূরে পাহাড়ের গায়ে তখন মিলিটারী ব্যারাক বসেছে। হরদম গাড়ী যাতায়াত করছে। রাস্তার ঠিক ধারে একটা পেট্রল পাম্প খুলে বসতেই দুদিনেই ফুলে লাল হয়ে গিয়েছিল সিংহমশায়।

সে আজ অনেকদিনের কথা। সিংহমশায় এখন মরে হেজে স্বর্গে। এত বড় বাড়ীটা দিয়ে গিয়েছিল দুই ছেলেকে। বেণীমাধব আর ননীমাধবকে। দুজনেই দুধরনের মানুষ। বেণীমাধব শুধু পায়রা ওড়ায়। পায়রাকে এমন শিক্ষা দেয় যে অনেক মাইল দূর থেকে ছেড়ে দিলেও ঠিক উড়ে আসে কবুতর খোপে। বাড়ীর মধ্যে ঘরে ঘরে নাকি শুধু পায়রার খোপ বানিয়েছে সে। দামী দামী পায়রা কিনে নিয়ে যাচ্ছে দেশ-বিদেশের লোকরা গোপনে খবর পাঠানোর জন্যে। পায়রার পায়ে চিঠি বেঁধে ছেড়ে দিলেই হল—ঠিক উড়ে ফিরে যাবে নিজের জায়গায়। পায়রা রেস জেতবার জন্যেও খদ্দের আসছে দামী দামী গাড়ী চেপে। আর আসছে নানারকমের লরী আর ভ্যান—পায়রাদের খাবার নিয়ে।

পাহাড়ি মানুষরা তাই সাহেব বাড়ির নাম দিয়েছিল—পায়রাকুঠী। দিনরাত পায়রা উড়ছে, নামছে বক-বকম করছে সেখানে। এ নাম সে বাড়ীকেই মানায়। মাঝে মাঝে পেল্লায় মোটর হাঁকিয়ে পায়রাদের নিয়ে অনেক দূরে চলে যেত বেণীমাধব। পাহাড়ের ওদিকে গিয়ে পায়রাগুলোকে ছেড়ে দিয়েই জোরে মোটর হাঁকিয়ে ফিরে আসত পায়রাকুঠীতে। কিছুক্ষণ পরেই দেখা যেত নীল আকাশ থেকে দল বেঁধে পতপত করে নেমে আসছে ফেলে আসা পায়রার দল।

পায়রার মাস্টার বেণীমাধব বিয়ে-থা করেনি। বেণীমাধবের ভাই ননীমাধবও করেনি। বেণীমাধব পায়রা নিয়ে মশগুল। ননীমাধব মঠ মন্দির নিয়ে উদাসীন। একমুখ দাড়ি, গেরুয়া বসন, রুদ্রাক্ষের মালা—এই ছিল ননীমাধবের সম্বল। মাঝে মাঝে আসত দাদার কাছে। স্টেশন থেকেই শোনা যেত তার হর-হর-ব্যোম-ব্যোম ডাক। হেঁটেই আসত। দুপাশের লোক সরে যেত তাকে দেখে। কেউ কেউ পেন্নাম ঠুকত ভক্তিভরে। মৃদু হেসে সবাইকেই নমস্কার করত ননীমাধব।

পায়রাকুঠীতে তাই কোন রহস্য ছিল না। কিন্তু সংসারে কিছু রহস্যসন্ধানী আছেন মামুলী বস্তুর মধ্যে থেকেও যাঁরা চমকপ্রদ চক্রান্তকে উদ্ধার করতে পারেন। যেমন আমাদের ইন্দ্রনাথ রুদ্র। প্রাইভেট ডিটেকটিভ। চেহারাটা কবি কবি হলেও স্বভাবটা ঈগলপাখীর মত। শিকারকে ফসকাতে দেয় না।

এ কাহিনী সেই ইন্দ্রনাথ রুদ্রেরই।

পায়রাকুঠীর সিকি মাইল পূবদিকে থাকেন মিসেস শিকদার। বিধবা। ভীষণ মোটা। কিন্তু অনেক টাকার মালিক। জমিজমা বিস্তর। দেখাশুনার জন্যে এমন একজনকে রেখেছিলেন

যিনি সারাজীবন আরবের মরুভূমিতে কাটিয়েছেন ভারত সরকারের চাকরী নিয়ে। তারপর রিটায়ার করে ফিরে এসেছেন দেশে দুই ছেলেকে মানুষ করার জন্যে।

শোভনলাল তাঁর নাম। মেজর শোভনলাল। আকারে বেঁটোখাটো। ল্যাটা কিন্তু রীতিমত কর্মঠ। কম কথা বলেন। কেননা তাঁর মনে অনেক দুঃখ। অল্প বয়েসেই বউ মারা যান দুই ছেলেকে রেখে। ছেলেদের মুখ চেয়েই আর বিয়ে করেন নি শোভনলাল। কিন্তু ছেলেদের শ্রদ্ধা ভালবাসাও পান নি।

মদন আর বিজন ছেলেদুটি হয়েছে বিশ্ববকাটে। মা না থাকলে যা হয় আর কি। বাপ চাকরী নিয়ে ব্যস্ত, ছেলেরা ছিল বোর্ডিং হাউসে। কিন্তু সেখানে সুশিক্ষার বদলে কুশিক্ষাই শিখছে শুনে শোভনলাল ছেলেদের এনে রাখলেন নিজের কাছে—কিন্তু ছেলেদের দুচোখের বালি হয়ে রইলেন।

অথচ ছেলেদের ভালবাসা পাওয়ার জন্যে চেষ্টার ক্রুটি রাখেন নি শোভনলাল। মা-মরা ছেলেদের মায়ের মতই স্নেহ ভালবাসা দিয়ে মানুষ করার জন্যে আরবদেশের এক শেখ সাহেবের মোটা মাইনের চাকরীর প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করলেন। মিসেস শিকদারের ফল আর ফুলের বাগান দেখাশুনোর চাকরী নিলেন নামমাত্র মাইনেতে। সারা জীবন মরুভূমিতে কাটানোর জন্যে বাগান তৈরীর দিকে ঝোঁক ছিল অনেকদিন থেকেই। শেষ জীবনের শান্তির আশায় তাই নিজেই ফলফুলের চারা লাগাতেন, জল দিতেন, ফুল তুলতেন। এত কষ্ট করতেন শুধু দুই ছেলের মুখে চাঁদের হাসি ফোটানোর জন্যে।

ছেলেরা কিন্তু তাকে দেখলেই গম্ভীর হয়ে যেত। এতদিন শাসন না পেয়ে যারা বজ্জাতের ধাড়ি হয়েছে, হঠাৎ শাসন তাদের সইবে কেন? তাই বেশীরভাগ সময় কাটাত বাইরে—পায়রাকুঠীতে।

নিঃসন্তান বেণীমাধব মদন আর বিজনকে খুব ভালবাসত। পায়রাকে কিভাবে শিখিয়ে পড়িয়ে চিঠি বওয়াতে হয়, তা হাতেনাতে দেখিয়ে দিত। মদন আর বিজনও তো তাই চায়। লেখাপড়া 'ডকে' উঠল। দিনরাত পায়রাকুঠীর পায়রা নিয়ে ব্যস্ত রইল মাঠে ঘাটে।

তিতিবিরক্ত হয়ে গেলেন শোভনলাল। বেশ বুঝলেন ছেলেরা শাসনের বাইরে চলে গেছে। সারা জীবন তিনি বাবার কর্তব্য করেননি—এখন কি পারবেন? মনে মনে নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করলেন ছেলেদের এই অধঃপতনের জন্যে। ভাবতে লাগলেন সত্যি সত্যিই শেখ সাহেবের চাকরীটা নিয়ে ফের আরবের মরুভূমিতে ফিরে যাবেন কিনা।

এই সময় একদিন সন্ধ্যে নাগাদ শহর থেকে ফিরে স্টেশনে নামলেন শোভনলাল। কাঁধে ঝোলা নিয়ে রাস্তায় পা দিয়েছেন, এমন সময়ে দেখলেন মিসেস শিকদার তাঁর ফিয়াট গাড়ীটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন গেটের কাছে।

শোভনলালকে দেখেই এগিয়ে এসে বললেন—আমার সঙ্গে আসুন, কথা আছে।

ফিয়াট এসে থামল মিসেস শিকদারের বাড়ীতে। গাড়ীর মধ্যে একটা কথাও বলেন নি ভদ্রমহিলা। শোভনলাল নিজেও কম কথার মানুষ। তাই চুপচাপ চেয়েছিলেন জানলা দিয়ে বাইরে।

গাড়ী থেকে নামবার পর মিসেস শিকদার ভেতরে গিয়ে বললেন,—'আপনি আজ এখানেই খেয়ে যান।'

'কিন্তু—' মৃদু আপত্তি জানালেন শোভনলাল।

'কোনো কিন্তু নয়। খেতে খেতে কথা বলব।' বলে মিসেস শিকদার রান্নাঘরে চলে গেলেন। বসবার ঘরে একা বসে রইলেন শোভনলার। হাতের ব্যাগটা পাশের সোফায় রেখে ভাবতে লাগলেন, কি এমন দরকার পড়ল মিসেস শিকদারের যে স্টেশন থেকে তুলে আনলেন গাড়ীতে? ভদ্রমহিলা একা থাকেন। বিধবা তো, ভীষণ পিটপিটে। ঝি-রাঁধুনী একদম বরদাস্ত করতে পারেন না।

ভাবতে ভাবতে আনমনা ভাবে বাঁ হাতে চারমিনার সিগারেটের নতুন প্যাকেট বের করে কাগজটা ছিঁড়ে মেঝেতে ফেললেন এবং একটা সিগারেট ঠোঁটের ডগায় ঝুলিয়ে নিলেন।

ছেঁড়া কাগজটা কিন্তু মেঝেতেই পড়ে রইল এবং সেইটাই হল তার মৃত্যুবাণ।

যা বলতে চেয়েছিলেন মিসেস শিকদার, তা খানিকটা আঁচ করতে পেরেই অত আড়ষ্ট হয়েছিলেন শোভনলাল। কথাটা অনেকদিন ধলেই বলি বলি করেও বলতে পারছেন না। কিন্তু আভাসে ইঙ্গিতে শোভনলাল জেনে ফেলেছেন মিসেস শিকদারের মূল অভিপ্রায় কি।

খারাপ কিছু নয়। কিন্তু এই বয়েসে নিতান্তই অশোভন। বিশেষ করে ছেলেরা আর কচিখোকা নেই। শৈশবে যারা মা হারিয়েছে, অন্য মায়ের হাতে তাদের তুলে দেওয়া যায় কী?

হ্যাঁ, মিসেস শিকদারের এই হল মনোগত অভিপ্রায়। তার বিরাট সম্পত্তি তিনি মদন আর বিজনকে দিয়ে দিতে চান—কিন্তু মা হিসেবে। ওদের ভাল বোর্ডিংস্কুলে রেখে লেখাপড়াও শেখাতে চান, কিন্তু শর্ত ওই একটাই। শোভনলালের মন সায় দেয় নি মিসেস শিকদারের এ-হেন উদারতায়। গর্ভধারিণী মায়ের স্থান কি অন্য মা এসে পূরণ করতে পারে?

রান্নাঘর থেকে ফিরে এলেন মিসেস শিকদার। ভীষণ মোটা হলেও ভদ্রমহিলা হাঁটাচলা করেন লঘুচরণে—দেহের ওজন নিয়ে কাতর নন মোটেই। শাড়ীর খুঁট দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে হাসিমুখে বললেন—'আপনি কাঁচা লঙ্কার ঝাল খান তো?'

'খাই', চারমিনার নামিয়ে গম্ভীরমুখে বললেন শোভনলাল—'তার আগে একটা জবাব চাই।'

'বলুন', হাত মুছতে মুছতে বললেন মিসেস শিকদার।

'আমাকে কি বলতে চান?'

সটান প্রশ্ন শুনে সটান চেয়ে মুচকি হাসলেন মিসেস শিকদার—'ধরুন মদন আর বিজনের ভার নেওয়ার প্রস্তাব।'

'সেটা সম্ভব নয়,' রুক্ষকণ্ঠে কথাটা বলতে চাননি শোভনলাল। তবুও গলাটা বড় কর্কশ শোনালো। তাই পরক্ষণেই মোলায়েম হবার চেষ্টায় হেসে বললেন—'ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমাকে ভাবতে দিন।'

গম্ভীর হয়ে গেলেন মিসেস শিকদার—'মদন আর বিজনের মুখ চেয়েই কি বলছেন? চোখের সামনে ছেলেদুটো বয়ে যাচ্ছে দেখেও চুপ থাকতে পারছেন? তাছাড়া আপনাকেও দেখাশুনা করবার জন্যে....'

ধাঁ করে রক্ত গরম হয়ে গেল শোভনলালের। মিলিটারী মেজাজ তো। রাগলে আর

কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। উঠে দাঁড়িয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে শুধু বললেন—'আপনি নির্লজ্জ বেহায়া হতে পারেন, আমি নই। সবচাইতে বড় কথা, মদন আর বিজন আমার ছেলে—আপনার নয়। মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ নাই-বা দেখালেন।'

বলেই আর দাঁড়ালেন না শোভনলাল। ছিটকে বেরিয়ে এলেন বাড়ী থেকে। হন হন করে সটান ফিরে এলেন নিজের বাড়ী।

সে-রাতে আর ঘুমোতে পারলেন না শোভনলাল। বুঝলেন, মিসেস শিকদারের চাকরী খতম হয়ে গেল এইখানেই। কাল থেকে অন্য কাজের ধান্দায় বেরুতে হবে।

তার চাইতে বরং আরব দেশেই ফিরে যাওয়া যাক। আরব ভাষাটা তাঁর চোস্ত ভাবে জানা আছে বলেই ওদেশে চাকরীর বাজারে তাঁর এত চাহিদা। শেখ সাহেবের মিলিটারী উপদেষ্টা হিসেবেই বাকী জীবনটা মরুভূমিতেই কাটানো যাক। ছেলেরা থাকুক বোর্ডিং হাউসে। এর বেশী আর কি বা করবেন শোভনলাল? তাঁর সব চেষ্টাই তো ব্যর্থ হল।

রাত তখন দুটো। বালিশে মাথা রেখে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন মেজর শোভনলাল।

পরের দিন সকালে পুলিশ তলব করল মেজরকে।

পুলিশ? অবাক হলেন শোভনলার। ভারত সরকারের আস্থাভাজন অফিসার ছিলেন এককালে। পুলিশ তাকে সমীহ করে সেই কারণেই। সাতসকালে কেন তবে তলব পড়ল?

কারণটা জানা গেল পুলিশ জীপ থেকে নামবার পর। জীপ গিয়ে দাঁড়াল মিসেস শিকদারের বাড়ীর উঠোনে। সেপাইশাস্ত্রী গিজগিজ করছে বাগানে। উৎসুক জনতা উঁকিঝুঁকি মারছে ভেতরে। বসবার ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালেন শোভনলাল।

পিঠ উঁচু সেকেলে সোফায় হেলান দিয়ে বসে আছেন স্থূলকায়া মিসেস শিকদার। চোখদুটো খোলা—পাতা নড়ছে না—চোখের মণি স্থির—প্রাণের চিহ্ন নেই।

বাঁদিকের রগে দুটো পাশাপাশি ফুটো। রক্ত জমে কালো হয়ে গেছে ক্ষতমুখে এবং গালের ওপর।

দারোগা বিষেণচাঁদ স্থির চোখে চেয়েছিলেন শোভনলালের মুখের দিকে—মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করছিলেন।

এখন আঙ্গুল তুলে দেখালেন মিসেস শিকদারের ডান দিকে। শোভনলালের চামড়ার ব্যাগটা রয়েছে সেখানে। কালকে ফেলে গেছিলেন—হঠাৎ মাথা গরম হয়ে যাওয়ায় নিয়ে যেতে ভুলে গেছিলেন।

'চিনতে পেরেছেন?' কাঠখোট্টা গলা বিষেণচাঁদের।

'হ্যাঁ, আমার ব্যাগ,' যন্ত্রচালিতের মত বললেন শোভনলাল।

'আপনি কাল এখানেই ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'চারমিনার সিগারেট কি আপনিই খান?'

'হ্যাঁ।'

'কাল নতুন প্যাকেট কিনেছিলেন?'

'হ্যাঁ। কি করে জানলেন?'

মেঝে থেকে দুটো প্যাকেট ছেঁড়া কাগজ তুলে দেখালেন বিষেণচাঁদ।

'আপনার সিগারেটের প্যাকেট থেকে ছেঁড়া। কিন্তু মেজর, বিধবাকে গুলি করতে গেলেন কেন?'

ফ্যালফ্যাল করে শুধু চেয়ে রইলেন শোভনলাল।

একটা কথাও বলতে পারলেন না।

শোভনলালের ভাগ্যক্রমে ইন্দ্রনাথ রুদ্র সেই সময়ে ও-অঞ্চলে গিয়েছিল একটা চোরাই নটরাজ মূর্তির সন্ধানে। মূর্তি উদ্ধার করা পর দারোগা বিষেণচাঁদের ফাঁড়িতে গিয়েছিল বিদায় নিতে, এমন সময় শুনল একটা যাচ্ছেতাই রকমের খুন হয়েছে গতকাল।

বিধবা খুন। কিন্তু টাকাকড়ি গয়নাগাটির জন্য নয়। মিসেস শিকদারের হাতের হীরের আংটি, গলার সোনার হার, এবং কোমরের চাবী স্পর্শ করা হয়নি। লোহার সিন্দুকের লাখখানেক টাকা আর জড়োয়ার গয়নাও কেউ লোপাট করেনি। নিয়ে গেছে শুধু বিধবার প্রাণটা।

কেন? বিষেণচাঁদের এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই সরেজমিন তদন্তে নিজেই এসেছিলেন ইন্দ্রনাথ। স্রেফ কৌতূহল মেটানোর জন্যে। চৈত্র সংক্রান্তির ঢাক বাজলেই যেমন গাজনের সন্ন্যেসীর পিঠ চড়চড় করে, কোথাও কোনো খুনজখম চুরি রাহাজানির খবর শুনলেই ইন্দ্রনাথের পা দুটোও সুড়সুড় করে ওঠে।

বিধবা হত্যাকাণ্ড রীতিমত রহস্যজনক। শোভনলালের ব্যাগ পাওয়া গেছে অকুস্থলে—নিষ্প্রাণ বিধবার দেহের ঠিক পাশেই। সোফার হাতলে, দরজার গায়ে আঙ্গুলের ছাপের ছবি তুলে দেখা যাচ্ছে হুবহু মিলে যাচ্ছে—শোভনলালের আঙ্গুলের ছাপের সঙ্গে। শুধু একটা জিনিস এখনো মিলিয়ে দেখা যায়নি—মৃতদেহ নিয়ে কাটা ছেঁড়া করে ময়না তদন্ত করলে সে রিপোর্টও পাওয়া যাবে। গুলি দুটো রগ ফুঁড়ে মাথার মধ্যে রয়ে গেছে। সেই গুলি শোভনলালের রিভলভারের গুলির সঙ্গে মেলে কিনা দেখতে হবে। কিন্তু বিধবাকে মেরে শোভনলালের লাভ কী? চাকরীটা তো গেল। টাকা পয়সাও লুঠ করা হয়নি। তবে?

শোভনলাল আর মদন-বিজনের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলার পর ফাঁড়িতে ফিরে এল ইন্দ্রনাথ।

বিষেণচাঁদ বললেন—'কি হে টিকটিকি, কিছু পেলে?'

বিষেণচাঁদ এককালে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে স্কটিশচার্চ কলেজে একই ক্লাসে বি-এসসি পড়েছিলেন, সেইসূত্রেই 'তুমি' বলেই সম্ভাষণ করেন ইন্দ্রনাথকে।

ইন্দ্রনাথ বললে—'শোভনলাল নির্দোষ।'

চোখ নাচিয়ে বললেন বিষেণচাঁদ—'কি করে বঝলে হে গণৎকার?'

'রগের বাঁ পাশে ফুটো দেখে।'

হেঁয়ালির মানে বুঝেই হেসে বিষেণচাঁদ বললেন—'সেটা আমিও লক্ষ্য করেছি।'

'শুধু একটা প্রমাণ লক্ষ্য করোনি।'

'কোনটা বৎস?'

'চারমিনারের এই ছেঁড়া কাগজদুটো।'

'বলো কি হে? আমিই তো দিলাম তোমাকে।'

'শোভনলাল একটা প্যাকেটের কাগজ ছিঁড়েছিলেন। আর একটা প্যাকেটের কাগজ কে ছিঁড়ল?'

'নিশ্চয় শোভনলাল।'

'মোটেই না।'

'কি করে বুঝলে?'

'সেটাই তো আমার মন্ত্রগুপ্তি,' রহস্যগম্ভীর হেসে বলল ইন্দ্রনাথ। 'ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুলে না পড়েও যে ডিটেকটিভ হওয়া যায়, সে প্রমাণ এইবার তোমায় হাতেনাতে দেব।'

নিশুতি রাত।

পায়রাকুঠীর বিশাল বাগানের অযত্নবর্ধিত ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে এগুচ্ছে একটি কৃষ্ণ-কালো কৃশ মূর্তি। মার্জারের মত লঘুচরণ তার। এক হাতে পেন্সিলটর্চ। আরেক হাতে মিশমিশে রিভলভার।

এখন আর তাঁর পরণে মুগার পাঞ্জাবী নেই। কবি-কবি দেহ আবৃত কালো ট্রাউজার্স আর নাইলন পুলওভারে ইন্দ্রনাথ রুদ্র নিশীথ অভিযানে বেরিয়েছে।

কৃশ কিন্তু ব্যায়ামপটু ইন্দ্রনাথ পিচ্ছিল গতিতে এসে দাঁড়াল জলের পাইপের তলায়। বেল্টের আংটায় টর্চ ঝুলিয়ে রিভলভার রাখল চামড়ার খাপে। তারপর গিরগিটির মত সরসর করে উঠে গেল ছাদে।

একঘণ্টা পরে ফের পাইপ বেয়ে নেমে এল ইন্দ্রনাথ। নিঃশব্দ চরণে মিলিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে।

অন্ধকারে ইনফ্রা-রেড ফোটোগ্রাফ তুললে ইন্দ্রনাথের মুখে তখন দেখা যেত আশ্চর্য হাসি। যুদ্ধ জয়ের শব্দহীন অট্টহাসি।

সকালে বিষেণচাঁদকে ঘুম থেকে টেনে তুলল ইন্দ্রনাথ।

বলল—'তোমার হাতে সেপাই কজন আছে?'

হকচকিয়ে গিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললেন বিষেণচাঁদ—'ইয়ার্কি মারছো নাকি?'

'আমার হাতে আর সময় নেই। নটার ট্রেনেই কলকাতা ফিরব। তাই যা বলবার তোমাকে বলে যাচ্ছি।'

এবার ঘুম ছুটে গেল বিষেণচাঁদের চোখ থেকে। বললেন—কি বলবে?

'বলব যে তোমার চাকরী যাওয়া উচিত। তোমার মত একটা গর্দভ পাঁঠা উজবুককে দারাগা বানিয়ে আমাদের সর্বনাশ হচ্ছে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তোমার নাকের ডগা দিয়ে এতবড় কাণ্ডটা হচ্ছে, কোন খবরই রাখো না?'

ভীষণ ভড়কে গিয়ে এবং দারুণ রেগে গিয়ে বিষেণচাঁদ তেড়ে উঠলেন—'খবরদার ইন্দ্রনাথ, মুখ সামলে কথা বলবে।'

'তুমি মুখ সামলে কথা বলবে। নাদাপেটা হাঁদারাম কোথাকার! পায়রাকুঠীর রহস্য এ্যাদ্দিনেও মাথায় আসেনি কেন?'

'পায়রাকুঠীর রহস্য!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, পায়রাকুঠীর রহস্য! শুনেছো কোনদিন এই আক্রাগণ্ডার বাজারে শুধু পায়রাদের খাওয়ানোর জন্যে লরী-লরী খাবার আসে তেরপল চাপা দিয়ে? হেঁড়েমাথায় এতদিন কেন খেয়াল হয়নি যে পৃথিবীর সব গুপ্তচর আর বিপ্লবীরা একটা-না-একটা উদ্ভট রকমের পেশা নিয়ে লোকের চোখে সাধু সেজে থাকে? স্পাইরা সাজে আর্টিস্ট, বিপ্লবীরা কয়লাওলা, কেউ খোলে পোলট্রি, কেউ করে মাছের ব্যবসা। পায়রা ট্রেনিং সেণ্টারের আড়ালেও যে এরকম একটা ব্যাপার চলছে না, এটা মাথায় আসেনি কেন মেড়াকান্ত হাঁদারাম?'

'ইন্দ্রনাথ! ইন্দ্রনাথ! কি বলতে চাইছ তুমি?'

নিজে গিয়ে দেখগে যাও। পায়রাকুঠী ঘেরাও করো আর্মড পুলিশ দিয়ে। সাংঘাতিক গুলিগোলা চলতে পারে। মিসেস শিকদারের হত্যাকারীকেও সেখানে পাবে।'

'কে? কার কথা বলছো?'

'বেণীমাধব।'

'প্রমাণ?'

'সিগারেটের প্যাকেট ছেঁড়া এই কাগজ দুটো।'

'ব্রাদার, আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে।'

'মাথায় গোবর থাকলে ওই রকমই হয়। আগেই তোমাকে বলেছিলাম, দুটো প্যাকেট ছেঁড়া হয়েছিল ওখানে। একটা শোভনলাল ছিঁড়েছেন—আর একটা অন্য কেউ।'

'কি করে বুঝলে অন্য কেউ?'

'আচ্ছা ইডিয়ট তো। প্রত্যেকেই সিগারেটের প্যাকেট ছেঁড়ে বিশেষ এক কায়দায়। পাশাপাশি দুটো ছেঁড়া কাগজ রেখে মুখে মুখে মেলালেই মাইক্রোসকোপের তলায় তফাৎটা ধরা পড়ে। তুমি আমায় দুটো কাগজ দিয়েছিলে। একটা হুবহু মিলে গেল শোভনলালের প্যাকেটের কাগজের সঙ্গে। আর একটা মিলল বেণীমাধবের চারমিনার প্যাকেটের কাগজের সঙ্গে।'

'তুমি—'

'আমি পায়রাকুঠী থেকেই আসছি। শোভনলাল যে খুনী নন, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ কিন্তু রগের বাঁদিকের গুলির চিহ্ন। কেন জানো তো?'

এতক্ষণে হাসি ফুটল বিষেণচাঁদের মুখে। বললেন—'শোভনলাল ল্যাটা বলে। ল্যাটা হাতের গুলি রগের ডানদিক দিয়ে মাথায় ঢুকত।'

'যাক খানিকটা বুদ্ধি আছে তাহলে। আর হ্যাঁ ভাল কথা। ননীমাধবকেও গ্রেপ্তার করতে ভুলো না।'

'সন্ন্যাসী ননীমাধবকে? কেন বন্ধু, কেন?'

'কেননা বেণীমাধব শুধু অস্ত্রাগারের মালিক। লরী আর ভ্যান বোঝাই পায়রার খাবার আসত না হে, আসত শুধু রিভলভার, বোমা, নাইট্রোগ্লিসারিন আর বন্দুক। পাঠাতো এই ননীমাধব। সে-ই যে এই গুপ্ত দলের অধিনায়ক।'

'অ্যাঁ! বলো কী হে! কিন্তু বিধবাকে মারা হল কেন বুঝলাম না তো?'

'অস্ত্রাগারের সন্ধান জেনে ফেলেছিলেন বলে। শোভনলালকে ডেকে সেই কথাটাই বলতে

চেয়েছিলেন মিসেস শিকদার। কিন্তু শোভনলাল রেগে চলে এলেন। তারপরেই বেণীমাধব এল। মিসেস শিকদারকে চেয়ারে বসা অবস্থাতেই সামনে দাঁড়িয়ে গুলি করল বাঁ রগে। চেনাজানা ছিল বলেই ভদ্রমহিলা চুপ করে বসেছিলেন সোফায়,—ভাবতেও পারেন নি বেণীমাধব এসেছে তাঁকেই নিকেশ করতে। তারপর চারমিনারের প্যাকেট ছিঁড়ে সিগারেট ধরিয়ে ফিরে গেল পায়রাকুঠীতে।'

'আর তুমি সেই প্যাকেট ছেঁড়া কাগজটা দেখেই বুঝলে—'

'যে ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুলে পড়েও তোমাদের মাথা কত মোটা হয়। বিদায় বন্ধু, ফির মিলেঙ্গে।'

যথাসময়ে পায়রাকুঠীতে হানা দিল আর্মড পুলিশ। ঘরে ঘরে পায়রার খোপের বদলে পাওয়া গেল কেবল বাক্স বোঝাই আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। □

* 'রহস্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত। শারদীয় সংখ্যা।

ছিদ্রান্বেষী ইন্দ্রনাথ

'গোয়েন্দা আমরা প্রত্যেকেই,' দাঁতে কামড়ানো চুরুটের ফাঁক দিয়ে জড়িয়ে মড়িয়ে বলল ইন্দ্রনাথ। 'প্রাত্যহিক জীবনে কে গোয়েন্দা নয় বলতে পারো?'

চাইনিজ শ্রিম্প বল খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছিল কবিতা। সাদা বাংলায়, চিংড়ি পকৌড়া। পাকস্থলী পরিপূর্ণ হওয়ার পর শুরু হয়েছে নির্ভেজাল আড্ডা।

'মেয়ে-গোয়েন্দা অবশ্য ঘরে ঘরে, সোয়ামীদের ওপর নজর রাখার সময়ে,' মুচকি হেসে চুটকি ছাড়ল কবিতাঃ 'যেমন আমার ঘরে আমি গোয়েন্দা।'

ইন্দ্রনাথ রসিকতার মুডে ছিল না। তাই একতাল ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'যেমন ধরো উকিল, ডাক্তার, অফিসার, ব্যবসাদার, রিপোর্টার। হোয়াইট হাউসের ভিৎ কাঁপিয়ে ছাড়ল দুজন রিপোর্টার। গিয়েছিল চুরির ঘটনার খোঁজে—পেলো সাপের সন্ধান। শুরু হলো গোয়েন্দাগিরি। টেলিফোনে খবর নিতে হবে? প্রশ্ন করে চুপ করে থাকো দশ সেকেণ্ড। জবাব না এলে বুঝতে হবে প্রশ্নের জবাব হল 'হ্যাঁ।' টেলিফোনও যখন বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল, তখন হোয়াইট হাউসের 'কেউকেটা'টির সঙ্গে দেখা করার সঙ্কেত জানানো হত ঝুল বারান্দার কোণে ফুলদানি বসিয়ে। দেখাসাক্ষাতের সময় জানানো হত পরের দিনের নিউইয়র্ক টাইমস-এর ২০ নম্বর পৃষ্ঠায়। সেই পৃষ্ঠায় ঘড়ির কাঁটা এঁকে গোপন সংবাদদাতা জানিয়ে দিতেন কোথায় কখন দেখা পাওয়া যাবে তাঁর। আশ্চর্য, তাই না? গোয়েন্দা-সাংবাদিকদের দৌলতেই সিংহাসনচ্যুত হলেন বহু কু-কর্মের নায়ক প্রেসিডেন্ট নিকসন।'

আমি বললাম, 'নতুন কথা কিছু শুনছি না।'

ভুরু তুলে ইন্দ্রনাথ বললে, 'নিকসনের ছিদ্র অন্বেষণ দূর করে শুধু একখানা বই লিখেই বব আর কার্ল আজ পর্যন্ত পিটেছেন এক কোটি চোদ্দ লক্ষ টাকা। বই লেখার আগেই প্রকাশকের কাছে পেয়েছেন পঁয়তাল্লিশ হাজার ডলার। প্লেবয় পত্রিকা লেখাটা ছেপেছে ত্রিশ হাজার ডলার দিয়ে। ফিল্ম প্রোডিউসার সিনেমা করবেন বলে দিয়েছেন সাড়ে চার লক্ষ ডলার। পেপার ব্যাক বার করার জন্যে নীলাম করে বইটার দাম তুলে দিয়েছেন দশ লক্ষ

ডলার পর্যন্ত। পুলিৎজার পুরস্কার পর্যন্ত পকেটে পুরেছেন ওঁরা। মৃগাঙ্ক, ইচ্ছে যায় আমার কেসগুলো বব আর কার্লের হাতে তুলে দিই। কলমের জোর থাকলে কি না হয়!'

মাথা গরম হয়ে গেল আমার ঃ 'নিজেকে বিরাট মনে করছিস মনে হচ্ছে? আমার না হয় কলমের জোর নেই, তোরও গোয়েন্দাগিরির জোর এমন কিছু নেই যে রাতারাতি পৃথিবী-বিখ্যাত হবি। এত অহঙ্কার ভাল নয়। পতনের পূর্ব লক্ষণ।'

যেন শুনতেই পায় নি। এমনি ভাবে জানলা দিয়ে আকাশ দেখতে দেখতে ইন্দ্রনাথ আত্মগত ভাবে বলে চলল, 'যত ভাবি ততই অবাক হই। গোয়েন্দা কে নয়? সব মানুষই নিজের নিজের পেশায় অল্পবিস্তর গোয়েন্দা। চিন্তাকে যে ডিসিপ্লিনে আনতে পেরেছে, বুদ্ধিকে যে একাগ্র করতে পেরেছে, পর্যবেক্ষণকে যে প্রয়োগ করতে পেরেছে—গোয়েন্দা হবার যোগ্যতা তার মধ্যে আছে। ভাল ডাক্তারকেও ফাঁদ পেতে রোগকে সন্ধান করতে হয়। এই রকম একটি চরিত্র শার্লক হোমস এবং সুবিখ্যাত ডিডাকটিভ মেথডের সৃষ্টি করেন কোনান ডয়াল। অফিসার যদি অন্ধ হয়, কারবারী যদি ভোঁতা-বুদ্ধি হয়, তাহলে লুঠেরা জোচ্চোরেরা দুদিনেই রাজা হয়ে বসত। বুদ্ধির লড়াই চলছে সর্বক্ষেত্রে। এরকম টুকটাক অনেক ঘটনা আমার জানা আছে। অফিসার নিজেই গোয়েন্দা হয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছে কোম্পানীর।'

'তা ঠিক,' সায় দিল কবিতা ঃ 'প্রবঞ্চকরা দুষ্ট জীবাণুর মতই কিলবিল করছে আশেপাশে। যে যত ভাল গোয়েন্দা, সে তত নিরাপদ। কথাগুলো দামি কথা সন্দেহ নেই; কিন্তু আমার নিরীহ সোয়ামীকে ঠেস দিয়ে কথা বলার কি দরকার বলতে পারো?'

'কেন বলব না বলতে পারো?' চুরুট নামিয়ে বলল ইন্দ্রনাথ, 'স্ট্যানলী গার্ডনার, সিরিল হেয়ার—এঁরা প্রত্যেকেই পেশায় উকিল। তাই তাঁদের গোয়েন্দা গল্পে অত ধার। কোনান ডয়াল, নীহার গুপ্ত পেশায় ডাক্তার—তাই লেখাও ক্ষুরধার। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, জি-কে চেস্টারটন সাহিত্যের সম্রাট—গোয়েন্দা গল্পেও তার আভাস। কিন্তু আমাদের মৃগাঙ্ক রায়ের কি গুণ আছে বলতে পারো। না, না, চটলে চলবে না। গুণীর কাছে প্রশস্তির চেয়ে সমালোচনার কদর বেশি।'

'কিন্তু এর নাম ছিদ্রান্বেষণ—সমালোচনা নয়।' মুখ টিপে হেসে বলল কবিতা।

'ছিদ্র অন্বেষণ করাই তো আমার কাজ।' চুরুট ফের কামড়ে ধরে বলল ইন্দ্রনাথ, 'নিশ্ছিদ্র চক্রান্তে ছিদ্র খুঁজে বার করার সাধু নাম হল গোয়েন্দাগিরি। 'সত্য' আর 'ছিদ্র' এক্ষেত্রে একই টাকার এপিঠ-ওপিঠ।'

মুখ লাল করে বললাম, 'এর শোধ আমি তুলব, ইন্দ্র। এখন থেকে তোকে 'ছিদ্রান্বেষী' ইন্দ্রনাথ বলেই চালাব—'সত্যান্বেষী নয়।'

অট্টহেসে বললে ইন্দ্রনাথ, 'ভালই তো, তাতে এক ঢিলে দু'পাখি মরবে। তোর ভাষায় গ্ল্যামারের অভাব প্রকাশ পাবে। আর, এতদিন বাদে আমার কপালে একটা খেতাব অন্তত জুটবে।'

এমন সময়ে কবিতা বললে সবিস্ময়ে, 'ওকি অবনীবাবু, নাক টিপে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

রাগ জল হয়ে গেল দরজার দিকে তাকাতেই। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার অবনী চাটুয্যে দাঁড়িয়ে সেখানে। তর্জনী আর বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে টিপে আছেন বাঁ-নাকের বাম ছিদ্র। বললেন

অনুনাসিক কণ্ঠে, 'দেঁখছি ডাঁন ফুঁটোয় নিশ্বেঁস পঁড়ছে কিঁনা।'

তাজ্জব হয়ে বললাম, 'সে আবার কী?'

নাক ছেড়ে দিয়ে বাঁ-পা আগে বাড়িয়ে ঘরে পদার্পণ করলেন অবনীবাবু। বললেন, 'শাস্ত্র তো মানেন না। মানলে এত দুর্ঘটনা দেশে ঘটত না।'

সকৌতুকে বলল ইন্দ্রনাথ, 'ইড়া আর পিঙ্গলার ব্যাপার মনে হচ্ছে?'

ভীষণ খুশি হলেন অবনীবাবু ঃ 'যাক, জানেন তাহলে। শুভকর্মে চন্দ্রনাড়ী প্রশস্ত। মানে, বাঁ-নাকে নিশ্বেস পড়লেই শুভকর্ম করা উচিত।'

'এখন কোন্ নাকে পড়ছে দেখলেন?'

'বাঁ-নাকে। সেই জন্যেই তো বাঁ-পা ফেলে ঢুকলাম মশায়।'

'অশুভ ঝঞ্ঝাটে পড়েছেন মনে হচ্ছে?'

টাক চুলকে বললেন অবনীবাবু, 'আর বলেন কেন, একেবার নিশ্ছিদ্র প্লট মশাই—স্কাউন্ড্রেলটাকে ধরেও ধরতে পারছি না।'

অপাঙ্গে আমার পানে চাইল ইন্দ্রনাথ। বলল, 'ছিদ্র খুঁজতে হবে তো? বলুন, বলুন, ছিদ্রান্বেষী হাজির।'

বলব কি মশায়, রাত দুটোর সময়ে সে কি উৎপাত! ঝন-ঝন-ঝন। বুঝছেন তো কিসের উৎপাত? টেলিফোন! টেলিফোন! যতক্ষণ মরে থাকে, ততক্ষণ ঘুমিয়ে খেয়ে জিরিয়ে বাঁচি মশায়। জ্যান্ত হলেই প্রাণান্ত!

যাক, যা বলছিলাম, রাত দুটোর সময়ে আরম্ভ হল টেলিফোনের বাঁদরামি। ঠিক যেন ঘুংড়ি কাসি। ইচ্ছে হল দিই ব্যাটাকে এক ডোজ 'স্পঞ্জি' খাইয়ে। হোমিওপ্যাথি বিদেশ থেকে এসেছে বলে এত হেনস্থা করবেন না। গরু হারালে শুধু গরু খুঁজে পাওয়া যায় না। বাদবাকি সব হয়। মহাত্মা হানিম্যান বলেছেন....

যাচ্চলে! যা বলতে যাচ্ছিলাম ভুলে গেলাম...। ও হ্যাঁ, নিশ্ছিদ্র প্লট। রাত দুটো। টেলিফোন। ঘুম ভাঙ্গতেই তেড়েমেড়ে রিসিভার খামচে ধরে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কে? কে? এত রাত্রে কিসের দরকার?'

অমনি মিষ্টি গলায় তোৎলা স্বরে ককিয়ে উঠছিল একটা মেয়েছেলেঃ 'অবনীবাবু? বাঁ-বাঁচান! ওরা আ—আ—আমাকে কিডন্যাপ করতে আসছে!'

সে এক জ্বালা মশায়! ভগবান তোৎলাদের মেরেছেন। আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু কথা বলতে গেলে বলুন দিকি মাথা গরম হয় না?

যাই হোক, হড়বড় করে তোৎলাতে তোৎলাতে মেয়েটা বললে পার্ক টেরেসের দশতলার ফ্ল্যাট থেকে তাকে গায়েব করতে আসছে ডাকাতরা। এক্ষুণি না এলেই নয়।

কথার শেষ পর্যন্ত শোনা গেল না, কড়-ড়-ড় করে গেল লাইনটা কেটে। এদিকে অ্যাটম বোমা ফাটিয়ে মরছি; অথচ টেলিফোনটা পর্যন্ত নিখুঁত বানাতে পারি না। মাইক্রোস্কোপ আনাই বিলেত থেকে। ঘেন্না ধরে গেল মশাই দেখে শুনে।

ওই রকম টেলিফোন পেলে চুপচাপ থাকা যায় না। দূরভাষিণীর মুণ্ডপাত করতে করতে ধড়াচূড়া এঁটে নিলাম। পার্ক স্ট্রীটেই যখন বদলি হয়েছি, তখন পার্ক টেরেসে না গিয়েও তো

থাকা যায় না। বেরোতে যাচ্ছি, এমন সময়ে আবার উৎপাত। ফের টেলিফোন!

এবার অবিকল সেই রকম মেয়েলি গলা। সেই রকমই মিষ্টি, কিন্তু যেন সর্দিবসা—মানে আপনাদের ছেলেছোকরাদের ভাষায় সেক্সি। শুধু যা তোৎলা নয়।

ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি। প্রথম মেয়েটার নাম হিমি, দু নম্বর মেয়েটার নাম হিমা। হিমি নাকি হিমার ছোটবোন। হিমা কান্না কান্না গলায় বললে, এক্ষুণি নাকি হিমিকে জোর করে নিয়ে যাবে মেয়েচোরেরা। ঠিকানাও বলে দিল। একই ঠিকানা। পার্ক টেরেসের দশতলা।

দুজন সেপাই আর একজন অফিসারকে নিয়ে ছুটলাম তক্ষুণি। নির্জন রাস্তা। পার্ক স্ট্রীটে অবশ্য রাত বলে কিছু নেই। দশতলা পার্ক টেরেসের সামনে আসতে না আসতে দেখলাম, সত্যি সত্যিই একটা মেয়েকে কাঁধের ওপর ফেলে বেরিয়ে আসছে একজন লোয়ার ক্লাসের লোক। পেছনে আরও দুজন। ওরা এসে দাঁড়াল একটা উইলিজ জীপের সামনে।

কিন্তু ঠিক সেই সময়ে মোড় ঘুরল আমার জীপ। ফুলস্পীডে গাড়ি চালাচ্ছিলাম। টহলদারি পুলিশকার হলে অত জোরে ছুটত না। ধড়িবাজ মেয়েচোরেরা তা বুঝেই বোধ হয় মেয়েটাকে ফুটপাতে ফেলেই ফের ঢুকে পড়ল পার্ক টেরেসে।

মহা ফাঁপড়ে পড়লাম তাই দেখে। মেয়েটাকে সামলাবো, না স্কাউনড্রেলগুলোর পেছনে দৌড়াব। বুড়ো বয়েসে আমি তো আর ছুটতে পারি না। পার্ক টেরেসের বাড়িখানাও চাট্টিখানি কথা নয়। ফ্ল্যাটের সংখ্যাই তো আড়াইশ'। শয়তান তিনটে কোথায় লুকিয়েছে দেখতে হলে আরো সেপাই চাই। আমি তাই মেয়েটাকে জীপে চাপিয়ে একজন সেপাই নিয়ে ফিরে এলাম থানায়। পরে ভ্যানভর্তি সেপাই পাঠালাম বটে—কিন্তু ওদের আর টিকি দেখতে পেলাম না। উইলিজ জীপটাও নাকি চোরাই জীপ।

চুলোয় যাক সে কথা। ফ্যাসাদের শুরু হল থানায় ঢুকতেই। দেখি কি আমার অফিস ঘরে বসে অবিকল, ওই রকম চেহারার একটা মেয়ে। বলব কি মশায়, ঠিক যেন সন্দেশের ছাঁচে তৈরি মুখ চোখ। যমজ। বুঝেছেন? বৌমা, অমন চোখ বড় বড় করে তাকিও না মা। আরো আছে। শেষকালে চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতেও পারে।

অজ্ঞান মেয়েটার জ্ঞান ফেরানোর ব্যবস্থা করলাম। যমজ বোনের পরিচয়ও পেলাম। হিমি আর হিমা। বড়লোকের মেয়ে মশাই। আদুরে আদুরে চেহারা। আইবুড়ো। অথচ বাপ এখনই দশতলা বারোতলা বাড়িতে একটি করে ফ্ল্যাট কিনে দিয়েছেন। ব্ল্যাকমানির খেলা তো, বলবার কিছুই নেই। মেয়েগুলিও হয়েছে তেমনি।

মরুকগে! ওদের কথা শুনব বলে বসতে না বসতেই রাতবিরেতে আর এক আপদ। বলুন দিকি কি আপদ? কল্পনাও করতে পারবেন না মশাই। মৃগাঙ্কবাবু অবশ্য আমাকে নিয়ে ঠেসে ক্যারিকেচার লিখছেন, কিন্তু বললে রাগ করবেন জানি—ওঁর কল্পনা শক্তিও তো তেমন নয়।

বৌমার মুখ ভার হল কেন? আসল কথা না বলে, বাজে কথা বলছি বলে? বুড়ো হয়েছি তো। রিটায়ারের সময় হয়ে এল। এখন একটু ফালতু কথা বলে ফেলি। কিছু মনে কোরো না। কি বলছিলাম? ও হ্যাঁ। আর একটা আপদ। ধরতে পারেন নি তো কি আপদ? মেয়েছেলে মশায়, আর একটা মেয়েছেলে। ভোর চারটের সময়ে হন্তদন্ত হয়ে থানায় ঢুকল আর একটা মেয়েছেলে। অবিকল অন্য দুজনের মত দেখতে।

বললে না পেত্যয় যাবেন মশায়, থানাশুদ্ধ লোক ব্যোমকে গেল তিন তিনটে একই ছাঁচের সন্দেশ দেখে। সরেশ সন্দেশ। কিন্তু এরকম কাণ্ড কখনো দেখি নি হোল লাইফে। যমজ পর্যন্ত দেখেছি, কিন্তু....কিন্তু....তিনটে মেয়ে একই ডিম ফুটে বেরোলে কি বলা উচিত মৃগাঙ্কবাবু?....ত্রমজ? ঠিক, ঠিক! ত্রমজ! ত্রমজ বোনই বটে। নামও শুনলাম তিন নম্বরের। হিমু। মানে, হিমি, হিমা আর হিমু হল তিন বোন। তিনজনেরই তিনটে খানদানি ফ্ল্যাট। তিনজনেই আইবুড়ো। তিনজনেই ফ্ল্যাটে পৌঁছেছে অনেক রাত্রে গ্র্যাণ্ড হোটেলের বিউটি কনটেস্ট থেকে। তিনজনেই ড্রেসিং টেবিলে একটা করে চিঠি পেয়েছে। তিনজনের চিঠিতেই লেখা আছে—বাপের পকেট থেকে লাখখানেক টাকা খসিয়ে না আনলে, খাঁচায় পোরা হবে সেই রাতেই। রাজী থাকলে জানলায় টর্চের আলো জ্বেলে রাখতে হবে একটানা এক মিনিট—রাত ঠিক দুটোর সময়ে।

রূপকথা শোনাচ্ছি, ভাববেন না যেন। খাস কলকাতায় এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যা মোহন সিরিজকেও টেক্কা মারতে পারে মশাই। সাঙ্কোপাঞ্জা শুধু রোমাঞ্চের পাতায় কেন, এই শহরেই আকছার পাবেন। হিমি, হিমা, হিমুর কাহিনীও স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশ্যন। মানে, তিন তিনটে ব্যাচেলর মেয়ে—ব্যাচেলর কিনা ভগবান জানেন—একা একা ফ্ল্যাটে থাকে—বাপ-মা অন্যবাড়িতে ফুর্তি করে নাগর নাগরী নিয়ে—এ ভাবা যায় না!

এই দেখুন, আবার আলতু-ফালতু বকতে আরম্ভ করেছি। দেখছি, আমার নিজেরই 'ব্যারা-কার্ব' খাওয়া উচিত। হোমিওপ্যাথি ওষুধ মশাই, বাচালতার দাওয়াই।

যাচ্চলে, আবার সব গুলিয়ে গেল। ও হ্যাঁ....হিমা আর হিমু চালাক মেয়ে। চিঠি পেয়েই টর্চ জ্বালিয়ে সঙ্কেত করেছে জানলায়। হিমি করে নি। ভয়ের চোটে সটান ফোন করেছে আমাকে। তারপর টেলিফোনে খবর দিয়েছে দুই বোনকে। টেলিফোন পেয়েই ওরা দুজনেই ছুটে এসেছে থানায়। এবার শুনুন, আসল কারবারটা!

তার আগে মা লক্ষ্মী, একটু চা-টা হবে? কফি-টফি না হলে গলাটা ইদানীং বড্ড শুকিয়ে যায়। আসছে? বেশ! বেশ! মা লক্ষ্মী আমাদের সাক্ষাৎ শচী দেবী—মৃগাঙ্কবাবু ভাগ্যবান ব্যক্তি। আমার গিন্নিটি হয়েছে বেয়াড়া টাইপের। কেউ চা চাইলেই এমন মুখখানা করবে, যেন ঘরে চিনি নেই।

গেল যা! আবার অন্য লাইনে চলে এসেছি। সেদিন একটা আমেরিকান নাটক দেখলাম মশাই। আমার হয়েছে ঠিক সেই অবস্থা। এক বুড়ো আর এক বুড়ি। দুজনেরই দ্বিতীয় বিয়ে। দুজনেই খালি ভুলে যায়। দুজনেই এক পার্টনারের স্মৃতি, আরেক পার্টনারের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলছে। আমার হয়েছে...

ধুত্তোর! কি বলছিলাম? ও হ্যাঁ....আসল কারবারটা। আসল কারবারটাই বলা হয়নি এতক্ষণ। হিমি, হিমা আর হিমুর মা'টি হলেন আর এক শচী দেবী। এই.....এই.....এই দ্যাখো মা! কি বলতে কি বলে ফেললাম। ইন্দ্রজায়া শচী দেবীর একটা মস্ত দুর্নাম আছে, জান তো? যখন যার, তখন তার। পুরোন ইন্দ্রকে হটিয়ে স্বর্গটা যে দখল করবে, শচী দেবী হাসি

হাসি মুখে অমনি তার হেঁসেল ঠেলতে আরম্ভ করে দেবেন। হিমি, হিমা আর হিমুর জননীটি অনেকটা তাই। মানে, সোসাইটি গার্ল। গার্ল এককালে ছিল—এখন পাক্কা লেডি। ফাংসন, মিটিং, পার্টি নিয়েই ব্যস্ত। স্বামীর নাম? এখনো বলি নি? হ্যাঃ হ্যাঃ! এই জন্যেই বোধ হয় ডি-সি পোস্টে প্রোমোশনটা আটকে গেল আমার। ভদ্রমহিলার স্বামী মস্ত কারবারী। কোচিন থেকে নারকেল এনে কলের ঘানিতে পিষে তেল বার করে সাপ্লাই দেন নানান কোম্পানীতে। বি-এম-পি তেলের নাম শোনেন নি? খাঁটি নারকেল তেল বলতে আর কিছু নেই এদেশে।

কোটি কোটি টাকার মালিক হওয়ার পর ভদ্রলোকের মতিভ্রম হয়েছে বোধ হয়। বিশেষ করে প্যারালিসিসে কোমর থেকে নিচ পর্যন্ত অবশ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই মাথায় নাকি ভূত চেপেছে। অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যবসার পরিকল্পনা ফাঁদছেন। মানে, শেষ পর্যন্ত কারবারটাকে তুলে দেওয়ার মতলব আর কি।

একটা প্ল্যান শুনবেন? কোচিন আর সিলোন থেকে জাহাজ-ভর্তি নারকেল এনে নাকি পোষাচ্ছে না। ঠিক করেছেন, চাষ করবেন নিজের দেশেই। সুন্দরবনে নারকেল ফলিয়ে দেশের চেহারা পাল্টে দেবেন। হাসবেন না! হাসবেন না। প্ল্যানটা একেবারে অবাস্তব নয়। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টাটা বাঁধবে কে? পশ্চিম বাংলার দক্ষিণ প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের গায়ে যে রিজার্ভ ফরেস্ট আছে, সেখানকার নোনা মাটি আর আবহাওয়া নাকি নারকেল চাষের উপযুক্ত। উনি ঠিক করেছেন সেখানে এক লাখ নারকেল চারা লাগাবেন। মোটামুটি আট থেকে দশ বছরের মধ্যে ফল দেবে এক-একটা নারকেল গাছ। গাছ যতদিন বাঁচবে, ফলও তদ্দিন মিলবে। এক লাখ চারার মধ্যে পঁচাত্তর হাজার চারাও যদি বেঁচে থাকে, মন্দ কি? গাছ পিছু বছরে মাত্র একশ' টাকার নারকেল ধরলেও, বছরে পঁচাত্তর লক্ষ টাকা নীট লাভ।

শুধু কি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা? নারকেল তেল, নারকেল দড়ি ইত্যাদির জন্যেও কলকারখানা গড়ে তোলা যাবে ওখানে। ফলে, সুন্দরবন অঞ্চলের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। সুন্দরবনে হঠাৎ ক্রাইম বেড়ে যাওয়ায় কর্তাদের গরম মাথাও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। হতে পয়সা এলে চুরি-ডাকাতির সাধ কার থাকে বলুন?

গভর্নমেণ্ট প্রকল্পটি লুফে নিয়েছেন। রিজার্ভ ফরেস্ট থেকে জমিও দিয়েছেন। তাইতেই লেগেছে গৃহবিবাদ। মানে বি-এম-পি অয়েল মিলের মালিক সনাতনপ্রসাদের সঙ্গে তার বিদুষী বিবি অহল্যার।

নামখানা শুনেছেন? অহল্যা। মেয়েদের মুখে শুনলাম, মা নাকি সত্যিই অহল্যা—রূপের দিক দিয়ে। বাবা এই রূপ দেখেই টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছিলেন ভদ্রমহিলাকে। মেয়েদের জুলুষ দেখলেই অবশ্য খানিকটা আঁচ করা যায়। কিন্তু মায়ের ছিটেফোঁটাও নাকি ওদের বরাতে জোটে নি।

কি বলছিলাম মা লক্ষ্মী? কর্তা-গিন্নীর ঝগড়ার কথা, তাই না? সুন্দরবনে নারকেল চাষ নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই খিটিমিটি লেগেছে বাপ-মায়ের মধ্যে, বলল ত্রমজ মেয়েরা। সনাতনপ্রসাদ নাকি নিজে তো মরতে বসেছেন, মরার আগে কারবার পর্যন্ত মেরে যাবেন।

যাকগে সেসব ঘরোয়া কেচ্ছা। মেয়ে তিনটের ওপর এই সময়ে নেকনজর পড়ল কোন হারামজাদাদের, জানবার জন্যে শুরু করলাম তদন্ত। সে রকম তদন্ত, কিছু মনে করবেন না ইন্দ্রনাথবাবু, আপনিও পারবেন না। অত ঝক্কি সইবার ক্ষমতা আপনাদের নেই। মৃগাঙ্কবাবু অবিশ্যি রুটিন তদন্ত বলে যথেষ্ট বিদ্রূপ করেন আমাদের পদ্ধতিকে। কিন্তু রুটিন তদন্ত একবার করতে আসুন না। কাছা খুলে যাবে।

তদন্তর ফিরিস্তি দেব না। তবে কি জানেন, তদন্তই সার হল। বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরোর মত আর কি। মেয়ে তিনটেকে কিছুতেই ফ্ল্যাট থেকে সরানো গেল না। সনাতনপ্রসাদের স্পেশ্যাল রিকোয়েস্টে কনস্টেবল বসিয়ে রাখলাম ফ্ল্যাটের গোড়ায় দিন কয়েকের জন্যে। কিন্তু সাতটা দিনও গেল না।

এবার আসছি আসলের আসল ব্যাপারে। রিয়াল মিস্ট্রি এইখানেই। কান খাড়া করে শুনুন মৃগাঙ্কবাবু। দয়া করে, নেক্সট গল্পে আমাকে একটু ক্রেডিট দেবেন।

সনাতনপ্রসাদের ফ্যাক্টরিতে কিছুদিন আগে বিশ্রী লেবার মুভমেণ্ট হয়ে গিয়েছিল। জানেন তো, আজকালকার শ্রমিক-কর্মচারীরা কোম্পানীর ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাবে। ম্যানেজমেণ্টকে যা খুশি তাই করতে দেয় না। ইউনিয়নের সঙ্গে মিটিং করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

সনাতনপ্রসাদ তার ধার ধারেন নি। সুন্দরবনে নারকেল চাষ প্রসঙ্গে সরাসরি সরকারের সঙ্গে চুক্তিতে নেমেছেন। ফলে, আতঙ্ক দেখা দিয়েছে কারখানায়। লীডাররাও কিছু একটা না পেলে লেবার তাতাতে পারে না। এই ইস্যু নিয়ে ওরা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করল কারখানায় যে, সনাতনপ্রসাদের প্রাইভেট কোয়ার্টারেরর সামনে সি-আর-পি বসাতে হল চৌপর দিনরাত।

আরও খবর পেয়েছি মশাই। অহল্যা দেবী নিজেও নাকি কারখানার লোককে ক্ষেপিয়ে তুলেছেন। লীডারদের ডেকে উস্কে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। শ্রমিকদের চাপে যেন স্বামীরত্ন ভড়কে যান এবং নারকেল চাষ শিকেয় তুলে রাখেন। বড় ঘরের বড় ব্যাপার। দেখে দেখে চোখ পচে গেল।

হঠাৎ হিমি-হিমা-হিমুর কেস টেকআপ করার সাতদিন পরে, একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। সেদিন রাত্রে একটা বিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্ন গিয়েছিলেন অহল্যা দেবী। আত্মীয়-বাড়ির নেমন্তন্ন। মাঝরাতে লগ্ন। তাই ঠিক করেছিলেন, ভোররাতে ফিরবেন। রাত ন'টার সময়ে সেজেগুজে নিচে নেমেছিলেন। কারখানার পাশেই ওঁদের কোয়ার্টার। সি-আর-পি'দের বলেছিলেন, কর্তা একলা রইল। যেন একটু নজর রাখা হয়। আঙুল তুলে দেখিয়েছিলেন, আলো জ্বলছে তিনতলায়। বলেছিলেন, 'একটু বরং দাঁড়িয়ে যাই। আলো নিভিয়ে উনি শুয়ে পড়লে যাব।' ড্রাইভারও দেখেছে আলো জ্বলছে। তারপর সবার সামনেই আলো নিভে গেল। অর্থাৎ সনাতনপ্রসাদ মাথার কাছে বেডসুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিয়ে ঘুমের আয়োজন করছেন।

তিনতলায় আর কেউ থাকে না—অ্যালসেসিয়ান কুকরটা ছাড়া। সনাতনপ্রসাদ কাউকে বিশ্বাস করেন না রাত্রে—কুকুর ছাড়া।

অহল্যা দেবী তিনতলার দরজায় নিজে চাবি লাগিয়েছিলেন। একটা চাবি ছিল ভেতরে—সনাতনপ্রসাদের বালিশের তলায়। দরজায় ইয়েল লক লাগানো ছিল। একবার চাবি লাগালে নিশ্চিন্ত। বিয়েবাড়ি যাচ্ছেন বলে হ্যাণ্ডব্যাগ রাখেন নি। তাই চাবির গোছা রাখতে দিয়েছিলেন ড্রাইভারকে। বিদুষী বিবি তো—আপটুডেট লেডী। আঁচলে চাবি বাঁধলে ইজ্জত চলে যায়।

পরের দিন সকালবেলা কুকুরের হাঁক-ডাকে চমকে উঠল কারখানার দারোয়ান থেকে আরম্ভ করে সি-আর-পি পর্যন্ত। চাকরবাকররা দোতলা থেকে ছুটে গেল তিনতলায়। সবাই শুনলে, অ্যালসেসিয়ান কুকুরটা ভেতর থেকে দরজা আঁচড়াচ্ছে আর ভীষণ চেঁচাচ্ছে। কোনদিন কিন্তু এভাবে চেঁচায় না।

আচ্ছা জ্বালা তো! দরজা খোলারও উপায় নেই। চাবি মেমসাহেবের কাছে। ঘরে আলোও জ্বলছে। কিন্তু সাহেব তো কুকুরটাকে ধমক দিচ্ছেন না?

ভোর ছ'টায় এসে পৌঁছলেন অহল্যা দেবী। কুকুরের হাঁক-ডাক শুনে আর দরজার সামনে চাকর-বাকরের জটলা দেখে ড্রাইভারের কাছ থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুললেন। কুকুরটাকে ডেকে নিয়ে চলে গেলেন করিডরের দিকে। তারপর ফিরে এসে গেলেন বেডরুমে।

চাকরবাকররা ছুটে গেল চিৎকার শুনে। দেখল, সনাতনপ্রসাদ মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছেন বিছানায়। চোখ খোলা। মুখের ওপর মাছি উড়ছে।

জানেন তো, মরা হাতির দাম লাখ টাকা। ডাক পড়ল এই ঘাটের মড়া অবনী চাটুয্যের। চুলচেরা রুটিন তদন্ত করে তো মশাই বিলকুল ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। ঘর বন্ধ। চাবি ড্রাইভারের কাছে। আর একটা চাবি সনাতনপ্রসাদের বালিশের তলায়। বিয়েবাড়ির সবাই সাক্ষী—অহল্যা দেবী আর ড্রাইভার দুজনেই বাড়ি ছেড়ে নড়েন নি। সনাতনপ্রসাদেরও বিছানা ছেড়ে ওঠার ক্ষমতা নেই। বেড সুইচ টিপে না হয় আলো নিভিয়েছিলেন রাত ন'টায়। কিন্তু আলোটা জ্বালল কে? সারারাত আলো জ্বলে নি—সি-আর-পি'রা সাক্ষী। ভোরবেলা বন্ধ ঘরে আলো জ্বালল কে? সনাতনপ্রসাদ? কি যে বলেন! তিনি তো তখন মরে ভূত। ময়নাতদন্তে দেখা গেল, তিনি হার্টফেল করেছেন রাত ন'টা থেকে দশটার মধ্যে। মানে আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার পর ঘুমের মধ্যেই স্থূল শরীর ত্যাগ করেছেন। আলোটা তাহলে জ্বালল কে? ভূত? অ্যালসেসিয়ানের পক্ষেও সম্ভব নয় দাঁতে কামড়ে আলো জ্বালানো। সেক্ষেত্রে সুইচে দাঁতের দাগ থাকত। মনিব মারা গেছে বুঝেই সে দরজা খুলতে চেষ্টা করেছে, চেঁচিয়েছে—সুইচ টিপে আলো নিশ্চয় জ্বালায় নি। কে টিপল বেড সুইচ? তবে কি সি-আর-পি'রা মিথ্যে বলছে? আলো সারারাত জ্বলে ছিল, কিন্তু ব্যাটারা ঘুমোচ্ছিল বলে দেখে নি? এখন মানতে চাইছে না?

একটা স্ট্রোকের ফলেই শুয়ে পড়েছিলেন সনাতনপ্রসাদ। চিন্তাভাবনাও ইদানিং খুব বেড়েছিল। হার্ট আর অত ধকল সইতে পারে নি। ফাইনাল স্ট্রোকেই শেষ হয়ে গেছেন।

বিধাতার কি লীলা! এত টাকার মালিক! মৃত্যুকালে মুখে জলটুকুও পেল না। কারও দেখা পেল না। তা না হয় হল, কিন্তু আলোটা জ্বালল কে?

না, না, যা ভাবছেন তা নয়। আলো যে জ্বেলেছে, তার নাম জানতে আমি আসি নি। শোনাতে এসেছি। বুঝলেন না? কে আলো জ্বেলেছে, সবই মোটামুটি আঁচ করে ফেলেছি। না, না, আমাকে বলতে দিন.....পুলিশ গোয়েন্দারা ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না। আমাদেরও ব্রেন আছে। আমি খবর নিয়ে জেনেছি, কারখানার ওয়ার্কস ম্যানেজারের সঙ্গে অহল্যা দেবীর একটু গুপ্ত প্রণয় ছিল। ভদ্রলোক খুবসুরৎ। বিলেত-ফেরৎ। ব্যাচেলর। আর কি চাই বলুন? আরো খবর পেয়েছি—পতিদেবতাকে রোজ স্বহস্তে ওষুধ খাওয়াতেন অহল্যা দেবী। এ ব্যাপারে কাউকে বিশ্বাস করতেন না সনাতনপ্রসাদ। শুনবেন আরো? সনাতনপ্রসাদের হার্ট হোঁচট খেয়ে খেয়ে চলছিল বলে একটা ওষুধ দেওয়া হত যার পাঁচ ফোঁটা মানে অমৃত, দশ ফোঁটা মানে বিষ—হার্টের রুগীর পক্ষে। দোহাই মৃগাঙ্কবাবু, ওষুধটার নাম জিজ্ঞেস করবেন না। আপনারা—লেখকরা বড় অবিবেচক হন। যা শুনবেন তাই লিখবেন, তারপর আরো একশোটা খুনের কেস নিয়ে নাকের জলে চোখের জলে হতে হবে আমার মত অনেক বান্দাকে। একটু বুঝে-সুঝে লিখবেন মশাই। জানেন তো, শতং বদ মা লিখ।

আচ্ছা মুশকিল তো, আবার বেরুটে চলে গেলাম। আসল কথাটাই তো এখনো বলিনি। বিয়েবাড়িতে যাওয়ার আগে কর্তা-গিন্নিতে বেশ খানিকটা বচসা হয়েছিল। চাকরবাকররা শুনেছিল। চড়া গলায় ধমক দিয়েছিলেন সনাতনপ্রসাদ। অহল্যাও দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। তারপরই সেজেগুজে হোল নাইট বাইরে থাকবেন বলে বেরিয়ে গিয়েছিলেন অহল্যা। যাবার আগে সেই বিশেষ ওষুধটা খাইয়ে গিয়েছিলেন কর্তাকে রোজকার মত রাত ন'টায়।

এখন কথা হচ্ছে ক'ফোঁটা খাইয়েছিলেন? আমি বলব দশ ফোঁটা—মানে সঙ্গে সঙ্গে মারা গিয়েছিলেন সনাতনপ্রসাদ। প্রমাণ এখনো পাই নি; কিন্তু বিষয় মানেই বিষ—বিষয়ের লোভে সবই সম্ভব। আর এখানে তো নাগর জুটেছে। ঘরে পঙ্গু স্বামী কাঁহাতক আর সহ্য করা যায়? সুতরাং পতিদেবতাকে তিনিই সরিয়ে দিয়েছেন ধরে নিলাম। কিন্তু আলোটা কিভাবে জ্বলল সেইটাই তো বুঝতে পারছি না।

দাঁড়ান, দাঁড়ান, এখনো শেষ হয় নি। আরো একটা জবর খবর শুনিয়ে দিই। শোনবার পর কিন্তু চোখ দুটো কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে পারে মা লক্ষ্মী। সাবধান! সাবধান!

হিমা-হিমি-হিমু, এই ত্রমজকে ফ্ল্যাট থেকে লোপাট করার ষড়যন্ত্রটি কে এঁটেছিল জানেন? কল্পনা করুন তো। পারলেন না তো? দুয়ো! দুয়ো! স্বয়ং গর্ভধারিণী মশাই। অহল্যা দেবী নিজে লোক লাগিয়ে মেয়েদের লোপাট করতে চেয়েছিলেন। কেন? কেন আবার—মেয়েরা কোন গতিকে জেনে ফেলেছিল মায়ের হাতে বাবার জীবন বিপন্ন হলেও হতে পারে। অথচ সেকথা সবাইকে বলা যায় না। তাই ওরা ঠিক করল আমার দোর ধরবে। অহল্যা দেবী চলেন শিরায় শিরায়। মেয়েদের মতলব টের পেয়ে পুলিশের নজর অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে ইচ্ছে করেই মেয়েদেরকে গায়েব করতে আরম্ভ করলেন। আসলে পুরো ব্যাপারটাই

সাজানো। অর্থাৎ সেই রাতে আমাকে স্রেফ বোকা বানিয়ে ছেড়েছেন অহল্যা দেবী তাঁর ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে। মেয়েরাও বিহ্বল হয়ে পড়ল হঠাৎ এই উৎপাতে। বাপের কথা খেয়াল রইল না।

তার সাতদিন পরেই কাজ হাসিল করে ফেললেন অহল্যা দেবী। তিনি জানেন, মেয়েরা বাপকে বাঁচাতে চেয়েছে ঠিকই, কিন্তু মাকে ফাঁসাতে চায়নি। পুলিশের কাছে এলেও তারা মায়ের নাম করত না। বাবা মারা যাওয়ার পর তো আরো বোবা হয়ে যাবে। সনাতনপ্রসাদ মারা যেতেনই—না হয় দু'দিন আগেই তাঁর কষ্ট ঘুচিয়ে দেওয়া হল। মাকে ফাঁসিয়ে ঘরোয়া কেলেঙ্কারি ফাঁস করে আর লাভ আছে কী?

বলব কি মশায়, গোটা ফ্যামিলিটাই যেন কেমনতর। সব ছাড়া ছাড়া। অথচ তালে হুঁশিয়ার। মা থেকে মেয়েরা পর্যন্ত কেউ একটি কথাও ফাঁস করে নি। কিন্তু আমার নাম অবনী চাটুয্যে। ঠেঙিয়ে নকশাল তাড়িয়েছি। কি বললেন? খুব বাহাদুরি করেছি? চাকরি মশাই, চাকরি! চাকরি করতে গেলে নিজের ছেলেকেও ফাটকে পুরতে হয়, নকশাল তো ছার!

এখন বলুন, প্লটটা নিশ্ছিদ্র কিনা। বেশ বুঝতে পারছি, সনাতনপ্রসাদ এমনি এমনি মরেন নি। কিন্তু শালা কিছুতেই তা প্রমাণ করতে পারছি না। নিশ্ছিদ্র প্লটে একটা ছিদ্রও আবিষ্কার করতে পারছি না। একি গেরোয় পড়লাম বলুন তো? আলোটা কে জ্বেলেছে, তা তো জানি। কিন্তু জ্বালল কি করে তাই তো বুঝছি না। বেশ বুঝছি, ছিদ্রটা ওইখানেই। ওই ছিদ্রটা আবিষ্কার করতে পারলেই ফাঁসিয়ে দেব অহল্যা দেবীকে।

ম্যারাথন বক্তৃতা থামতেই কবিতা বললে, 'আপনার কফি জুড়িয়ে গেল। চাইনিজ শ্রিম্প বলগুলো পর্যন্ত ইঁটের গুলি হয়ে গেল।'

'অ্যাঁ! কখন এল এসব? বলো নি তো?' আঁৎকে উঠে প্লেটভর্তি চিংড়ি পকৌড়া আক্রমণ করলেন অবনী চাটুয্যে।

'বলতে দিলেন কই? যতবার মুখ খুলতে গেলাম, ততবারই তো দাবড়ানি দিয়ে থামিয়ে দিলেন।'

মুখভর্তি পকৌড়া নিয়ে অঁ-অঁ-অঁ-অঁ করে কি যেন বললেন অবনী চাটুয্যে, বোঝা গেল না।

হাসি চেপে ইন্দ্রনাথ বলল, 'আস্তে আস্তে খান, বিষম লেগে যাবে। খেয়ে নিয়ে চলুন ঘরটা দেখে আসি।'

কোঁৎ করে গিলে নিয়ে বললেন অবনীবাবু, 'কার ঘর?'

'সনাতনপ্রসাদের।'

'হা পোড়া কপাল! সপ্তকাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার বাবা! আরে মশায়, এখনো বুঝলেন না রুটিন-তদন্তে আমরা কিছুই বাদ দিই না?'

'রুটি আর লুচির মধ্যে যা তফাৎ, আপনার রুটিন-তদন্ত আর আমার লুচি—ন তদন্তেও

সেই তফাৎ অবনীবাবু।'

'মানে? মানে? মানে? এত অবিশ্বাস আমার ওপর কেন?' বলেই খপাৎ করে আরো দুটো পকৌড়া মুখগহ্বরে ঠেসে দিলেন অবনীবাবু।

'দেখবেন শ্বাসনালীতে যেন আটকে না যায়।' বলল ইন্দ্রনাথ, 'আপনি এত সুন্দরভাবে সব কথা বললেন যে, অবিশ্বাস করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। জ্বলন্ত বর্ণনা যাকে বলে—আপনার বর্ণনাও তাই। বায়োস্কোপের ছবির মত সব চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি বলেই একটা খটমট জায়গা ভেরিফাই করতে চাই।'

মুখভর্তি পকৌড়া চিবোনো বন্ধ করে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন অবনীবাবু। ভাবখানা—খটমট জায়গাটা আবার কোথায় দেখলেন মশায়?

ইন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দিলে, 'অহল্যা দেবী বিয়েবাড়ি থেকে এসে দরজা খুলেই কিন্তু বেডরুমে যান নি—যা সবাই যায়। উনি কুকুরটাকে নিয়ে করিডরে গেলেন। কেন?'

চোখদুটো আস্তে আস্তে ছানাবড়ার মত করে ফেললেন অবনীবাবু।

ইন্দ্রনাথ আরো বললে, 'উনি কি তাহলে জ্ঞানপাপী? উনি কি জানতেন, শোবার ঘরে স্বামীর মৃতদেহ পড়ে রয়েছে? কুকুরের অস্বাভাবিক চেঁচামেচির পর দরজা খুলেই ওঁর উচিত ছিল অসুস্থ স্বামীর কাছে ছুটে যাওয়া। কিন্তু কেন উনি করিডরে গেলেন, আমি গিয়ে দেখতে চাই।'

কণ্ঠনালী দিয়ে মস্ত ডেলাটাকে পাকস্থলীতে চালান করে দিয়ে বললেন অবনীবাবু, 'একটু দাঁড়ান। আর মোট চারটে আছে।'

ইন্দ্রনাথ আগে থাকতেই শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছিল অবনীবাবুকে।

সনাতনপ্রসাদের ঘরে ঢুকে তাই অবনী চাটুয্যে সোজা চলে গেলেন বেডরুমে। অহল্যা দেবীকে আবোল তাবোল কথায় আটকে রেখে দিলেন সেখানে।

ইন্দ্রনাথ এল করিডরে। ঢুকেই বাঁ দিকে। শেষপ্রান্তে একটা কাঠের বাক্স। অ্যালসেসিয়ানের শোবার জায়গা। বাক্সটা তখন খালি। কুকুর বেরিয়েছে চাকরের সঙ্গে হাওয়া খেতে।

ইন্দ্রনাথ আগে থেকেই ভেবে রেখেছিল, কি করতে হবে। তাই হেঁট হয়ে কাঠের বাক্সটা সরিয়ে রাখল পাশে।

বাক্সর তলায় একটা ময়লা লিনোনিয়াম পাতা। লিনোনিয়ামটাও তুলে ফেলল ইন্দ্রনাথ।

তলায় একটা কাঠের পাটাতন। লম্বায় একফুট, চওড়ায় একফুট। দেওয়ালের গা ঘেঁষে কাঠের ঢাকনির গায়ে পেন্সিল ঢোকানোর মত একটা ফুটো।

ছিদ্রপথে কড়ে আঙুল ঢুকিয়ে পাটাতনটা উঠিয়ে ফেলল ইন্দ্রনাথ। মেঝের চৌকোণা গর্তে একটা বাক্স বসানো। ইলেকট্রিক মিটার আর মেন সুইচের জঙ্গল সেখানে। হালফ্যাসানেরবাড়ি তো—দেওয়ালের গায়ে কিছু নেই।

পকেট থেকে টর্চ বের করে খুঁটিয়ে দেখল ইন্দ্রনাথ। কাঠের ঢাকনির যেখানে ফুটো, ঠিক

তার তলায় কাঠের গায়ে দুটো ছোট ছোট ছিদ্র। যেন স্ক্রু লাগানো ছিল। মেন সুইচের মাথা থেকে দুটো তার বেরিয়েছে। একটা তারে কিন্তু ব্ল্যাকটেপ জড়ানো।

সন্তর্পণে ব্ল্যাক টেপ খুলে ফেলল ইন্দ্রনাথ তার না ছুঁয়েই। তারটা সত্যিই কাটা। দুটো প্রান্ত জুড়ে ব্ল্যাক টেপ দিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছে।

বাক্সের তলায় ছোট্ট একটা টুকরো। সোলার ছিপির টুকরো।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ।

ফিরে এল শোবার ঘলে। অহল্যা দেবী গালে হাত দিয়ে নিশ্চুপ হয়ে শুনছেন অবনীবাবুর ফালতু বক্তিমে।

ভদ্রমহিলা নিঃসন্দেহে অপূর্ব সুন্দরী। খুঁত কোথাও নেই। বয়স হয়তো তিরিশ, মনে হচ্ছে আরো কম।

ইন্দ্রনাথকে দেখেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন অবনীবাবু। চোখের মধ্যে প্রশ্ন ফুটিয়ে জানতে চাইলেন—হল কিছু?

গম্ভীর মুখে পলকহীন চোখে অহল্যা দেবীর পানে চেয়ে বলল ইন্দ্রনাথ, 'নমস্কার, আমার নাম ইন্দ্রনাথ রুদ্র। প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আপনার কাছে শুধু দুটি জিনিস চাইতে এলাম।'

প্রতি নমস্কার করলেন অহল্যা, 'বলুন।'

'একটা কলিংবেলের টেপা সুইচ। আর একটা ছোট্ট সোলার ছিপি।'

নিমেষ মধ্যে নিরক্ত হয়ে গেলেন অহল্যা।

অবনীবাবুর পানে ফিরে বলল ইন্দ্রনাথ, 'এখন গ্রেপ্তার করতে পারেন। প্রমাণ পাওয়া গেছে।'

আবার চিংড়ি পকৌড়া। আবার কফি। আবার সরগরম বৈঠক।

ইন্দ্রনাথ বললে, 'ছিদ্রান্বেষী ছিদ্র খুঁজতে গিয়ে সত্যি সত্যিই ছিদ্র বের করে ফেলল।'

'কেসটা কিন্তু এখনো আমার কাছে পরিষ্কার হয় নি।' উৎকট গম্ভীর হয়ে বললাম আমি।

'ইহজন্মে হবে না। অবনীবাবু নিশ্ছিদ্র প্লটের ছিদ্রটা তাঁর অজান্তেই শুনিয়ে দিয়েছিলেন। তোরা প্রত্যেকে শুনেছিস। আমিও শুনেছি। কিন্তু ওই যে বললাম, যার চিন্তার ডিসিপ্লিন, বুদ্ধির একাগ্রতা আর পর্যবেক্ষণ প্রয়োগশক্তি আছে—সে ছাড়া গোয়েন্দা হওয়া কাউকে সাজে না। তাই নিশ্ছিদ্র প্লটের ছিদ্র আমার মাথায় এসে গেল, তোদের মাথায় এল না।'

কবিতা একদম না ঘাঁটিয়ে ভাল মানুষের মত মুখ করে বলল, 'হার মানছি ঠাকুরপো। কিন্তু আর সাসপেন্সে রেখো না। প্রেসার উঠে যাচ্ছে।'

প্রসন্ন হয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, 'আমি এইখানে বসেই আঁচ করেছিলাম, আলোর তারে এমন কিছু কারচুপি করা হয়েছিল যা অহল্যা দেবীর অনুপস্থিতিতে আপনা থেকেই আলো নেভাবে বা জ্বালাবে। ঘরের মধ্যে প্রাণী ছিলেন দুজন। সনাতনপ্রসাদ আর কুকুর। সনাতনপ্রসাদ

চলৎশক্তিহীন এবং আলো যখন জ্বলেছে বা নিভেছে—তখন তিনি মৃত। জীবিত প্রাণী বলতে রইল শুধু কুকরটা। কুকুরটার সঙ্গে আলো জ্বলা নেভার কোন সম্পর্ক নেই তো? অহল্যা দরজা খুলে ঢুকেই কুকুরটাকে নিয়ে করিডরে গেছিলেন কেন? করিডরেই কারচুপিটা নেই তো? হতে পারে কুকুরটা না জেনেই পুশ বাটনে চাপ দিয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়েছে অথবা জ্বালিয়েছে। কিন্তু নিভেছে রাত্রে—কুকুরের শোবার সময়। জ্বলেছে ভোরে—কুকুরের ওঠার সময়। তবে কি শোবার জায়গাটাতেই টেপা সুইচটা আছে?

'তাই তিনতলায় গিয়ে আমি আগে গেলাম করিডরে। দেখলাম, সত্যিই কুকুরের শোবার বাক্স রয়েছে সেখানে। সুসংবদ্ধ চিন্তা আর শৃঙ্খলাবদ্ধ যুক্তির প্রথমটি যদি সঠিক হয়, পরেরগুলোও সঠিক হতে বাধ্য। তাই বাক্স সরাতেই কি-কি পেলাম তা আগেই বলেছি।

'মেন সুইচের একটা তার কেটে, সেই তারে বাড়তি তার জুড়ে এনে লাগানো হয়েছিল একটা টেপা সুইচে। সুইচটা স্ক্রু দিয়ে লাগানো হয়েছিল কাঠের ডালার ছোট্ট ফুটোর ঠিক তলায়। সুইচের ভেতরে কনট্যাক্ট প্লেট দুটোকে ইচ্ছে করে বেঁকিয়ে এমন জায়গায় রাখা হয়েছিল, যাতে বাক্সের মধ্যে কুকুর শুলেই ঢাকনি চেপে বসবে সুইচের ওপর। ফলে কনট্যাক্ট কেটে যাবে। মানে আলো নিভে যাবে। কুকুরটা বাক্স থেকে নেমে এলেই ডালাটা সুইচের ওপরে উঠে যাবে—আলো জ্বলে উঠবে। অর্থাৎ পুশ বাটন টিপে ধরলে আলো জ্বলে, ছেড়ে দিলে নেভে। এই সুইচে ঠিক তার উল্টো ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। টিপলে নিভবে, ছাড়লে জ্বলবে।'

'কিন্তু ছিপিটার ভূমিকা কি?' শুধোলাম আমি।

'কাঠের ঢাকনিটা সুইচের মাথায় ঠেকছিল না বলেই ফুটো দিয়ে সোলার ছিপি এঁটে দিয়েছিলেন অহল্যা দেবী। ছিপির তলাটাই সুইচের ওপর চেপে বসে আলো নিভিয়েছে কুকুরের শোবার সময়ে। ঘরে ঢুকেই ওই ছিপিটা সরিয়ে নেবেন বলে অহল্যা দেবী আগে করিডরে গিয়েছিলেন। পুশ বাটন সরিয়েছেন পরে ধীরে সুস্থে।'

বিমূঢ় কণ্ঠে কবিতা বললে, 'দরজা বন্ধ করে অহল্যা দেবী নিচে নামার আগেই তো কুকুরটা বাক্সে গিয়ে শুড়ে পড়তে পারত! তাহলে তো আলো নেভার ব্যাপারে সি-আর-পি'দের সাক্ষী রাখা যেত না?'

হাল ছেড়ে দিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, 'জন্মে এমন দেখি নি! আরে বাবা, খানকয়েক বিস্কুট শোবার ঘরে ছড়িয়ে এলেই তো হল! কুকুর বিস্কুট না খেয়ে শুতে আসবে না। ততক্ষণে অহল্যা দেবী নিচে পৌঁছে যাবেন। সি-আর-পি'দের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবেন—ঘরে আরো জ্বলছে। হয়েছেও তাই। সব কবুল করেছেন অহল্যা দেবী।'

'ত্রমজ মেয়ে তিনটে?' বোকার মত জিজ্ঞেস করে ফেলেছিলাম আমি।

সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে উঠেছিল কবিতাঃ 'মরণ আর কি! সে-খোঁজে তোমার দরকার কী?' □

* 'রোমাঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত।

আদুরে খোকা

রাত তখন দুটো।

টেলিফোন এল শিকাগোর সীমানা ঘাঁটি থেকে। রাইটউড এভিন্যুতে ছোট্ট একটা পানাগারে এইমাত্র একটা রাহাজানি হয়ে গেল। টেলিফোনেই ঘটনাটার খুঁটিনাটি বিবরণ শুনলাম কর্তব্যরত সার্জেন্টের কাছ থেকে।

জায়গাটা শহরের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। কাজেই চট করে একটা গাড়ী নিয়ে ঝটিতি পৌঁছে গেলাম অকুস্থলে। গিয়েই দেখা হয়ে গেল মার্টিন চৌয়ানস্কির সঙ্গে। দারুণ উত্তেজনায় প্রায় লাফাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। ধড়ে যে তখনও প্রাণটা রয়ে গেছে, এ জন্যেও আনন্দের অবধি ছিল না তাঁর। ভয়ে প্রাণ উড়ে গিয়েছিল ভদ্রলোকের এবং সেই বৃত্তান্তই আমাকে বলতে পেরে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

"দুটো বাজতে তখনও দশ মিনিট বাকী। দোকান বন্ধ করবো করবো ভাবছি, এমন সময়ে একটা লোক এসে হাজির। লোকটাকে আমি চিনিই না। ঠিক বন্ধের মুখে হুট করে আসার জন্যে মেজাজ খিঁচড়ে গেল আমার। তাই সাফ বলে দিলাম, চটপট এক ঢোক গিলেই বিদেয় হতে হবে। খদ্দের বেশী ছিল না তখন। কপোত-কপোতীর মত একটি যুগল মূর্তি আর মের্ডাড বসাকি। মেডার্ড বসাকিকে তো আপনি চেনেনই। উনিও তো পুলিশ অফিসার। আজ রাতে ওঁর কোনো ডিউটি ছিল না।

"লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম কি ধরনের সুরা তাকে দেব। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর-টুত্তর না দিয়ে ফস করে এক জোড়া রিভলভার বার করে আমার দিকে তাগ করে ধরলো সে। আর তারপরেই এক হুঙ্কার—'টাকাগুলো বার করে দিলে কিরকম হয়?'

"শুনেই বসাকি হাত বাড়ালেন তাঁর রিভলভারের দিকে। লোকটা কিন্তু ভারী হুঁশিয়ার। সঙ্গে সঙ্গে যেন কিছু হয় নি এমনি সবে বলে উঠল—'আপনি বরং ওটা টেবিলের ওপরেই রেখে দিন। তা না হলে আজ রাতেই একজনকে অক্কা পেতে হবে।'

"আমিই বললাম বসাকিকে—'শুনুন, শুনুন, রিভলভারটা সরিয়েই রাখুন। আমি চাই না খামোকা একটা খুনোখুনি হয়ে যাক এখানে। নগদ যত টাকা আছে তা না হয় ওকে দিয়ে দিচ্ছি আমি।'

"কথা শুনলেন বসাকি। গোঁয়ার্তুমি করলেন না। বাস্তবিকই, আমাকে অথবা অন্য কাউকে বিপদে ফেলার ইচ্ছে তো ওঁর ছিল না।

"বন্দুকধারী এবার বসাকিকেই উদ্দেশ করে বললেন,—'ভালো মানুষের মত রিভলভারটা আমার দিকে ঠেলে এগিয়ে দিন দিকি মশাই।' কথার সঙ্গে সঙ্গে ক্লিক করে শব্দ হলো দুটো রিভলভারেরই।

"প্রথম থেকেই লক্ষ্য করলাম লোকটা একেবারেই নিরুত্তেজ, নিরুদ্বেগ, আর সংহত। বসাকি রিভলভারটা বারের টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে এগিয়ে দিলে পর নির্বিকারভাবে লোকটা তা তুলে নিয়ে গুঁজে রাখল পকেটে। তারপর আমাকে লক্ষ্য করে বললে—'এবার স্মার্ট ছেলের মত চটপট টাকা-কড়িগুলো বার করে দিন তো। সবুজ রঙের যা কিছু নোট -ফোট আছে, তাই দিন। খুচরা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।'

"বাক্যব্যয় না করে কড়কড়ে ষাটটা ডলার তুলে দিলাম লোকটার হাতে। টাকাটা পকেটস্থ করেই এক দৌড়ে চোখের আড়াল হয়ে গেল সে।"

বসাকি এর পর এক মুহূর্তের বেশী সবুর করেন নি। কিন্তু আততায়ী তার চাইতে অনেক বেশী ক্ষিপ্র। কাজেই পথে বেরিয়ে লোকটার টিকিও দেখতে পান নি বসাকি। রাস্তায় শুধু তাল তাল অন্ধকারই ছিল না, ছিল অজস্র আঁকাবাঁকা সরু গলি। যে কোন একটার মধ্যে ঢুকে সটকান দেওয়া এমন কি আর কঠিন কাজ।

আমি আসার আগেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন বসাকি। খুব শীগগিরই তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনাও কম। তবুও বন্দুকধারী আগন্তুকের নিখুঁত দৈহিক বর্ণনা পেতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না আমাকে। লোকটা ধূমকেতুর মত যখন ঢুকে পড়ে মদ্যশালায়, তখন যে তরুণ-তরুণী দুটি ছিল ঘরের মধ্যে, তাদের কাছ থেকে এবং চৌয়ানস্কির মুখে যা শুনলাম, তা থেকেই লোকটা স্পষ্ট হয়ে উঠল মনের চোখে। বয়সে সে যুবাপুরুষ, কালো-কালো এক মাথা চুল, ছিপছিপে চেহারা—দেখতে শুনতে মন্দ নয়। পরনে তার কালো প্যান্ট। খাটো হাতা স্পোর্টস শার্টটা প্যান্টের ওপর এমনভাবে ঝুলিয়ে দিয়েছিল সে যে বেল্টে গোঁজা রিভলভার দুটো তাইতেই ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।

বসাকি আসার আগেই বেশ বুঝেছিলাম লোকটাকে। বসাকির কাছে পরে শুনলাম লোকটার চেহারার আর এক দফা বর্ণনা। আর এ রকম হরিণের মত দৌড়োতে নাকি তিনি এর আগে আর কাউকে দেখেন নি। ঘাঁটিতে বসে এ সম্বন্ধে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা হলো আমাদের মধ্যে। ১৯৫৫ সালের এপ্রিল ফুলের তারিখ দেওয়া আমার রিপোর্টটাও সঙ্গে ছিল। লেফটেন্যাণ্ট ফ্র্যাঙ্ক পেপে রিপোর্টটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে এক কথায় বলে দিলেন এ অপকর্ম কোন্ মহাপ্রভুর।

বললেন—"এ কাজ ঐ বোম্বেটে কার্পেণ্টার ছোকরার। এই নিয়ে সত্তরবার হলো। কিন্তু ওকে আমি বার করবোই। এই যদি আমার জীবনের শেষ গ্রেপ্তার হয়, তাহলেও জেনো, ওর রেহাই নেই।"

বাস্তবিকই রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিলেন ফ্র্যাঙ্ক পেপে। ঝানু অফিসার হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা তো বড় কম নয়। সহকর্মীরা তাঁকে যেমন ভালবাসতো, শ্রদ্ধা করতো ঠিক তেমনি তাঁকে যমের মত ভয়ও করতো আর দু'চক্ষে দেখতে পারতো না শিকাগোর অপরাধদুনিয়ার বাসিন্দারা। বেশ কয়েকবার গুলি-গোলা চলেছিল পুলিশ আর শহরের গুণ্ডাদের মধ্যে। ফ্র্যাঙ্ক পেপে কিন্তু লড়াই-অন্তে এমন আটজন মূর্তিমানকে শ্রীঘরে পাঠিয়েছিলেন, খুন-জখম আর ডাকাতির জন্যে যারা কুখ্যাত।

পেপের সঙ্গে কথাবার্তা, শেষ হ'লে পর ফিরে এলাম আমার অফিসে। ধার করলাম রিচার্ড কার্পেণ্টারের ইয়া মোটা ফাইলটা। ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে লোকটাকে খুঁজছি আমরা। উচ্চতায় সে পাঁচ-ফুট এগারো ইঞ্চি। ওজন ১৬৫ পাউণ্ড। মাঝে মাঝে গোঁফ রাখে। কোটরে-বসা চোখ। বয়স ছাব্বিশ বছর। বিস্তর ডাকাতির মামলা ঝুলছে তার নামে। কিন্তু গত পনেরো মাস যাবৎ আরও ঘন ঘন আর বেশী সংখ্যায় রিপোর্ট আসা শুরু হয়েছে। তার কীর্তিকলাপের ধরন দেখে মনে হয় শিকাগো শহরের বাইরে সে কোন দিনই যায়নি। মুদীখানা, পেট্রোল পাম্প, পানাগার, হোটেল, লণ্ড্রী ইত্যাদি ছোটখাটো জায়গায় ক্ষমতা জাহির

করেই খুশী সে। ছদ্মবেশ ধারণের প্রচেষ্টা কোন দিনই করে নি কার্পেণ্টার এবং একলা কাজ করাই পছন্দ করে সে। এখনও কাউকে সে যমালয়ে পাঠায়নি বটে, তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস একদিন না একদিন সে তা করবেই।

অনেক তথ্যই জানা গিয়েছিল ওর সম্বন্ধে। প্রতিবারেই ক্যাশ লুঠ করার সময়ে হুমকি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল দুটো বার করে ফেলে ও। তারপর কোনো গাড়ীর সাহায্য না নিয়েই চক্ষের নিমেষে অন্তর্হিত হয় নগদ সমেত। দারুণ চটপটে সে। দৌড়োতেও পারে হরিণের মত অস্বাভাবিক দ্রুত বেগে। এবং যেখানেই তার আবির্ভাব হোক না কেন, রিভলভার দুটো সব সময়ে তার সঙ্গে থাকবেই। ভয় দেখাবার জন্যে পিস্তলের হ্যামার ঠুকে ক্লিক্ ক্লিক শব্দ করাও তার আর একটা নিয়মিত নষ্টামি। বাঁধাধরা সূচী অনুসারেই কাজ চালিয়ে যায় কার্পেণ্টার। দেখা গেছে, প্রতিদিন প্রায় পঁচিশ ডলার দরকার পড়ে ওর। উদাহরণ স্বরূপ, কোনো জায়গায় চড়াও হওয়ার পর যদি একশো ডলার হাতাতে পারে কার্পেণ্টার, তাহলে অন্ততপক্ষে চারদিন আর কোনো উৎপাত করতে শোনা যায় না ওকে। আবার কখন-সখন যদি এর দ্বিগুণ অর্থ পকেটস্থ করতে পারে, তাহলে তো পুরো এক হপ্তা পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে জিরিয়ে নেয়। মদ্যশালায় তার আবির্ভাব ঘটে শুধু রাত্রে—দোকান বন্ধ করার সময়ে। কেননা, এই সময়ে ক্যাশে যত টাকা জমা পড়ে, তত টাকা সারা দিনে অন্য কোনো সময়ে পাওয়া সম্ভব নয়। কোনো কোনো পানাগারে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সামনে বিয়ারের গেলাস নিয়ে ঝিমুতে থাকে ও। তারপর কাজ হাসিল করার পরেই গেলাসটি চুরমার করে দিয়ে যায় যাতে তার আঙুলের ছাপ গোয়েন্দাদের হাতে না পড়ে।

এইভাবে যাদের সিন্দুক ও হাল্কা করেছে তাদেরই একজনকে দিব্বি শান্তভাবে বলেছিল কার্পেণ্টার—'আরে মশাই নিজের মগজ খাটান। উত্তেজিত হবেন না, নাভার্সও হবেন না। দেখতেই তো পাচ্ছেন কি রকম স্থির আমি। আপনাকে পরলোক পাঠানোর কোনো সদিচ্ছাই নেই আমার। কাজেই আমার মতই নির্বিকার থাকুন। তবে, বেচাল দেখলেই আপনার ঐ আস্ত মগজে একটা ফুটো করে দিতে এতটুকুও দ্বিধা করব না।' আর এক মদের দোকানের মালিকের কাছে শুনেছিলাম, কার্পেণ্টার নাকি ক্যাশ থেকে তিনশো ডলার হাতিয়ে নিয়ে উধাও হওয়ার পরেও খদ্দেররা বিন্দুবিসর্গ টের পায়নি। পুলিশ আসবার পরে টনক নড়ে তাদের।

একবার ক্যাশ লুঠের পরেই একজন ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে আশাহত করেছিল কার্পেণ্টার। ড্রাইভারকে ও বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলে যে, একটা মারমুখো লোকের কাছ থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে চাইছে সে। স্ত্রীর শোবার ঘরে নাকি কার্পেণ্টারকে দেখতে পেয়েছিল লোকটা। তাই তার রক্তদর্শন না করলে নাকি স্বামী ভদ্রলোক শান্ত হবে না। কাজে কাজেই যত তাড়াতাড়ি এ অঞ্চল থেকে সটকান দিতে পারে সে, ততই মঙ্গল। ড্রাইভার ভাবলে বুঝি সত্যি সত্যিই আরোহীর জীবনরক্ষা করছে সে। কিন্তু এত ঝক্কি পোহাবার পুরস্কার মিললো মাত্র দশ সেণ্ট বখশিস! নিজের পরিবার ছাড়া, প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এই একই রকম সঙ্কীর্ণমনা ছিল কার্পেণ্টার। তাছাড়া, আরও একটা গুণ ছিল তাল। বেশীর ভাগ লুঠেরা খোলামকুচির মত টাকা ছড়িয়ে দুদিনেই ফতুর হয়ে যায়। কিন্তু কার্পেণ্টার ছিল বড় হিসেবী। অপচয় করা তার কোষ্ঠীতে লেখা ছিল না।

একবার খবর এলো বেশ কয়েক মাস হলো নর্থ ক্যারোনিলা এভিন্যুতে বোবা-কালাদের

প্রতিষ্ঠান ক্র্যাকোভার হোম-এ আস্তানা নিয়েছে সে। জোর কানাঘুসো শুনলাম, এখানে গেলেই দর্শন মিলবে মহাপ্রভুর। বাড়ীটা ঘেরাও করে ফেললাম আমরা। কিন্তু দেখা গেল দু হপ্তা আগেই পাখী উড়েছে।

রাইটউড সরাইখানায় তার কুকীর্তির পর দুমাস কেটে গেল। কিন্তু কোন্ গর্তে যে সে সেঁধিয়ে বসে রয়েছে, তার কোন হদিশ পেলাম না আমরা। কার্পেণ্টারের মার্জারের মত ক্ষিপ্রতা আর তড়িৎ-তৎপরতায় প্রতিটি পুলিশ কর্মী সজাগ হয়ে উঠেছিল। গায়ে এতটুকু আঁচ না লাগিয়ে পর-পর এতগুলি বে-আইনী কাজ করে সারা পুলিশ বাহিনীকেই চ্যালেঞ্জ করে বসেছিল ও। শেষকালে সম্মেলনে বসলাম আমরা। নতুন কৌশল আর কর্মপদ্ধতির উদ্ভাবন করলাম। খুব সম্ভব মেয়েদের কাছ থেকেই পাওয়া যাবে তার বর্তমান ঠিকানা, এই আশায় এই ধরনের হেন মেয়ে নেই, যাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে ছাড়লাম আমরা। কিন্তু কার্পেণ্টারের ছবি দেখা সত্ত্বেও কেউ চিনতে পারলো না ওকে। শেষকালে বারমেড, সস্তা হোটেলের রিসেপসন ক্লার্ক, এবং অপরাধ দুনিয়ার-ছিঁচকে চোর-ছ্যাঁচোড় থেকে শুরু করে রাঘব-বোয়ালদেরও রেহাই দিলাম না। কিন্তু বৃথাই। দেখা গেল, কার্পেণ্টার বাস্তবিকই নির্বান্ধব। শিয়ালের মত ধূর্ত সে। নিজের জীবিকা সমস্যার সমাধান করে সে নিজের বুদ্ধি-শক্তি দিয়েই—দুনিয়ার কারোর ওপর আস্থা নেই তার।

লোকটার সম্ভবপর গতিবিধি বিশ্লেষণ করার জন্যে হয়তো একজন মনোসমীক্ষকেরই দরকার ছিল আমাদের। অনেকবার এমন সম্ভাবনাও এসেছে আমাদের মাথায় যে হয়তো শহরতলীরই কোনো সম্মানজনক প্রতিষ্ঠানে দিনের বেলা ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে সে। আর রাতের বেলা শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে কোনো কারখানায় দিনের তৎপরতা গোপন করার জন্যেই। কিন্তু শিকাগো শহরটা তো আর ছোট শহর নয়। কাজেই এত সহজে এ রকম চিরুনি-আঁচড়ানো তল্লাশি পর্ব পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না কোনমতেই।

কার্পেণ্টারের জন্ম হয় ১৯২৯ সালে। অর্থনৈতিক নিস্তেজনার সেই সঙ্কটময় দিনগুলিতে শান্তি ছিল না পরিবারে। ঝগড়াঝাঁটি লেগেই ছিল বাবা আর মায়ের মধ্যে। শেষকালে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে পৃথক হয়ে গেলেন ওর মা ছেলেমেয়েদের নিয়ে। আর, তার কিছুদিন পরেই মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেলেন ওর বাবা। রিচার্ড কার্পেণ্টারের বয়স তখন মাত্র দশ বছর। জীবন-বীমা না থাকায় দারুণ চাপ পড়লো ওর মায়ের ওপর। অভাব-অনটনের নিত্য 'নেই নেই' হাহাকারে দেখতে দেখতে বুড়িয়ে গেলেন তার মা। তবুও ভেঙ্গে পড়লেন না ভদ্রমহিলা। কষ্টেসৃষ্টে কোনোমতে শান্তি বজায় রাখলেন ছোট্ট পরিবারটির মধ্যে। রিচার্ড, তার দুই বোন, আর নিজে—এই নিয়ে ছিল তাঁর ছোট্ট সংসার। ছেলেমেয়েদর মধ্যে রিচার্ডকেই তিনি বেশী ভালবাসতেন। তাছাড়া, আশ্চর্য একটা সম্প্রীতিবোধ ছিল তিন ভাইবোনের মধ্যে। এমন বড় একটা দেখা যায় না। রিচার্ড কিন্তু মা বলতে অজ্ঞান। মা ছাড়া তার এক দণ্ডও চলতো না। মায়ের কোলে বসে আদর পাওয়ার মত লোভনীয় জিনিস তার কাছে আর কিছুই ছিল না। একদিন এইভাবেই কোলে বসে মাকে জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলেছিল রিচার্ড। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল—'মা, নিজেকে বড় একা লাগছে আমার। আমাকে ছেড়ে যেও না।' এ রকম পরিস্থিতিতে সে যে মায়ের সবচেয়ে আদুরে হয়ে উঠবে, তা বলাই বাহুল্য।

সংসারের টানাটানি আরও বৃদ্ধি পেল। শেষকালে নিরুপায় হয়ে মিল-অকির একটা অনাথ আশ্রমে রিচার্ডকে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হলেন ওর মা। রিচার্ড কার্পেন্টারের পরবর্তী জীবনে যে কলঙ্কময় অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়েছিল, তার সূচনা কিন্তু এইখান থেকেই। রিচার্ডের সঙ্গে কেউই নিষ্ঠুর ব্যবহার করেনি। বরং যত্ন পরিচর্যার সীমা ছিল না সেখানে। কিন্তু বাড়ী থেকে অনেক দূরে থাকার ফলে তার মানসিক অশান্তির সীমা-পরিসীমা ছিল না। কাজেই শত চেষ্টাতেও ওর শিক্ষকেরা এদিক দিয়ে ওকে সুখী করে তুলতে পারেন নি। কোনো রকম ক্রটি ছিল না তার আচার ব্যবহারে। চোখে-মুখে এমন একটা ছেলেমানুষী মিষ্টিভাব ছিল যে ভাল না বেসে পারা যেত না। কিন্তু পড়াশুনোর দিক দিয়ে ক্রমশই পিছিয়ে পড়তে লাগল রিচার্ড। আপ্রাণ চেষ্টা করলেন শিক্ষকরা। কিন্তু কিছুতেই স্কুলের পড়াশুনোয় মন বসাতে পারলো না রিচার্ড কার্পেন্টার।

ষোলো বছর বয়সে তার চাইতে অনেক কমবয়সী ছেলেদের ক্লাসে বসতে হলো তাকে। সমবয়সী ছাত্ররা তাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া, চেহারায়, পোশাকে নোংরা থাকার বদভ্যাস শুরু হয় এখান থেকেই। স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর ও ঘুরতে থাকে এক কাজ থেকে আর এক কাজে। কখনও হয়েছে জাহাজঘাটার কেরানী, কখনও ট্রাক-ড্রাইভার। কখনও নিয়েছে ডিস ধোওয়ার এবং এই ধরনের আরও কত ছোটখাটো কাজ। কিন্তু কোথাও বেশীদিন টিকে থাকতে পারেনি ও। যতবার চাকরী গিয়েছে তার, ততবারই সহানুভূতির স্নিগ্ধ প্রলেপে মনের জ্বালা জুড়োনোর জন্যে ছুটে গেছে মায়ের কাছে। প্রতিবারই অভিযোগ জানিয়েছে বড়ই অসুখী আর নিঃসঙ্গ সে।

আঠারো বছর বয়েসে সৈন্যবাহিনীতে নাম লেখালো রিচার্ড কার্পেন্টার। কিন্তু মিলিটারী সম্পত্তিতে ক্ষতি করা থেকে শুরু করে এত রকম নিয়ম লঙ্ঘন আরম্ভ হলো যে গার্ডহাউসেই বিস্তর সময় ব্যয় করতে হলো ওকে। শেষকালে এ ধরনের অবাঞ্ছিত লোককে বরখাস্ত করা ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না। সৈন্যবাহিনী থেকে বেরিয়ে এল রিচার্ড কার্পেন্টার শুধু একটি জিনিস ভালভাবেই রপ্ত করে এবং তা হচ্ছে পিস্তল চালানো। কিন্তু তার চরিত্রের আশ্চর্য দিকটুকু জানলে বাস্তবিকই অবাক হতে হয়। এ হেন লোকেরও আতীব্র আসক্তি ছিল সিরিয়াস সঙ্গীত, অপেরা, সিম্ফনী আর কনসার্টে। বহু রবিবাসরীয় অপরাহ্নে ক্ল্যাসিকাল রেকর্ড বাজিয়ে শুনিয়েছে ও মা'কে। ভালো ভালো রেকর্ড সংগ্রহের বাতিকেই উড়ে যেত ওর যাবতীয় উদ্বৃত্ত অর্থ।

অপরাধী জীবনের গোড়ার দিকেই দু'দুবার পুলিশ পাকড়াও করে রিচার্ড কার্পেন্টারকে। প্রথমবার সৈন্যবাহিনী থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর বেআইনীভাবে বিস্তল বহন করার অপরাধে। সৈন্যবাহিনীতে একসময়ে যারা কাজ করেছে, হামেশাই লুকিয়ে চুরিয়ে পিস্তল সঙ্গে রাখতে দেখা যায় তাদের। কাজেই কার্পেন্টারকেও একপ্রস্থ ধমকধামক দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো। কঠিন শাস্তি হলো না। এগারো মাস পরে বাড়ীর মধ্যে বসে দুটো রিভলভার পরিষ্কার করছিল রিচার্ড। হঠাৎ বন্দুক থেকে গুলি ছুটে যায়—গুলি গিয়ে লাগে ওর মায়েরই গায়ে। কপাল ভাল, খুব গুরুতর চোট লাগেনি। কিন্তু পুলিশ যখন জানতে চাইল আসল ব্যাপারটা কি, তখন চটেমটে ওর মা পুলিশমহলকেই অভিযুক্ত করে বসলেন। তারা নাকি খামোকা তার আদুরে ছেলেকে নাজেহাল করছে।

১৯৫১ সালে রিভলভার উঁচিয়ে একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছ থেকে আট ডলার ছিনিয়ে নেওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার হলো রিচার্ড কার্পেন্টার। মূল সাক্ষী কিন্তু নিশ্চিতভাবে জানতো না যে কার্পেন্টারই প্রকৃত অপরাধী। তা সত্ত্বেও গ্রেপ্তার করা হলো ওকে। আটটা ডলার আর একটা রিভলভারও পাওয়া গেল ওর কাছ থেকেই। তাতেই আদালতের আর কোনো সন্দেহই রইল না কয়েদীর কুকীর্তি সম্বন্ধে। এক বছর কারাবাসের দণ্ড দিলেন ধর্মাবতার।

বড় কড়া দাওয়াই দেওয়া হলো রিচার্ডকে। অন্ততঃ সেই ভাবেই শাস্তিটাকে নিয়েছিল ও। এক বছরের মধ্যে কোনো কয়েদীর সঙ্গেই বন্ধুত্ব করতে দেখা গেল না ওকে। মা মাঝে মাঝে আসতেন। সঙ্গে আনতেন মিঠাই আর কেক। কার্পেন্টার কাউকেই ভাগ দিত না এইসব খাবারদাবারের। খুপরির অন্যান্য কয়েদীরা 'আদুরে খোকা' বলে খেপাতো ওকে। ফলে, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল ওর মনের জ্বালা।

শ্রীঘর থেকে বেরিয়ে এসে কার্পেন্টার প্রতিজ্ঞা করলো জীবনে আর কখনো আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে খেলা করবে না। খুঁজে পেতে একটা ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাজ জুটিয়ে ফেলল ও। প্রতি হপ্তায় আশী ডলার রোজগার করতে লাগল কার্পেন্টার। চরিত্রের মধ্যে অতিনৈষ্ঠিক বৈশিষ্ট্যের অঙ্কুরও দেখা গিয়েছিল সে সময়ে। বারবনিতা বা জুয়াড়ীদের ট্যাক্সিতে তুলতো না ও। নিঃসঙ্গ নেকড়ের মতই ভয়াবহতা ওর প্রকৃতির কন্দরে সুপ্ত ছিল তখন। কিন্তু মাঝে মাঝে দুই বোন আর একজন খুড়তুতো বোনকে নিয়ে প্রায়ই সিনেমায় যেত। স্কেটিং করতেও যেত সবাইকে নিয়ে। পরে এই খুড়তুতো বোনের কাছে শুনেছিলাম—'রিচার্ড নিজে কিন্তু স্কেটিং জানতো না। তবুও রাত্রে আমাদের একলা ছেড়ে দিতে চাইত না ও। অনেক সৌভাগ্য থাকলে তবে এ রকম ভাই পাওয়া যায়।'

তিন বোনের জন্যে সুন্দর সুন্দর পোশাক কিনে আনত রিচার্ড। নিজে কিন্তু নোংরা অগোছালো বেশবাস পরেই দিন কাটিয়ে দিত। একটি মাত্র সুট ছিল ওর। জুতোর অবস্থাও ছিল শোচনীয়—ঘন ঘন মেরামত না করলে চলতো না। রীতিমত উত্তেজনার ঝোঁকে যখন সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলছে কার্পেন্টার, তখনও কিন্তু ওর ঠাকুরদা বিশ্বাস করতে চাননি যে রিচার্ড কার্পেন্টার একজন বিপজ্জনক প্রকৃতির অপরাধী। জোর গলায় বলেছিলেন বৃদ্ধ—"ভারী ভালো ছেলে ছিল ডিকি। একটু খামখেয়ালী ছিল বটে কিন্তু তাতে কি আসে যায়? ও যখন ট্যাক্সি চালাতো, তখন আমার জন্যে দুটো তিনটে সিগার আনতে কোনোদিনই ভুল হতো না ওর। বাজে সিগার নয়—যথেষ্ট ভালো সিগার।"

রিচার্ড কার্পেন্টারের পরিবারের সবাই ভাবলে ছেলেটির এত মানসিক অশান্তির মূল কারণ হলো পুলিশের হয়রানি আর আদালতের সমবেদনার অভাব। ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসের চার তারিখে আর একবার স্বরূপ প্রকাশ করে ফেলল কার্পেন্টার। একটা মোটর চুরি করল ও। পরে প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল গাড়ীটা ওরই হাতে। একটা মুদীখানায় হানা দিয়ে লুঠ করল একশো ডলার। এই ঘটনার পর থেকে আর কোনোদিন সে ফিরে আসেনি নিজের বাড়ীতে। পরিবারের কারোর সঙ্গেও আর দেখা করেনি। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগল কার্পেন্টার। পায়ে তার ক্রেপসোলের জুতো। বেল্টে গোঁজা একজোড়া রিভলভার। পর-পর দুঃসাহসিক রাহাজানির এক ভয়ঙ্কর তালিকার সূচনা কিন্তু এই ঘটনা দিয়েই শুরু।

পুরো আঠারো মাস সবার চোখে ধুলো দিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে রইল রিচার্ড কার্পেন্টার।

পুলিশ মহলের প্রত্যেকেই তখন খুঁজছে ওকে। তারপর এল ১৯৫৫ সালের অগাষ্টের সেই শোকাবহ দিনটি। আমার বন্ধু আর সহকর্মী ডিটেকটিভ মর্ফি বাড়ী থেকে হেডকোয়ার্টার আসছিল মাটির তলার রেলে চেপে। ডাকাতির তদন্ত করাই ছিল চশমাচোখো মর্ফির একমাত্র কাজ। কার্পেণ্টারের রাহাজানি সম্পর্কিত সবকটা স্টাফ মিটিংয়ে হাজির ছিল মর্ফি। কাজেই চলন্ত ট্রেনে বন্দুকধারী ছোকরাকে দেখে চিনতে ভুল হয়নি ওর। তৎক্ষণাৎ লম্বা লম্বা পা ফেলে রিচার্ডকে গ্রেপ্তার করে ফেলে ও। রুজভেল্ট রোড আর স্টেট স্ট্রীটের প্ল্যাটফর্মে কার্পেণ্টারকে নিয়ে নেমে পড়ে মর্ফি। তারপর এক অসতর্ক মুহূর্তে পকেট থেকে কার্পেণ্টারের ফোটোগ্রাফ বার করে যখন আসল লোকটার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে ব্যস্ত, ঠিক তখনই রিভলভার বার করে এক গুলিতেই মর্ফিকে খতম করে দিলে কার্পেণ্টার। ফোটোগ্রাফ গিয়ে পড়ল মেঝের ওপর। উদ্যত রিভলভারের সামনে ভয়চকিত জনতাকে স্থাণুর মত দাঁড় করিয়ে রেখে ও গিয়ে উঠে পড়ল একটা মস্ত গাড়ীর মধ্যে। সাবওয়ে থেকে বেরিযে যাওয়ার পথ দিয়েই বাইরে যাচ্ছিল গাড়ীটা। দরজা খুলেই ভেতরে উঠে পড়ে কার্পেণ্টার। বিদ্যুৎ গতিতে আবার কার্তুজ ভরে নেয় রিভলভারে। এবং পরক্ষণেই ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে নলচেটা স্থির করে রেখে গর্জে ওঠে চাপা কণ্ঠে—"এইমাত্র কয়েকজনকে খুন করে এলাম আমি। চেঁচামেচি না করে গাড়ীটা না চালিয়ে গেলে আপনাকেও খুন করবো আমি।"

গাড়ীটা চালাচ্ছিলেন তেষট্টি বছরের বুড়ো মিঃ চার্লস এ কোর্পার। কার্পেণ্টারের বজ্রগর্ভ হুমকি শুনেই আঁৎকে উঠে প্রাণ হাতে নিয়ে বায়ুবেগে গাড়ী চালালেন তিনি। দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলেন শিকাগোর সবচেয়ে সরগরম স্থান লুপ, ডিয়ারবর্ণ আর ম্যাডিসন স্ট্রীটের কেন্দ্রে। একলাফে গাড়ী থেকে নেমেই উল্কাবেগে উধাও হয়ে গেল কার্পেণ্টার।

প্রথমেই যে পুলিশ প্রহরীটির সঙ্গে দেখা হলো, তার কাছেই হাউ হাউ করে কোর্পার সাড়ম্বরে বর্ণনা করলেন এইমাত্র কি ভয়ঙ্কর ঘটনাটা ঘটে গেল। আঙুলের ছাপের বিশেষজ্ঞ এসে কোর্পারের গাড়ী থেকে উদ্ধার করলেন তালু আর তিনটে আঙুলের ছাপ। কার্পেণ্টারের ছাপের সঙ্গেই তা হুবহু মিলে গেল।

পুলিশ অফিসারকে নিকেশ করেছে কার্পেণ্টার। কাজেই পুলিশ ফোর্সের প্রত্যেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলে তার পায়ে বেড়ি পরানোর। যেভাবেই হোক ফাঁদে ফেলতে হবে কার্পেণ্টারকে কিন্তু প্রতিজ্ঞা করা যত সহজ, তাকে পূরণ করা ততটা সহজ নয়। একটা বাড়তি সূত্র অবশ্য পেয়েছিলাম। মিঃ কোর্পারের কাছে শুনেছিলাম হানাদার লোকটার মুখটা নাকি রোদে পোড়া তামাটে রঙের—প্রায় কালোই বলা চলে। স্থির করলাম, লেক মিচিগানে বেলাভূমিতে যে কটা সমুদ্রস্নানের স্থান আছে, সব কটাতেই একবার আমার যাওয়া দরকার। এ যেন অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া, লাগলেও লেগে যেতে পারে।

কিন্তু কিছুই হলো না। চাঞ্চল্যকর গল্পে বোঝাই রইল খবরের কাগজের পাতাগুলো। আমাদের কাছেও এল এন্তার মিথ্যা সংবাদ। শিকাগোর একটি সংবাদপত্র পাঁচ হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করে বসল। এমনকি সাহায্য করার জন্যে এফ. বি. আই. (Federal Bureau of Investigation) কয়েকজন এজেণ্টকেও পাঠিয়ে দিলে আমাদের দপ্তরে। সবই হলো। কিন্তু কার্পেণ্টারের টিকি দেখা গেল না কোথাও।

ডিটেকটিভ মর্ফি নিহত হওয়ার তিনদিন পর পুলিশকর্মী ক্লারেন্স কের ছেলেমেয়েদের

বাড়ীতে রেখে বউকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন একটা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত হলে। মজার ব্যাপার কি জানেন? যে ছবিটা দেখতে গিয়েছিলেন ক্লারেন্স কের, তার নামও কিন্তু 'কল মি লাকি'।

সিনেমা হলে ঢুকেই ক্লারেন্স-এর চোখ পড়ল একটা লোকের ওপর। পেছনের সারিতে নাক ডাকিয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছিল লোকটা। এক নজরেই রিচার্ড কার্পেন্টারকে চিনতে পেরেছিলেন ক্লারেন্স। গোলমাল না করে বউকে বললেন, গাড়ীতে ফিরে তার জন্যে অপেক্ষা করতে।

ইতস্তত করতে লাগলেন তাঁর স্ত্রী। তাঁর ইচ্ছে ছিল ফোন করে পুলিশ ফৌজ ডেকে আনা। কিন্তু ক্লারেন্সের সেই এক গোঁ—"কাজটা যখন আমারই আওতায় পড়ছে, তখন আমি একাই সামলাতে পারব তা।"

মাত্র বছরখানেক হলো পুলিশ ফোর্সে যোগদান করেছিলেন ক্লারেন্স। নবাগত তিনি, অভিজ্ঞতাও ছিল অল্প। তাই বুদ্ধিমতী স্ত্রীর পরামর্শ শুনলেই ভাল করতেন। ঘুমন্ত কার্পেন্টারকে ঝাঁকুনি দিয়ে কড়া গলায় শুধোলেন ক্লারেন্স—"এটা কি ঘুমোবার জায়গা?"

"নিজের চরকায় তেল দিন।" ঘুম জড়ানো স্বরে উত্তর এল তখুনি।

"আমি পুলিশ অফিসার। লবিতে আসুন আমার সঙ্গে।"

ধীর পদে উঠে এল কার্পেন্টার। এমনভাবে এল, যেন তখনও পুরোপুরি ভাবে জেগে ওঠেনি ও। এক হাতে রিভলভার আর এক হাতে ব্যাগ নিয়ে সজাগ হয়ে রইলেন ক্লারেন্স।

ঘুম-ঘুম স্বরে আবার বলে ওঠে কার্পেন্টার—"বাইরে বড় গরম, তাই ঠাণ্ডায় বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম। বে-আইনী কিছু তো করিনি।"

লবিতে প্রবেশ করে দুজনে। ঠিক এই সময়ে হোঁচট খাওয়ার ভান করেই রিভলভার বার করে সোজা ক্লারেন্সের বুকের ওপর গুলিবর্ষণ করলে কার্পেন্টার। ক্লারেন্সও পাল্টা গুলিবর্ষণ করলেন বটে, কিন্তু গুলিটা লাগলো পলায়মান কার্পেন্টারের পায়ে। তীরবেগে ও ছুটে গেল জরুরী অবস্থায় বাইরে বেরোনোর দরজার দিকে। আড়াই শো লোক বসা থাকলেও তখনও বেশ অন্ধকার বিরাজ করছিল সিনেমা হলের মধ্যে। পটাপট শব্দে জ্বলে উঠল আলোগুলো—কিন্তু আবার পাঁকাল মাছের মতই হাত ফস্কে অদৃশ্য হয়ে গেল রিচার্ড কার্পেন্টার।

গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ শুনেই লবির দিকে ছুটে গেলেন ক্লারেন্সের স্ত্রী। রাস্তা দিয়ে একজন যাজক যাচ্ছিলেন—ফায়ারিংয়ের শব্দে তিনিও বিলক্ষণ আঁৎকে উঠেছিলেন। আসবার সময়ে তাঁকেই হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলেন ক্লারেন্স-পত্নী। এসে দেখলেন টমাস ব্র্যাণ্ড নামে একজন মেডিক্যাল ছাত্র প্রাথমিক শুশ্রূষা করার পর চেষ্টা করছেন কেরের বুক থেকে ফিন্‌কি দিয়ে ছুটে আসা রক্তস্রোত বন্ধ করতে। ক্লারেন্সের চেতনা তখন বিলুপ্ত প্রায়। সেই অবস্থাতেই দুর্বোধ্য ভাবে বিড়বিড় করে চলেছেন—"কার্পেন্টার....কার্পেন্টার....আমি চিনেছি ওকে, কার্পেন্টার....।"

সেন্ট মেরী অফ নাজারেথ হাসপাতালে পুরো পাঁচ ঘণ্টা অপারেশন টেবিলে শুইয়ে রাখা হলো ক্লারেন্স কের-কে। শিকাগোর সবচেয়ে নামকরা বুক আর হৃদযন্ত্র অস্ত্রোপচারক ডক্টর এডোয়ার্ড এ অ্যাভারী দুরূহ অস্ত্রোপচার করে জীবনরক্ষা করলেন ক্লারেন্সের। অত্যন্ত পল্‌কা

সুতোর ওপর ঝুলছিল তাঁর জীবন। কেননা হৃদযন্ত্রের কাছেই একটা ধমনী জখম হয়েছিল গুরুতরভাবে। পরে ডক্টর অ্যাভারী আমাদের বলেছিলেন—"হৃদপিণ্ডের স্পন্দনই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে কের-কে। বুক ফুঁড়ে বুলেটটা বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে সঙ্কুচিত হয়েছিল ওর হৃদয়যন্ত্র। তা না হয়ে যদি প্রসারিত হয়ে থাকত, তাহলেই কিনারা কেটে বেরিয়ে যেত গুলিটা—সেক্ষেত্রে ওর মৃত্যু ছিল অবধারিত। কিন্তু এখন আর কোনো ভয় নেই।"

কার্পেন্টারের এই সর্বশেষ পাশবিক কুকীর্তির খবর ফলাও আকারে ছড়িয়ে পড়ল খবরের কাগজ, টেলিভিশন আর রেডিও মাধ্যমে। সে যে কোথায় ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে, সে সম্বন্ধেও মন্তব্য করতে ছাড়লো না খবর পরিবেশকরা। কিন্তু এই একটিমাত্র সমস্যার সমাধান করতে গিয়েই পুলিশ হিমসিম খেয়ে গেল! কোন কোটরে যে সেঁধিয়েছে আহত কার্পেন্টার, তার কোনো হদিশই পেল না পুলিশমহল। জখম অবস্থায় গাড়ী না নিয়ে বেশী দূর যাওয়া কার্পেন্টারের পক্ষে সম্ভব নয় জানতাম। সারা শহর তখন সচকিত হয়ে উঠেছে—লোকের মুখে মুখে আলোচনা চলছে খুনে-প্রসঙ্গ নিয়ে। সেইজন্যেই আশা ছিল এবার জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাবে। তাছাড়া, কম করে ষাটটা পুলিশ স্কোয়াডকেও মোতায়েন করা হয়েছিল খুনে বন্দুকবাজকে পাকড়াও করার জন্যে। প্রতিটি হাসপাতালে খবর চলে গিয়েছিল—যে কোনো মুহূর্তে ক্ষতস্থান চিকিৎসার জন্যে কার্পেন্টারের আগমন ঘটতে পারে। রেলপথ আর বাস স্টপেজেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিল গোয়েন্দারা। আজে-বাজে লোকের কাছ থেকে টেলিফোন মারফৎ কয়েকটা লোমহর্ষক গল্পও শুনলাম। তারা নাকি স্বচক্ষে দেখেছে রাস্তার অন্যদিক দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটে চলেছে খুনে কার্পেন্টার। কেউ কেউ তাকে লুকিয়ে থাকতে দেখেছে বিশেষ কোনো ফ্ল্যাটে অথবা দোকানের মধ্যে। সে নাকি নতুন একপ্রস্থ পোশাক কেনবার চেষ্টা করছে, লেক মিচিগানের নৌকোয় তাকে নাকি উঠতে দেখা গেছে, এবং নিশ্চিন্তভাবে সে-ই নাকি একটা মালবাহী গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েছে—এমনও দেখা গেছে। জনা ছ'য়েক তরুণকে হাতকড়া লাগিয়ে টেনে আনলো পুলিশ। কিন্তু কার্পেন্টারের সঙ্গে তাদের মুখের কোনোরকম সাদৃশ্যই পাওয়া গেল না। একজন আঁৎকে উঠে হন্তদন্ত হয়ে খবর আনলে একটা সিনেমাবাড়ির ছাদে নাকি খুনেটাকে দেখতে পেয়েছে সে। সঙ্গে সঙ্গে স্কোয়াডের অফিসাররা বাড়ীটা ঘেরাও করে তল্লাশী করলে তন্নতন্ন করে। পরিশেষে ছাদের ওপর পাওয়া গেল শুধু দু'জন অর্ধ বসনা তরুণীকে—রৌদ্র-সুখ উপভোগ করছিল তারা।

এ হেন গদ্যময় পরিস্থিতিতে কার্পেন্টার গ্রেপ্তার হলে বাস্তবিকই ক্লাইমাক্স থেকে বঞ্চিত হতো এই চমকপ্রদ কাহিনী। কিন্তু এরপর যা ঘটলো, তাকে হলিউডী রীতি ছাড়া আর কিছু বলা চলে না—অলীক উপন্যাস যেন চাঞ্চল্যকর বাস্তবে রূপান্তরিত হলো। যে রাত্রে সিনেমার মধ্যে পুলিশকর্মী ক্লারেন্স কের গুলিবিদ্ধ হলেন, ঠিক সেই রাত থেকেই বিচিত্র এই কাহিনীর মধ্যে জড়িয়ে পড়ল একটা অতি সাধারণ মার্কিন পরিবার—ট্রাক-ড্রাইভার লিওনার্ড পাওয়েল, তার বউ আর সাত বছরের ছেলে রবার্ট আর তিন বছরের মেয়ে ডায়ানা। ওয়েস্ট পোটোমাক এভিন্যুতে এদের নিবাস।

সেই রাতেই উৎসব ছিল পাওয়েলের বাড়ীতে। সাড়ম্বরে ডিনারের আয়োজন করেছিল

পাওয়েল তার নবম বিবাহ বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন নিয়ে স্ফূর্তিতে উচ্ছল হয়েছিল তারা রাত দশটা পঁচিশ মিনিট পর্যন্ত। অতিথিরা যখন বিদায় নিলে, তখন পাওয়েলের ছোট মেয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে, আর ছেলে অন্য ঘরে বসে টেলিভিশন দেখছে। দারুণ গরম পড়েছিল সে রাত্রে—গাছের পাতা নড়ানোর মত হাওয়াও বইছিল না। রান্নাঘরে গিয়েছিল লিওনার্ড রেফ্রিজারেটর থেকে কোল্ড ড্রিংক বার করার জন্যে, এমন সময়ে পর্দা লাগানো দরজায় টোকা মারার শব্দ শুনতে পেল ও! সামনেই দাঁড়িয়েছিল রিভলভার হাতে রিচার্ড কার্পেণ্টার। লিওনার্ড ওর দিকে ফিরতেই তুহিন-শীতল স্বরে বলল—"জানেন তো আমি কে?"

নীরবে মাথা হেলিয়ে লিওনার্ড জানালে, হ্যাঁ, সে জানে।

"এইমাত্র আরও একজন পুলিশের লোককে গুলি করে এলাম আমি। আমি যা বলি, তা যদি করেন তো কোনো ক্ষতি হবে না আপনার। আর তা যদি না করেন, যদি দরজাটা খুলতে না চান—এইখান থেকেই আপনাকে গুলি করবো আমি। খুলে দিন দরজাটা।"

কয়েক মাস আগে মদ্যশালায় পুলিশ কর্মী বসাকির যে রিভলভারটা পকেটস্থ করেছিল কার্পেণ্টার, সেইটাই অকম্পিত হাতে উঁচিয়ে ধরে সে লিওনার্ডের দিকে।

স্বর শুনেই রান্নাঘরে ছুটে এসেছিল মিসেস পাওয়েল। খুব ধীরস্থিরভাবে সংক্ষেপে বলে উঠল লিওনার্ড—"ডার্লিং, উত্তেজিত হয়ো না। এরই নাম কার্পেণ্টার। ও বলছে, ওর কথামত কাজ করলে ও গুলি করবে না! আমাদের কোনো ক্ষতিই হবে না। চেঁচিও না।"

অন্য ঘরে টেলিভিশন সেটটা চালিয়ে দিল ববি। কথা বলার শব্দ কানে আসতেই সচকিত হয়ে ওঠে কার্পেণ্টার। সুধোয়—"ওঘরে কে?"

"আমাদের দুই ছেলেমেয়ে। ববি এখন টেলিভিশন দেখছে। কিন্তু এখুনি এঘরে আসবে ও শুভরাত্রি জানাতে। পিস্তলটা পকেটে রাখলে ভাল করতেন। ওকে বুঝিয়ে বলব'খন আমাদেরই বন্ধু আপনি। ও তা বিশ্বাস করবে। গণ্ডগোলও করবে না। কিন্তু রিভলভার দেখিয়ে ভয় পাইয়ে দিলে হয়তো ও চেঁচিয়ে কান্নাকাটি করতে পারে।"

ববি ঘরে ঢুকতেই রিভলভার আড়ালে সরিয়ে রাখল কার্পেণ্টার। মদে জড়ানো গলায় আস্তে আস্তে কয়েকটি কথাও বললো তার সঙ্গে। কোনো কিছু সন্দেহ না করে শুতে চলে গেল ববি।

পর পর দু গেলাস জল খেল কার্পেণ্টার। তারপর মিসেস পাওয়েলকে হুকুম করলে ক্ষতস্থান বাঁধার জন্যে একটা ব্যাণ্ডেজ নিয়ে আসতে। লিওনার্ড নিজে থেকেই ওষুধের দোকানে গিয়ে বীজবারক (অ্যাণ্টিসেপটিক) কিনে আনতে চাইল। কিন্তু কার্পেণ্টার বড় হুঁশিয়ার। বাড়ী ছেড়ে বেরোনো তো দূরের কথা, একটু বেচাল দেখলেই ভয়ংকর পরিণতির সম্ভাবনাটা সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিলে সে।

এরপর ট্রাউজার খুলে ফেলে আহত ঊরুর ওপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধলে কার্পেণ্টার। কের-এর প্রথম বুলেটটা মাংসর মধ্যে দিয়ে গেলেও দ্বিতীয় বুলেটটা গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে—এতটুকু আঁচড়ও লাগেনি। মিসেস পাওয়েলকে দিয়ে টোষ্ট আর কফি তৈরী করিয়ে আনল ও। কিন্তু খেল খুব অল্পই।

ক্ষুন্নিবৃত্তি এবং ক্ষতস্থান শুশ্রূষার পর লিভিংরুমে গিয়ে পাওয়েল দম্পতির সঙ্গে

টেলিভিশন দেখতে বসল কার্পেণ্টার। প্রোগ্রাম বন্ধ করে বিস্তারিতভাবে তার সর্বশেষ কীর্তির বুলেটিন প্রচারিত হওয়ার সময়ে নেকড়ের মত দাঁত বের করে হি-হি করে হেসে উঠল কার্পেণ্টার।

ট্রাক চালানোই লিওনার্ড পাওয়েলের পেশা। ছ'ফুট চার ইঞ্চি উঁচু বিশাল শরীরে শক্তি বড় কম নেই। ওজনও কার্পেণ্টারের চাইতে কম করে ষাট পাউণ্ড বেশী। কিন্তু খুনে কার্পেণ্টারের মন তো নয়—যেন একটা শক্তিশালী রাডার যন্ত্র। রাডার-মন দিয়ে পাওয়েলের চিন্তাশক্তি আঁচ করে নিয়ে ভ্রূকুটি করে চিবিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—"ও চেষ্টা করবেন না। বউ আর বাচ্ছাগুলোর কথা মনে রাখবেন সবসময়ে।"

দেহের প্রতিটি তন্তুতে নিঃসীম ক্লান্তির গুরুভার নামলেও রীতিমত হুঁশিয়ার রইল কার্পেণ্টার। অনেকক্ষণ পরে পাওয়েল বললে এবার ঘরের আলো নিভিয়ে দেওয়া দরকার। তা না হলে প্রতিবেশীদের সন্দেহ হতে পারে। খড়খড়ির পাখিগুলো নামিয়ে দিতে হুকুম করলো কার্পেণ্টার। জানলার আর আলোর ওপরেও আবরণ টেনে দেওয়া হলো তার নির্দেশে। দেখতে দেখতে ভ্যাপসা গরমে উনুনের মতই তপ্ত হয়ে উঠল ঘরটা।

বহুদূর থেকে ভেসে আসছিল পুলিশ সাইরেনের তীক্ষ্ণ তীব্র শব্দ—আশপাশের অঞ্চল তন্নতন্ন করে খুঁজছিল ওরা। যেন নিজের সঙ্গেই নিজে কথা বলছে, এমনিভাবে বিড়বিড় করে ওঠে কার্পেণ্টার—"আমার সম্বন্ধে খুব বেশী মাথা ঘামাবেন না আপনারা। শুধু এইটুকুই জানিয়ে রাখতে চাই, প্রথম গুলিটা আমি ছুঁড়িনি। যাকগে, ও নিয়ে আর এখন ভেবে লাভ কি।"

তন্ময় হয়ে টেলিভিশন শুনতে লাগল কার্পেণ্টার। কের তখনও জীবিত ছিল কিনা, সেই খবরই জানার জন্যেই কানখাড়া করে বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপর বললো—"শুধু একটি দুঃখ রয়ে গেল আমার জীবনে। এমন কোনো কাজ করে গেলাম না যার জন্যে আমার মা আর বোনেরা গর্ববোধ করতে পারে। অত্যন্ত নোংরা আর উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করেছি আমি। কিন্তু এখন বড় দেরী হয়ে গেছে। হয় ঐ টিকটিকিগুলোর গুলিতে আমাকে মরতে হবে, আর না হলে ইলেকট্রিক চেয়ার তো রয়েছেই। মরবার আগে অন্তত একবারের জন্য মা'কে দেখতে পেলে অনেকটা শান্তি পাবো আমি।"

বন্ধুর মতই সমবেদনার সুরে বলে লিওনার্ড—"চেষ্টা করলে আমার তো মনে হয় অনেক ভাল থাকতে পারতে তুমি, সবার ভালবাসাও পেতে। তোমার বর্তমান হাল দেখে, এত কষ্ট দেখে, বাস্তবিকই দুঃখ হচ্ছে আমার।"

সঠিক মনোবিদ্যা প্রয়োগ করেছিল লিওনার্ড। সমবেদনার স্নিগ্ধ ছোঁয়া পেলেই সবকিছু ভুলে যেত কার্পেণ্টার। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠল—"আজ সারারাত এখানেই থাকবো আমি। কাল রাতও থাকবো। অন্ধকার হলে তবে বেরুবো। ততক্ষণে টিকটিকিগুলো নিশ্চয় এ অঞ্চল ছেড়ে অন্য অঞ্চলে যাবে আমাকে খুঁজতে।"

ছেলেমেয়েদের শোবার ঘরে ঘুমোবার ইচ্ছে ছিল কার্পেণ্টারের। সেক্ষেত্রে তার রক্ষণাবেক্ষণের ভারটা থাকতো নাকি ওদের ওপরেই। কিন্তু মায়ের মন কেঁপে উঠল তাতে। মরিয়া হয়ে এই বলে বোঝালে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে ছোটোমেয়ে অচেনা মুখ দেখে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠতে

পারে। তাহলেই মহাবিপদ। যুক্তিটা মনে ধরলো কার্পেন্টারের। কাজেই বন্ধ ঘরে পাওয়েল দম্পতির সঙ্গেই রাত কাটানোর আয়োজন করল ও।

একটির পর একটি ঘণ্টা কাটতে থাকে। আরও গুমোট হয়ে উঠতে থাকে ছোট্ট ঘরটা। রিভলভারটা হাতেই রেখেছিল কার্পেন্টার। ঘুম-ঘুম চোখেও সজাগ রেখেছিল দৃষ্টি। ঘুমের দাপটে চোখ দুটো একেবারেই বন্ধ না হয়ে যায় সেজন্যে সারারাত সে কি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা তার!

পরের দিন ভোরবেলা লিওনার্ড বললে—"আমাকে কাজে বেরুতে হবে। না বেরুলে কোম্পানী আর পাড়াপড়শীরা অনেক প্রশ্ন করতে পারে।" অপলক চোখে লিওনার্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে কার্পেন্টার শুধু বললে—"যাচ্ছেন যান, কিন্তু মনে রাখবেন বাড়ীতে রইল আপনার স্ত্রী আর দুই ছেলেমেয়ে। আমি যদি আপনি হতাম, তাহলে এরকম পরিস্থিতিতে আহাম্মকের মত কিছুই করতাম না। বুঝেছেন?"

লিওনার্ড বুঝেছিল। সাড়ে ছটার সময়ে বেরিয়ে গেল সে। রাত্রেই তো আপদ বিদেয় হচ্ছে বাড়ী থেকে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে ফোন করলেই চলবে'খন। ঐটুকু সময়ের মধ্যে বেশী পথ আর যেতে হচ্ছে না বাছাধনকে। লাঞ্চ খাওয়ার অবসরে স্ত্রীকে ফোন করলো লিওনার্ড। সব শান্ত, কোনো হাঙ্গামা নেই।

দিনের বেলা কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিল কার্পেন্টার। ঘুম থেকে উঠে এক পেট খেয়েও নিল। তারপর গোঁফটা কামিয়ে ফেলে মুখ পরিষ্কার করে ফেলল। মিসেস পাওয়েলের ভয়ার্ত মুখচ্ছবি দেখে নিশ্চিন্ত ছিল কার্পেন্টার। নিদারুণ আতঙ্কে এমনই অন্তর-কাঁপুনি শুরু হয়েছিল তার যে কোনরকম বিপদের সম্ভাবনাই ছিল না ওদিক থেকে। সেইদিনই বিকেলে মিসেস পাওয়েলের মা এল মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে। এই সময়টা ছেলেমেয়েদের শোবার ঘরে ঘাপটি মেরে রইল কার্পেন্টার।

দারুণ উদ্বিগ্ন মন নিয়ে কাজ থেকে ফিরে এল লিওনার্ড। সঙ্গে এনেছিল সেইদিনকার দৈনিকের সর্বশেষ সংস্করণ! কাগজটা ছিনিয়ে নিল কার্পেন্টার। তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল নিজের সম্বন্ধে টাটকা সংবাদ জানার আগ্রহে। আর তখনই অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বলে উঠল ও—"অন্তত পক্ষে আরও দুদিন এ জায়গা ছেড়ে বেরোনো চলবে না। এখানে থাকার জন্যে আপনাদের খরচপত্রও আমি পরে পুষিয়ে দেব কিছু টাকা পাঠিয়ে।"

ডিনার তৈরী করে ডাক দিল মিসেস পাওয়েল। কিন্তু অচেনা লোকের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেতে ছেলেমেয়েরা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করায় কালো আঙুর আর শাকসব্জীভরা প্লেটটা নিয়ে সামনের ঘরে উঠে এল কার্পেন্টার। ইতিমধ্যে খেতে খেতে ফিসফাস করে কি শলাপরামর্শ করে নিল পাওয়েল দম্পতি। তারপরেই লিওনার্ড উঠে গেল অন্য ঘরে কার্পেন্টারের কাছে। গিয়ে বললে যে তার ছেলেমেয়েদের একটা নিয়মিত অভ্যাস আছে। প্রতিদিন রাত্রে বাড়ীর সামনে গিয়ে ওরা মা আর দাদু-দিদিমার সঙ্গে কিছুক্ষণ বসে থাকে। সে রাতেও ওদের যাওয়া দরকার। দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে অনুমতি দিল কার্পেন্টার।

কিছুক্ষণ পরে লিওনার্ড বলে উঠল—"এই যাঃ, ভুলেই গিয়েছিলাম। শ্বশুরের সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু কথা কইবো বলেছিলাম। আমারই যাওয়া দরকার নীচে। তা না হলে উনি নিজেই উঠে আসবেন।"

কার্পেণ্টার বললেন, —"অত কথায় কাজ কি। ঠিক দশ মিনিটের মধ্যে আপনার ফিরে আসা চাই। ভুলে যাবেন না আপনার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা আমার রিভলভারের পাল্লার মধ্যেই রয়েছে।"

ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল লিওনার্ড। পরক্ষণে গোটা কয়েক লম্বা লাফে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে বাড়ীর পেছনে এসে ইঙ্গিতে স্ত্রীকে ডেকে বলে দিল ছেলেমেয়ে আর তার বাবা-মাকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যেতে। ঠিক এইরকমটিই আশা করেছিল মিসেস পাওয়েল। তারপর কি করা উচিত তা তাকে না বললেও চলতো। রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল লিওনার্ড। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে খেলায় মগ্ন ছেলেমেয়েদের চীৎকার করে সাবধান করে দিলে— "পালাও এক্ষুণি—বন্দুক নিয়ে আসছে একটা খুনে গুণ্ডা।"

ঠিক নটা বেজে এক মিনিটের সময়ে টেলিফোন পেলাম লিওনার্ড পাওয়েলের। ডিটেকটিভদের চীফ ফ্রাঙ্ক ও সুলিভ্যান টেলিফোন পেয়ে ছোট্ট করে বললেন লিওনার্ডকে— "গ্যাঁট হয়ে বসে থাকুন। আমরা আসছি।" তৎক্ষণাৎ বেতার-বার্তা চলে গেল তিরিশটা পুলিশের গাড়ীতে। প্রত্যেকেই চতুর্দিক থেকে এগিয়ে আসতে লাগল পাওয়ালের ফ্ল্যাটের দিকে। কয়েক মিনিট পরেই সার্জেন্ট মিকলাজ-এর গলা শুনলাম ঃ

"কার্পেণ্টার.....কার্পেণ্টার......ওপরে হাত তুলে বেরিয়ে এস। বাড়ী ঘেরাও করে ফেলেছি আমরা। সরে পড়ার কোনো সুযোগই নেই।"

জানলার সামনে আবির্ভূত হলো কার্পেণ্টার। দড়াম করে সার্জেন্টের দিকে গুলিবর্ষণ করেই সাঁৎ করে সরে গেল আড়ালে।

মিকলাজ এবার চীৎকার করে হুঁশিয়ার করে দিলে বাড়ীর অন্যান্য বাসিন্দাদের। সবাই যেন মেঝের ওপর শুয়ে পড়েন—পুলিশ গুলিবর্ষণ শুরু করবে কার্পেণ্টারের ওপর। ইতিমধ্যে প্রায় হাজার দুয়েক উৎসুক লোক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল রাস্তার ওপর। সবার সামনেই আবার কার্পেণ্টার দেখিয়ে দিয়ে গেল তার অসমসাহসিকতা আর অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতা। পাওয়েলদের জানলা থেকে আচম্বিতে সে লাফিয়ে উঠল শূন্যপথে—চার ফুট দূরেই ছিল পাশের বাড়ীর জানলাটা। জনতা এবং পুলিশ কিছু বোঝবার আগেই দারুণ শব্দে খোলা জানলাটার ওপর আছড়ে পড়লো সে। ঝনঝন করে ভেঙে পড়লো সার্সির কাঁচ, অক্ষত রইল না তার মুখ আর হাত। চক্ষের নিমেষে ঘরের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল কার্পেণ্টার। —ঘরের মধ্যে যে কজন ছিল, তারা তো ভয়ে কাঠ হয়ে প্রায় মিশে গেল দেওয়ালের সঙ্গে। কোনো দিকে না তাকিয়ে এক দৌড়ে ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ও। সেখান থেকে সিঁড়ি টপকে পৌছেলো আর এক ফ্ল্যাটে। মূর্তিমান বিভীষিকার মত রিচার্ড কার্পেণ্টারকে ধেয়ে আসতে দেখে সে ঘরের বাসিন্দারা আগেই উধাও হয়েছিল।

বাইরের বিস্ময়বিহ্বল দৃশ্য দেখার লোভ সম্বরণ করতে পারলো না কার্পেণ্টার। তাই জানলা দিয়ে উঁকি মারতেই কালি পটকার স্তূপে আগুন লাগার মত প্রচণ্ড শব্দে এক ঝাঁক পুলিশের গুলি ছুটে এল তাকে লক্ষ্য করে। সাঁৎ করে কার্পেণ্টার আড়ালে সরে এল বটে, কিন্তু টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল সার্সির কাঁচ আর ঝাঁঝরা হয়ে গেল কাঠের ফ্রেম। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই স্কোয়াড অফিসাররা ঢুকে পড়ল বাড়ীর মধ্যে।

মেঝের ওপর বসেছিল কার্পেণ্টার। পুলিশ অফিসারদের রণমূর্তি দেখেই নিরীহ

নাগরিকদের মতই বলে উঠল—"আমি না, আমি না, আমাকে আপনাদের দরকার নেই। আমি তো এইখানেই থাকি।"

কিন্তু এ ধোঁকাবাজিতে ভোলবার পাত্র নয় অফিসার। হিড়হিড় করে সিঁড়ির ওপর দিয়ে ওকে টেনে নামিয়ে আনা হলো নীচে। একবার তো ও ফস্ করে রিভলভারটা বার করে ফেলেছিল আর কি! তবে তাতে সুবিধা করা গেল না। রাস্তায় টেনে নামানোর পরও মানুষ-নেকড়ের মতই ও প্রাণপণে ধস্তাধস্তি করতে থাকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার। হৈ-হৈ করে এগিয়ে এল মারমুখো জনতা। আর সে কি চীৎকার—"মারুন, মারুন, খুন করে ফেলুন খুনে ছুঁচোটাকে!"

ঠেলেঠুলে পুলিশের গাড়ীতে তুলে দিলাম ওকে, মিনিট কয়েক পরেই চার্জরুমে দেহতল্লাস করা হলো ওর। পাওয়া গেল এই কটা জিনিস ঃ দুটো রিভলভার, ছটা .৩৮ কার্তুজ, এক প্যাকেট অ্যাসপিরিন, হাতঘড়ি, পাঁচটা চাবি, দুটো পাঁচ ডলারের নোট আর খুচরো আটটা সেন্ট।

বিচার শুরু হলে কার্পেণ্টারের হাত-পা বেঁধে এবং কোমরবন্ধনীর সঙ্গে পুরু চামড়ার ফিতে লাগিয়ে আদালতে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। বড় বিশ্রী দেখাচ্ছিল ওকে দাড়ি না কামানোর জন্যে আর চুল না আঁচড়ানোর জন্যে। শুনানির সময়ে আগাগোড়া একজন আত্মীয়ার সঙ্গে কথা কইলো কার্পেণ্টার। স্টেট প্রসিকিউটর জোর গলায় বললেন, রিচার্ড কার্পেণ্টার আইনত সুস্থ মস্তিষ্ক। বেশ কয়েকজন মনোসমীক্ষককে ডেকে তিনি প্রমাণ করে দিলেন কোনটা ন্যায় এবং কোনটা অন্যায়, তা বোঝার টনটনে জ্ঞান আছে তার। কৌসিলীর সঙ্গে সহযোগিতা করার মত বুদ্ধিবিবেচনারও অভাব নেই।

আর তাই, ডিটেকটিভ উইলিয়াম মর্ফিকে হত্যার অপরাধে ১৯৫৬ সালের ১৬ই মার্চ আদুরে খোকা পুলিশ-হন্তা রিচার্ড ডি কার্পেণ্টারকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়া হলো শুনে কেউই অবাক হননি। □

* জন ফ্লান্নেগান (শিকাগো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) রচিত কাহিনী অবলম্বনেও।

ম্যারিঅন-এর ঘটনা

কাপড়ের আবরণে মাথা-মুখ ঢাকা যেন চলমান প্রেতমূর্তি—গুপ্ত সমিতির সদস্য—এদের আমি দেখেছিলাম। সাদা পোশাক পরে ছিল সবাই। ঘোড়ায় চেপে স্রোতের মত এসেছিল তারা। প্রদোষের ম্লান আলোয় ঘোড়সওয়ার মূর্তিগুলোকে সাক্ষাৎ শয়তানের মত দেখাচ্ছিল। আমার তখন বয়স খুব অল্প। নেহাতই ছেলেমানুষ। ফ্লোরিডার মেরিয়ানার কাছাকাছি একটা গ্রামে আমি থাকতাম। অনেক রাত আমার জীবনে এসেছে, কিন্তু সে রাতটাকে আমি আজও ভুলতে পারিনি। ভুলতে পারিনি কিভাবে মাথা-মুখ আচ্ছাদিত লোকগুলো একটা জ্বলন্ত ক্রশ ঝুলিয়ে দিয়েছিল ক্যাথলিক গির্জের বাইরে; তারপর ভেতরকার উপাসনারত সবাইকে হুকুম করেছিল বাইরে বেরিয়ে আসতে। বয়স তখন খুবই অল্প হলেও এ সবের অর্থ যে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ভয়াবহ সূচনা, তা বোঝার মত বুদ্ধি আমার ছিল।

ক্যাথলিক, নিগ্রো, ইহুদি—এদের প্রত্যেককে ঘৃণা করতো মাথামুখ ঢাকা এই লোকগুলো। গায়ের রঙ যাদের সাদা নয়, দক্ষিণদেশের মানুষ না হলেও যারা তাই মনে করে নিজেদের—এদের প্রত্যেককে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতো এরা, এই মাথা-মুখ আচ্ছাদিত লোকেরা। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের গ্রামের সবার এবং খেত-খামারের চাষী মানুষদের অন্তরে বিভীষিকা রচনা করে এসেছে এই কু ক্লুক্স ক্ল্যান-য়েরা।

ছেলেবেলার প্রথমদিকের স্মৃতি, বিশেষ করে এই সবের স্মৃতি কোনদিনই মুছে যায় না মনের পট থেকে। পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘটনা হলেও আজও আমি যখন জীবনে প্রথম দেখা মাথা-মুখ ঢাকা সেই লোকগুলোর কথা মনে করি, স্নায়ুতে স্নায়ুতে উপলব্ধি করি সেদিনকার রক্তজমানো আতঙ্ক।

পরে এদের সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য আমি জেনেছিলাম। জেনেছিলাম কিভাবে গৃহযুদ্ধের সময়ে সর্বপ্রথম শুরু হয় কু ক্লুক্স ক্ল্যান-য়ের তৎপরতা। তারপর দাসত্ব প্রথা লোপ পাওয়ার পর আরও দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে এরা। সে সময়ে অজ্ঞতা, আতঙ্ক আর কুসংস্কার—এই সব কটিকেই কাজে লাগাতো ওরা। অনেক নিগ্রোর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ক্ল্যান্সমেনরা সত্যি সত্যিই সাদা ভূত এবং তাদের অলৌকিক ক্ষমতাও তাই সীমাহীন।

কলেজে পড়ার সময়ে ক্ল্যান্দের তৎপরতা সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য আমি পড়েছিলাম। এদের বিচিত্র অনুষ্ঠান-পদ্ধতি যা শুনলে উপকথা বলে মনে হয়, এদের মৃত্যুর শপথ এবং কোন সভ্যের নাম ফাঁস করে দেওয়ার দুঃসাহস যে দেখায় তার প্রতি পাশবিক দণ্ডদানের বিধান—সবই আমি জানতে পারলাম। কশাঘাত এবং লাঞ্ছনার সে এক গা শিউরোনো কাহিনী। 'গ্র্যাণ্ড ইম্পিরিয়েল উইজার্ড অ্যাণ্ড মোগল' ইত্যাদি গালভরা নামগুলো শুনলে হাসি পেলেও কিন্তু বাস্তবিকই এদের অস্তিত্ব ছিল। ধর্মগত এবং জাতিগত বিদ্বেষকে জিইয়ে রাখার জন্যে যারা জীবন পণ করেছে, এ নাম ছিল তাদেরই।

তারপর বহুবছর পরের কথা। বড় হয়েছি আমি। দেহ-মনে পরিপূর্ণতা লাভ করেছি এবং অপরাধী সন্ধানী হিসেবে কিছু সুনামও হয়েছে। ওয়াশিংটন থেকে আমাকে পাঠানো হলো একটা কু ক্লুক্স ক্ল্যান হত্যার তদন্তে। সমাজের দুষ্ট ব্রণস্বরূপ আমেরিকার রীতিনীতির পরিপন্থী এই গুপ্ত সমিতির কফিনে আরও একটা পেরেক পোঁতার জন্যে আমার সর্বশক্তি বিনিয়োগ করা সংকল্প নিয়ে রওনা হলাম আমি।

১৯৩০ সালের ৭ই আগষ্ট ইণ্ডিআনার ম্যারিঅনে পৌঁছোলাম আমি। বিধির কি বিড়ম্বনা। এক সময়ে এই ম্যারিঅনের নামডাক ছিল অন্য কারণে। অবরুদ্ধ দক্ষিণ অঞ্চল থেকে বহু নিগ্রো ক্রীতদাস 'মাটির তলার রেলপথ' দিয়ে সটকান দিয়েছিল এইখান দিয়েই।

ম্যারিঅনের ঘটনাটা আসলে দু পরিচ্ছেদে ভাগ করা একটিমাত্র কাহিনী—যার শুরু এবং শেষ মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। ফেয়ারমণ্ট জায়গাটা খুব কাছেই। ফেয়ারমণ্টের একটি খামার থেকে একটি ছেলে তার আঠারো বছরের বান্ধবীর সাথে দেখা করার জন্যে এসেছিল ম্যারিঅনে। ঘটনার শুরু এইখান থেকেই। সিনেমা দেখতে গিয়েছিল দুজনে। তারপর একটা ড্রাগ ষ্টোরে দাঁড়ায় সোডা খাওয়ার জন্যে। সেখান থেকে দুজনে গাড়ী হাঁকিয়ে যায় মিস্‌সিসিনউয়া নদীর দিকে। গাড়ী দাঁড় করানোর পর নদীর ধারে দুজনেই একটু ফূর্তিউচ্ছল হয়ে ওঠে। লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণীরা এ ধরনের পরিবেশে এসে যে রকম আনন্দে মেতে

ওঠে, এও তাই। কিন্তু এ-হেন কবিতার ছন্দপতন ঘটলো আচম্বিতে আতঙ্ক আর বিভীষিকার এক ঘন কালো মেঘের আবির্ভাবে। আচমকা এক ঝটকায় খুলে গেল গাড়ীর দরজা এবং একটা ছায়ামূর্তি, নিগ্রো বলেই মনে হয়েছিল তাকে, একটা রিভলভার তুলে ধরল দুজনের পানে।

গুরু গম্ভীর গলা শোনা যায়, "ওহে খোকাখুকুরা, বেয়াড়াপনা করলেই বিপদে পড়বে। ভাল চাও তো গুটি গুটি নেমে এস দিকি গাড়ীর ভেতর থেকে।"

বিনা দ্বিধায় হুকুম তামিল করে ছেলেটি। মেয়েটি গাড়ীর মধ্যেই বসে থাকে। এবার পিস্তলধারীর সংকেত পেয়ে অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে আরও দুজন ছায়ামূর্তি। ছেলেটির পকেট হাতড়ে তাকে কপর্দকহীন করে ওরা—খুচরোগুলোও নিতে ভোলে না। তারপর দলের পাণ্ডার হুকুম হয় 'মেয়েটিকে দেখাশুনা করার'। ওদের মধ্যে একজন সুট করে ঢুকে পড়ে গাড়ীর ভেতর এবং পর মুহূর্তে মেয়েটির ভয়ার্ত চীৎকার ভেসে আসে ছেলেটির কানে। মরিয়া হয়ে ওঠে সে। নিজের বিপদ তুচ্ছ করে আচমকা এক মোক্ষম ঘুসি বসিয়ে দেয়ে পিস্তলধারীর মুখের ওপর।

এ কাজে রীতিমত সাহসের দরকার—বিশেষ করে একজন অল্পবয়সী ছেলের পক্ষে এতখানি সাহস দেখানো বড় সোজা কথা নয়।

একটু টলে ওঠে পিস্তলধারী। তারপরেই সামলে নিয়ে পর পর তিনবার গুলিবর্ষণ করে। হাতে এবং পেটে গুলিবিদ্ধ হয়ে আছড়ে পড়ে ছেলেটি। ক্ষতমুখ দিয়ে ফিনকি দিয়ে ছুটে আসা রক্তের মধ্যে গড়িয়ে গিয়ে জ্ঞান হারায় সে।

হানাদার তিনজন তীরবেগে দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়ে নিজেদের গাড়ীতে। পুরোনো মডেলের একটা টি ফোর্ড গাড়ী। এবং সাংঘাতিক ভাবে আহত ছেলেটির পানে এক পলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়েই ঝড়ের মত বেগে গাড়ী চালিয়ে উধাও হয় সব্বাই।

প্রিয়তম ছেলেটির পায়ে নতজানু হয়ে বসে পড়ে মেয়েটি। ঘটনার আকস্মিকতায় এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিল বেচারী যে প্রথমেই আর্তস্বরে চীৎকার করে ওঠে সে। কিন্তু তার চীৎকার শুনে ছুটে আসার মত লোক ধারে কাছে কেউই ছিল না। শেষকালে নিরালা জায়গাটা ছেড়ে সে দৌড়োতে থাকে একটা খামারবাড়ী লক্ষ্য করে সাহায্যের আশায়। রাত তখন দশটা কুড়ি মিনিট।

গুলিবর্ষণের এই দৃশ্যটি যেখানে ঘটে, সে জায়গাটি ম্যারিঅনের বাইরে। কাজেই শহরের পুলিশরা সাফ বলে দিলে তদন্তটা পড়ছে কাউন্টি কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ারে। ডাক পড়ল ষ্টেট হাইওয়ে পেট্রলের। শেষে ঠিক হলো গ্রান্ট কাউন্টির শেরিফ জেক ক্যাম্পবেল হাতে নেবেন এই কেস।

ক্যাম্পবেল লোকটি ছিলেন ঝানু পুলিশ অফিসার। সাহসেরও তাঁর অভাব ছিল না। এবং অভাব যে বাস্তবিকই নেই, তা প্রমাণিত হয় তাঁর খুঁড়িয়ে চলার ধরন থেকেই। পিস্তলযুদ্ধে গুরুতরভাবে পায়ে চোট পেয়েছিলেন ক্যাম্পবেল। এ কেস যখন হাতে নিলেন, তখন ডাক্তারেরা উঠে পড়ে লেগেছেন ছেলেটির জীবন বাঁচানোর জন্যে। মেয়েটির জবানবন্দি থেকে ঘটনার নিখুঁত বিবরণও পাওয়া গিয়েছিল।

গুলিবর্ষণের পরেই সেই রাত্রে ম্যারিঅনে হাজির ছিলেন ক্যাম্পবেল। একটা সেকেলে

মডেলের টি ফোর্ড গাড়ীর মধ্যে তিনজন নিগ্রোকেও দেখেছিলেন। ওয়াশিংটন স্ট্রীট বরাবর বিকট স্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে গাড়ী চালাচ্ছিল ওরা। ওদের এই হুল্লোড় আর আচরণ দেখে তখন কিন্তু উনি বিশেষ কিছু ভাবেন নি। উনি জানতেন, মেজাজ খিঁচড়ে গেলে, খুব মুষড়ে পড়লে মানুষমাত্রই, তা সে কালো হোক আর সাদাই হোক, একটু বেসামাল হয়ে ওঠে। হাবভাবে আচার ব্যবহারে তখন অনায়াসেই একটা বেখাপ্পা বেয়াড়া ভাব লক্ষ্য করা যায়। যাই হোক, টি মডেল গাড়ীটাকে দাঁড় করালেন উনি। দেখলেন, রেজিস্ট্রেশন হয়েছে টম শিপ্-এর নামে। এই কাণ্ডর একটু পরেই ক্যাম্পবেল এবং তাঁর ডেপুটিরা রওনা হলেন টম শিপ-এর ঠিকানা খুঁজে বার করার জন্যে শহরের যে অঞ্চলে কালো চামড়ার লোকেরা থাকে সেই দিকে।

কোঠা বাড়ীটায় রঙের কোন বালাই ছিল না। আধা-অন্ধকারের মধ্যে বাড়ীটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন বয়সের ভারে বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বেচারী—নিজেকে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে রাখার মত শক্তিও তার নেই। গ্যারেজের ভেতরে হানা দিতেই ফোর্ড গাড়ীটা চোখে পড়ল পুলিশ অফিসারদের। অ্যাক্সেলের চার পাশে ঘাস এবং গুল্ম লেগেছিল। মিস্‌সিসিনউয়া নদীর তীরে গেলে যে ধরনের ঘাস-গুল্ম পাওয়া যায়—ঠিক সেই রকমের।

পর্দা দেওয়া দরজাটা লাথি মেরে দুহাট করে খুলে ফেললেন ক্যাম্পবেল। এলোমেলো বিছানার ওপর জামাকাপড় পরেই চিৎপাত হয়ে শুয়ে ছিল টম শিপ। ঘুম ভাঙানোর পর সে স্বীকার করলে, হ্যাঁ, এক স্মিথ আর হার্ব ক্যামেরন নামে দুই বন্ধুর সঙ্গে সে একটু ফুর্তি করতে বেরিয়েছিল বটে। শিপ্‌কে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ক্যাম্পবেল। ডেপুটিরা পাকড়াও করে আনলেন স্মিথ আর ক্যামেরনকে।

আব্রাহাম স্মিথের বয়স উনিশ বছর। আর হার্ব ক্যামেরনের বয়স মাত্র ষোল। উপবাসশীর্ণ ফিনফিনে চেহারা তার। হাতকড়া লাগিয়ে দুজনকে নিয়ে যাওয়া হলো ম্যারিঅনের পুরোনো আদালত ভবনে। লাল ইঁট আর গ্র্যানাইট দিয়ে তৈরী সে বাড়ী।

নদীতীরে গুলিবর্ষণের অকুস্থলে এবং তার পরের ভয়াবহ উপসংহার নিয়ে তদন্তে ব্যস্ত থাকার সময়ে ক্যাম্পবেল অনেক কথা আমায় বললেন সে রাতের ঘটনা প্রসঙ্গে। কিন্তু গ্রেপ্তার করবার পর সেই রাতেই ডেপুটিরা এই তিনটি কালোচামড়া ছেলেদের নিয়ে আসলে কি যে করছিলেন, তার কোন বৃত্তান্তই আমি বার করতে পারলাম না কারও কাছ থেকে। শুনেছিলাম 'থার্ড ডিগ্রী' নামক পদ্ধতিটিও বাদ যায় নি। কেউ কেউ বললে, ছেলেগুলোর পেট থেকে স্বীকরোক্তি আদায় করার পর নাকি বেদম হাঁপিয়ে পড়েছিলেন ডেপুটিরা।

নদীতীরে প্রেমিক-প্রেমিকার ওপর চড়াও হওয়ার কথা স্বীকার করেছিল টম শিপ্। বাকী দুজনেই স্বীকার করেছিল, হ্যাঁ তারাও ছিল টম শিপ্-এর সাথে।

ম্যারিঅনের সীমানার বাইরে কু ক্লক্স ক্ল্যান-এর সভার নির্ধারিত সময় ছিল ৭ই আগস্টের রাত দুটো। সবাই মিলিত হবার পর নিষিদ্ধ জিন-এর স্রোত বয়ে গেল নির্বাধে। সেই সঙ্গে চললো নিগ্রোদের প্রতি অবাধে বিষোদগার। আলোচনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে পেতে শেষ পর্যন্ত মতলব স্থির হয়ে গেল ঃ ঠিক হলো, দল বেঁধে সবাই হামলা দেবে জেলের মধ্যে। সভা যখন ভঙ্গ হলো, তখন বেশীর ভাগ ক্ল্যানস্‌মেনই-ই মদে চুর চুর এবং নষ্টামির জন্যে উদগ্রীব। জেলার প্রত্যেককে ডেকে তুলে বিরাট দল গড়ার পরিকল্পনাও হয়েছিল। স্লোগান তৈরী হলো,

‘কুত্তা নিগারগুলোকে যেভাবেই হোক পাঠাতে হবে যমালয়ে!’

সকাল দশটা নাগাদ আদালত ভবনের দিকে যে কটা রাস্তা এসেছে, সব কটায় জড়ো হলো কাতারে কাতারে লোক। পিল পিল করে আরও লোক আসছিল ম্যারিঅনের বাইরে থেকে। রাগে গন গনে প্রত্যেকেরই মেজাজ। সত্যি কথা বলতে কি আসন্ন হাঙ্গামার সম্ভাবনায় দেখতে দেখতে থমথমে হয়ে উঠল চারপাশের আবহাওয়া। জেলের বাইরের জনতা যে কিছু গোলমাল শুরু করার জন্যেই ওৎ পেতে রয়েছে, এ সম্পর্কেও হুঁশিয়ার করে দেওয়া হলো শেরিফ ক্যাম্পবেলকে। কয়েদীদের চুপিসারে ম্যারিঅনের বাইরে পাচার করে দেওয়ার পরামর্শও দেওয়া হলো তাঁকে।

কিন্তু নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাস রাখতেন শেরিফ। তাই জবাব দিলেন—“অর্থাৎ সবাই ভাবুক যে ভয়ের চোটে ল্যাজ গুলিয়ে সরে পড়ছি আমি। ওসব কিস্‌সু হবে না। এ অঞ্চলের সবচেয়ে দুর্ভেদ্য জেল হলো এইটা। কারও ক্ষমতা নেই দরজা ভেঙে এর ভেতরে উৎপাত করবে।”

দারুণ ভুল করেছিলেন ক্যাম্পবেল। কেননা, খুব জোর ঘণ্টা তিনেক, কি তারও একটু পরেই জয়জয়কার পড়ে গেল সেই আইনের যে আইন কোন আইনের পরোয়া না করে নিজ হাতেই তুলে নেয় অপরাধীকে দণ্ড দেওয়ার গুরুভার। কড়া রোদ্দুরের মধ্যে ঝুলতে লাগল দু’দুটো নিষ্প্রাণ দেহ। আনুষ্ঠানিক বিচার প্রহসন বেমালুম কেটে ছেঁটে সংক্ষিপ্ত করে আনলে জনতা। রক্তের তৃষ্ণা মিটোনোর এই বীভৎস দৃশ্যে কিন্তু একটি জাতীয় রক্ষীও উপস্থিত ছিল না এ কাজ থেকে তাদের নিবৃত্ত করার জন্যে।

জেলের ওপর সর্বপ্রথম হামলা শুরু হয় চারজন মাথা মুখ ঢাকা ক্ল্যানস্‌মেন-এর প্রচেষ্টায়। রাস্তার কোণ থেকে লোহার ট্রাফিক সিগন্যালটা মাটি খুঁড়ে তুলে আনে ওরা। তারপর, শুরু হয় আদালত ভবনের লোহার খিলমারা ওককাঠের ভারী দরজাটার ওপর আঘাতের পর আঘাত। কিন্তু এক চুলও নড়ে না পাথরের মত শক্ত দরজাটা। বাধ্য হয়ে লোহার খেঁটে নামিয়ে রেখে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেয় ওরা। রীতিমত ঘামতে ঘামতে বিস্তর গালিগালাজ বর্ষণের পর আবার নতুন উদ্যমে শুরু হয় তাদের প্রচেষ্টা।

ইতিমধ্যে একটা কাঁদুনে গ্যাসের বোমা এসে পড়ে জনতার মাঝে তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্যে। কিন্তু একজন অতি-তৎপর ক্ল্যান হাঙ্গামাকারী চট্‌ করে বোমাটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলে যেদিক থেকে এসেছে সেইদিকেই। দরজা-ভাঙ্গার খেঁটে এবার আর ব্যর্থ হয় না। দরজার পাশে পাশে গাঁথুনিতে ফাটল দেখা যেতেই মুহুর্মুহু বিজয়ের উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে এদিকে-সেদিকে। হুড পরা একজন চীৎকার করে ওঠে—“ওহে হাত লাগাও সবাই, বাস্টার্ডদের এবার আমরা হাতের মুঠোয় পাব।” হাতে হাতে চালান হয়ে গেল জিন-মদের একটা বোতল। উইজার্ড অর্থাৎ জাদুকরের পোশাকের নীচ থেকে বেরিয়ে এল একটা দড়ি! এবং আরও রাশি রাশি লোক ছুটে এল হাত লাগানোর জন্যে।

জেলের বাইরের পৈশাচিক উল্লাসে উন্মত্ত হাঙ্গামাকারীদের নিরোধ করা যাবে না—এমন ধারণা কিন্তু তখনও জেলের ভেতরে শেরিফ ক্যাম্পবেলের মাথায় আসেনি। আগের চাইতেও জনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কাণ্ড দেখার জন্যে গাড়ীর ছাদের ওপরেও উঠে পড়েছিল বিস্তর মানুষ। কেউ কেউ আবার আদালত-ভবনের দরজা ভাঙার দৃশ্যটা ছেলেমেয়েদের দেখানোর

জন্যে তাদেরকে তুলে নিয়েছিল নিজের কাঁধের ওপর। এ হেন হামলা স্বচক্ষে দেখে বিকৃত তৃপ্তি পাওয়ার জন্যে এসেছিল অনেকে। এ কাজে অংশ নেওয়ার হত সাহস তাদের ছিল না। বাধা দেওয়ার মত সাহস বা সদিচ্ছাও কারও ছিল না।

জানলা থেকে তারস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে ক্যাম্পবেল—"থামো! দরজার দিকে আমি মেশিন গানের মুখ ঘুরিয়ে রেখেছি। প্রথমেই যে ঢুকবে, তার আর নিস্তার নেই।"

বিকট চিৎকার আর উল্লাসধ্বনির মধ্যে অব্যাহত থাকে হামানদিস্তা পেটার মত দমাদম শব্দ। শেষকালে খসে পড়ে পাথর আর ইঁটের বাঁধুনি এবং বিজয়মাল্য এসে পড়ে কু ক্লুক্স ক্ল্যানদের গলে। ধুলো আর চুন-কালি-শুরকির কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হুড়মুড় করে জনতা ঢুকে পড়ে ভেতরে। তারপর যে দৃশ্যের সৃষ্টি হয়, তা উন্মাদদের প্রলয়নাচন ছাড়া আর কিছুই নয়।

বেপরোয়া জনতার ওপর গুলি চালানোর ভয় দেখালেও শেষ পর্যন্ত তা আর করলেন না ক্যাম্পবেল। এ সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা বাস্তবিকই বড় সহজ কাজ নয়। উনি জানতেন ভিড়ের মধ্যে তাঁর বন্ধু আছে, প্রতিবেশী আছে, হয়তো দু'একজন আত্মীয়ও আছে। কয়েদীদের প্রতিরক্ষার জন্যে জন বারো কি তারও বেশী মানুষকে সাবাড় করাটা ন্যায়সঙ্গত কিনা, তা তাঁকে ভাবতে হয়েছে ঐটুকু সময়ের মধ্যেই। এবং তার চাইতেও দরকারী হলো এই যে জনতার ওপর বেধড়ক গুলি চালিয়েও কি কয়েদীদের বাঁচাতে পারতেন উনি?

মাথা মুখ ঢাকা ভেল্কিবাজরা শেরিফের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় চাবীর থোকা। খুলে যায় গারদের দরজা। দুজন চেপে ধরে টম শিপ্‌কে। অজ্ঞান হতে তখন তার বেশী দেরী নেই। একজন তাকে শক্ত হাতে ধরে রাখে, আর একজন ঘুসির পর ঘুসি বসিয়ে যেতে থাকে তার মুখের ওপর। টানতে টানতে ওকে আনা হয় বাইরে। আদালত ভবনের সিঁড়ির ওপর থেকে লাথি মেরে গড়িয়ে দেওয়া হয় নীচের লনে। তারপর যখন দড়ির ফাঁস পরানো হয় ওর গলায়, তখন পুরোপুরি অচেতন হয়ে পড়েছে সে। গাড়ির ছাদের ওপর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে গলা চিরে চীৎকার করতে থাকে—"খুন করো ওকে! খুন করো ওকে!"

এক মুহূর্তের মধ্যেই গাছ থেকে ঝুলতে থাকে টম শিপ্। তারপর টেনে আনা হয় এব স্মিথকে। দুহাত তার পিছনে বাঁধা। একজন মাতাল জড়িয়ে জড়িয়ে জিজ্ঞেস করে—"কিহে কালো শয়তান, কিরকম লাগছে তোমার?" দড়ির অন্য প্রান্তের ফাঁসটি ওক গাছের একটা শাখার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনা হয়। এবং নিষ্করুণভাবে ফাঁসবদ্ধ এই নিগ্রো ছোকরাও খুব দ্রুত ত্যাগ করে তার শেষ নিঃশ্বাস।

ষোল বছরের হার্ব ক্যামেরন একজন স্ত্রীলোকের সেলে লুকিয়ে পড়ে রেহাই পেয়ে যায় সে যাত্রা। চুরির জন্যে স্রেফ দশদিনের হাজতবাসের গল্প ওরা বিশ্বাস করেছিল কিনা, অথবা ওরকম হাড্ডিসার ছোকরার জন্যে দড়ির অপচয় করাটা ওরা অনুচিত মনে করেছিল কিনা—তা কেউ বলতে পারবে না। এমনও হতে পারে যে দুদুটো খুনের পর জনতার হত্যালালসা এবং হাঙ্গামাতৃষ্ণা অনেকাংশে মিটে গিয়েছিল।

এই ভয়াবহ গল্প বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ার পর দুনিয়ার পুলিশরা এসে হাজির হলো ম্যারিঅনে। জাতীয় রক্ষীবাহিনীও এল। কিন্তু তখন ক্ল্যানস্‌মেনদের কেউই আর ছিল না সেখানে—অন্তত হুড-পরা অবস্থায় নয়। অপরাধীদের খুঁজে বার করার চেষ্টায় আমি যখন

কাজ শুরু করলাম, তখনও কিন্তু বেশ গরম ম্যারিঅনের আবহাওয়া। রুচিশীল নাগরিকেরা যে এই বীভৎস হাঙ্গামার জন্যে খুব মুষড়ে পড়েন নি, এমন কল্পনাও যেন কেউ না করেন। এমনকি একজন পুরুতও হত্যাকারীদের সনাক্ত করতে যারা পারে তাদের প্রতি আবেদন করার সময়ে প্রকাশ করে ফেলেছিলেন, বহুজনের মতের সঙ্গে তাঁরও মতের মিল আছে এ বিষয়ে। উনি বলেছিলেন, ''খ্রিস্টের নামে বলছি, জনতার ভয়াবহ জয়লাভের ফলে যারা অত্যাচারিত, তাদের সম্পর্কে সত্য কথা শুনতে চাই আমরা।''

সামরিক আইনের আওতায় এসে পড়ে ম্যারিঅন। জনতা আইনের নিয়ম লঙ্ঘন করার মত সাহস যাদের আছে, তাদেরকে নিয়ে চার হপ্তা ধরে একনাগাড়ে আমি চেষ্টা করলাম ন্যায়চক্রকে ঘূর্ণ্যমান রাখতে। কিন্তু এত তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য যারা দেখেছে, তাদের অত জিজ্ঞাসাবাদ করেও আমি এমন দুজন সাক্ষী পেলাম না যারা দলের পাণ্ডাদের নাম বলতে রাজী আছে। দুজন তো দূরের কথা, এরকম লোক আমি একজনকেও পেলাম না। কেউই বললো না—''আমি দেখেছি—নিগ্রোদের গলায় ফাঁস পরাতে। আমি ওকে চিনি। ভালভাবেই চিনি। আমার ভুল হতে পারে না এবিষয়ে। বহুবার তার গলাও আমি শুনেছি।''

গুজব শোনা গেল, ক্ল্যান পাণ্ডারা জর্জিয়া পালিয়েছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর করণীয় কিছুই ছিল না। পরবর্তী কর্মপন্থাকে কার্যকরী করতে গেলেই আমাকে প্রমাণ করতে হবে ব্যাপারটা দুই দেশের মধ্যে সন্ধি সম্বন্ধে আবদ্ধ অপরাধ। অর্থাৎ আন্তঃ প্রদেশ কিডন্যাপিং, অথবা আন্তঃ প্রদেশ যোগাযোগ। কিন্তু তা অসম্ভব ছিল। গভর্ণমেন্টের পক্ষেও করণীয় কিছু ছিল না। কাজে কাজেই কেসটা ছেড়ে দেওয়া হলো প্রদেশ কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের হাতে।

জেম্‌স্ এম ওগ্‌ডেন নামে এক সাহসী অ্যাটর্নী-জেনারেল শেষ পর্যন্ত ম্যারিঅনের ক্ল্যানদের দলপতি হিসেবে দুজন পুরুষকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণাদির অভাবে কোর্ট এ অভিযোগ নাকচ করে দেয়।

হার স্বীকার করার পর ম্যারিঅন ছেড়ে এসেছিলাম আজ হতে প্রায় পঁচিশ বছর আগে। এর মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে দক্ষিণ অঞ্চলে, সুদিন এসেছে, উন্নতি ঘটেছে। যদিও হেথায়-সেথায় এখনও জাতিবিদ্বেষ ফুটে রয়েছে দুষ্ট কীটঘ্ন ফুলের মত, তবুও বেশীর ভাগ আমেরিকান তাকিয়ে আছেন সেই সুদিনের দিকে যেদিন এই বিষ চিরতরে মুছে যাবে সমাজের বুক থেকে। □

* জন কোন্যালী (আমেরিকা) রচিত কাহিনী অবলম্বনে।

এক বোতল কাশাকা

সারা বিকেল তুমুল বৃষ্টি পড়েছিল রিও-ডি-জেনেরিও-তে। খুনটা হয়েছিল সেই রাতেই এবং তখনও জলের দাগ বুকে নিয়ে চিক্‌চিক্ করছিল গোটা শহরটা। বেলাভূমি বরাবর অন্তহীন আলোর মালাটি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল নিস্তরঙ্গ শান্ত জলরাশির কালো কুচকুচে পটভূমিকায়। বন্দর অঞ্চল থেকে বেরিয়ে এসেছিল আরও একটা আলোর রেখা। আঁকাবাঁকা

পথে না গিয়ে রেখাটা সিধে চলে গিয়েছিল শহরের বুক পর্যন্ত। আলোর ধারায় ঝকমক করছিল রাস্তাগুলো। কাদাজল ছিটিয়ে-ছিটিয়ে ছুটে চলেছিল বড় বড় সব গাড়ী।

সুন্দর সুন্দর সব হোটেল, কারুকাজকরা বড় বড় বাড়ী আর কাঁচের দেওয়ালওলা প্রকোষ্ঠগুলোর খোলা জানালায় পাওয়া যাচ্ছিল আনন্দের উষ্ণতা; হাল্কা হাসির ঠুনকো আওয়াজ, ম্যারিমবা আর ম্যারাকাস-এর শব্দ, বেহালার তারে উত্থিত সঙ্গীত আর কক্‌টেল গেলাসের রিনিঝিনি আওয়াজ—সবই ভেসে আসছিল বাতায়নপথে। এ সময়ে এই রকমটি শোনাই তো স্বাভাবিক। স্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ সুপ্তিভঙ্গ হওয়ায় জেগে উঠেছিল সারা শহরটা। নর এবং নারী, চটপটে তাদের প্রকৃতি, বিপুল তাদের অর্থ—প্রত্যেকেই এই ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে যেন আর একবার উপলব্ধি করছিল আনন্দের প্রতি, ফুর্তির প্রতি তাদের আতীব্র আকর্ষণ। নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মতই তীব্র সে অনুভূতি।

শ্যাম্পেনের বুদবুদ আর মহার্ঘ সুগন্ধির বায়ুবহ সৌরভের আবেশে আবিষ্ট কেউই সে রাতে ক্ষণেকের জন্যেও ভাবেনি অপরূপ সুন্দর কোপকাবানার বালুকাবেলার কাছাকাছি পাহাড়ের সানুদেশের নিরানন্দ কুঁড়েঘরের শহরটির কথা। অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নজরে আসছিল না; মাঝে মাঝে এই নিরন্ধ্র তমিস্রার মধ্যে জেগেছিল কয়েকটা আলোর শুধু কম্পমান বিন্দু—মোমবাতির শিখা। আর ছিল নিস্তব্ধতা। শুধু শোনা যাচ্ছিল টুপ টুপ করে জল পড়ার আওয়াজ—মর্চে ধরা টিনের চাল থেকে বিন্দু বিন্দু জল ঝরে পড়ছিল ধরিত্রীর বুকে। এছাড়া সবকিছুই হারিয়ে গিয়েছিল নৈঃশব্দ্যের অতলে।

আচম্বিতে একটা কুঁড়েঘর থেকে ভেসে এল ক্রুদ্ধ চাপা কণ্ঠস্বর এবং পরক্ষণেই একটা আর্ত চীৎকার। আর তারপরেই সব চুপ। অসহ্য থমথমে নীরবতা। কুঁড়েঘরের ভেতরকার মোমবাতিগুলো নিভে গেল একে একে। এক মুহূর্ত পরেই সুট করে একটা মূর্তি বেরিয়ে এল ভেতর থেকে—চটপট পা চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। নিম্নমানের জীবনধারা প্রবাহিত সমাজের এই দরিদ্র অংশটিতে কেউই কারও খবর রাখতো না এবং এখানে খুনজখম ছিল নেহাতই একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। কাজে কাজেই পরের দিন সকাল না হওয়া পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত রয়ে গেল রোগা একহারা মেয়েটির লাশ। এবং তারপরেই খবর চলে গেল পুলিশের দপ্তরে।

যে কুঁড়ের নীচে খুনটি হয়েছে বিস্তর লোক তার চারধারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সবার আগে আমার চোখে পড়ল কয়েকটা ছেঁড়া পোশাক পরা ছেলেমেয়ে। বাচ্চাগুলো এদিক সেদিক দৌড়ে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল। জনতার এই জমাট প্রাচীর নাড়ায় কার সাধ্য। শেষকালে যখন চীৎকার করে উঠলাম ঃ "পুলিশকে এগোতে দাও", তখনই চটপট পথ করে দিলে ওরা এবং কয়েকজনকে টুক করে সরে পড়তেও দেখলাম। কারণটা আমার অজানা নয়। সম্প্রতি এ অঞ্চলে পর পর কয়েকটা চুরি হয়ে গেছে রাতের অন্ধকারে। কিন্তু এসব ব্যাপার নিয়ে পুলিশকে যতখানি মাথা ঘামাতে হয়েছে, তার চেয়েও যে বেশীমাত্রায় তৎপর হতে হবে এ কেস নিয়ে—তা ওদের কারোরই জানতে বাকী নেই।

ঠেলেঠুলে এগিয়ে গেলাম সামনের দিকে। টানের চোটে খুলে গেল কোটের সামনের বোতাম। পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে অতখানি ওঠার ফলে রীতিমত ঘেমেও গিয়েছিলাম। তাই

মুছে নিলাম কপালের ঘাম। এতখানি হেঁটে আসার ফলে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। নোংরা পরিবেশের মধ্যে এসে পড়ে একটু মুষড়েও পড়েছিলাম। কিন্তু খুন যখন হয়েছে তখন খুনীকে আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে।

আধপোড়া সিগারেটটার দিকে একবার তাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম আমি। তারপরেই মাথা নীচু করতে হলো একটা নীচু বরগার আক্রমণ থেকে মাথা সামলানোর জন্যে। নোংরা নীচু কুঁড়েঘরটার অন্ধকারের মধ্যে থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল বরগাটা।

শুনতে পেলাম বাইরে সিগারেটটার প্রান্তভাগ নিয়ে ছেলেমেয়েগুলো মহাবাগ্‌বিতণ্ডা জুড়েছে এবং হাতাহাতি শুরু করে দিয়েছে। রিও ফোর্সে আঠারো বছর রয়েছি আমি পুলিশ চীফ-এর পদে। কাজেকাজেই রুগীকে পরীক্ষা করার সময়ে ডাক্তারের মনে যে ধরনের আগ্রহের সঞ্চার হয়, ঠিক সেই ধরনের পুলিশ চীফ সুলভ আগ্রহ দুই চোখে নিয়ে তাকালাম ঘরটার চারপাশে। এর আগেও এরকম ধরনের কয়েকশো চালাঘরে হানা দিতে হয়েছিল আমাকে। সে সবের থেকে কোনও প্রভেদ দেখতে পেলাম না এ ঘরটায়। একই রকমের নড়বড়ে আসবাবপত্র, হাড়জিরজিরে টেবিল, গোটা দুই ঝপ-করে-ভেঙ্গে-পড়া চেয়ার এবং এক কোণে রাশীকৃত নোংরা কম্বল। সূর্যকিরণের প্রসাদবঞ্চিত হওয়ায় একই রকমের উৎকট গন্ধ আর মেঝের ওপর ধুলোর পুরু স্তর। কুঁড়ে ঘরের এই শহরে সবকটা চালাঘরেই যেমনটি দেখতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ টিনের চাদর আর ধাতুর প্যানেল দিয়ে তৈরী বাঁধা-ছক-দেওয়াল আর ছাদ—এ ঘরের বৈশিষ্ট্যও দেখলাম তাই। হরেক রকমের এই জিনিসগুলো অবশ্য সবই চোরাই মাল—এক সময়ে যা ব্যবহৃত হতো বিজ্ঞাপনের সাইনবোর্ড হিসেবে।

সেদিন সকালে অন্যান্য সবকটা চালাঘর থেকে এই ঘরটিকে একেবারে আলাদা করে ফেলেছিল যে জিনিসটি তা হলো একটা দেহ। মেঝের ওপর হাত পা ছড়িয়ে পড়েছিল দেহটা। স্ত্রীলোকের লাশ। মুখ থুবড়ে পড়েছিল সে দুই হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে।

ঝুঁকে পড়ে চিৎ করে শুইয়ে দিলাম ওর দেহ। এক সময়ে সুন্দরী ছিল সে। কিন্তু এখন যার মুখের দিকে তাকালাম তাকে মাঝবয়েসী স্ত্রীলোক ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। বহু বছর ধরে জীবনকে জোড়াতালি দিয়ে চালিয়ে নেওয়ার নিদর্শন ফুটে ছিল তার নিষ্প্রাণ মুখের পরতে পরতে। বলিরেখা গভীর হয়ে বসে গিয়েছিল তার চামড়ায়।

বিস্রস্ত কাঁচাপাকা চুল এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো বিস্ফারিত চোখের ওপর। জবরদস্তির কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না কোথাও। অথচ সমস্ত চালাঘরটা আর্তসুরে বলতে চাইছিল—"খুন! খুন!"

নতজানু হয়ে বসেছিলাম এতক্ষণ। এবার উঠে দাঁড়ালাম। দরজার কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল যারা, তাকালাম তাদের দিকে। ভিড়ের মধ্যে যে সব মুখ আমি দেখতে পেলাম, বহুদিন ধরে তাদের খোঁজ করছিল আমাদের দপ্তর। কিন্তু এখন সে সময় নয়। পরে এদের নিয়ে পড়া যাবে'খন।

প্রশ্ন করতে শুরু করলাম। বেশী প্রশ্ন নয়। কেননা আমি জানতাম এদের কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য আমি পাবো না। আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তা—এই দুইয়ের তাড়নায় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে ওরা কেউই চায় না অপরকে ফাঁসিয়ে দিতে। তাছাড়া পাশের চালাঘরের লোক কতটা খবর রাখে, তা তো কেউই জানে না। ওরা নাকি কাউকেই দেখেনি এবং অস্বাভাবিক কিছু

শোনেও নি। কিছু দেখলে বা শুনতে পেলে তখুনি পুলিশকে না জানিয়ে কি তারা বসে থাকে হাত পা গুটিয়ে?

মনে মনেই বলি, ''তাই বটে আইনকে অক্ষরে অক্ষরে তোমার মেনে চলো কিনা। পুলিশকে সাহায্য করতেও কসুর করো না। কিন্তু তবুও যদিও বা কোনদিন পাকড়াও করতে পারি খুনীকে—জানি তোমাদের এককণা সাহায্যও থাকবে না তার মধ্যে।''

ভিড়ের মধ্যে সামনে এগিয়ে গিয়ে এমনই একটা প্রশ্ন করলাম যার উত্তরে সত্য না বললেই নয়।

জিজ্ঞেস করলাম—''নিহত স্ত্রীলোকটি কে?''

একজন উত্তর দিলে—''এলসা।''

''পুরো নাম কি?''

''পুরো নাম কোনদিনই আমাদের বলেনি ও।''

''পেট চলতো কি করে?''

''ভিক্ষে করে।''

''আর কোনপথে টাকা রোজগার করতো কি?''

''আমরা অন্তত জানি না।''

''বিয়ে করেছে?''

''যদিও বা করে থাকে, কোনদিন দেখিনি ওর স্বামীকে।''

''ওর সঙ্গে আর কেউ থাকত এখানে?''

''দেখিনি কোনদিন।''

''তোমাদের মধ্যে আর কেউ কিছু জানে কি?''

''সিনর মার্টিনেলি, আপনি তো জানেনই এর চেয়ে বেশী আর কিছু জানলে কতখানি খুশী হতাম আমরা।''

সেই একঘেয়ে পুরোনো গল্প। পেছন ফিরে আবার গেলাম চালাঘরটার ভেতরে। ওদের কাছ থেকে আর কোন খবর জানার সম্ভাবনা নেই। সম্ভবত, বেশী কিছু জানেও না ওরা। খুনখারাপী করাটা চালাঘরবাসীদের আওতার মধ্যে পড়লেও জিনিসটা ওরা ফ্যামিলির চৌহদ্দির বাইরে সরিয়ে রাখাই পছন্দ করে।

পুলিশের ডাক্তার জানত নিছক পয়েণ্ট নিয়ে লেখা খুব সংক্ষিপ্ত রিপোর্টই পছন্দ করি আমি। ফিরে এসে দেখি লাশ পরীক্ষাপর্ব সাঙ্গ করে ফেলছে সে। আমাকে দেখেই বললো—''মাথায় চোট লেগেছিল। খুলি চুরমার হয়ে গেছে। মারা গেছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স মেয়েটার। পুষ্টিকর খাবার না খেতে পাওয়ায় চেহারা হয়েছে অস্থিসার। ঘণ্টা দশেক হলো মারা গেছে।''

তার মানে দাঁড়াচ্ছে—এই যে গত রাতে দশটা নাগাদ খুন হয়েছে এলসা। ঠিক এই সময়টায় স্ত্রীকে নিয়ে আমি বাড়ীর কাছাকাছি একটা সিনেমা হাউসে মিকিমাউজ-এর ছবি দেখতে দেখতে মনের আনন্দে হাসছিলাম। আবার ঠিক সেই সময়টাতেই কোপাকাবানায় শুরু হয়েছিল প্রথম ফ্লোর-শো এবং ঝলমলে আলোয় আনন্দে ফুর্তিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছিল রিও-র একটা অংশ।

ডাক্তারকে শুধোলাম—"এই কি সব? আর কিছু নেই?"

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে যায় ডাক্তার দরজার কাছে। বলে—"আর একটা খবর। আকণ্ঠ মদ গিলেছিল মেয়েটা।"

"মদ গিলেছিল!" চিন্তার আনাগোনা শুরু হয় মস্তিষ্কের কোষগুলোয়। "ইণ্টারেস্টিং পয়েন্ট। পয়সার লোভে নিশ্চয় এ কাজ কেউ করেনি। কেননা, পকেট হাতড়ে কয়েকটা ক্রুজিরোজও পাওয়া গেল না। তাছাড়া, নিজের পয়সায় সাধারণত কেউ মদ্য পান করে না। আর একবার চোখ বুলিয়ে দেখা যাক কি পাওয়া যায় আশেপাশে।"

আর একবার তল্লাসি চালিয়ে নতুন তথ্য বলতে বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না শুধু একটা খালি বোতল ছাড়া। মেঝের ওপর গড়াগড়ি যাচ্ছিল বোতলটা। তর্জনীটা বোতলের মুখে আঁকশির মত আটকে দিয়ে তুলে ধরলাম নাকের কাছে। তখনও কাশাকার বিশ্রী অস্বস্তিকর গন্ধ পাচ্ছিলাম বোতলের মধ্যে। কাশাকা এক রকমের সস্তা মদ। আখ থেকে এখানকার লোকেরা চোলাই করে নেয় কাশাকা। বিশেষ করে এই কাশাকাটি যে সবচেয়ে সস্তা আর সবচেয়ে মারাত্মক, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই ছিল না। সামান্য কয়েকটা ক্রুজিরোজ-এর বিনিময়ে ধীরে ধীরে নিভিয়ে দিতে পারে তা যত কিছু যন্ত্রণা-চিন্তা-উদ্বেগ-ক্লেশ।

সন্তর্পণে বোতলটাকে কাগজ দিয়ে মুড়ে শেষবারের মত চোখ বুলিয়ে নিলাম চারধারে। তারপর অ্যাসিষ্ট্যাণ্টদের ডেকে হুকুম দিলাম লাশটাকে ষ্ট্রেচারে করে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিতে। পাহাড়ের পাশেই দাঁড়িয়েছিল অ্যামবুলেন্স।

ভিড় ঠেলে এগুচ্ছি, আস্তে আস্তে পা ফেলে নেমে আসছি ঢালু পথ বেয়ে এমন সময় শ্লেষতীক্ষ্ণ সুরে কে যেন পেছন থেকে বলে উঠল—"গুড মর্ণিং, সিনর মার্টিনেলি।"

কণ্ঠস্বরের অধিকারী যদি জানত যে আমার দুজন সহকারী ঐদিনই আবার ফিরে আসবে শহরে—হোল্ড-আপ চার্জের বলে তাকে গ্রেপ্তার করতে—তাহলে এতখানি চ্যাংড়ামি করতে সে যেত না।

এ ধরনের খুনের তদন্তের একটা বিরাট অংশই হচ্ছে নিরানন্দ কর্মসূচীর একঘেয়েমি। পুলিশ হেড কোয়ার্টারে ফিরে আসার পরেই শুরু হলো এই চক্রবৎ কর্মসূচীর পুনরাবর্তন।

লাশটা আনার পর আঙুলের ছাপ নিয়ে সনাক্ত করা হয়েছিল। এলসা কোয়েলহার বয়স সাতচল্লিশ। রেসিফি শহরের উত্তরাঞ্চলে তার আদি নিবাস। বহু বছর ধরে ভিক্ষুক-বৃত্তি আর যাযাবর-বৃত্তির-অভিযোগের রেকর্ড পাওয়া গেল এলসার। তার সর্বশেষ জেলখাটার মেয়াদ ছিল দশ দিনের এবং সে মেয়াদ শেষ হয়েছে তার মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে।

কাশাকা বোতলের ল্যাবোরেটরী রিপোর্ট তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। আঙুলের ছাপ মৃত মেয়েটারই। নীল কাঁচের সরু হয়ে ওঠা ঘাড়ের কাছে একটা ধ্যাবড়া তালুর ছাপ পাওয়া গিয়েছিল। ব্যস আর কিছু না।

বেশ কিছুদিন একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম তালুর ছাপটার দিকে। হৃদয় রেখা আর আয়ু-রেখাদুটো নিবিড় হয়ে নেমে এসেছিল বোতলের তলার দিকে। একটু আবেগের সঞ্চার হয় আমার মনে। ভাবি, হাতের এই রেখা দেখে কোনও হস্ত-রেখাবিদ্ কি বলতে পারত আগে

থেকেই নির্ধারিত হয়ে ছিল এলসার ললাটলিপি? কিন্তু দিবাস্বপ্নর অথবা অনুধ্যান করার সময় এটা নয়।

ভাবলাম, "কি করা যায় এবার? আচ্ছা, এলসার তো পেশা ছিল ভিক্ষে করা। পৃথিবীর যে কোন বড় শহরে আছে এই বিপুল অথচ একান্ত ঘনিষ্ঠ সমাজটার উৎপাত। আমার সুযোগ খুবই ক্ষীণ ঃ সমপেশার কাউকে পাকড়াও করে আলাপ করা ছাড়া আপাতত আর কোন উপায় আমি দেখি না।

নগরবাসী ভিখিরীরা সাধারণত মামুলী শ্রেণীর বদমাস হয়। খুনটুন করা এদের ইতিহাসে বড় একটা দেখা যায় না। শুধু তাই নয় নিজের পেশার কেউ যে খুন হয় এটাও কেউ চায় না।

ল্যাটিন ভিখিরী জানে খুনীরা অনায়াসেই খুন করতে পারে তাকে কেননা, দু-একটা ভিখিরীকে নিয়ে মাথা ঘামানোর মত সময় সাধারণত সমাজের নেই। কাজেকাজেই এলসার সহকর্মীরা যখন দেখলে যে ওর হত্যাকারীকে খুঁজে বার করার সমস্যা নিয়ে বেজায় দুশ্চিন্তায় পড়েছি আমি এবং এমনভাবে সেই খুনীটার সন্ধান করছি যেন একটা নামকরা লোককে খুন করে বসেছে সে, তখন ওরা আমায় সাহায্য করতে শুরু করল। ওদের কথার মধ্যে থেকেই এল অভীপ্সিত সাহায্য। এলসা সম্বন্ধে যা কিছু জানত সব বলল ওরা। এক সময়ে একটা রাঞ্চের পরিচারিকা ছিল সে। তখন তার যৌবন ছিল, রূপ ছিল। তার পর তাকে ব্যভিচারের পথে নামিয়ে আনে রাঞ্চের মালিকের ছেলে এবং বাসনা পরিতৃপ্তির পর তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যায় ভাঙাচোরা লোহার টুকরোর একটা স্তূপের ওপর।

বন্ধুবান্ধব? প্রত্যেকেই ভালবাসত ওকে। বিশেষ কোন বন্ধু? আর্নেস্টো নামে একটা ভিখিরীর সঙ্গে কিছুদিন ছিল এলসা। কিন্তু পরে ওদের মধ্যে ঝগড়া হয়ে যায়।

ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। ভিখিরীদের মধ্যে ভালবাসা, থ্যাবড়া চালাঘরের ভেতরে মদের ঝোঁকে কোঁদল, মাথার ওপর আচম্বিতে চোট.....হুঁ, এইভাবেই হয়তো ঘটেছে ব্যাপারটা।

কিন্তু আর্নেস্টো কোথায়? ভিখিরীরা তা জানে না। গত দিনদুয়েক ওকে দেখা যায় নি। কিন্তু সে নাকি রিও-র "ব্রডওয়ে" সিনেলান্‌ডিয়া ডিস্ট্রিক্ট-এর থিয়েটারের ভিড়ে "কাজ" করতো।

একজন ভিখিরী আমার সঙ্গে ফিরে এল পুলিশ হেডকোয়ার্টারে। জুয়াচোর বদ্‌মাসদের গ্যালারীতে আর্নেস্টোর ফোটোগ্রাফ দেখেই চিনতে পারল সে। সঙ্গে সঙ্গে হুলিয়া বেরিয়ে গেল তাকে গ্রেপ্তার করে আনার। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার তাকে। আর, তারপরেই শুরু হলো আমাদের ডিপার্টমেন্টের সেই কাজটি, যে কাজ সব গোয়েন্দাদের জীবনের একটা বিরাট অংশ জুড়ে থাকে এবং তা হচ্ছে প্রতীক্ষা—নিছক প্রতীক্ষা।

তিনদিন পরে নিয়ে আসা হলো আর্নেস্টোকে।

ওর খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখের কোণাগুলো লাল, আর নোংরা চেহারার সঙ্গে পুলিশের ফটোগ্রাফের সাদৃশ্য বার করাই মহামুস্কিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। জেলখানার মধ্যে দাড়ি-গোঁফ কামানোর পর এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার পর তোলা হয়েছিল ফোটোগ্রাফটি।

সনাক্তকরণে একটু প্রাথমিক অসুবিধা দেখা গেলেও লোকটা আর্নেস্টোই বটে।

মানুষটি ছোটখাটো কৃশকায়। নার্ভাস চোখে মিট মিট করেও বার বার তাকাতে লাগল আমার পালিশকরা টেবিল আর অফিসের পুরোনো দেওয়ালের দিকে।

"মেয়েটাকে চেনো?" টেবিলের ওপর থেকে এলসার ছবি ঠেলে দিয়ে শুধোলাম আমি।

এক পলক ছবিটার দিকে তাকালে আর্নেস্টো।

তারপর জবাব দিলে মন্দে-ভাঙ্গা গলায়—"নিশ্চয়। আমরা—আমরা খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু।" হলদে-হলদে দাঁত বার করে নার্ভাসভাবে একটু হাসবার চেষ্টা করল ও।

"এলসা যে মারা গেছে, এ খবর তুমি পেয়েছো কি?" প্রশ্নটা তীরের মত ছুঁড়ে দিলাম ওকে লক্ষ্য করে।

বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে ওঠে আর্নেস্টোর চোখ।

"মরবার আগে তোমার সঙ্গে তার একচোট হাতাহাতি হয়েছিল—খুন হওয়ার একটু আগেই, তাই নয় কি?"

চুপ করে রইল আর্নেস্টো। অথবা মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কথা বলার শক্তিও হারিয়ে ফেলল সে।

'কি জন্যে এ কাজ করলে আর্নেস্টা?"

"আমি? দিব্যি কেটে বলছি, আমি ওকে খুন করিনি...." কাশির ধমকে মাঝপথেই আটকে গেল বাকী কথাটা এবং তখনই দেখা গেল সে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত।

সামলে না নেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম আমি। তারপর আবার শুরু করলাম—"ঠিক আছে, ঠিক আছে, এবার আমি শুনতে চাই সব কিছু, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। এলসাকে তুমি কতদিন থেকে চিনতে? ঝগড়াই বা করলে কেন? সমস্ত বল। বুঝেছো?"

সাগ্রহে মাথা নেড়ে সায় দিলে আর্নেস্টো। কাহিনীটা চটপট বলে ফেলার খুব ইচ্ছে দেখা গেল ওর মধ্যে। চার কি পাঁচ বছর হলো এলসার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে তার। গত দু'বছর ওরা একসঙ্গে বাস করে এসেছে। কিন্তু ইদানীং ওর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছিল আর্নেস্টোর মনে। হপ্তা তিনেক আগে পুলিশের জালে ধরা পড়ে আর্নেস্টো। তারপর জেলের মধ্যেই কাটাতে হয়েছে কয়েকটা দিন।

জেল থেকে বেরিয়েই এলসার খোঁজ করতে লাগল ও। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না ওকে। ও ভেবেছিল, নিশ্চয় অন্য কোন ভিখিরীর সঙ্গে সটকান দিয়েছে এলসা। তারপর কিন্তু এলসাকে আবার দেখতে পায় আর্নেস্টো। কিন্তু ওর অভিযোগ অস্বীকার করে এলসা। দারুণ ঝগড়া হয় দুজনের মধ্যে। তার বেশী কিছু নয়। এলসাকে খুন করেনি আর্নেস্টো।

শুধোলাম—"সোমবার রাতে কোথায় ছিলে তুমি? ঐ রাতেই খুন হয়েছে এলসা।"

ঠোঁট চেটে নিলে আর্নেস্টো। বলল—"বন্দর অঞ্চলে ছিলাম। সারারাত সেইখানেই ঘুমিয়েছি আমি।"

"কেউ দেখেছিল তোমাকে? প্রমাণ করতে পারো তোমার কথা?"

"না, পারব বলে মনে হয় না আমার।"

"সে রাতে তাহলে এলসার ধারে কাছে যাওনি তুমি?"

"দিব্যি গেলে বলছি যাইনি।"

"ঠিক তো?"

"বেঠিক কিছু বলিনি সিনর মার্টিনেলি। ঐ রাতে ওকে আমি দেখিই নি। একাজও আমি করিনি।"

আর্নেস্টোকে সেলের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দেওয়া ছাড়া করণীয় আর কিছুই ছিল না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল, এই সে-ই লোক যাকে আমি খুঁজছি। ভিখিরীরা সবসময়ে জটলা পাকিয়ে বাস করে। সে রাতে যদি বন্দর অঞ্চলেই থাকতো আর্নেস্টো, তাহলে সমশ্রেণীর কেউ না কেউ ওকে ঠিকই দেখতে পেত। এবং সেক্ষেত্রে নিজে থেকেই ওর অ্যালিবি আমাকে জানিয়ে দিল আর্নেস্টো।

আর্নেস্টোই হত্যাকারী। কিন্তু কে করে তা প্রমাণ করা যায়? সন্দেহের অভিযোগে কাউকে যে ফাঁসিতে ঝোলানো যায় না, এ তথ্য আর্নেস্টো জানে। আদালতে হাজির করলে এই মস্ত সুবিধেটাই পেয়ে যাবে সে।

এর পর কিছুদিন ধরে অনেকভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক প্রশ্ন করেছিলাম আর্নেস্টোকে। যতই ওকে চাপ দিতে থাকি, ততই মনে হতে লাগল ও যেন বুঝতে পারছে যে অকাট্য কোন প্রমাণ হাতে না নিয়ে স্রেফ সন্দেহের বশে জেরা করে চলেছি ওকে। এক এক দফা সওয়ালজবাব হয়ে যাবার পরে ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত অসভ্য হয়ে উঠতে লাগল আর্নেস্টো এবং দফায় দফায় আমিও ভেঙে পড়তে লাগলাম, রেণু রেণু হয়ে যেতে থাকে আমার মনোবল।

খুনের প্রায় দিন-দশেক পরে এক রাত্রে আর একবার শুরু করলাম আমার নিষ্ফল প্রচেষ্টা। শেষকালে যখন বুঝলাম আমার সমস্ত উদ্যমই নিরর্থক এবং কোন মতেই পরিস্থিতির এতটুকু উন্নতিসাধন সম্ভব নয়, তখন কোটটাকে খামচে তুলে নিয়ে সিধে রওনা হলাম বাড়ীমুখো। রীতিমত নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিলাম আমি। শরীর-মন ভরে উঠেছিল অপরিসীম অবসাদে।

আমার ছোট্ট ফ্ল্যাটের দরজায় চৌকাঠ পেরোনোর আগেই লক্ষ্য করলাম পালটে গেছে সমস্ত আবহাওয়া—রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছিল ভাল ভাল খাবার রাঁধার সুগন্ধ। দরজা খুলতেই ময়দা মাখা দু'হাত বাড়িয়ে সাদরে অভ্যর্থনা জানালে আমার স্ত্রী। হাতের তালুতে চারু অধরোষ্ঠের চুম্বন তুলে নিয়ে আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে খুশী-উচ্ছল স্বরে বলে উঠল—"দু'এক মিনিটের মধ্যেই সব তৈরী হয়ে যাবে।"

"আমার খুব খিদে পায়নি।" আর্নেস্টোর ইস্পাত-কঠিন আত্মপ্রত্যয়ের কথা ভাবতে ভাবতে জবাব দিলাম আমি।

হেসে উঠল আমার স্ত্রী, বলল—"টেবিলে খাবার এসে পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত চিরকালই ঐ কথাই বলেছো তুমি।"

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লাম। দেখলাম, এক বোতল মদ তুলে নিয়ে একটা কেকের মিশ্রণের ওপর খানিকটা মদ ও ঢালছে। ঢালা শেষ হলে বোতলটা নামিয়ে রাখল ও। দেখলাম ওর ময়দা-মাখা তালুর পরিষ্কার ছাপ উঠে এসেছে বোতলটার ঘাড়ের কাছে। .....হৃদয়রেখা আর আয়ুরেখা দুটি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে এসেছে ওপরে বোতলের মুখের দিকে।

আর একবার তাকালাম ছাপটার দিকে এবং তারপরেই বিদ্যুৎচমকের মত পরিষ্কার হয়ে গেল সবকিছু।

কোটটাকে ঝপ করে তুলে নিয়ে এমনভাবে বিকট চীৎকার করে উঠেছিলাম যা শুনলে

মনে হতো যেন একটা উন্মাদ তারস্বরে সম্বোধন করছে তার বউকে।

"এখুনি ফিরে আসছি," বলেই বোঁ করে উধাও হয়ে গেলাম রান্নাঘর থেকে।

পিছু পিছু এল না আমার স্ত্রী। এমন কি ডিনার ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার অনুযোগ নিয়ে উষ্মাও প্রকাশ করল না। বহুদিন ধরে ঘর করতে হয়েছে তাকে গোয়েন্দার সঙ্গে—তাই এ সব তার গা-সওয়া।

আমি তীরবেগে ফিরে চললাম অফিসে। কেসটার প্রমাণ রয়েছে সেইখানেই।

ঠোঁটের কোণে উপহাসের হাসি ঝুলিয়ে এল আর্নেস্টো। কিন্তু আমার চোখের দৃষ্টি দেখেই এ হাসি মিলোতে বিশেষ দেরী লাগল না।

শান্তস্বরে বললাম—"খুনের চার্জ আনছি আমি তোমার বিরুদ্ধে।"

বলে, টেবিলের ড্রয়ার থেকে বার করলাম কাশাকার বোতলটা—যে বোতলটা দিয়ে পরপারে পাঠানো হয়েছে এলসাকে।

বোতলটা দেখামাত্র আর্নেস্টো বুঝলে তার বরাত মন্দ। আমতা-আমতা করতে থাকে ও। "না, না, আমি ইচ্ছে করে করিনি ও কাজ। ভুল হয়ে গিয়েছিল।"

আর একটা শব্দও সহ্য করার মত মনের অবস্থা আমার ছিল না। এক ধমকে ওকে চুপ করিয়ে দিয়ে বললাম—"হ্যাঁ, ভুলই বটে, তোমারই ভুল। বোতলটাকে ওখানে ফেলে যাওয়াটাই হয়েছে মহাভুল। বোতলের ওপর তালুর ছাপটা দেখে প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম ও ছাপ এলসার।

"জিনিসটা আরও লক্ষ্য করা উচিত ছিল আমার। তালুর লম্বা লম্বা রেখাগুলো নীচের দিকে নামতে নামতে কাছাকাছি চলে এসেছে। তার মানে এই যে, বোতলটা যার হাতে ছিল, সে মদ ঢালবার জন্যে বোতল ধরেনি, ধরেছিল উল্টোভাবে হাতিয়ার হিসেবে, ঠিক এই ভাবে।"

মুগুর ভাঁজার মত বোতলটাকে এক পাক ঘোরাতেই সে রাতের স্মৃতি হু-হু করে ভাসিয়ে দিল আর্নেস্টোর মনের দুকূল। শুরু হলো দয়াভিক্ষার পালা। এলসার সঙ্গে মদ্যপান করার সময়ে নাকি কথা কাটাকাটি শুরু হয় ওর সঙ্গে আর্নেস্টোর। ঝগড়ার বিষয় সেই একই—এলসার ওপর সন্দেহ। তখনই, "বোতল দিয়ে ওর মাথায় দড়াম করে এক ঘা বসিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাই আমি"—স্বীকার করলে আর্নেস্টো।

আর্নেস্টোর তালুর ছাপের সঙ্গে বোতলের ছাপ মিলিয়ে দেখলাম। না দেখলেও চলতো। কিন্তু নিয়মের খাতিরে এটুকু করতে হলো। দেখলাম, অবিকল মিলে গেল দুটি ছাপ।

কেসের পরিসমাপ্তি শুনে কিন্তু অবাক হয়ে গিয়েছিল আর্নেস্টো। বিচারপতির মুখে যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা শুনেও কিন্তু যতখানি বিচলিত হওয়া উচিত ছিল, তার অর্ধেকও হয়নি আর্নেস্টো। কারণ কি জানেন? ওকে আমি বলেছিলাম, এলসা কোনদিনই বিশ্বাসঘাতকতা করেনি তার সাথে। আর্নেস্টো জেল খেটে বেরিয়ে আসার পর এলসাকে খুঁজতে গিয়ে তাকে পায়নি। কেননা, এলসাও তো তখন ভিক্ষুকবৃত্তির অপরাধে শ্রীঘরে চালান হয়েছে। আর্নেস্টো ভেবেছিল এলসা বুঝি কোন প্রেমিকের সঙ্গে ফুর্তি লুটতে গেছে—আসলে সে তখন ছিল পুলিশেরই হেফাজতে।

চার বছর পরে আজ আমার শুধু বয়সই বাড়েনি, রিও-ডি-জেনেরিও'র সি আই ডি'র

চীফ হিসেবে নতুন খেতাবও পেয়েছি। কিন্তু আজও আমি মনে করতে পারি সেই রাতটির কথা যখন বাড়ী ফিরে আসার পর দেখেছিলাম ডিনার সাজিয়ে বসে রয়েছে আমার স্ত্রী। খাবার যে এত সুস্বাদু হতে পারে, তা আগে জানতাম না। স্ত্রীর পাকা হাতের কেক-তৈরীর সূত্র-কাহিনী যখন বললাম, তখন তো হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল ও। হাসিমুখে গিন্নী সেদিন বলেছিল—"অফিসে যে সময়টা কাটাও, তার চাইতে বেশী সময় যদি আমার রান্নাঘরে খরচ করো, তাহলে হয়তো দেখা যাবে আরও অনেক কেস সমাধান করতে পারছ তুমি।" □

* আলফোনসো মার্তিনেল্লি (ব্রাজিল) রচিত কাহিনী অবলম্বনে।

বাদালোনা-র সেই লাশটি

ভুল যত সামান্যই হোক না কেন, তা যে সব সময়েই বুঝতে পারা যায় না—তা নয়। কিন্তু কঠিন হলো এই ছোট্ট ভুল শুধরোনো। বিশেষ করে আপনি যদি সত্যান্বেষী অপরাধবিশেষজ্ঞ হন, আর রহস্য সমাধানের গুরুভার যদি চাপানো হয় আপনার কাঁধে—তাহলে এই ছোট্ট ভুলই যে শেষকালে কি মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে, তা শুধু আপনিই হাড়ে হাড়ে টের পান। তদন্তের শুরুতেই যদি কোন রকমে ভুলপথে চালিয়ে দেওয়া যায় আপনাকে, তাহলেই তুমুল বিপর্যয়ের মাঝে পড়ে সম্পূর্ণ বিপন্ন হয়ে পড়তে আপনি বাধ্য।

প্রথম থেকেই আমার কেন জানি মনে হয়েছিল বাদালোনার খুনের কেসটাতে রহস্য রয়েছে প্রচুর। আপাতদৃষ্টিতে যত সরল মনে হয়েছিল, তত সরল নয় কেসটি। সমস্ত হত্যাপর্বটা এমনই গোলমেলে যে মেজাজ খিঁচড়ে গিয়েছিল আমার। খবরের কাগজে বর্ণিত লোমহর্ষক নাটক হিসাবেই প্রথম শুরু হয়, কাহিনী। স্বভাবমত সাংবাদিকরা দিব্বি চাঞ্চল্যকরভাবেই পরিবেশন করেছিল খবরটা। কিছু কিছু আবছা ইঙ্গিত আর সম্ভাবনাও উল্লেখ করতে ভোলে নি। ১৯৩২ সালের মার্চ মাসের শেষাশেষি শুরু হয় এই সংবাদ-পত্র নাটকের। বাদালোনার একটা ভিলায় মাটির নীচে একটি যুবতী মেয়ের লাশ পাওয়া গিয়েছে। বাদালোনা অবশ্য বার্সিলোনার কাছেই। সম্ভবত মাসখানেক আগে খুন করা হয়েছিল মেয়েটিকে। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তার বিকৃত দেহ। মুখ দেখে জানার উপায় ছিল না তার প্রকৃত পরিচয়।কিন্তু এইটুকু বোঝা গিয়েছিল যে বছর তিরিশ হবে তার বয়স।

বাড়ীটা একতলা। মালিকের নাম অ্যান্তোনিও ক্যারিরা জান্‌কোসা। মাস তিনেক আগে আর্জেন্টিনার এক ভদ্রলোককে বাড়ীটা ভাড়া দিয়েছিলেন তিনি। ভদ্রলোকের নাম অরিলিও মার্তিনেজ। নিজেকে আর্জেন্টিনার বাসিন্দা বলে দাবী করলেও আসলে তিনি ছিলেন স্পেনের অধিবাসী।

লাশ পাওয়ার একমাস আগে এই ভদ্রলোকই বাড়ীর চাবী মালিকের হাতে তুলে দিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে যান। দিনকয়েক পরে ঘরদোর তদারক করতে এলেন জান্‌কোসা। তখনই কিরকম একটা গন্ধ পেলেন উনি। শুধু তাই নয়। লক্ষ্য করলেন মেঝের কয়েকটা টালিও আলগা হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের শরণ নিলেন জান্‌কোসা। ম্যাজিস্ট্রেট হুকুম দিলেন মেঝের টালি সরিয়ে পরীক্ষা করা হোক। মাটি খুঁড়তেই পাওয়া গেল মেয়েটার দেহ। একটা

থলির মধ্যে হাত-পা বাঁধা লাশটা ঠেসে সযত্নে সেলাই করে দেওয়া হয়েছিল মুখটা।

ড্রেসিং গাউন ছাড়া আর কিছুই ছিল না মেয়েটির পরনে। খবরের কাগজের সবজান্তারা লিখেছিল, গলা টিপে অথবা মাথায় চোট মেরে জীবনদীপ নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল হতভাগিনীর। লাশ পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন প্রায় তিরিশ বছর তার বয়স।

এখনও মনে পড়ে কেসটা হাতে নেওয়ার পর বাদালোনায় গিয়ে কি পরিমাণে দমে গিয়েছিলাম আমি। অল্প কয়েকটি শহরতলী ভিলা দিয়ে গড়ে-ওঠা অঞ্চলটিতে জীবনের চঞ্চল স্রোতস্বিনী যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এরকম নিঝুম নিশ্চুপ জায়গা মোটেই ভাল লাগে না আমার। বিশেষ করে কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না খুন যেখানে হয়েছে, সেই ভিলাটিকে। পূতিগন্ধে ভরপুর বাতাসে যেন দম আটকে আসতে চায়। ঘরের মেঝেতে বিশাল একটা গর্ত দেখলাম। লাশটা থলিতে পাওয়া গিয়েছিল এই ঘর থেকেই।

তন্নতন্ন করে বাড়ী তল্লাস করে একগাদা পরিধেয়, একটা চশমা এবং একটা হাতব্যাগ জড়ো করলাম আমি, কতকগুলো পোশাকে রক্তের দাগ লেগেছিল। বলা-বাহুল্য জিনিসগুলো নিহত মেয়েটিরই। সারা তল্লাটে দারুণ গুজব ছড়িয়ে গিয়েছিল খুন যেই করুক না কেন, এই তার প্রথম খুন নয়। পাড়াপড়শীদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে একটু বুদ্ধি খরচ করলেই পুলিশের কর্তারা এই 'মৃত্যু-ভবন' থেকে আরও অনেক লাশ আবিষ্কার করতে পারবে। গুজবগুলো যে নেহাৎই গুজব এবং ভিত্তিহীন, তা না বললেও চলবে। সেই কারণেই প্রথমেই বলে নিয়েছি আমি কেসটার প্রকৃত রহস্য ধরতে না পারার ফলেই এতখানি জটিল হয়ে উঠেছিল এই তদন্ত পর্ব।

জটিলতা আরও বৃদ্ধি পেল শবব্যবচ্ছেদ করার পর। তাড়াহুড়ো করে কোনোরকমে ওপরে-ওপরে কর্তব্য শেষ করলেন ডাক্তার। মেয়েটির বয়স পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে, তথ্য পেলাম তাঁর কাছ থেকেই। ফলে, ঐ বয়সের অনেকগুলি মেয়ের নাম পাওয়া গেল। খামোকা খানিকটা সময় নষ্ট করলাম তাদের প্রত্যেকের হদিশ বার করতে। শেষকালে দেখা গেল প্রত্যেকেই জলজ্যান্ত জীবিত।

হত্যা-রহস্য সমাধানে একটা মস্ত বড় বিষয় হচ্ছে মোটিভ অর্থাৎ হত্যার উদ্দেশ্য। প্রত্যেক গোয়েন্দাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মোটিভ নির্ণয় করার জন্যে আদাজল খেয়ে উঠে-পড়ে লাগে। কিন্তু এদিক দিয়েও আমি অসহায়। কেননা, খুনের আগে অরিলিও মার্তিনেজের জীবন সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ জানতাম না আমি। মাস দুয়েকের জন্যে ভিলায় আস্তানা পেতেছিলেন ভদ্রলোক। তারপর আরও মাসদুয়েক কেটে গেছে, নতুন কোনো ভাড়াটে বসান নি তিনি বাড়ীতে। পাড়াপড়শীদের কাছে শুনলাম সন্ধ্যের অন্ধকার না নামলে ভদ্রলোককে বাইরে বেরোতে দেখা যেত না। দেখতে শুনতে যুবাপুরুষের মতই। মৃদুস্বরে বড় সুন্দর কথাবার্তা বলে চিত্তজয়ের গুণ ছিল তাঁর। কৃশকায়। উচ্চতাও তেমন কিছু নয়। কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদের দিক দিয়ে ফুলবাবুটির মত সেজেগুজে থাকতেন। চেহারার ওপর যে বিলক্ষণ যত্ন ছিল মার্তিনেজের, তা তাঁকে দেখলেই বোঝা যেত।

বাড়ীর লীজে সই দেওয়ার সময় আত্ম-পরিচয় দেওয়া আইডেনটিফিকেশন কার্ডটি সংলগ্ন করে রেখেছিলেন মার্তিনেজ। এই কার্ড পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলাম অনেক যত্ন নিয়ে সই করেছেন ভদ্রলোক। তাইতেই আমার আর তিলমাত্র সন্দেহ রইল না যে এ নাম তার

পিতৃদত্ত নয়—ছদ্মনাম। আমি জানি অনেকে মনে করেন Graphology অর্থাৎ হাতের লেখা পরীক্ষা করে চরিত্র নিরূপণের শাস্ত্রে নাকি কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তাঁদের সঙ্গে এ সম্পর্কে একমত নই আমি। ঠিকানা ছাড়া কার্ডে যা কিছু তথ্য পাওয়া গেল, তা ডাহা মিথ্যা। ঠিকানা দেওয়া ছিল ১০ নং ক্যাল্লি দ্য টলার্স, বার্সিলোনা। গেলাম সেখানে। বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল যে স্ত্রীলোকটির ওপর, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম অরিলিও মার্তিনেজ বলে কেউ এ বাড়ীতে থাকতেন কিনা? বাড়ীর মালিকের কাছে আমাকে নিয়ে গেল সে এবং তার কাছেই জানলাম অরিলিও মার্তিনেজের নাম এ বাড়ীর কেউ এর আগে শোনে নি। কিন্তু সহজেই হাল ছাড়বার পাত্র নই আমি। নামটা যে আসল নয়, তা তো আমি জানতামই। কাজেই, মার্তিনেজের চেহারার বর্ণনা দিলাম এবার। কাজ হোল তাতে। বাড়ীওলা বললেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনি বই কি। বেঞ্জামিন বালসোনাকেই তো এই রকম দেখতে। আমার এই বাড়ীতেই কিছুদিন ছিলেন ভদ্রলোক। বড় অল্প কথাবার্তা বলতেন। তাছাড়া বাঁধাধরা জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন না তিনি—বড় বিশৃঙ্খল ছিল তাঁর প্রকৃতি। মাঝে মাঝে দারুণ টানাটানি চলতো। তবে একবার শুনেছিলাম, বার্সিলোনাতে নাকি তাঁর একটা ভিলা আছে।"

নথিপত্র ঘেঁটে দেখা গেল পয়লা নম্বরের জোচ্চোর এই বালসানো। অনেকগুলো শহরের পুলিশ মহলে বিলক্ষণ নামডাক আছে তার। দুরন্ত জুয়ারী সে, হাতের মার প্যাঁচেও মহা ওস্তাদ। এ ধরনের লোকদের জীবনে অভাব-অনটন আর স্বাচ্ছন্দ্যের যেমন দ্রুত পরম্পরা দেখা যায়, বালসানোও তার ব্যতিক্রম ছিল না। বালসানো আর অরিলিও মার্তিনেজ যে এক এবং অভিন্ন পুরুষ, তা প্রমাণ করতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। ক্যাল্লি দ্য টলার্সের বাড়ীওলা আর বাদালোনার প্রতিবেশীদের পুলিশ ফোটোগ্রাফ দেখাতে তারাও একবাক্যে সমর্থন জানালো আমার সিদ্ধান্তকে।

তদন্ত-পর্বের এই পর্যায়ে পৌঁছে অনায়াসেই বালসানোর নামে গ্রেপ্তার পরোয়ানা বার করে দিতে পারতাম। কিন্তু নিহত মেয়েটিকে তখনও শনাক্ত করে উঠতে পারি নি আমি। কাজেই চট করে কিছু করা সঙ্গত মনে করলাম না। এই সময়ে খবর পেলাম, ইউলেলিয়া মাইনো নামে একজন বিবাহিত মেয়ের সঙ্গে বার্সিলোনাতে প্রায় দেখতে পাওয়া যেত বালসানোকে। গোলগাল নধরকান্তি চেহারা মেয়েটার। চুলের রঙ কুচকুচে কালো। ক্যাল্লি দ্য লা ক্যাডেনাতে একসাথে একটি ঘরে কিছুদিন ছিল ওরা দুজনে। তারপর উধাও হয়ে যায় বালসানো এবং মেয়েটি। এবং কেউ জানে না বর্তমানে পৃথিবীর কোন মুলুকে আস্তানা নিয়েছে দুই মূর্তিমান।

আরও খবর পেলাম, ইউলেলিয়া তার সৎমায়ের সঙ্গে গ্র্যানোলর্স-এ থাকতো। সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলাম সেখানে। বিমাতা বাড়ীতেই ছিলেন। আমাকে দেখেই না জানি কি হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়েছে মনে করে রীতিমত শঙ্কিত আর উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। এই বাড়ীতেই একটা চিঠির কয়েকটা ছিন্ন অংশ পেলাম। জোড়া লাগাতেই পেলাম পুরো চিঠিটা। ইউলেলিয়ার চিঠি। একজন বন্ধুর সঙ্গে বার্সিলোনা ত্যাগ করে যাচ্ছে সে। বিমাতার কাছে তার অনুরোধ তিনি যেন পড়া শেষ হয়ে গেলেই চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলেন। চিঠির তারিখ ছিল ২৩শে মার্চ, ১৯৩২। বাদালোনায় মৃতদেহ আবিষ্কারের ঠিক দুদিন আগেকার তারিখ।

এ কেসের একটা অত্যন্ত দরকারী সূত্র হচ্ছে বালসানো-ইউলেলিয়া ঘটিত প্রণয়

উপাখ্যানটি। কিন্তু তার চাইতেও দরকারী যা, তা হলো খুনে পাষণ্ডটার নাম ধাম জানা। শবব্যবচ্ছেদ হওয়ার পর যে রিপোর্ট পেয়েছিলাম তা আমার কাছে অন্তত সন্তোষজনক মনে হয় নি। কিন্তু একগুঁয়ে ডাক্তার কিছুতেই তাঁর রিপোর্ট শুধরোতে রাজী হলেন না। মেয়েটির বয়স নাকি কোনমতেই তিরিশের বেশী নয়—ছিনেজোঁকের মত এই তথ্যকেই আঁকড়ে রইলেন ভদ্রলোক। ভেবে দেখলাম ক্যাল্লিন দ্য টলার্সের বোর্ডিং হাউসে গেলে অনেক জটিল প্রশ্নের উত্তর আমি পেলেও পেতে পারি। তাই আবার গেলাম বাড়ীওলার সঙ্গে এ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে।

এমি ল্যাঙ্গার নামে একজন জার্মান স্ত্রীলোকের সঙ্গে কিছুদিনের জন্যে এ বাড়ীতে সংসার পেতেছিল বালসানো। প্রায় ষাট বছর বয়স এমি ল্যাঙ্গারের। বিধবা। স্বামী ছিলেন সিভিল ইঞ্জিনীয়র। অবস্থা ভালই ছিল তাঁর। আসক্তি মদ আর অন্যান্য মাদক দ্রব্যে। বিস্তর অর্থ ছাড়াও অনেক হীরে জহরৎ ছিল নাকি তার গহনার পেঁটরায়। চলে যাওয়ার সময়ে সব কিছুই নিয়ে গিয়েছিলো সে ফেলে গিয়েছিল শুধু একটা কাকাতুয়া। দিব্বি জার্মান বলতে পারে পাখীটা। দেখলাম, মনিবানীর আকস্মিক অন্তর্ধানে মুষড়ে পড়েছে বেচারী। খুঁজে পেতে এমন একজনকে বার করলাম যে জার্মান কথা কইতে পারে। তাকে নিয়ে এলাম কাকাতুয়ার সামনে। ওদের কথাবার্তা থেকে নতুন কোনো তথ্য জানতে পারব, এই আশা ছিল আমার। কিন্তু এবারও আশাহত হতে হলো আমাকে।

কিন্তু এমি লাঙ্গারই যে বালসানোর হাতে খুন হয়েছে এবং বাদালোনার সেই লাশটি যে তারই সে বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল আমার। বাদালোনার ভিলাতে পাওয়া কিছু আসবাবপত্র আর বই যে এমি ল্যাঙ্গারেরই, তাও প্রমাণ করতে মোটেই বেগ পেতে হয় নি আমাকে। খুঁজতে খুঁজতে বার্সিলোনায় একটি দোকানের সন্ধান পেলাম। পুরনো জিনিস খরিদ করতো দোকানদার। এমি ল্যাঙ্গারের কিছু পোশাক উদ্ধার করলাম দোকান থেকে। বালসানোই বিক্রী করে ছিল। কিন্তু আসল কাজটাই যে তখনো বাকী। যেমন করেই হোক আমাকে প্রমাণ করতেই হবে যে লাশটা এমি ল্যাঙ্গারেরই এবং কোনো তরুণী মেয়ের নয়। এ ব্যাপারে আমার ওপর কিঞ্চিৎ কৃপাবর্ষণ করলেন ভাগ্যদেবী। হঠাৎ খবর পেলাম, এমির পায়ে একবার একটা দগদগে ঘা হয়েছিল। অস্ত্রোপচার করে তবে সুস্থ হয়েছিল সে। ভেবে দেখলাম এ খবর যদি নির্ভেজাল হয়, তাহলে লাশটা আর একবার পরীক্ষা করলেই মুস্কিল আসান হয়ে যাবে। তৎক্ষণাৎ সে ব্যবস্থা হলো। অপারেশনের চিহ্নও পাওয়া গেল পায়ে। ডাক্তারও শেষ পর্যন্ত সুর পাল্টে স্বীকার করলেন, মেয়েটার বয়স তিরিশ নয়, ষাট এবং সে এমি ল্যাঙ্গারই বটে।

এবার বালসানো আর তার নতুন প্রণয়িনীকে জালে ফেলতে হবে। কাগজে কাগজে ছেপে দিলাম ওদের ছবি আর দৈহিক বর্ণনা। পরিশেষে মাদ্রিদের লাভেপিসু কোয়ার্টারে একটা বোর্ডিং হাউসে গ্রেপ্তার করা হলো দুজনকে যে ঘরে এমি ল্যাঙ্গারকে পুঁতে রেখে ছিল, তার নক্‌শা আর খবরের কাগজে প্রকাশিত খুনের বিবরণটা নিজের কাছেই রেখে ছিল বালসানো।

গ্রেপ্তার হওয়ার পর এতটুকু চঞ্চলতা দেখা গেল না বালসানোর ধীর স্থির মুখে। ওর বিরুদ্ধে কেসটা যে ভাবে দাঁড় করিয়েছিলাম তাতে ফাঁক ছিল না কোথাও। কিন্তু অম্লানবদনে ও সব অভিযোগ অস্বীকার করে বসলো। এমি ল্যাঙ্গারকে নাকি সে কস্মিনকালেও দেখেনি

এবং এ জঘন্য হত্যা তার নয়, তারই জানাশুনা আর একজন অপরাধীর। এমি ল্যাঙ্গার নিহত হওয়ার সময়ে শ্রীঘরে ছিল তার এই খুনে বন্ধুটি—এ খবর শুনেও তিলমাত্র বিচলিত হলো না ও। ওর মনোবল ভেঙ্গে দেওয়ার জন্যে বেশ কয়েকবার অকুস্থলে নিয়ে গেলাম ওকে। প্রতিবারই বিন্দু বিন্দু ঘামে ওর বিবর্ণ মুখ ভরে উঠলেও কিছুতেই স্বীকার করানো গেল না যে সেই হত্যাকারী।

ভিলার মধ্যে কিন্তু এমি ল্যাঙ্গারকে খুন করা হয়নি। ক্যাল্লি দ্য টলার্সের বোর্ডিং হাউস ছেড়ে বার্সিলোনার ক্যাল্লি দ্য রোজেনল-এ একটা বাড়ীতে আস্তানা নিয়েছিল ওরা। খুনের দিন-তিনেক বাদে বালসানোকে একটা বিশাল সুটকেশ বয়ে নিয়ে যেতে দেখেছিল একজন মেয়ে কুলি। বিশ্রী দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিল ভেতর থেকে। জার্মান স্ত্রীলোকটি অসুস্থ হয়ে পড়ার ফলে সে নাকি একাই ফিরে যাচ্ছে এই সাফাই গেয়েছিল বালসানো।

নাক সিঁটকে শুধিয়েছিল মেয়ে-কুলিটা—'কিন্তু ঐ সুটকেশটা থেকে ও রকম যাচ্ছেতাই গন্ধ বেরুচ্ছে কেন বলুন তো? কি আছে ওতে?'

'সসেজ—একদম খারাপ হয়ে গেছে কিনা তাই,' চটপট জবাব দিয়েছিল বালসানো।

এই সুটকেশটাই ভিলাতে নিয়ে গিয়েছিল সে। ভেতরে ছিল হতভাগিনী এমি ল্যাঙ্গারের লাশ। সুটকেশটা পরীক্ষা করার পর রক্তের দাগ পাওয়া গেল ভেতরে। পেরেকে লেগে থাকা মেয়েদের পোশাকের সুতোও পেলাম। খুনের সুত্রপাত হয় একটা ঝগড়া থেকে। বালসানোর ধারণা ছিল কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আছে এমি ল্যাঙ্গারের। কিন্তু যখন সে দেখলে সব ভুয়ো—অত টাকাই নেই তার, তখন সংহার মূর্তি ধারণ করলো সে। মদে চুর চুর হয়েছিল এমি। কথা কাটাকাটি হতে হতে ফস করে সে খামচে ধরে বালসানোর মুখ। তৎক্ষণাৎ ছুরি বাগিয়ে ধরে বালসানো এবং পরমুহূর্তে একটি মাত্র মোক্ষম টানে দু-টুকরো করে দেয় এমির কণ্ঠনালী। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে রুধির স্রোত। আঘাতটা যে মারাত্মক, তখন বুঝতে পারে নি বালসানো। তাই গোটা দুই মোজা এমির গলায় পেঁচিয়ে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করতে থাকে ও। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই নিষ্প্রাণ হয়ে যায় এমির দেহ। নির্বিকারভাবে এবার লাশ সরানোর আয়োজনে তৎপর হয়ে ওঠে বালসানো। স্বল্প পরিসরে দেহটাকে যাতে ঠেসে নিয়ে যাওয়া যায়, তাই আরও ক্ষতবিক্ষত করে নেয় লাশটা। এই কারণেই বিকৃত দেহটাকে পুলিশের হাতে পড়ার পর চুল চেরা পরীক্ষা না করার ফলে ঠিক কিভাবে খুন হয়েছিল এমি, তা জানা যায়নি অনেকদিন পর্যন্ত।

এমিকে কবর দেওয়ার জন্যে ভিলার বাগানটাই প্রথমে মনোনীত করেছিল বালসানো। কিন্তু যে রাতে কাজ সারবে বলে স্থির করলে সে, সেই রাতেই একজন চৌকিদার তাকে দেখতে পায়। কাজেই পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ফেলে বালসানো। ঘরের মেঝেতেই সমাহিত করা হলো এমি ল্যাঙ্গারকে। বার্সিলোনার ক্রিমিন্যাল কোর্টে খুনের অপরাধে বিচার শুরু করা হলো তার আর ইউলেলিয়া মেইনের। কিন্তু তখনও অবিচল বালসানো। দৃঢ়কণ্ঠে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করার পর বার বার এই বলে সে হুঁশিয়ার করে দিলে আদালতকে যে নির্দোষীকে অবিচারের যাঁতায় ফেললে প্রত্যেকেরই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। মুক্তি দেওয়া হলো ইউলেলিয়াকে। কিন্তু খুন আর ডাকাতি করার জন্যে বাইশ বছর এবং দলিল দস্তাবেজ জাল করার জন্যে আরও দুবছর সশ্রম কারাবাসের শাস্তি দেওয়া হলো খুনে বদমাস বেঞ্জামিন

বালসানোকে।

১৯৩৬ সালে শুরু হয় স্পেনের গৃহযুদ্ধ। বালসানো তখনও জেলে। যুদ্ধের দুর্যোগ বার্সিলোনার ওপর ঘনিয়ে আসতেই অন্যান্য কয়েদীদের সাথে তাকেও মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫৫ সালের আবার নতুন অপরাধের জন্যে তাকে পাঠানো হয় কারাকপাটের অন্তরালে। □

* ডন ভিসেন্‌তি রেগুয়েনগো (মাদ্রিদ, স্পেন) রচিত কাহিনী অবলম্বনে।

মধ্যরাতের মস্কো

ব্যক্তিগত শোকাবহ ঘটনার গল্প দিয়ে দৈনিকের পাতা ভরাতে অভ্যস্ত নই আমরা রাশিয়ানরা। অনেকরকম দুঃখময় দুর্ঘটনা ঘটতে দেখা যায় অনেকের অদৃষ্টে। বহু হতভাগ্য নর-নারী নিছক উচ্চাশা অথবা তীব্র অনুভূতির তাড়নায় হরেকরকম অপরাধও করে ফেলে। ফলাও করে এই সব কাহিনীর প্রচার আমরা করি না। এর চাইতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়েই মাথা ঘামাতে হয় আমাদের। শুধু আমাদের জাতভাইদের দিক দিয়েই নয়, পৃথিবীর সব দেশের বাসিন্দাদের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ এই সব সমস্যা। অনেক সমালোচকদের মতে ব্যষ্টির প্রতি অবহেলা থেকেই নাকি আমাদের এই ধরনের মতবাদ বা দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্ভব হয়েছে। প্রকৃত সত্যটুকু কিন্তু ঠিক তার বিপরীত। আমরা বিশ্বাস করি, সামান্য কয়েকটা চোর ছ্যাঁচোড়, খুনে-গুণ্ডা, জালিয়াৎ-বদমাস আর নারীধর্ষণকারীদের তৎপরতা আর তাদের সমুচিত দণ্ডদানের সমস্যাগুলোকে হারিয়ে যেতে দেওয়া উচিত নয়।

সে যাই হোক, সারা দুনিয়ার পুলিশ সহকর্মীর সঙ্গে আমার কর্মজীবনের সবচেয়ে মনে রাখবার মত কাহিনী বলবার সুযোগ যখন আমাকেও দেওয়া হয়েছে, তখন সে সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার আমি করবো। শুনুন তবে এই ঘটনার বৃত্তান্ত।

১৯৫৫ সালের আগষ্টের শেষাশেষি গ্রীষ্মের সেই রাতটার কথা এখনও ছবির মতই মনে পড়ে আমার। রাতের তমিস্রা গাঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিনের দাবদাহও কমে এসেছিল অনেকখানি। আমার অধীনস্থ মস্কো মেট্রোর একজন ইন্সপেক্টরের ডিউটি শেষ হওয়ায় বাড়ীর দিকে রওনা হয়েছিল। আর্কাডি গুরেলভিচ মানুষটি বড় ভালো। কাজ-কর্মে তার জুড়ি মেলা ভার, কমরেড হিসেবেও চমৎকার। প্রতিবেশী হিসেবে এই রকম মানুষকেই সবাই পেতে চায় যে যার পল্লীতে। একই ফ্ল্যাট—বাড়ীতে থাকতাম আমরা। পাঁচতলার আর্কাডি আর দোতলায় আমি সপরিবারে। একই আমোদ-প্রমোদ কেন্দ্রে খেলাধুলো করত আমাদের ছেলেমেয়েরা, একই স্কুলে পড়তে যেত সবাই দল বেঁধে। সভা-সমিতিতে, সিনেমা-থিয়েটারে, পাবলিক স্কুলের সামাজিক অনুষ্ঠানে একই সঙ্গে যেতাম আমরা দুই পরিবার।

বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স আর্কাডির। দুনিয়ায় দুটি জিনিস তার দারুণ প্রিয়; একটি কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং অপরটি ফুটবল খেলা। আগষ্টের সেই রাতে সাবওয়ে ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে যখন সে বাড়ীর পথ ধরলো, তখন ঘড়ির কাঁটা মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। রাস্তার আলোগুলো অর্ধেক নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। আলো অন্ধকার মিশানো জনহীন পথঘাটে প্রাণী বলতে সে

তখন একা।

আচম্বিতে রাস্তার মোড় থেকে বাঁক নিয়ে টায়ারের তীব্র আর্তনাদ তুলে পথ ছেড়ে ফুটপাতের ওপর বেগে ধেয়ে গেল ছোট্ট একটা মোটরকার। সামনেই পড়ল আর্কাডি। এমনই প্রচণ্ড বেগে তার ওপর এসে পড়ল গাড়ীটা যে আর্কাডির দেহটা ছিটকে গিয়ে আছড়ে পড়ল সামনের উইণ্ডস্ক্রীনের ওপর—বলা বাহুল্য সেই প্রচণ্ড সংঘাতে স্ক্রীনের কাঁচও অটুট রইল না।

ধরা পড়ার ভয়ে গাড়ীর গতি কমানো দূরে থাকুক, ক্ষিপ্তের মত গাড়ী হাঁকিয়ে ছুটে চলল ড্রাইভার। সাংঘাতিকভাবে জখম আর্কাডির অচেতন দেহটা কিছু দূর পর্যন্ত গাড়ীর সামনেই লেপটে ছিল, তারপর তা ঠিকরে পড়ল রাস্তার ওপর আমাদেরই ফ্ল্যাটবাড়ির প্রায় সামনেই। উল্কার মত বেগে উত্তরদিকের শহরতলী অঞ্চলে দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল বেপরোয়া গাড়ীটা।

টায়ারের কর্কশ আর্তনাদের পরেই ধপ করে একটা চাপা শব্দ এবং পরক্ষণেই কাঁচভাঙ্গার ক্ষীণ ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ শুনেই আশপাশের বাড়ী থেকে জনাছয়েক স্ত্রী-পুরুষ বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। রাস্তার ওপর আহত আর্কাডিকে তারাই পড়ে থাকতে দেখে। একজন তখুনি আমার ফ্ল্যাটে দৌড়ে গিয়ে উত্তেজিতভাবে খবর দিলে যে সিরিয়াস অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে কমরেড গুরেলভিচের। তৎক্ষণাৎ ফোনে অ্যাম্বুলেন্স পাঠানোর নির্দেশ দিলাম। স্থানীয় পুলিশ ষ্টেশনেও খবর দিতে ভুললাম না।

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি রাস্তার ওপরেই পড়ে রয়েছে আর্কাডি। একজন একটা ভারী কম্বল দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল তার সর্বাঙ্গ। এমনই নিথর হয়ে শুয়েছিল ও যে প্রথমে ভাবলাম বুঝি বৃথা চেষ্টা, ও দেহে আর প্রাণ নেই। কিন্তু ঝুঁকে পড়তেই লক্ষ্য করলাম খুব ক্ষীণভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে—তবে চেতনার কোনো লক্ষণ দেখলাম না রক্তাক্ত দেহে। মস্ত বড় একটা ক্ষতচিহ্ন দেখলাম মাথার খুলিতে। গা শিউরে ওঠে সেই বীভৎস চোট দেখলে।

মিনিট কয়েকের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স এবং অনেকগুলো পুলিশের গাড়ী উত্তেজিত এবং উদ্বিগ্ন প্রতিবেশীদের ভিড় ঠেলে পৌঁছে গেল দুর্ঘটনাস্থলে। স্বামীর নেতিয়ে পড়া দেহ ষ্ট্রেচারে উঠিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে তোলার সময় হাউ-মাউ করে কাঁদতে লাগল আর্কাডির বউ।

অশ্রুসিক্ত সে কি কান্না। একজন মহিলা সযত্নে একটা শাল জড়িয়ে দিলে তার গায়ে। যথাসাধ্য সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল সবাই মিলে।

সাক্ষীদের সওয়াল জবাব শুরু করলেন পুলিশ অফিসাররা। কিন্তু আচম্বিতে ধেয়ে আসা গাড়ীর গর্জন, টায়ারের তীব্র আর্তনাদ তুলে উধাও হয়ে যাওয়া এবং শীতার্ত রাস্তার ওপর মৃতপ্রায় অবস্থায় আর্কাডিকে পড়ে থাকতে দেখা ছাড়া নতুন কোনো খবরই কেউ শোনাতে পারলে না।

এ কেস সম্পর্কে ব্যক্তিগত এবং পেশাগত দুরকম আগ্রহই সমানভাবে জেগেছিল আমার মনে। তাই ঠিক করলাম পুলিশের গাড়ী নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের পিছু পিছু গোর্কি হসপিটালে যাবো। উত্তরমুখো পথে রওনা হলাম আমরা।

দুর্ঘটনাস্থল থেকে প্রায় গোটা তিরিশ বাড়ী পেরিয়ে আসার পর একটা মেরামত এবং সারভিস ষ্টেশনের সামনে এসে পৌঁছোলাম। নতুন তৈরী হয়েছে ষ্টেশনটা। দেখেই আমার

মাথায় একটা মতলব এল।

'কমরেড, থামাও এখুনি।' আচমকা হুকুম শুনেই ক্যাঁচ করে ব্রেক টিপে ধরলে পুলিশ ড্রাইভার।

হাতে ফ্লাশলাইট নিয়ে অন্ধকার গলি পেরিয়ে গ্যারাজের পেছনে গাড়ী পার্ক করার জায়গায় পৌঁছোলাম আমরা। আলোর সরু রশ্মি গিয়ে পড়লো একটা বেজায় জখম গাড়ীর ওপর। টুকরো টুকরো হয়ে গেছিল গাড়ীটার উইণ্ডস্ক্রীন। আর টোল খেয়ে গেছিল সামনের হুড।

এখনও সে আবিষ্কারের কথা মনে পড়লেই ভাবি বাস্তবিকই সেদিন অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল আমার। তা না হলে নিছক সাধারণ জ্ঞানকে সম্বল করে আততায়ীবিহীন গাড়ীটাকে এত তাড়াতাড়ি এভাবে আবিষ্কার করতে পারতাম না আমি।

আরো কয়েক পা এগিয়ে যেতেই নিঃসন্দেহ হলাম আমরা। হ্যাঁ, এইটাই সেই ধাক্কা মেরে উধাও হওয়া গাড়ীই বটে। র‍্যাডিয়েটর তখনও গরম রয়েছে। হুডটার ঠিক মাঝখানের পাঁজরে লেগে রয়েছে আর্কাডির ফ্লানেল কোটের একটা ছিন্ন অংশ।

গাড়ীর ওপর দিয়ে আলো বুলিয়ে নিতে গিয়ে এমনই একটা জিনিস নজরে পড়ল আমার যে তা দেখা মাত্র বিভীষিকা যেন সাঁড়াশি দিয়ে টিপে ধরলো আমার হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকুনিকে। তারার মত আকার নিয়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল কাঁচটা। আর, তার ঠিক মাঝখানে ভাঙা কাঁচের খাঁজে আটকে ছিল একটুকরো হাড়—মাথায় খুলির দশ সেন্টিমিটার লম্বা হাড়।

খুব সাবধানে হাড়টাকে খাঁজ থেকে উদ্ধার করে রুমালে মুড়তে যখন ব্যস্ত আমার কমরেড ততক্ষণে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলাম আমাদের আবিষ্কারের বৃত্তান্ত। গাড়ীটা পরীক্ষা করার জন্যে পুলিশের গাড়ী পাঠানোর ব্যবস্থাও করলে সে। এরপর আমি ফোন করলাম হসপিটালে। বললাম, এখুন অপারেশন রুমে আসছি আমরা।

সাইরেনের আর্তনাদে রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ফালা-ফালা করে বাকী পথটা যেন উড়ে এসে গোর্কি হসপিটালে পৌঁছলাম আমরা। আমার জরুরী ডাকে বিলক্ষণ বিরক্ত হয়েছিলেন ডাক্তাররা। মরণোন্মুখ মানুষটার অপারেশন কেন যে স্থগিত রাখতে বলেছি তা তো তাঁরা জানতেন না।

হসপিটাল পৌঁছেই বললাম, আর্কাডি আমার বিশেষ বন্ধু। তাই ভাবলাম ওর জীবনরক্ষার প্রচেষ্টায় অপারেশন শুরু করার আগে এই জিনিসটা আপনাদের দেখালে হয়তো সত্যিই ওর কোনো উপকার করতে পারবো আমি।

এমনভাবে ডাক্তাররা তাকালেন যেন মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে আমার আর তারপরেই একজন হাড়টা রুমালের মোড়ক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—হবে, হবে, এইতেই হবে।

হাড়টা তখুনি খুব সন্তর্পণে পরিষ্কার করে ফেললেন ওঁরা। পরে অপারেশন থিয়েটারে গিয়ে আর্কাডি গুরেলভিচের করোটির সঠিক জায়গাটিতে তা বসিয়ে বেমালুম জুড়ে দিলেন। তিন ঘণ্টা পরে অস্ত্রোপচার শেষ হলো। তারপর একজন ডাক্তার বেরিয়ে এলেন। আমি যেখানে ঠায় দাঁড়িয়েছিলাম এতক্ষণ, এসে দাঁড়ালেন সেখানে।

বললেন, 'কমিশনার, বিপদমুক্ত হয়েছেন আপনার বন্ধু। কিন্তু ঐ হাড়টা না পাওয়া গেলে

এ সুখবর হয়তো আপনাকে শোনাতে পারতাম না।'

মিনিট দশেক পরেই আর একটা পুলিশের গাড়ি এসে পৌঁছালো হসপিটালের প্রাঙ্গণে। গোয়েন্দার কাছে রিপোর্ট পেলাম, গাড়ীটার নাম্বার প্লেট থেকে ধাক্কা মেরে উধাও হওয়া ড্রাইভারকে সনাক্ত করতে পেরেছি আমরা। বাড়ীতেই ছিলেন ভদ্রলোক। মদের নেশা তখনও তাঁর কাটেনি। পুলিশের কাছে বিনা দ্বিধায় সব স্বীকার করেছেন তিনি। পার্টির উচ্চপদস্থ কর্মচারী তিনি। তা সত্ত্বেও এই গুরুতর অপরাধের জন্য আইনের রক্ত চক্ষুকে তিনি এড়াতে পারেন নি। মাথা পেতে নিতে হয়েছিল ধর্মাধিকরণের গুরুদণ্ড।

দ্রুত গোয়েন্দাগিরি এবং তার চাইতেও বেশী কপালজোর—এই দুইয়ের ফলে এ কেসে রক্ষা পেয়েছিল একজনের জীবন। অন্যান্য দেশে রাশিয়ান পুলিশদের বড় দুর্নাম আছে। তারা নাকি সোভিয়েট ইউনিয়নের যারা শত্রু তাদের গ্রেপ্তার করা এবং হনন করা ছাড়া অন্য কোনো বিষয়েই আগ্রহী নয়। কিন্তু আমি বলবো দুনিয়ার যেখানে যত পুলিশ আছে তাদের সঙ্গে আমার এবং আমার সহ-কর্মীদের কোনো প্রভেদই নেই। আমরা সবাই সমান, একই আমাদের দায়িত্ব। কোনো জীবন বিনষ্ট করার চাইতে সে জীবন রক্ষা করার জন্যে হাজার রকম প্রচেষ্টা করতে আমরা দ্বিধা করি না। □

* গ্রেগরী আরেন্সকী (রাশিয়া) রচিত কাহিনী অবলম্বনে।

দামাস্কাসের উগ্র সূর্য

গ্রীষ্মের মাসগুলোয় দুপুরের সূর্য বড়ই নির্দয়ভাবে কিরণ ঢালতে থাকে আমাদের শহরের নতুন আর পুরনো বাড়ীর শীর্ষে, মসজিদের সাদা চুড়োয় আর মৌচাকের মত গম্বুজগুলোয়। জীবনের চাঞ্চল্য একেবারেই উবে যায় শহরের বুক থেকে, খাঁ-খাঁ করে পথঘাট। দামাস্কাসের পুরোনো অঞ্চলের ছাদ-ঢাকা সঙ্কীর্ণ রাস্তায় অলসভাবে গাধাগুলোকে টানতে টানতে নিয়ে যায় শুধু কয়েকজন ফেজ টুপি-পরা বেদুইন। এমন কি সদা গমগমে হট্টগোলে ভরা বাজারগুলো, যেখানে টাকা-কড়ির ভাবনা-চিন্তা ছাড়া আর কিছুই স্থান পায় না, সেই বাজারগুলোও ঝিমিয়ে পড়ে। সারাদিন ধরে আগুন বর্ষণে ক্লান্ত তপনদেব যতক্ষণ না পশ্চিমে হেলে পড়ে, ততক্ষণে তলিয়ে থাকে সুপ্তির নিতলে।

কিন্তু এই ঝিমুনির অবসরেই তৎপর হয়ে ওঠার সুযোগ পায় দু-ধরনের অপরাধী ঃ যে প্রকৃতির মানুষ শহরের কর্মবিরতি আর বিশ্রামক্ষণের সুযোগ নিয়ে খুন-জখম রাহাজানি আর হরেক রকম অপকর্মে মেতে ওঠে, তারা, এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে একটি অমানুষ তস্কর—আগুন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দামাস্কাস শহরের বুকে নির্বিবাদে লুঠতরাজ চালিয়েছে এই অমানুষ অপরাধীটি এবং দু দুবার জমির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল এত বড় শহরটাকে।

কোন রকম তঞ্চকতা না করে সবিনয়ে জানাচ্ছি, প্রথম অপরাধীর জন্যে যতখানি হুঁশিয়ার দামাস্কাসের পুলিশ বাহিনী, ঠিক ততখানিই দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রেও।

জুলাইয়ের সেই দিনটিতে প্রথম যে খবরটি এসে পৌঁছালো পুলিশ হেড কোয়ার্টারে তা হলো একটি আগুন লাগার খবর। শৌখীন শহরতলী সৌকসারুজার একটা বাড়ীতে অগ্নিদেবের

তাণ্ডব নৃত্য দেখা গেছে। চিরাচরিতভাবে নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করতে লাগলাম আগুনের উৎস সম্বন্ধে। আগুন লাগতে পারে 'দামাস্কাসের আগুন অভিশাপে'র জন্যে অথবা নেহাতই অসাবধান হওয়ার ফলে। কিন্তু ক্রিমিনাল ইনভেসটিগেশন ডিভিশনের চীফ হিসাবে ফোনের জবাব দিতে গিয়েই শুনলাম একটা উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। সৌকসারুজা থেকে একজন পুলিশম্যান বলছে—'চীফ, এ শুধু আগুন নয়, আরো কিছু। ফটকের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি উঠোনের এপর পড়ে রয়েছে একটা মেয়ের দেহ। ধোঁয়ার জন্যে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।'

প্রথম রিপোর্ট পাওয়ার পর যে ঠিকানাটা টুকে রেখেছিলাম, তার ওপর এবার চোখ পড়তেই চিনতে পারলাম বাড়ীটাকে। সেকেলে আমলের যে ধরনের জমজমাট আরব্য ভবনগুলো দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে দামাস্কাসের বুক থেকে, এ প্রাসাদটি তাদেরই অন্যতম। উঁচু-উঁচু পাঁচিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কতবার জালিকাটা ফটকের মধ্যে দিয়ে দেখেছি ভেতরকার শান্ত সুন্দর শুচিময় উঠোনটিকে। প্রাসাদটাকে বেষ্টন করে থাকত প্রাঙ্গণটা। বহু শতাব্দী আগে সোনা আর রেশম দিয়ে বোনা মূল্যবান বস্ত্রের জন্য যখন দিকে দিকে সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল আমাদের এই শহরটির তখন এক ধনবান ব্রোকেড ব্যবসায়ী প্রাসাদটা তৈরী করেছিলেন। কি লজ্জার কথা! এতদিন পর গৌরবময় অতীতের এত চমৎকার নিদর্শনটাকেই কিনা গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে সর্বভুক আগুনের দেবতা। কিন্তু এই অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে যে মৃত্যুও জড়িয়ে পড়েছে, তা মনে পড়তেই রোমান্টিক রোমন্থনকে নির্বাসন দিলাম মন থেকে।

অকুস্থলে পৌঁছেও করবার বিশেষ কিছু ছিল না। কেন না, তখনও আগুনকে বাগে আনতেই ব্যস্ত দমকলবাহিনী। ফটকের বাইরে দেখি কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে গেছে। কয়েকজন বললে বটে কে যেন আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠে সাহায্য চেয়েছিল। কিন্তু পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ার মেঘ ভেদ করে কিছুই করা সম্ভব হয়নি ওদের পক্ষে।

যে মুহূর্তে সম্ভব হলো প্রাঙ্গণে পা দেওয়ার, আর একটা মুহূর্তও বাজে সময় নষ্ট না করলাম না। ভেতরে গিয়ে দেখলাম পরমাসুন্দরী এক অষ্টাদশী তন্বী মেয়ের দেহ। যদিও বিস্তর ঝুল আর ভুষোয় মলিন হয়ে গিয়েছিল তার মুখশ্রী, যদিও পলকহীন বিস্ফারিত কালো চোখের মণি দুটো স্থির হয়েছিল নীল আকাশের পানে—তবুও এক নজরে বোঝা গেল বাস্তবিকই এ রকম অলোকসুন্দর কান্তি বড় একটা দেখা যায় না। পরনে দামাস্কাসের পোশাক। টুকটুকে লাল রঙের রেশম। নরম। নমনীয়। মণিবন্ধ আর গলায় সযত্ন খচিত বাহারী জড়োয়া অলংকার। কিন্তু তার ফ্যাকাশে নিরক্ত গলায় যে জিনিসটি নেকলেসের মত অত সুন্দর ছিল না, তা হচ্ছে একটা দগদগে কুৎসিৎ ক্ষতচিহ্ন। এবং এই ক্ষতই নিভিয়ে দিয়েছে মেয়েটির জীবনের প্রদীপ।

নিষ্প্রাণ দেহটার পাশে নতজানু হয়ে বসে পড়েছিলাম। অবাক হয়ে গেছিলাম আমার অনুভূতিপ্রবণতা দেখে। বছরের পর বছর খুন-জখম হিংসা-জিঘাংসা নিয়ে নাড়াচাড়া করে এসেও এখনও আমার কোমল অনুভূতির ধারগুলো দেখলাম ভোঁতা হয়ে যায়নি। আচম্বিতে একটা চীৎকার শুনলাম। শব্দটা এল রান্নাঘর থেকে। তখনও গল্-গল্ করে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল ঘরটা থেকে। চটপট এগিয়ে দেখি আরও একটি মহিলার লাশের পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে দমকল বাহিনীর দুজন লোক। যদিও আগুনের নিষ্ঠুর জিহ্বাস্পর্শে হতভাগিনীর দেহের খানিকটা অংশ

পুড়ে গিয়েছিল, তবুও উঠোনের মরা মেয়েটির চাইতে এই মহিলার বয়স যে অনেক বেশী তা বুঝতে মোটেই বেগ পেতে হলো না আমাকে। আরও বুঝলাম, জীবিতকালে অল্পবয়েসী মেয়েটির চাইতেও অনেক বেশী চটকদার ছিল মহিলাটির তনুশ্রী। সযত্নে প্রসাধন করা কাঁচা-পাকা চুলের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছিল একটা বিশ্রী আঘাত-চিহ্ন। এবং সে আঘাত হানা হয়েছে যে অত্যন্ত গুরুভার একটা হাতিয়ার দিয়ে, তা অতি সহজেই বুঝতে পারলাম আমি।

একলা আগুনকেই অভিশাপ দিচ্ছিলাম সবাই মিলে। এবার দু-দুটো নৃশংস খুনের তদন্তের গুরুদায়িত্ব এসে পড়লো কাঁধে।

বাইরের জনতাকে এতক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করছিল আমাদের গোয়েন্দারা। তাইতেই জানা গেল জমকালো এই ভবনটার বর্তমান বাসিন্দা ছিল পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের ডাকাতি ডিভিশনের চীফ ক্লার্ক, তার বউ আর মেয়ে। পুলিশের সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের যোগসূত্র বেরিয়ে পড়তেই সম্ভবপর একটা মোটিভের অঙ্কুর দেখা গেল আমার মধ্যে। প্রতিহিংসার জন্যেই কি তবে এই হনন-পন্থা? প্রতিহিংসা-পাগল কোন বিকৃত মগজই কি তাহলে পুলিশ বাহিনীরই একজনের দেনা-পাওনা মিটিয়ে দিয়ে গেল এই ভাবে?

হেড কোয়ার্টারে একটা ফোন করতেই তৎক্ষণাৎ অকুস্থলে হাজির হলেন পুলিশ কমিশনার, করোনার, বিচার সম্পর্কীয় সাক্ষ্য প্রমাণাদির অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং নরহত্যা স্কোয়াডের হোমরাচোমরারা। সবাই মিলে একসঙ্গে শুরু করলাম তাল তাল বাষ্পে ভরা প্রাসাদের ভেতরে চুলচেরা অনুসন্ধান পর্ব।

দেখে শুনে বেশ বোঝা গেল খুনের সব চিহ্ন মুছে দেওয়ার জন্যেই আগুনের সাহায্য নিয়েছিল খুনী। নিখুঁত হয়েছিল তার পরিকল্পনা। আগুনের শিখা যেটুকু নষ্ট করতে পারেনি, ফায়ার ব্রিগেডের কেমিক্যালস আর জলেই তার দফারফা হয়ে গেছে।

মিনিট পনেরো ধরে জলে-ভেজা রাবিশ খোঁজার পর শেষকালে রান্নাঘরে একটা সূত্র পাওয়া গেল। মাংস থেঁতো করে 'কুব্বি' বানানোর জন্যে আমরা আরবীয়রা, যে ধরনের কাঠের হাতুড়ি ব্যবহার করি, সেই রকম একটা হাতুড়ি পেলাম আমরা। হাতুড়িটার ওজন পাউণ্ড সাতেকের কম তো নয়ই। মেঝের ওপর যে জায়গায় তা পড়েছিল, তা দেখেই মনে হলো বর্ষীয়সী মহিলার মাথায় ঐ মারাত্মক আঘাত হানার পরেই হাতুড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল খুনীটা। আধপোড়া হাতুড়িটা হাতে নিয়ে মনটা কি রকম যেন হয়ে গেল। ভাবলাম আর কি আমি সুস্বাদু 'কুব্বি' দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে ভাত খেতে পারব? আমার রন্ধন পটীয়সী বউয়ের এটা আবার স্পেশাল খানা। মনের পর্দায় চকিতে-ভেসে গেল কটি কথা—'যে জিনিস দিয়ে এমন মুখরোচক খানা বানানো যায়, তা দিয়ে প্রয়োজন হলে নরহত্যাও করা যায় একই রকম পরিপাটিভাবে।'

অনুসন্ধানে ঢিলে পড়লো না এতটুকুও। হাতুড়িটা যেখানে পাওয়া গেছিল, তার কাছেই পড়ে থাকতে দেখলাম একটা কাঁচের টুকরো। করাতের মত এবড়ো-খেবড়ো হলেও রীতিমত ধারালো কাঁচটা। আয়না ভেঙ্গে যাওয়ায় টুকরোটা পড়েছিল মেঝের ওপর। আগুনের তাপেও ভেঙ্গে পড়তে পারে আয়নাটা। অথবা, উঠোনে পড়ে থাকা তরুণী মেয়েটির জীবনের সরু সুতো কাটবার জন্যেও এই অভিনব ছুরিটাকে বানিয়ে নিয়েছিল হত্যাকারী।

খোঁড়া-খুঁড়িতে বাধা পড়লো। করোনার তাঁর রিপোর্ট দিলেন আমাকে। মাথায় চোট

পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছিল বর্ষীয়সী মহিলাটি। কিন্তু তার দেহটা যেভাবে পড়ে আছে, তা দেখে মনে হয় তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রান্নাঘরের ভেতরে। তরুণী মেয়েটার গলা কাটবার আগে যে তাকে গলা টিপে মারা হয়েছিল, তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। আর তারপরেই হতভাগিনীর লাশটাকে ফেলে দেওয়া হয় প্রাঙ্গণে।

দুই নারীর অঙ্গেই ছিল উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া মহার্ঘ অলংকারাদি। তাই লুঠতরাজ করার মোটিভ নিয়ে যে খুন করা হয়নি, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলাম আমরা। পোশাক এবং দেহে ধস্তাধস্তির কোন চিহ্ন ছিল না। তাই, যৌনবাসনার পরিতৃপ্তির জন্যে যে এই জঘন্য খুনখারাপী—এমন সম্ভাবনাকেও বাতিল করতে হলো।

তদন্ত পর্ব এই পর্যন্ত আসার পরই ভদ্রমহিলার স্বামীর অনপস্থিতিটা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলাম আমি। সে ভদ্রলোক কোথায়? এতক্ষণেও বউ আর মেয়ের এই শোচনীয় পরিণতি তার কানে পৌঁছয়নি, এমন কি হতে পারে? আমার তো তা বিশ্বাস হলো না। খবর পাওয়া মাত্রই তো দুরন্ত আরব ঘোড়ার পিঠে চড়ে এতক্ষণে তাঁর পৌঁছে যাওয়ার কথা অকুস্থলে। ব্যাপার তো সুবিধের মনে হচ্ছে না।

ঘড়ি দেখছি, এমন সময়ে একজন ডিটেকটিভ জানালে নিপাত্তা স্বামী মহাপ্রভু নাকি অফিসেই কাজ করছিলেন। দুঃসংবাদটা শোনামাত্র অজ্ঞান হয়ে গেছেন ভদ্রলোক। খবরটা শুনে তার এতক্ষণ পর্যন্ত অদৃশ্য থাকার একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পেলেও স্থির করলাম, ভদ্রলোক এখানে এসে পৌঁছোনোর পর থেকেই এ দৃশ্যের প্রতিক্রিয়া তাঁর ওপর কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তা সজাগ চোখে লক্ষ্য রাখতে হবে।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ফটকের সামনে জমায়েৎ লোকের ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল একটা ট্যাক্সি। ভেতর থেকে রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখে নামলেন এক ভদ্রলোক। তখনও ঠক ঠক করে কাঁপছিলেন আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন তিনি।

নামার সঙ্গে সঙ্গে হিষ্টিরিয়া রুগীর মত প্রথমেই আর্ত সুরে চেঁচিয়ে উঠলেন উনি—'আমার খুকী সে কোথায়?'

'কোন খুকী?' শুধোই আমি। 'খুকী বলতে যদি তরুণী মেয়েটাকে বোঝান তো দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে—'

'না। না। মারিহা মারা গেছে, আমি জানি। কিন্তু ইয়ামিন, আমার বাচ্ছা মেয়েটা, সে কোথায়?'

এবার স্তম্ভিত হওয়ার পালা আমার। খুনের সংখ্যা কি তাহলে সবশুদ্ধ তিন? এমনও হতে পারে, চোখের সামনে মা আর দিদিকে খুন হতে দেখেছে বাচ্ছা মেয়েটি। তারপর গায়েব করা হয়েছে তাকে। সম্ভবত এ খুনের একমাত্র মোটিভ কিডন্যাপ করাই। সে যাই হোক, নৃশংস খুনের সমাধানের আগে আমাদের জানা দরকার নিপাত্তা বাচ্ছাটির পরিণতি এবং এই চিন্তাই প্রবল হয়ে উঠল আমাদের মগজে।

শোকবিহ্বল ভদ্রলোককে নার্ভ নিরুত্তেজ করার দাওয়াই খাইয়ে দিলাম এক ডোজ। অল্পক্ষণের মধ্যেই বাচ্ছাটার চেহারার নিখুঁত বিবরণ পাওয়া গেল তাঁর কাছ থেকে। বয়স তার সাড়ে তিন বছর। লম্বা লম্বা কালো চুল আঁটো করে বাঁধা। ধূসর চোখ। আধো-আধো স্বরে কথা বলার দরুন সব কথা বোঝা মুস্কিল। পরনে কি ধরনের পোশাক ছিল, তা বলা

সম্ভব হলো না তাঁর পক্ষে।

রাস্তার ভিড়ের মধ্যে হাঁটা শুরু করলাম আমি। ওদের মধ্যে অনেকেরই হয়তো কিছু কিছু বলার আছে। দেওয়ার মত উপদেশও আছে বিস্তর। কিন্তু সবকিছু শোনার পর মূল্যবান কিছু পাওয়া গেল বলে মনে হলো না আমার। বাড়ীর মধ্যে কাউকে ঢুকতে বা বেরুতে কেউই দেখেনি। আগেই শুনেছিলাম, একটা আর্ত চীৎকার এদের কানে ভেসে এসেছিল। এই চীৎকার ছাড়া আর কোনরকম সন্দেহজনক শব্দ কেউই শুনতে পায়নি। শহরতলীর এই অংশটায় যারা বাস করে, আইনের প্রতি অনুরাগ তাদের প্রত্যেকেরই আছে এবং সেই মার্জিত রুচি শান্তিপ্রিয় বাসিন্দাদের একজনের মনেও খটকা লাগতে পারে এরকম সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়েনি।

সবই বুঝলাম। কিন্তু এসব সত্ত্বেও দু দুটো খুন হয়ে গেছে আজই। খুনের সংখ্যা দুই কেন, তিন হওয়াটাও অসম্ভব কিছু না। ভাবলাম দীর্ঘকাল ধরে গড়ে ওঠে মানব সভ্যতা। ভাবলাম কবে সেইদিন আসবে যেদিন তা হনন আর জিঘাংসার বহু উর্ধ্বে উঠে যেতে পারবে? ঋষিতুল্য ঐতিহাসিকরা গৌরবতিলক পরিয়েছেন দামাস্কাসের সুমহান ঐতিহ্যললাটে এই তথ্য জানিয়ে যে দামাস্কাসই হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন শহর যেখানে সর্বপ্রথম গড়ে উঠেছিল মানুষের জনপদ। গৌরবময় এই দামাস্কাস শহরে অন্তত এই ধরনের পৈশাচিক খুনজখম যেন আর না হয়। আমাদেরও জ্ঞানের সীমা আরও ছড়িয়ে পড়া দরকার। রক্তক্ষরণ না করে, বর্বর প্রবৃত্তিকে সমূলে বিনষ্ট করে কিভাবে বাঁচার মত বাঁচতে হয় তা আমাদের এখনও জানা দরকার। আমরা এখনও তা শিখিনি এবং চারপাশের কাণ্ডকারখানা থেকেই তা বোঝা যায় হাড়ে হাড়ে।

ভাবালুতা আর রোমন্থনের ফলে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলাম আমি। এবং অসহিষ্ণুতা এমনই একটা মনের গঠন যাকে প্রশ্রয় দেওয়া কোন পুলিশম্যানেরই উচিত নয়। যেভাবেই হোক, বাচ্ছাটাকে খুঁজে বের করতেই হবে আমাদের। রহস্যের চাবিকাঠি সম্ভবত সে-ই। সারা দেশ জুড়ে তল্লাসি চালিয়ে কচি মেয়েটার হদিশ বার করার নির্দেশনামা বেরিয়ে গেল চারিদিকে। সজাগ হয়ে গেল প্রতিটি পুলিশ ষ্টেশন, রোড পেট্রল, ট্রাফিক অফিসার আর রেডিও ষ্টেশন। আর, হেড কোয়ার্টারে গোল হয়ে বসে নতুন খবরের প্রতীক্ষায় রইলাম আমরা।

অসহ্য শ্বাসরোধী সাসপেন্সে ভরা দু দুটো ঘণ্টা কেটে গেল। কিন্তু একটা সূত্রও এসে পৌঁছোলো না আমাদের হাতে। প্রতিটি সেকেণ্ড অতীত হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিল তিল করে বৃদ্ধি পাচ্ছে হত্যাকারীর সুযোগ আর সুবিধে—বৃদ্ধি পাচ্ছে বাচ্ছাটির বিপদাশঙ্কা, অবশ্য তখনও যদি জীবিত থাকে সে।

যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছি, ভাবছি, কোন সূত্র আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে কিনা, ঠিক এমনি সময়ে রেডিও-রুম থেকে খবর পাওয়া গেল আমাদের বর্ণনামাফিক একটা খুকীকে দামাস্কাকের প্রাচীন অঞ্চলের শহরতলীতে একলা ঘুরতে দেখা যাচ্ছে। মক্কা রোডে পাওয়া গেছে তাকে।

তল্লাশি পর্ব শেষ হয়ে গেল, এমন কথা বিশ্বাস করতে মন চাইল না আমার। কিন্তু বাচ্ছাটাকে নিয়ে আসার পর দেখা গেল বাস্তবিকই হারিয়ে যাওয়া খুকীর চেহারার বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যায় তার চেহারা। বাঁ বাহুর ওপর বাঁধা ছোট্ট পাতলা সোনার তাবিজটার

ওপর আরবীয় ভাষায় তার নামও খোদাই করা ছিল। কিন্তু সাক্ষী হিসেবে ক্ষুদে ইয়ামিনকে কোন কাজেই লাগানো গেল না। শ্রান্তি, ভয়, অশ্রু আর আধো আধো স্বরে কথা বলা— এই সবকিছুর ব্যূহ ভেদ করে সে যে কোথায় ছিল এবং কার সাথে ছিল, তা জানা একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল আমাদের পক্ষে। ওর বিড়বিড় বকুনির মধ্যে বারবার এই একই শব্দ আউড়ে চলেছিল সে। শব্দটার অর্থ 'আমার মামা।'

হুকুম চলে গেল এই মামা লোকটিকে খুঁজে পেতে আনার জন্যে। তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার।

যে খবরের কাগজে অফিসে 'মামা' কাজ করতো, সেখান থেকে রিপোর্ট পাওয়া গেল, খুনের দিন সকালে অফিসেই কাজ করেছে সে। তারপর সে বাইরে যেতে চায় এবং অনুমতি পাওয়ার পর অফিস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে সে। অফিস ত্যাগ করার পর তার গতিবিধি সম্পর্ক কোন খবরই আর পেলাম না আমরা।

অপরাধ-বিশেষজ্ঞ মহলে একটা খুব চালু কথা আছে ঃ খুনী সব সময়েই ফিরে আসে খুনের দৃশ্যে। বহু পুরনো এবং প্রায় সকলেরই জানা উক্তিটির মধ্যে কিছু মনোবৈজ্ঞানিক সত্য আছে। অপরাধ-ইতিহাসের পাতায় পাতায় ঠাসা আছে এরকম বিস্তর কেস যা পড়লেই দেখা যাবে কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্যে ফেলে যাওয়া প্রমাণাদি নিশ্চিহ্ন করে দেওযার জন্যে, বিকৃত বাসনার পরিতৃপ্তির জন্যে, এমন কি অকুস্থলে এসে সুতীব্র অনুতাপের মধ্যে মনে শান্তিলাভের জন্যেও খুনের দৃশ্যে বারবার ফিরে আসে খুনীরা।

আর তাই, চারজন ডিটেকটিভ নিয়ে একটা দল তৈরী করলাম। ধোঁয়ায় মলিন প্রাসাদের আশপাশেই মোতায়েন হল এরা। বেশী সময় অপেক্ষা করতে হলো না। অচিরেই ওদের একজন খবর দিলে প্রাসাদটার আশেপাশেই সন্দেহজনকভাবে ঘুর ঘুর করছে অদ্ভুত প্রকৃতির একটা লোক।

এইভাবে রিপোর্ট পেশ করছিল অফিসারটি—"শোকাবহ এই ঘটনা সম্বন্ধে লোকে কি বলাবলি করছে—তা শোনার নিবিড় আগ্রহ দেখা গেছে এই লোকটার হাবেভাবে। বিভিন্ন লোকের কাছে গিয়ে সে জিজ্ঞেস করে ঘটনা সম্বন্ধে তাদের মতামত কি। কিন্তু শুধু শুনেই যায় নিজের অভিমত একদম প্রকাশ করে না।"

আমরা তিনজন খুকীকে নিয়ে রওনা হলাম প্রাসাদ অভিমুখে। গাড়ীর দরজা খুলতে না খুলতেই—বাচ্ছাটা লাফিয়ে নেমে পড়ল ফুটপাতের ওপর এবং পরক্ষণেই তীরবেগে দৌড়ে গিয়ে মামা, বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল যার প্রসারিত বাহুযুগলের মধ্যে, সেই লোকটিকে নিয়েই পুঞ্জিভূত হয়ে উঠেছিল আমাদের সন্দেহের রাশি। সনাক্তকরণ যা হলো, তা চমৎকার। আর কিছু দরকার নেই। লোকটাকে গ্রেপ্তার করে হেড কোয়ার্টারে নিলে এলাম সওয়াল জবাবের জন্যে।

সন্দেহভাজন ব্যক্তিটির নাম আবদুল ওহাব সাক্কা আমিনি। বয়স তিরিশের এদিকে। খুকীর মায়ের ভাই সে অর্থাৎ চীফ ক্লার্কের সম্বন্ধী। সওয়াল জবাবের সময়ে তার কথাবার্তায় সুগভীর আত্মপ্রত্যয় লক্ষ্য করলাম। আগাগোড়া একই কথা বলে বারবার বলে গেল সে। তার বোন নাকি তাকে টেলিফোন করেছিল। দারুণ গরম পড়েছিল, তাই সে তাকে জিজ্ঞেস করে ছোট্ট ইয়ামিনকে বরদা নদীর ধারে বিকেলে বেড়াতে নিয়ে যাবে কিনা। বাচ্ছাটাকে দারুণ ভালবাসে

তার মামা, 'নিজের মেয়ের মতই', তাই এ প্রস্তাব শুনে বিলক্ষণ উল্লসিত হয়েছিল মাতুল মহাপ্রভু। খুকীকে নেওয়ার জন্যে বাড়ীতে এলে অস্বাভাবিক কিছুই নাকি চোখে পড়েনি তার। কোনও আগন্তুককে ও দেখেনি। প্রাঙ্গণে বসে তার বোন সেলাই করছিল। তার শান্ত সুন্দর প্রকৃতিতে কোনরকম বৈলক্ষণ্যও লক্ষ্য করেনি সে।

এ কাহিনী যে সত্য, তা বলবৎ করতে পারে, সুনিশ্চিত করতে পারে, এমন কোনও লোককে হাজির করতে পারবে কি সে?

একটু ভেবে ও বললে—"হ্যাঁ, পারবো। আমাদেরই কাগজের একজন রিপোর্টারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। নাম তার হামিন। একসঙ্গে বরফ-কুচো দেওয়া সরবৎও খেয়েছিলাম আমরা।"

রিপোর্টারকে ফোন করার পরেই প্রথম শক্ পেল আমিনি। বরফকুচো দেওয়া সরবৎ খাওয়া তো দূরের কথা, গত কদিনের মধ্যে সহকর্মীর টিকিও নাকি দেখে নি সে—সাফ জবাব দিয়ে দিলে রিপোর্টার ভদ্রলোক। একটু ভেবে নিয়ে আমিনি চটপট বুঝিয়ে দিলে তার অস্বীকার করার মূল কারণটা—"একটা গণিকালয় চালায় হামিন। তাই পুলিশের কোন ঝামেলায় নিজেকে জড়াতে চায় না ও।"

বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে সমানে প্রশ্ন করে যেতে লাগলাম ওকে। উত্তর দেওয়ার সময়ে চোখমুখের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে লাগলাম তীক্ষ্ণ চোখে। আর, তখনই, আচমকা আমার চোখ পড়ল বাঁহাতের ওপর। টেবিলের কিনারাটা বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরেছিল ও। বুড়ো আঙুলের নখের নীচে একটা লালচে দাগ দেখতে পেলাম আমি।

ভাবলাম, এ দাগ রক্তের না-ও হতে পারে। খুব সম্ভব কাজ করার সময়ে ছাপাখানার লাল কালি উঠে এসেছে ওর নখের ওপর। নখের ওপর খানিকটা ধুলোও লেগেছিল। মনের কন্দর থেকে উঠে এল হুঁশিয়ার থাকার হুকুমনামা। এই সূত্র বা অন্য কোন সূত্রই উপেক্ষা করলে চলবে না।

ল্যাবোরেটরীতে দ্রুত পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ধুলোর মধ্যে রক্ত পাওয়া গেল। খবরটা মামার কানে পৌঁছে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একেবারেই ভেঙ্গে পড়লো বেচারী আর তারপরেই কয়েক মিনিটের মধ্যেই শুনতে পেলাম তার অপরাধ কাহিনী।

খবরের কাগজের অফিস থেকে যে মাইনে আমি পাই, তা দিয়ে আমার চলে না। আমার ভাল লাগে ভাল খাবার, প্রচুর মদ, সুন্দরী মেয়ে আর জুয়োর টেবিলের উত্তেজনা। আমার ফ্যামিলি যখন যথেষ্ট বিত্তবান, তখন এভাবে মাটিতে মুখ রগড়ে জীবনধারণ করা আমার পোষায় না। আমার সম্মানের হানি ঘটে তাতে।

"আমার বোনের অন্তরে দয়ামায়া ছিল প্রচুর। প্রায় তার সঙ্গে দেখা করতাম আমি। আমার টাকার দরকার হলেই মুক্ত হস্তে সব সময়ে আমাকে দেদার টাকা দিত সে। গতরাতে ভাগ্যের চাকা ঘোরে আমার প্রতিকূলে, আজ সকালে পথের ভিখিরী হয়ে গেলাম আমি। তাই এসেছিলাম বোনের কাছে। ফটকের কাছে খেলা করছিল ইয়ামিন। উঠোনে সেলাইয়ের কল নিয়ে বসেছিল আমার বোন। মামুলি কুশল বিনিময় করার পর আমি সরাসরি এসে পড়লাম আমার কথায়। আমার অর্থের দরকার এবং তা এখুনি দিতে হবে। ও বললে—"আজকে তো বাড়ীতে টাকাকড়ি নেই, ভাইয়া।" কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি চাপ দিতে ধৈর্যচ্যুতি

ঘটল ওর। বলল—"ঘ্যানঘ্যান করো না। বললাম তো হাতে টাকা নেই।"

"তখনই একটা শয়তানি মতলব উঁকি মারল আমার মগজে। একতলায় রাখা কাবার্ডে যে জড়োয়া গহনা আছে, সেগুলো পকেটস্থ করলে কেমন হয়? বললাম—বহিন, তোমার জড়োয়া গয়নাগুলো আমাকে দিয়ে দাও, বলেই—বাড়ীর দিকে পা বাড়ালাম আমি।

"মুহূর্তের মধ্যে বুঝলাম, বড় বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। চীৎকার করে উঠল আমার বোন—'নেমকহারাম কুকুর কোথাকার। তোমার ঐ নোংরা আমোদের জন্যে আমার মায়ের গয়নাগুলোকে এবার ভোগে লাগাতে চাও। অনেক বছর তোমাকে আড়াল করে রেখেছিলাম আমি। কিন্তু আর না। আজ রাতেই আমার স্বামীকে বলবো তোমার এই জঘন্য আচরণের কথা। এখন দূর হও এখান থেকে—আর কোনও দিন এমুখো হয়ো না।'

"ওর ক্রোধ আমার রক্তে আগুন লাগিয়ে দিলে। প্রচণ্ড রাগে যেন উন্মাদ হয়ে গেলাম আমি। ক্ষিপ্তের মত ধেয়ে গিয়ে রান্নাঘরের মধ্যে সবার আগে চোখ পড়ল একটা জিনিস—একটা 'কুব্বি' হাতুড়ি। এক ঝটকায় হাতে তুলে নিলাম হাতুড়িটা। দরজার সামনেই মুখোমুখি হয়ে গেলাম ওর সাথে এবং সজোরে হাতুড়ির একটা মোক্ষম ঘা মারলাম ওর মাথায়। ও লুটিয়ে পড়তেই লাশটা টানতে টানতে নিয়ে এলাম রান্নাঘরের ভিতরে।

"আমার বড় ভাগ্নী মারিহা চীৎকার শুনেই বারান্দায় দৌড়ে এসেছিল। এসেই দেখেছিল মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে তার মা। আর্তস্বরে চীৎকার করে উঠল ও সাহায্যের জন্যে। ওকেও এবার থামানো দরকার। দৌড়ে ওর ঘরে ঢুকে গলা টিপে মারবার চেষ্টা করলাম আমি। কিন্তু দেখলাম, কাজটা খুব সহজ নয়। শেষ পর্যন্ত দমবন্ধ করে ওকে মারতে পেরেছিলাম কিনা, সে সম্বন্ধেও নিশ্চিত নই আমি। তখনি আয়নাটা ভেঙ্গে ফেলে কাচের টুকরো তুলে নিয়ে ওর গলার শিরাটা কেটে দু ফাঁক করে দিলাম।

"রাগ পড়ে আসতেই মাথা সাফ হয়ে গেল। এবার আমার দুষ্কর্ম ঢেকেঢুকে প্রমাণাদি বিনষ্ট করে সটকান দেওয়ার বাসনাই প্রবল হয়ে উঠল মগজের মধ্যে। সারা বাড়ীটায় স্প্রে করে তেল ছড়িয়ে দিলাম। তারপর আগুন ধরিয়ে দিয়ে লম্বা দিলাম। যাওয়ার আগে অবশ্য কাবার্ড থেকে জড়োয়া গয়নাগুলো আত্মসাৎ করতে ভুলিনি।

"তীরবেগে বেরিয়ে আসার সময়ে প্রবেশপথের কাছে দেখলাম ইয়ামিন খেলা করছে আপন মনে। ওকে কোলে তুলে নিলাম। শক্ত করে চেপে ধরলাম বুকের ওপর—উদ্দেশ্য ছিল রক্তের দাগ ওকে দিয়ে ঢেকে রাখা। রাস্তায় গাড়ীতে উঠতে উঠতে ওকে বললাম, আমরা বেড়াতে যাচ্ছি।

"গাড়ীর মধ্যে তেমন ঝামেলা পোহাতে হয়নি আমাকে। কয়েকজন যাত্রী ইয়ামিনের সঙ্গে খেলা জুড়ে দিলে, হাসিঠাট্টাও বাদ গেল না। বাড়ী পৌঁছেই জামাকাপড় পালটে ফেললাম। তারপর রাস্তায় অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সাথে ইয়ামিনকে খেলতে দিয়ে ফিরে এলাম বোনের বাড়ীতে ব্যাপার কতদূর গড়িয়েছে তা দেখতে। তারপর তো আপনারা জানেনই।"

আর তাই, "খুনী সবসময়ে ফিরে আসে খুনের দৃশ্যে"—এই আপ্তবাক্য অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে জোড়া খুন আবিষ্কার হওয়ার বারো ঘণ্টার মধ্যে সমাধান করে ফেললাম কেসটার। যে চাবিকাঠি দিয়ে রহস্য ভেদ করলাম তা কিন্তু পুরোপুরি মনোবৈজ্ঞানিক।

যে রকম চটপট কেসের সমাধান হয়ে গেল, ঠিক সেই রকম চটপট সাঙ্গ হলো দণ্ডবিধান

পর্ব। এক হপ্তা পরেই ভবিষ্যতের হবু খুনীদের চরম শিক্ষা দেওয়ার জন্যে দামাস্কাসের প্রধান পার্কে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে লাগল আবদুল ওহাব সাক্‌কা আমিনির নিষ্প্রাণ দেহ। □

* ইব্রাহিম গাজী (দামাস্কাস, সিরিয়া) রচিত কাহিনী অবলম্বনে।

নেশা লাগে খুনের স্বাদে

কেঁদে ফেললেন প্রৌঢ়া। বললেন—'আমার দৃঢ়বিশ্বাস সাংঘাতিক কিছু একটা হয়েছে আমার ছেলের।'

এ ঘটনা যখন ঘটে, তখন আমি ছিলাম ব্লুমফনটিনের অপরাধী তদন্ত বিভাগের চীফ। আমারই অফিসঘরে বসে ঝর-ঝর করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন প্রৌঢ়া—"দিন তিনেক আগে আমার ভাইয়ের সঙ্গে গাড়ীতে করে কোথায় যায় সে। কোথায় জানি গুপ্তধন খুঁড়ে বার করার মতলব ছিল ওদের। তারপর থেকেই আর কোনো পাত্তা নেই ওদের। বুঝতেই পারছেন আমার মনের অবস্থাটা।"

ভদ্রমহিলা যে কার্ড পাঠিয়েছিলেন, তাতে তার নাম লেখা ছিল মিসেস লুইসা মোলার। বিধবা। ছেলের নাম জন ফ্রেডারিক মোলার। বয়স আটাশ বছর। প্রৌঢ়ার দৃঢ়বিশ্বাস কোনো সাংঘাতিক কারণেই ফ্রেডারিক নাকি নিপাত্তা হয়ে গিয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—"কিন্তু আপনি এত উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন, তাতো বুঝলাম না। আপনার ভাইয়ের সঙ্গেই তো রয়েছে আপনার ছেলে, অজানা-অচেনা লোকের সঙ্গে তো নেই। তাছাড়া, কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়নি গাড়ীটার। হলে এতক্ষণে তা জানতে পারতাম। খুব সম্ভব যে গুপ্তধনের সন্ধানে ওঁদের এই অভিযান, তা নিশ্চয় সহজে খুঁজে পাচ্ছে না ওরা। তাই এত দেরী।"

কিন্তু এ যুক্তিতে সান্ত্বনা পাবার পাত্রী নন মিসেস মোলার। বললেন—"আমার ভাইকে নিশ্চয় আপনি চেনেন না। অপরাধের ইতিহাস আছে তার জীবনে। শেষবার পুলিশের হামলায় জড়িয়ে পড়ার সময় কাকে জানি ও বলেছিল আমার ছেলেই নাকি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার সঙ্গে। যদিও সম্পূর্ণ অসত্য এই অভিযোগ, তবুও ও শাসিয়ে ছিল জেল থেকে একবার খালাস পেলেই জনকে শায়েস্তা করে ছাড়বে সে। মাত্র এক হপ্তা হলো জেলের বাইরে পা দিয়েছে ও।"

মিসেস মোলার বিদায় নেওয়ার পর তাঁর গুণধর ভাইয়ের পুরোনো রেকর্ড ঘাঁটতে বসলাম। ভায়ার নাম ষ্টিফেনাস লুই ভ্যানউইক। ডোসয়ারটা বার করতেই তার মধ্যে পেলাম সব তথ্য। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স লোকটার। অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেটের একটা খামারবাড়ীতে অতিবাহিত হয়েছে তার যৌবন। এরপর এক শহর থেকে আর এক শহরে টো টো করে ঘুরেছে ষ্টিফেনাস। শয়ন করেছে হট্টমন্দিরে এবং ভোজন জুটিয়েছে উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে। সম্প্রতি শ্রীঘর গিয়েছিল কয়েক শো পাউণ্ড আত্মসাৎ করার অপরাধে। দীর্ঘ আঠারো মাস ঘানি টানতে হয়েছে বাছাধনকে এ যাত্রা। ধড়িবাজ-শিরোমণি প্রবঞ্চকদের মতই তার যেমন আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ছিল না, তেমনই অভাব ছিল না এন্তার অবিশ্বাস্য গল্পের। এই কারণেই

নজরবন্দী রাখা হয়েছিল বটে, সেই সঙ্গে আরও একটি মন্তব্য জুড়ে দেওয়া হয়েছিল রিপোর্টের অন্তে। তার প্রতিভার প্রকৃতি দেখে বিশেষজ্ঞের রিপোর্টে তাকে সুস্থ মস্তিষ্ক বলা হয়েছিল বটে, সেই সঙ্গে আরও একটি মন্তব্য জুড়ে দেওয়া হয়েছিল রিপোর্টের অন্তে। তার প্রতিভার প্রকৃতি দেখে বিশেষজ্ঞের ধারণা মাঝে মাঝে নাকি মানসিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা যেতে পারে তার প্রকৃতিতে।

যে পুলিশ অফিসারের দায়িত্বে তৈরী হয়েছিল এই ডোসিয়ার, তিনি বিশ্বাস করতেন একদিন না একদিন খুনজখম জাতীয় কোনো গুরু অপরাধ করে বসবে ভ্যানউইক। এ জাতীয় সিদ্ধান্তে তিনি এসেছিলেন ভ্যানউইকের ছেলেবেলার ইতিহাস জানার পর। হামেশাই দুটো বেড়ালের লেজে গাঁট বেঁধে ছেড়ে দিত বালক ভ্যানউইক। তারপর শুরু হতো চামড়ার চাবুক দিয়ে বেধড়ক পিটানো। তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে শেষনিঃশ্বাস ফেলতো অসহায় জীবগুলো। আর তাই দেখে, তাদের চরম বেদনা সমস্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠত ক্ষুদে ভ্যানউইক।

আরও অনেক তথ্য পাওয়া গেল ডোসিয়ারে। অনর্গল কাঁচা মিথ্যে কথা বলায় তার নাকি জুড়ি নেই। বলার ধরনটিও বড় মার্জিত এবং ভদ্র। এই মহাগুণটি তার ছিল বলেই নাছোড়বান্দার মত লেগে থেকে শিকারের পকেট হাল্কা করতে তাকে বেশী বেগ পেতে হতো না।

মিসেস মোলারের কান্নাকাটির পরেই ব্লুমফনটিনের সুপ্রীমকোর্টে মাষ্টারস অফিসে খোঁজ-খবর নিলাম আমি। এই অফিসেই ক্লার্কের কাজ করত তাঁর ছেলে। দক্ষিণ আফ্রিকায় যে চারটি প্রদেশ আছে, অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেট তাদেরই অন্যতম এবং এই প্রদেশেরই রাজধানী হলো এই ব্লুমফনটিন শহরটি। হীরের খনির সুবিখ্যাত কেন্দ্র কিমবার্লি থেকে প্রায় শখানেক মাইল দূরে ছোট্ট এই শহরটায় সে সময় ১৯৩০ সালে, শুধু শ্বেতাঙ্গই ছিল প্রায় ৩০,০০০। ব্রিটেনের সঙ্গে লড়াইয়ে ট্রান্সভালের সঙ্গে বুয়োরস-এর রিপাবলিকান গভর্ণমেণ্ট যোগদান করার পর থেকে উত্তেজনার লেশমাত্রও ছিল না সে শহরে। আইন অনুরাগী নাগরিকদের কেন্দ্র হওয়ার সুখ্যাতি অর্জন করেছিল ব্লুমফনটিন। খুনজখম জাতীয় অপরাধের নামও একরকম ভুলেই গিয়েছিল সবাই।

সুপ্রীমকোর্টের অফিসাররা আমাকে জানালেন যে, দিনকয়েক আগে ভাগ্নের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল ভ্যানউইক। আন্তরিকভাবেই বিস্তর আলোচনা হয় দুজনের মধ্যে। বাইরে থেকে কোনো রকম বিদ্বেষ বা অস্বাভাবিক কিছু দেখা যায়নি ওদের কথায়-বার্তায় আচরণে। ভ্যানউইক বিদায় নেওয়ার পর দারুণ উত্তেজিত হয়ে এক সহকর্মীর কাছে ফলাও করে গল্প করতে থাকে মোলার যে সে নাকি তার মামার সঙ্গে গুপ্তধন খুঁড়তে বেরোবে শীগগিরই। ব্লুমফনটিন থেকে দেড়শো মাইল দূরে ওয়াটারভালে নাকি মাটির নীচে পোঁতা আছে এই সম্পদ।

জুলাই মাসের বারো তারিখে মামাকে নিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে মোলার। গাড়ীর পেছনে ছিল একটা গাঁইতি আর একটা কোদাল। ওয়াটারভালের খামারভাড়ীতেই মানুষ হয়েছিল ভ্যানউইক। কাজে কাজেই দুজন গোয়েন্দাকে পাঠিয়ে দিলাম তখুনি যদি কোনো হদিশ পাওয়া যায় এই আশায়। ঘণ্টা কয়েক পরেই এদেরই একজনের

কাছ থেকে টেলিফোন এল। সেইদিনই সন্ধ্যার সময়ে খামার বাড়ী ছেড়ে রওনা হয়েছে ভ্যানউইক আর তার ভাগ্নে। মিসেস সি জে হফম্যান ঐ অঞ্চলেই থাকেন। রাতের অন্ধকারে তাঁর বাড়ীতে নাকি ভ্যানউইক এসেছিল। গাড়ী খারাপ হয়ে গিয়েছিল তার। তাই মেরামত করার জন্যে একটা টর্চের দরকার হয়ে পড়েছিল। কিন্তু টর্চ দিয়ে ভ্যানউইককে সাহায্য করতে পারেন নি মিসেস হফম্যান। বলেছিলেন, রাতটা যদি তাঁর বাড়ীতেই কাটানো মনস্থ করে ভ্যানউইক তাহলে না হয় একটা শয্যার বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন তিনি। ভ্যানউইক কিন্তু রাজী হয় নি। আর দেরী না করে যেমন করেই হোক তখুনি নাকি তার যাত্রা আবার শুরু করা দরকার।

ওয়াটারভাল তল্লাস করার নির্দেশ পাঠালাম ফোন মারফত। তারপর খবরের কাগজের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিলাম মোলারের অন্তর্ধান কাহিনী এবং ভ্যানউইককে অনুরোধ জানলাম সে যেন তদন্তে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসে আমাদের পাশে। বহু প্রচলিত এই টোপ যে তাঁকে আকৃষ্ট করবে, এ রকম কোন দৃঢ় বিশ্বাস আমার ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য! জোহানেসবার্গ ষ্টারে খবরটা পড়ামাত্র প্রথম ট্রেন ধরেই সে রওনা হয়েছিল ব্লুমফনটিন অভিমুখে। নিশ্চয় আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে গেছে এবং ওকে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করিনি আমরা—এই ধারণার বশবর্তী হয়েই যে আমাদের ফাঁদে পা দিয়েছিল ও, সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমার।

ইতিমধ্যে আমার অনুচরেরা ওয়াটারভালে একটা শিয়ালের গর্তের হদিশ পেল। সম্প্রতি খোঁড়াখুঁড়ির চিহ্ন ছিল গর্তটার ওপর। তৎক্ষণাৎ মাটি সরিয়ে ফেলে ওরা এবং আবিষ্কার করে মোলারের কুণ্ডলী পাকানো লাশ। জমি থেকে প্রায় আড়াই ফুট নীচে মাটির মধ্যে মুখ গুঁজড়ে পড়েছিল দেহটা। জ্যাকেটের পেছনে ছিল একটা ছিদ্র। সে ছিদ্র শরীরের মধ্যেও প্রবেশ করেছে অনেকখানি। তীক্ষ্ণাগ্র কোনো হাতিয়ার দিয়ে চোট মারার ফলেই এই ছিদ্রের সৃষ্টি। ট্রাউজারের বোতাম দুটোও ছিঁড়ে গিয়েছিল কি এক অজানা কারণে।

পোষ্টমর্টেমে হাজির থাকার জন্যে মোটর হাঁকিয়ে গেলাম ওয়াটারভালে। মোটামুটি একটা ছাউনির নীচে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল লাশটা। মোমের ল্যাম্প জ্বেলে শুরু হলো পরীক্ষা পর্ব। চোখের সামনে বীভৎস দৃশ্য দেখেও নিজেদের সংযত করার বিদ্যে আয়ত্ত করতে হয় পুলিশ অফিসারদের। কিন্তু জন মোলারের সেই ভয়ঙ্কর পরিণতি কোনদিনই ভোলবার নয়। ডিমের খোলা ফেটে ফুটে গেলে যে রকম দেখতে হয়, ঠিক সেইভাবেই থেঁতো করা হয়েছিল বেচারার মাথার খুলিকে। আর শিরদাঁড়ার মূলে ঐ আঘাতচিহ্নের সৃষ্টি যদি মোলারের জ্ঞান টনটনে থাকার সময়ে করে থাকে, তাহলে যে কি অসীম যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে জ্ঞান লোপ পেয়েছে ওর, তা আর না বললেও চলে!

শিয়ালের গর্তে কিন্তু ধস্তাধস্তির কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। কাছাকাছি একটা ডোবার নীচে গাঁইতি আর কোদালটা পাওয়া গিয়েছিল। 'এস ভ্যান ডবলিউ' চিহ্নিত একজোড়া কাদামাখা মোজাও খুঁজে পেয়েছিল গোয়েন্দারা। ব্লুমফনটিনে ফিরে এসে দেখলাম কয়েক ঘণ্টা আগেই খবরের কাগজের আবেদন পড়ে পুলিস ষ্টেশনে হাজির হয়েছে ভ্যানউইক।

নির্বিকার মুখে ফাঁড়ির ভেতর লম্বা লম্বা পা ফেলে ঢুকে ডিউটি অফিসারকে বলেছিল ভ্যানউইক—'কাগজে পড়লাম আমার সঙ্গে দেখা করতে চান আপনারা। তাই প্রথম ট্রেনেই

ফিরে এলাম যদি আপনাদের কোনো কাজ লাগি এই আশায়।'

ভ্যানউইককে এরপর জানানো হলো যে আর তার সাহায্যের দরকার নেই। কেননা তার ভাগ্নের লাশ খুঁজে পাওয়া গেছে এবং খুনের অপরাধেই এখন তাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। ডিউটি অফিসারের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল যথেষ্ট। তাই ভ্যানউইকের কাছ থেকে তখুনি কোনো বিবৃতি নিতে সরাসরি অস্বীকার করলেন তিনি। তার কারণ সেই মুহূর্তেই যদি বিবৃতি নেওয়া হয় ওর কাছ থেকে তাহলে পরে হয়ত বলপূর্বক বিবৃতি আদায়ের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারেন তিনি এবং এই এক চালেই ফেঁসে যেতে পারে কেসটা।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই শোকাবহ শেষ দৃশ্যটার পূর্ণ অভিনয় করার জন্যে ভ্যানউইককে ওয়াটারভালে নিয়ে যাওয়ার আর্জি পেশ করলেন প্রতিবাদী পক্ষের আইনবিদ। বিচারবিভাগও মঞ্জুর করল সে আর্জি। সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে একজন ফটোগ্রাফার আর একজন ডাক্তারও গেলেন সেই দলে। শিয়ালের গর্তের কাছে এসে ঠিক কি ঘটেছিল সেদিন তা বলতে শুরু করল ভ্যানউইক।

আগের বছর প্রতারণার দায়ে গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় হুঁশিয়ার ভ্যানউইক একটা বাক্সের মধ্যে তিন হাজার পাউণ্ডের নোট ঠেসে বাক্সটাকে লুকিয়ে রেখেছিল বিশেষ একটা গোপন স্থানে। ওয়াটারভালের সেই বিশেষ স্থানটিতে। ওরা যখন পৌঁছালো তখন অমানিশার অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে।

'জমির উপরিভাগ থেকে আঠারো ইঞ্চির মধ্যে দুটো গর্ত দেখতে পেলাম আমরা। দুটো গর্তই বুজিয়ে ফেলা হয়েছে মাটি দিয়ে। ঠিক কোন গর্তটিতে যে বাক্সটি লুকিয়েছে তা যখন স্থির করতে পারলাম না, তখন স্থির করলাম দুটোই খুঁড়ে দেখা যাক। বেশ খানিকটা মাটি তুলে ফেলার পর কোদালটা সরিয়ে রেখে গাঁইতি তুললাম। বাক্সের ওপর যে পাথরটা চাপা দিয়ে গিয়েছিলাম, এই পাথরটা চাড় দিয়ে উঠিয়ে ফেলার জন্যেই তুলেছিলাম গাঁইতিটা।

'এই সময়ে মোলার বললে তার বড় তেষ্টা পেয়েছে। জিজ্ঞেস করলে কোথায় জল পাওয়া যাবে। বললাম, খানিক দূরেই একটা জলের কল আছে। কলটা দেখার জন্যেই ও যখন ধপ করে বসে পড়ল গর্তের কিনারায় তখনই আচমকা আমার মনে হলো গাঁইতি তোলার সময়ে হয়তো অজান্তে ওকে জখম করে ফেলেছি আমি। পেছন ফিরে দেখি টলমল করছে ও কিনারার ওপর। গাঁইতি ফেলে ওকে ধরতে গেলাম আমি কিন্তু তার আগেই মাথা নীচের দিকে করে পড়ে গেল ও গর্তের মধ্যে। এবং পড়লো আমারই ওপরে। সামলাতে না পেরে আমিও ছিটকে পড়লাম একদিকে। কানে ভেসে এল শুধু একটা ধপাস শব্দ।

''কান খাড়া করেও যখন আর তার কোনো শব্দ শুনতে পেলাম না তখন গর্তের মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে খুঁজে পেলাম ওর নেতিয়ে-পড়া দেহ। মাথার নীচেই পড়েছিল গাঁইতিটা। দেখলাম, বড় মারাত্মক জখম হয়েছে বেচারী। আর, তার পরেই অন্ধকার হয়ে গেল সব কিছু। এর পরে যে কি হয়েছে তা এখনও মনে করতে পারছি না আমি। এই শোচনীয় পরিণতির আকস্মিকতার আঘাত বোধহয় সামলাতে পারি নি—তাই লোপ পেয়েছিল চেতনা।''

'এর পর কি কি ঘটনা মনে পড়ে তোমার? প্রশ্ন করেন মিঃ এফ.পি.ডি.ওয়েট— কয়েদীর কৌঁসিলী।

"গাড়ীর কাছে আবার ফিরে আসার পরেই চেতনা ফিরে আসে আমার। মাথা ঘুরছিল। ইচ্ছে হয়েছিল গলা ছেড়ে আর্ত চীৎকার করি, ঈশ্বরের কাছে আবেদন জানাই যেন আমাকেও শেষ করে ফেলেন তিনি এইভাবে। গাড়ীর মধ্যে উঠে বসেছিলাম তারপর। গাড়ীতে স্টার্ট দেওয়ার পর ভাবলাম, অনেক.....অনেক দূর চলে যেতে হবে আমার, তা না হলে শান্তি পাবো না আমি।"

এরপর আবার অভিনয় করে দেখানো হলো সেই শোচনীয় দুর্ঘটনা। গর্তের মধ্যে নেমে গাঁইতি তুললে ভ্যানউইক। আর, কিনারায় বসে রইল তার কৌসিলী নিহত মোলার যে অবস্থায় বসেছিল হুবহু সেইভাবে। ফটোগ্রাফ নেওয়া হল এই দৃশ্যের এবং দেখা গেল শূন্যে আন্দোলিত গাঁইতির ফলাটা বাস্তবিকই আঘাত হানছে কিনারায় ঝুঁকে-বসা মানুষটার এমন একটা স্থানে যেখানে চোট পাওয়ার পরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে হতভাগ্য জন মোলার।

আগাগোড়া সমস্ত দৃশ্যটা দেখে ডাক্তারও বললেন যে বাস্তবিকই মোলারের পতন এবং মৃত্যুটি নিছক দুর্ঘটনা ছাড়া হয়তো আর কিছুই নয়। বললেন—"আমার তো মনে হয় তা খুবই সম্ভব। জ্যাকেট ছেঁদা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক ঐ জায়গাতেই মারাত্মক চোট পেয়েছে মোলার। আর তারপরেই ভ্যানউইক যেভাবে দেখালো, ঠিক ঐভাবেই সে তাল সামলাতে না পেরে গড়িয়ে পড়েছে গর্তের মধ্যে।"

মোজা ফেলে যাওয়া অথবা ডোবার মধ্যে গাঁইতি আর কোদাল রেখে যাওয়ার রহস্য কিন্তু ব্যাখ্যা করতে পারে নি ভ্যানউইক। জিনিসগুলো বলা ওর পক্ষে সম্ভব নয় এই কারণে যে তখনও নাকি ওর মনের আচ্ছন্নতা কাটে নি এবং সে সময়ে কি করেছে না করেছে তার বিন্দুমাত্র মনে নেই ওর। কিছুদিনের জন্যে মানসিক চিকিৎসালয়ে থাকতে হয়েছিল ভ্যানউইককে। কাজেই মোলারের মৃত্যুর রাতেও যে সে স্মৃতিহীনতায় আক্রান্ত হয়েছিল, তা বোঝা গেল ওর কাহিনী থেকে। মনোসমীক্ষকেরাও সমর্থন জানালেন এ কাহিনী শুনে। তাঁরা বললেন, ঐ রকম অবস্থার মধ্যে পড়লে তার পক্ষে স্মৃতি হারিয়ে ফেলা খুবই সম্ভব।

এ কেস যে শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখা যাবে না এবং সাফল্য যে এক রকম অসম্ভব তা প্রতিবাদী পক্ষের বিপুল তোড়জোড় দেখেই বুঝলাম। ১৯৩০ সনের ২১শে অক্টোবর ফ্রি ষ্টেটের বিচারপতি-সভাপতি স্যার ইটিন ভিলিয়ার্স এবং ব্লুমফনটিন ক্রিমিন্যাল সেসনের জুরীর সামনে হাজির করা হলো ভ্যানউইককে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অম্লানবদনে সে বললে অ্যাডভেঞ্চার করতে বেরিয়ে দুর্ঘটনায় মারা গেছে মোলার। বিশেষজ্ঞ সাক্ষীদেরও ডাকা হলো তার এই কাহিনীকে সমর্থন জানানোর জন্যে।

অভিযোগ সমর্থন করার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে অ্যাটর্ণী জেনারেল মিঃ ডব্লিউ.জি.হোল.কে.সি. বললেন ভ্যানউইকের বর্ণনা মত কিনারায় বসে ঝুঁকে পড়ে জলের কল দেখা মোলারের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। তাছাড়া, কাহিনীর সত্যতা প্রমাণের জন্যে যে ফটোগ্রাফ তোলা হয়েছে সেগুলিও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। কেননা, ফটোগ্রাফার নিজেও স্বীকার করেছে ক্যামেরা একপাশে সরিয়ে বিশেষ এক কোণ থেকে তোলা হয়েছিল ছবিগুলো। কাজে কাজেই কাহিনীর সত্যতা প্রমাণিত হওয়া দূরে থাকুক, সম্পূর্ণ মিথ্যা একটা ধারণাই প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস রয়েছে এসব ছবির মধ্যে। যেভাবে মোলার ঝুঁকে বসেছিল কিনারার ওপর এবং যেভাবে শূন্যে আন্দোলিত গাঁইতিটা এসে পড়েছিল তার পিঠের ওপর—তা কৌশলে তোলা

ছবি দিয়ে সৃষ্ট চোখের ধাঁধার জন্যেই সম্ভবপর বলে মনে হতে পারে—প্রকৃতপক্ষে তা একেবারেই অসম্ভব। এ শুধু ক্যামেরার বাহাদুরী ছাড়া আর কিছুই নয়।

ঘণ্টা তিনেক পরে জুরীরা ফিরে এসে রায় দিলেন 'আসামী নির্দোষ'। বুক ফুলিয়ে কাঠগড়া থেকে নেমে এল ভ্যানউইক। আইনের প্রহসনে এতটুকু আঁচড়ও লাগলো না তার দেহে।

পরের দিন রাস্তায় দেখা হয়ে গেল একজন জুরীর সঙ্গে। আমাকে দেখেই পথের ওপরেই তিনি দাঁড় করালেন আমাকে। তারপর, যেন দারুণ অন্যায় করেছেন, এমনিভাবে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিমায় বললেন—'এ ছাড়া আর কি করার ছিল বলুন? ভেবে দেখলাম, বিচারপতি নিজেই ওকে খালাস দেওয়ার পক্ষপাতী। তাই তাঁর বিরুদ্ধে যাওয়া সঙ্গত মনে করলাম না আমরা।''

উত্তরে আমি বললাম—'লিখে রাখতে পারেন, আজ থেকে ছ'মাসের মধ্যে আরও একটা খুনের অপরাধে ভ্যানউইককে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। দ্বিতীয়বার আর পিছলে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না ওর পক্ষে। তবে তার আগে আরও একটা প্রাণ নষ্ট হবে, এই যা দুঃখ।''

তিনমাস পরে আর একটা নৃশংস হত্যার খবর এল। নিহত ব্যক্তি জাতিতে ব্রিটিশ। নাম সিরিল প্রিগ টাকার। ট্রান্সভালে প্রিটোরিয়ার কাছে অ্যাপলেডুর্নয়ে একটা খামারবাড়ীর মালিক সে। তারই বাড়ীর কাছে মাটির মধ্যে থেকে উদ্ধার করা হলো তার দেহ। একটা বাক্সের মধ্যে লাশটা ঠেসে পুঁতে রাখা হয়েছিল একটা বড় ফাটলের মধ্যে। যে হাতুড়ি দিয়ে তাকে পিটিয়ে মারা হয়েছিল, রক্তমাখা সেই হাতিয়ারটাও ওয়াগন-হাউসের মধ্যে কাঠের গাদার নীচে পাওয়া গেল।

সন্দেহভাজন হত্যাকারীর চেহারার বিবরণ ছড়িয়ে দেওয়া হলো দেশময় পুলিশের দপ্তরে দপ্তরে। ছোটখাটো মানুষটি, টাক মাথা, ঝুলে পড়া গোঁফ। সম্ভবত ফ্রি ষ্টেটেরই বাসিন্দা সে। টাকারের সঙ্গে খামারবাড়ী কেনা সম্পর্কে কথাবার্তা চলছিল তার।

আমার ভবিষ্যৎবাণী অর্ধ সময়ের মধ্যেই অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। এবার কিন্তু মস্তিষ্ক বিকৃতির দোহাই শুনলেন না জুরীরা। পূর্ব-পরিকল্পিত এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত হত্যার রায় দিলেন তাঁরা। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলো ভ্যানউইক। শেষ কটা দিন বাইবেল পড়ে এবং ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেই কেটে গেল তার। ১৯৩১ সালের ১২ই জুন ফাঁসির দড়িতে দু'দুটো নরহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করে গেল সে।

কিছুদিন পরেই আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন মিসেস মোলার। মৃত্যুর ঠিক আগে তাঁর কাছে একটা চিঠি লিখেছিল ভ্যানউইক। চিঠিখানা আমার হাতে দিলেন উনি।

''বোন লুইসা,

ক্ষমা চাওয়ার জন্যে তোমার কাছে যেতে পারছি না আমি। যে শোক তোমায় দিয়েছি জানি না তার কোনো ক্ষমা আছে কিনা। বোন, আমিই খুন করেছি তোমার ছেলেকে। যিশুর দোহাই আমাকে ক্ষমা করো।

স্বীকার করছি, অকারণে তার জীবনে-প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছি আমি। যেখানে তাকে খুন করেছিলাম, আমার কোনো টাকাকড়িই পোঁতা ছিল না সেখানে। এই প্রথম আদালতে কেস জিতলাম আমি। আগাগোড়া ডাহা মিথ্যে বলেছি আমি। অন্যান্য কেসে সত্য বলেছিলাম

বলেই শাস্তি পেয়েছি বার বার।''

নিছক টাকার লোভেই দ্বিতীয় খুনটা করে ভ্যানউইক! বিক্রয়দলিল জাল করে টাকারের খামারবাড়ীর মালিক হয়ে বসার মতলবেই ভদ্রলোককে সরিয়ে দেয় পৃথিবী থেকে। লাশটাকে ফাটলের মধ্যে কবর দেওয়ার পর ধারণা ছিল শত চেষ্টা করলেও তা উদ্ধার করা কারোর পক্ষেই সম্ভব হবে না। একটা খুন করে অনায়াসেই যখন বুড়ো আঙ্গুল দেখাতে পেয়েছে সে আইনের রক্তচক্ষুকে, তখন আরও একটা করলেই বা ধরছে কে?

ভাগ্নে নিধনের মোটিভ পরিষ্কার হয়ে যায় যদি ধরে নেওয়া যায়—সত্যি সত্যিই সে বিশ্বাস করতো যে মোলার তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আগের চুরির ব্যাপারে। লুকোনো চোরাই টাকা উদ্ধারের অ্যাডভেঞ্চারে একসঙ্গে দুজনের যাওয়া থেকেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে আগের চুরির ব্যাপারে মোলারেরও হাত ছিল। শেষ মুহূর্তের অনুতাপের দহনে জ্বলতে জ্বলতে ভ্যানউইক ভাগ্নের নাম মুছে দিয়েছিল এ কলঙ্ক কাহিনী থেকে। বোনকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছিল, তার ছেলে এমন কোনো জঘন্য কাজ করেনি যে তার জন্যে লজ্জিত হতে হবে পরিবারের আর সবাইকে।

অসুন্দর পথে নোংরা জীবন-পর্বে বোধ করি এইটাই তার একমাত্র সুন্দর কীর্তি। □

* উইলিয়াম বিনী (দঃ অফ্রিকা) রচিত কাহিনী অবলম্বনে।

ব্লেড, ক্রীম আর ঘুমের বড়ি

কর্মজীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কেসটিকে কোন তরুণ গোয়েন্দাই ভুলতে পারে না। তার কারণ সে সময়ে সে স্বপ্ন দেখে বুঝি বা এর সফল পরিসমাপ্তির ওপরেই নির্ভর করছে তার সারা ভবিষ্যৎ। যদিও এমনতর ধারণায় সত্যের ছিটেফোঁটাও নেই। পরে অবশ্য পরিণত বুদ্ধি দিয়ে, আরও পরিষ্কারভাবে বিচারবিবেচনা করার শক্তিলাভের পর সে উপলব্ধি করতে পারে কতখানি আজগুবি আর অলীক ব্যাপারের ওপর তার সম্ভবপর সাফল্য আর ব্যর্থতা নির্ভর করেছে। এই জাতীয় অকুতোভয় স্পার্টান দর্শনবাদ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভের পরেই সে গোয়েন্দাগিরিতে আরও পারদর্শী হয়ে উঠতে থাকে। এ জ্ঞানলাভের পথটি কিন্তু কুসুমাস্তীর্ণ নয়। আমার বেদনাময় অভিজ্ঞতা থেকেই আমি তা জেনেছি।

আজ আমি বেলগ্রেডের পুলিশ চীফ। কিন্তু এত বছর পরেও সেদিন ব্যর্থতার কামড় আমার তরুণ মনকে স্বভাবে দংশেছিল এবং যে নিদারুণ নিরাশা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল—আজও তা ঠিক তেমনিভাবেই উপলব্ধি করতে পারি। সে সময়ে বেলগ্রেডের হেড কোয়ার্টারে ছিলাম অতি কম মাইনের গোয়েন্দা হিসেবে। যুগোশ্লাভিয়ায় তখন রাজতন্ত্র-শাসন কায়েমী রয়েছে। সালটা ১৯৩৪। গ্রীষ্মকাল। আমার ঠিক ওপরকার চীফ তার ছোট্ট অফিসঘরে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন—'জোসেফ, তুমি আমেরিকায় যেতে চাও?'

সেদিনকার আতীব্র উত্তেজনা আজও আমি মনে করতে পারি। প্রস্তাবটা শুনেই চট করে শুধিয়েছিলাম—'আপনি কি সত্যি সত্যিই যেতে বলছেন আমাকে? আমার কপাল ভাল, কিছু কিছু ইংরেজি আমি বলতে পারি।'

'সুযোগটা তোমাকে দেওয়া হচ্ছে শুধু ঐ কারণেই। এই ফাইলটা নিয়ে যাও। খুব মন দিয়ে কাগজগুলো পড়ে ফ্যালো। বছরের পর বছর অপরাধীদের যত রেকর্ড আমরা সংগ্রহ করেছি, তার মধ্যে সবচেয়ে সম্পূর্ণ রেকর্ড হচ্ছে এটি। লোকটাকে আমি অন্য দেশের শাসনের আওতা থেকে টেনে এনে এদেশের শাসনব্যবস্থার এখ্তিয়ারে ফেলতে চাই। কি করে তুমি তা করবে তা আমি জানতে চাই না। আমি শুধু চাই, বিচারের জন্যে তাকে তুমি যুগোশ্লাভিয়ার মাটিতে নিয়ে এসো। বহুদিন ধরে অনেক নারীকে শিকার বানিয়েছে সে। তার অগুন্তি হলেও -হতে পারে বউয়ের অন্ততঃ একজনকে যে সে খুন করেছে, সে বিষয়েও আমাদের মনে আর কোন দ্বিধা বা সন্দেহ নেই। তার একমাত্র উপযুক্ত স্থান হচ্ছে যুগোশ্লাভ কারাগার।'

আইভান পোডারজে-র অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রথম খবর এইভাবেই কানে পৌঁছোলো আমার। জন্ম তার যুগোশ্লাভিয়ায়। পেশায় সে পয়লা নম্বরের ভণ্ড। বহু নারীকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে সে এবং ধনবতী মহিলাদের সংখ্যাই তাদের মধ্যে বেশী। তার পিছু নিয়ে ইউরোপ থেকে যেতে হয়েছে আমেরিকায়, আবার ফিরে আসতে হয়েছে ব্রিটেন, ফ্রান্সে, জার্মানীতে আর অষ্ট্রিয়ায়। শেষকালে ওয়াল্ট্স্ আর প্রেটার ভায়োলেটের শহর ভিয়েনায় মুখোমুখি হয়েছিলাম তার।

কেসটা হাতে নেওয়ার একমাস পরেই নিউইয়র্কে হাজির হলাম আমি। কেসটা সম্বন্ধে তখন কত আশা, কত স্বপ্নই না ছিল আমার মনে। ভাবতাম যে লোকটাকে গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করার গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমার কাঁধে, তাকে হাতের মুঠোয় আনার তদন্ত-পর্বের এই বুঝি প্রথম পর্যায়। ভাবতাম, এ তদন্তের অন্তে সাফল্য থাকবেই এবং ধুরন্ধর বদমাসটাকে আমি গ্রেপ্তার করবোই। কেসটার প্রাথমিক কাজ দেখেই আমার হুঁশিয়ার হওয়া উচিত ছিল। পোডারজের ধড়িবাজি আর পিছলে বেরিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা এত বেশি যে, বঁড়শিতে গাঁথা হতভাগিনীদের অর্থে সে শুধু বিলাসবহুল জীবনই যাপন করেনি, তার প্রাপ্য শাস্তিকে এক ধাপ টপকে যাওয়ার মত বুদ্ধিমত্তা যে তার মগজে আছে, তা আমার বোঝা উচিত ছিল।

লোকটার গতিবিধি সম্বন্ধে খুবই আবছা খবর রাখত আমেরিকার ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেণ্ট। গত বছরের আগে যুগোশ্লাভ কন্টিন্জেন্টের কেউই নাকি তাকে দেখেনি। কিন্তু নিউইয়র্কের পুলিশবাহিনীর কাছ থেকে সব সময়ে সব রকম সাহায্য আমি পেয়েছিলাম। তাঁরাই আমাকে জানালেন, কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিপথ থেকে বেমালুম উধাও হয়ে যাওয়ার কিছু আগেই পোডারজে নাকি আবার বিয়ে করেছিল। মেয়েটির নাম অ্যাগনেস টাফভারসন। শহরের নামকরা কর্পোরেশন আইনবিদ সে। বয়স প্রায় তেতাল্লিশ। দারুণ ধূর্ত। বিয়ের আগে পর্যন্ত একটু নিরিবিলি নিঃসঙ্গ জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল সে।

মানহাট্টানে 'লিটল চার্চ অ্যারাউণ্ড দ্য কর্ণার'-এর মিনিষ্টারের কাছ থেকে কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ করলাম আমি।

ভদ্রলোক বললেন—"কিছুদিন আগেই এক যুগোশ্লাভ ভদ্রলোকের বিয়ের খুঁটিনাটি তদারক করতে হয়েছে আমাকে। বিয়ের সাক্ষীরা আসলে তাঁকে চিনতই না। এই গ্রামেরই বাসিন্দা তারা। খুব শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয় বিয়ের অনুষ্ঠান। তারপরেই গাড়ী হাঁকিয়ে চলে

যান বর-বউ। আর তাঁদের দেখা যায় নি।"

অন্যান্য সূত্র থেকে অ্যাগনেস টাফভারসনের কুক্ষণে-শুরু রোমান্সের কাহিনীও শুনতে পেলাম। বিয়ের কয়েকমাস আগে সে ইউরোপে গিয়েছিল ছুটি উপভোগ করতে। তখনই ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরাতে তার সঙ্গে আলাপ হয় পোডারজে-র। মেয়েদের চিরকালই চুম্বকের মত কাছে টেনে আনতে পারে পোডারজে। অ্যাগনেসের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটলো না। পোডারজেকে ভীষণ ভাল লেগে গেল তার। অ্যাগনেসকে পোডারজে বুঝিয়ে দিলে সে যুগোশ্লাভিয়ার অবসরপ্রাপ্ত আর্মি অফিসার। নিজের সম্পত্তিও আছে যথেষ্ট। নিজস্ব কতকগুলো পেটেন্ট কৌশল প্রয়োগ করাই পছন্দ করত পোডারজে। ব্যবসা সম্পর্কিত নানাবিধ ঝুঁকি নেওয়ার সময়ে আন্তর্জাতিক সর্ম্পক স্থাপন করতে পারলে বিস্তর আমোদ পেত। হাবভাব রীতিমত মার্জিত আর শিক্ষিত ছিল সে। আন্তর্জাতিক আইন কানুনও কিছু কিছু জানত। যখনই দেখা হতো দুজনে, খট করে গোড়ালি ঠুকে সম্ভ্রমভরে অ্যাগনেসের হাতে চুম্বন এঁকে দিত পোডারজে। আর তাইতেই গলে গেল অ্যাগনেসের মন! অ্যাগনেস নিজেও কিন্তু বিলক্ষণ ধূর্ত ছিল। ধীশক্তিও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু মেয়েদের প্রতি কোন পুরুষ যে এতখানি আদবকায়দা আর শিষ্টাচার দেখাতে পারে, তা তার আগে জানা ছিল না। অন্ততঃ তার বরাতে এমনটি এর আগে আর জোটেনি। বিশেষ করে ঐ রকম বিপজ্জনক বয়েসে, যে বয়েসে প্রেমমাত্রই একদম অন্ধ, সে বয়েসে চিত্তজয়ের এই অভিনব পন্থাটির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম যা হবার, তাই হলো।

মায়াবী জাদুকরের মতই অ্যাগনেসকে মোহমুগ্ধ করে ফেললে পোডারজে। কিন্তু প্রথম থেকেই হুঁশিয়ার হয়ে প্রেমাস্পদ সম্বন্ধে যদি একটু খোঁজ-খবর করতে অ্যাগনেস, তাহলেই অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্যই জানতে পারত সে। চওড়া-কাঁধ কোঁকড়া চুল পোডারজেকে দেখে কিন্তু তার সত্যিকারের বয়েসের চাইতে অনেক কম বয়েসী বলেই মনে হতো। এই কান্তিমান প্রিয়ংবদ মানুষটি যে আসলে একটা পাকা ঠগ—তা জানতে তার বেশী সময় লাগত না। তার সন্ধানে শুধু যে তার স্বদেশের পুলিশই ঘুরছে তা নয়-বহু জায়গার পুলিশবাহিনী বিভিন্ন ধরনের বিস্তর আইনবিগর্হিত কার্যকলাপের জন্যে তাকে খুঁজছিল। এসব অপরাধের মধ্যে গভর্নমেন্ট এবং আর্মি অফিসারের ছদ্মবেশ ধারণও আছে। কিন্তু বুদ্ধিমতী হওয়া সত্ত্বেও এই ঝামেলাটুকুর মধ্যে আর যেতে চায়নি অ্যাগনেস। তার কারণও ছিল। প্রথমত সে নারী তার ওপর প্রেমে অন্ধ। দ্বিতীয়ত মনচোর প্রিয়জনের সঙ্গে ইউরোপের বড় বড় শহরগুলো দেখতে পাওয়ার সুখ স্বপ্নেও সে তখন মশগুল। পোডারজেও হচ্ছে সেই ধরনের লোক, যে জাতিগত সঙ্কীর্ণতার অনেক ঊর্ধ্বে সব দেশকেই যে স্বদেশ মনে করে এবং এদিক দিয়ে তার অভিজ্ঞতাও বড় কম নেই। কাজে কাজেই দেশবিদেশের হরেকরকম গল্প শুনিয়ে অ্যাগনেসের মনের আকাশে রাশি রাশি রঙের স্বপ্ন ছড়িয়ে দিতে বিন্দুমাত্র কসুর করলে না সে। ভিয়েনায় একসঙ্গে নাচলে ওরা দুজনে। নিউইয়র্কের রক্ষণশীল কোন মহিলার কাছে এ অভিজ্ঞতা তো নিদারুণ রোমাণ্টিক মর্মস্পশী এবং কোনদিনই ভুলতে পারা যায় না।

অ্যাগনেস নিউইয়র্কে ফিরে এল বন্ধুবান্ধব আর ব্যবসায়ী মহলের পরিচিত সবাই লক্ষ্য করলে সুখ আর আনন্দ যেন উপছে তার মনের দুকূল ছাপিয়ে, ঝরে পড়ছে তার চোখে, মুখে, হাসিতে। শুধু তাই নয়। তার বয়সও যেন কমে এসেছে অনেকটা। পোডারজের প্রতীক্ষায়

ছিল অ্যাগনেস। কয়েকদিনের মধ্যেই রওনা হলো সে। ১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে যুগোশ্লাভের পুলিশ যখন তাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজছে, ঠিক তখনই জাহাজে চেপে পাড়ি দিলে সে আমেরিকার দিকে। নিউইয়র্কে পৌঁছে আস্তানা নিলে গ্রেমার্সি পার্কের একটা ছোট্ট হোটেলে।

পুনর্মিলনের কিছুদিন পরেই অসুস্থ হয়ে পড়ে অ্যাগনেস। সুযোগটাকে পুরোমাত্রায় কাজে লাগালে পোডারজে। অ্যাগনেসের প্রতি তার অনুরাগ যে কতখানি গভীর তা এই সুযোগে অন্তরস্পর্শী অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দিলে ও। কথাবার্তা আদবকায়দায় তো তার জুড়ি মেলা ভার। তার ওপর মনটাও যে কতখানি নরম—তা প্রমাণিত হোল তখনই। সুস্থ হয়ে উঠলে ডিনার, কনসার্ট আর ব্রডওয়ে শো নিয়ে কদিন খুব ফুর্তি করলো দুজনে।

ওদের প্রাক্‌বিবাহ প্রেমপর্বের শেষ পর্যায়টা কিন্তু খুবই সংক্ষিপ্ত। ঐ বছরের ডিসেম্বরের চার তারিখে বিয়ে হয়ে গেল ওদের। যে ফ্ল্যাটে দীর্ঘদিন একাকী নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেছে অ্যাগনেস, বিয়ের পর পর সেই ফ্ল্যাটেই উঠে এলো পোডারজে। সবকিছুই ঘটে গেল খুবই তাড়াতাড়ি। অ্যাগনেসের ফ্যামিলির সঙ্গে পোডারজের কোনদিনই দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। বিয়ের রাতে অ্যাগনেস ডেট্রয়েটে তার বাড়ীতে আর মন্ট্রিয়ালে তার বোনকে টেলিফোন করে জানালে বিবাহসংবাদ।

কাকপক্ষীকে না জানিয়ে বিয়ে শেষ করার কারণ বোঝাতে গিয়ে অ্যাগনেস বলেছিল—"ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে তোমাদের কাউকেই আমন্ত্রণ জানাতে পারলাম না। ছ'ঘণ্টা আগেও আমি জানতাম না যে বিয়ে করতে চলেছি আমি। কিন্তু বিশ্বাস করো মানুষটিকে দারুণ ভালবাসি আমি। সারা দুনিয়ার এমন চমৎকার মানুষ আর দুটি নেই।"

অ্যাগনেসের আত্মীয়স্বজনেরা পরে আমাকে বলেছিল পোডারজেও নাকি টেলিফোনে কথা বলেছিল তাদের সঙ্গে। বলেছিল—"মধুচন্দ্র যাপন করতে আমরা ইংল্যাণ্ড রওনা হচ্ছি। সেখান থেকে জার্মানীতে আমার এষ্টেটে কয়েকটা দিন থাকব। সত্যি কথা বলতে কি মাস ছয়েকের আগে অ্যাগনেসের সঙ্গে আপনাদের আর দেখাই হবে না। জার্মানী থেকে আমরা যাবো যুগোশ্লাভিয়ায়। যে দেশে আমার জন্ম, অ্যাগনেসকে আমি নিয়ে যেতে চাই সে দেশের মাটিতে।"

ছ'মাসব্যাপী মধুচন্দ্রের প্রস্তুতি নিয়ে কিছুদিন ব্যস্ত রইল অ্যাগনেস। কেনাকাটা করা, প্যাক করা ছাড়াও টাকা-কড়িরও একটা পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করতে হলো ওকে। ব্যাঙ্ক থেকে ২৫০০০ ডলার তুলল ও। ৫০০০ ডলার বাদে পুরো অর্থটাই তুলে দিলে তার প্রিয় 'ক্যাপ্টেনে'র হাতে। স্বামীকে সে ক্যাপ্টেন বলেই জানত। টাকা রাখা হলো একটা জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে। বাকী টাকাটা পাঠিয়ে দেওয়া হলো লণ্ডনে। ডিসেম্বর মাসের কুড়ি তারিখে ওদের ইংল্যাণ্ড রওনা হওয়ার দিন ধার্য হয়েছিল। ওদের মানে, ক্যাপ্টেন আর মিসেস পোডারজের। জাহাজটার নাম 'হামবুর্গ'। সে সময়ে নাৎসীদের পতাকা উড়ত হামবুর্গের ওপর।

যাত্রার দিনটি এগিয়ে আসতে থাকে। অ্যাগনেস একদিন জাহাজে গিয়ে কিছু মালপত্র রেখে এল তার কেবিনে। কেবিনটা শুধু তার একার জন্যেই বুক করা হয়েছিল। যাত্রীদের তালিকায় তার স্বামীর নাম ছিল না। নামটি যে কেন বাদ গেল এবং এই বাদ দেওয়ার পেছনে কোন কুমতলব আছে কিনা—এ ধরনের কোন সন্দেহ অ্যাগনেসের প্রণয়-নিবিড়

মগজে স্থান পায়নি। স্বামীর ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। পোডারজে বউকে কি বুঝিয়েছিল, তা কোনদিনই জানা যায় নি। তবে অ্যাগনেসের পরিচারিকা ফ্লোরা মিলারের কাছে জানা গেছিল মিসেস পোডারজে নাকি তাকে বলেছিলেন যে ব্যবসা-সম্পর্কিত কিছু কাজকর্মের জন্যে কিছুদিন পরে রওনা হবেন তাঁর স্বামী।

কয়েকজন সাক্ষী বললে, পোডারজে নাকি তাদের কাছে এমন একটা দোকানের ঠিকানা চেয়েছিল যেখানে দেশভ্রমণের উপযুক্ত একটা পেল্লায় ট্রাঙ্ক কিনতে পাওয়া যায়। সমস্ত জামাকাপড় সে একটা ট্রাঙ্কে রাখাই পছন্দ করে—বিশেষ করে সাগরপাড়ি দেওয়ার সময়ে। থার্ড এভিন্যুতে এমনি একটা দোকান পেয়েছিল সে। মস্ত বড় একটা পুরোনো ট্রাঙ্কও কিনেছিল। ডেলিভারী দেওয়ার পর তারই নির্দেশমত ট্রাঙ্কটা রাখা হলো বাড়ীর নিচের তলায়। সেই রাতেই সেকেণ্ড এভিন্যুতে সাইমন ফেইনগোল্ডের ওষুধের দোকানে গেছিল পোডারজে। ইউরোপের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা চলে দুজনের মধ্যে। ফেইনগোল্ড একবার বলেছিলেন, এ অবস্থায় পোডারজের আত্মীয়স্বজনের জীবনের আশঙ্কা পদে পদে। শুনে হেসে উঠেছিল পোডারজে। তার বিশ্বাস জার্মানীর হর্তাকর্তা হিসেবে আর বেশীদিন টিকে থাকতে হবে না হিটলারকে। দশ ডলার দামের দাড়ি কামানোর ব্লেড, মুখে মাখার ক্রীম, আর ঘুমের বড়ি কিনে ছিল ও। সমুদ্রযাত্রার জন্যে নাকি এগুলো তার দরকার। নিউইয়র্ক ষ্টেট ল'র বিধান অনুসারে ঘুমের বড়ির ক্রেতা হিসেবে রেজিষ্টারে সই দিয়ে গেছিল পোডারজে।

দোকান থেকে সিধে ফ্ল্যাটে বউয়ের কাছে ফিরে আসে ও। এসে দেখে অ্যাগনেসকে জিনিসপত্র গুছোতে সাহায্য করছে পরিচারিকা ফ্লোরা মিলার। অনেক রাত হয়ে গেছিল। সারাদিন বড় খাটুনি গেছিল ফ্লোরার। তাই পোডারজে ওকে তখনকার মত ছুটি দেয় এবং বলে পরের দিনও তার ছুটি রইল আজকের অতিরিক্ত খাটুনির দরুন।

একটু পরেই দরজায় টোকা শোনা যায়। টোকা দিচ্ছিলেন ওষুধের দোকানের মালিক ফেইনগোল্ড। পোডারজের কাছ থেকে বিশ ডলারের বিল নিয়ে বাকী ডলার ফেরত দেওয়ার সময়ে তিনি দুটো ডলার বেশী দিয়ে ফেলেছেন। দরজাটা সামান্য ফাঁক করে ফেইনগোল্ডের কথা শুনেছিল পোডারজে। তারপর ফাঁক দিয়ে বাড়তি ডলার ঠেলে দিয়ে রেগেমেগে দড়াম করে বন্ধ করে দিয়েছিল দরজার পাল্লা।

পরের দিন অ্যাগনেসকে দেখা গেল না। সন্ধ্যের আগে পর্যন্ত তার স্বামীরও পাত্তা পাওয়া গেল না। সন্ধ্যের সময়ে বাড়ী ফিরে একতলা থেকে ট্রাঙ্কটা নিজে ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে লিফ্‌ট্‌-এ তুলে দিলে সে। পরের দিন সকলে উঈসবার্জার ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীকে খবর দিলে ট্রাঙ্কটা নিয়ে যাওয়ার জন্যে। হোয়াইট ষ্টারের জাহাজ 'অলিম্পিকে' ট্রাঙ্কটা তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল পোডারজে। পোডারজের পরিকল্পনামত বন্দোবস্তের কিছু কিছু একজন কেরানী জানতো। ও তাকে বুঝিয়েছিল—''আমার স্ত্রী আগেই রওনা হয়ে গেছে। ইংল্যাণ্ডেই তার সঙ্গে দেখা হবে আমার।'' ২২শে ডিসেম্বর ফ্ল্যাটে ফিরে এসেছিল পরিচালিকা ফ্লোরা মিলার। তার জন্যেও একটা গল্প বানিয়ে রেখেছিল 'ক্যাপ্টেন'। বলছিল—'কয়েক দিনের জন্যে ফিলাডেলফিয়া গেছেন মাদাম।''

রওনা না হওয়া পর্যন্ত 'ক্যাপ্টেনের' টুকিটাকি কাজ করে দিলে ফ্লোরা। 'অলিম্পিকে' নিয়ে যাওয়ার জন্যে উঈসবার্জার কোম্পানী তার চারটে ট্রাঙ্ক আর অন্যান্য মালপত্র বুঝে

নিতে এলে, পোডারজে কিন্তু তার 'ক্যাপ্টেন'-সুলভ পদমর্যাদা আর সম্ভ্রান্ত ঘরের অভিজাত পুরুষের চালচলনটা পুরোপুরি বজায় রাখতে পারলে না। মালপত্র বওয়ার কাজে একরকম জোর করেই নিজেও হাত লাগালে। শুধু তাই নয়। ট্রাক ড্রাইভারের সঙ্গে জেটি পর্যন্ত গেল এক গাড়ীতে মালপত্রের সঙ্গে, সেখানে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মালপত্র ঠিকমত নামানো হচ্ছে কিনা, তার তদারকি করলে। এমন কি, যেভাবে তার হুকুম-মাফিক মাল নামানো উচিত, তা ঠিকমত তামিল না হওয়ায় দুচারবার তো অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজও করতে ছাড়লে না।

অর্ধেক মালপত্র নিয়ে যাওয়া হলো ডেকের নীচে। বাকী মাল, তার মধ্যে বিশাল ট্রাঙ্কটাও ছিল, রাখা হলো পোডারজের কেবিনে। ওর সৌভাগ্যক্রমে কি দুর্ভাগ্যক্রমে তা জানি না, পোডারজের বরাতে যে কেবিনটি জুটেছিল সেটি একদম নীচের ডেকের—জলরেখার ঠিক ওপরেই। ছোট্ট কিন্তু বেজায় আরামপ্রদ কেবিনটা। পোর্ট হোলের ভেতর দিয়ে কোন কিছু সাগরের জলে ফেলে দেওয়াটাও মোটেই কঠিন কাজ নয়।

যাত্রা শুরু হওয়ার সময় ঘনিয়ে এলে নিজের কেবিনে সেঁধিয়ে পড়ল পোডারজে। সদ্যবিবাহিত হলেও তখন সে বধূহীন। অ্যাগনেসকে কেউই দেখেনি। সে কোথায় অথবা কি অবস্থায় আছে—তা কেউ জানত না। কিন্তু পোডারজের দিব্বি হাসিখুশী মেজাজে এতটুকু বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। বেয়াড়া ধরনের কোন প্রশ্নেরও সম্মুখীন হতে হলো না তাকে।

ছদিনের যাত্রায় কিছু চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটল না। কেবিন ছেড়ে একেবারেই বাইরে বেরোয় নি পোডারজে। তাতে অবশ্য আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বহু প্যাসেঞ্জারই তার মত কেবিন ছেড়ে বাইরে আসা পছন্ত করেনি সমুদ্র-পীড়ার ভয়ে।

'অলিম্পিকে'র ষ্টুয়ার্ডের সঙ্গে অনেক কথা হলো আমার। আমার আগেই অবশ্য নিউইয়র্ক পুলিশও তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে গেছিল।

আমার প্রশ্নের উত্তরে সে বললে—"ক্যাপ্টেন পোডারজে মানুষটি ভারী চমৎকার। অল্প কথা বলার স্বভাব তাঁর একেবারেই নেই। সারবিয়ান চাষা আর তাদের খাসা খানা সম্বন্ধে কথা বলতে দারুণ ভালবাসতেন তিনি। আমার মনে হয় ইউরোপের জন্যে তাঁর প্রাণ কেঁদেছিল বলেই ফিরে চলেছিলেন উনি। একবার কথায় কথায় আমাকে বলেছিলেন—আমেরিকা আমার জন্যে নয়। বেজায় বড় এই দেশটা। আর, এখানকার প্রতিটি লোক দিনরাত হন্যে হয়ে ছুটছে টাকার পেছনে। যে দেশে জীবনে এত সংঘাতময়, সে দেশের তোয়াক্কা করি না আমি।"

ষ্টুয়ার্ডের কাছে পোডারজে গল্প করেছিল সে নাকি একটা নতুন ধরনের সিন্দুক বিক্রী করতে এসেছিল আমেরিকায়। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে তার প্রচেষ্টা।

জিজ্ঞেস করেছিলাম—'ট্রাঙ্কটা তাঁকে কি কোনদিন খুলতে দেখেছেন?"

'ইয়েস, স্যার, হামেশাই দেখেছি। একবার ভেতর থেকে একটা নেকটাই বার করে আবার ভেতরে রেখে দিয়েছিলেন উনি।"

"কেবিনের মধ্যে কোন বিটকেল গন্ধ পেয়েছিলেন কি?"

"না স্যার, ও ধরনের কোন গন্ধ তো ছিল না!"

পরে আমি জেনেছিলাম 'ক্যাপ্টেনে'র জন্যে আরও একজন অপেক্ষা করেছিল ইংল্যাণ্ডে।

নাম তার মার্গারিট সুজান বাট্রাণ্ড পোডারজে—তার আইন-সম্মত বউ। মার্গারিটের সঙ্গে বিয়ে হয় ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে। শুধু তিনজন নারীকেই সারা জীবনে বিয়ে করেছিল পোডারজে—অ্যাগনেস ছিল এই তিনজনেরই একজন। এ ছাড়াও তার হবু-পত্নীর সংখ্যা বড় কম ছিল না।

যুগোশ্লাভের রেকর্ড ঘেঁটে আমি জেনেছিলাম, বেলগ্রেডের একটি মহিলাকেও 'বিয়ে' করেছিল পোডারজে। প্রচুর অর্থ পকেটস্থ করে রাতারাতি মেয়েটাকে পথে বসিয়ে যায় সে।

পোডারজের সঙ্গে বিচ্ছেদজনিত বিরহবেদনা এতটুকু স্পর্শ করেনি মার্গারিটাকে। অন্তত বাইরে থেকে দেখে তো তাই মনে হয়েছিল। দুজনের স্বচ্ছলভাবে চলে যাওয়ার উপযুক্ত টাকা না আনা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না তার। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দরকার তার এবং তা যেনতেন-প্রকারেণ পেলেই হলো। স্বামীকে লেখা তার একটা চিঠি পরে পেয়েছিলাম। নিউইয়র্কে ক্যাপ্টেনকে লেখা এই চিঠিটায় সে লিখেছিল ঃ

"কিভাবে তুমি টাকা রোজগার করো তা আমি জানতে চাই না। এন্তার টাকা জমিয়ে যাও—যে কোন পন্থায় প্রচুর টাকা রোজগার করে এনে দাও আমাকে। সে টাকা কিভাবে আসছে, তা নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই। যে চালে আমরা চলতে চাই, সে চালে চলার মত যথেষ্ট অর্থ পেলেই আমার হলো।"

লণ্ডনে পোডারজে এসে পৌঁছোলে স্বমূর্তি ধারণ করলো মার্গারিট। অ্যাগনেসের জড়োয়া গয়নাগুলো নতুন ডিজাইনে বানিয়ে নেওয়া হলো। পোশাকগুলোও নতুন করে কেটে সেলাই করা হলো মার্গারেটের গায়ের মাপে। নিপাত্তা মহিলার ২৫০০০ ডলারেরও আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

অ্যাগনেসের আত্মীয়স্বজনরা জানত 'স্বামী'র সঙ্গেই ২০শে ডিসেম্বর হামবুর্গ রওনা হয়েছে অ্যাগনেস। কয়েক হপ্তা পরে লণ্ডন থেকে মনট্রিয়লে স্যালি টাফভারসনের কাছে একটা টেলিগ্রাম এসে পৌঁছোলো ঃ

"এখানকার আবহাওয়া ভাল লাগছে না। ভারতবর্ষের দিকে চলেছি। পরে চিঠি লিখবো। —অ্যাগনেস।"

তিন মাস পরে ১৯৩৪ সালের এপ্রিলের শেষাশেষি ভারতবর্ষ বা পৃথিবীর কোনও দেশ থেকে কোনও খবর এসে পৌঁছলো না পরিবারবর্গের কাছে। মহা চিন্তায় পড়লেন স্যালি টাফভারসন। না ভেবেচিন্তে তো কোন কাজ করার অভ্যেস নেই অ্যাগনেসের। বুদ্ধি বিবেচনাও ওর প্রচুর। বোনেদের মধ্যে বয়েসে সবচেয়ে বড় বলে স্যালির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতাটা একটু বেশী। আর তাই এ রকম চুপচাপ থাকাটা তো অ্যাগনেসের পক্ষে শোভা পায় না।

নিউইয়র্কে এসে পৌঁছোলেন স্যালি টাফভারসন। দেখা করলেন নিরুদ্দেশ ব্যক্তিদের পুলিশ ব্যুরোর প্রধান ক্যাপ্টেন জন জে আয়ারস-এর সঙ্গে।

"নেহাতই ছেলেমানুষী বলে মনে হয় তাই নয়? দেহ-মনে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে যে মেয়েটি, আইনবিদ্ হিসেবেও সুনাম কিনেছে যে, সে কিনা হঠ্ করে বিয়ে করে বসলো একজন বিদেশীকে এবং তারপরেই পা বাড়ালো দেশের বাইরে। সে যাই হোক, কিন্তু এই চুপচাপ থাকাটাই যে বেজায় ভাবিয়ে তুলেছে আমায়। তিন মাস একটা খবর নেই, অদ্ভুত নয় কি? ওদেরকে খুঁজে বার করার কোন উপায় কি নেই?" ক্যাপ্টেন আয়ারস্‌কে শুধিয়েছিলেন স্যালি।

এই সাক্ষাৎকারের ফলেই বেলগ্রেডে একটা টেলিগ্রাম এসে পৌঁছলো আমাদের দপ্তরে। আইডান পোডারজের কুলজি জানাতে হবে। টেলিগ্রাম পেয়েই পোডারজের ক্রিমিন্যাল রেকর্ডের খুঁটিনাটি পাঠিয়ে দিলাম আমরা। সেই সঙ্গে প্রস্তাব করলাম তদন্তে সাহায্য করার জন্যে এখান থেকে কাউকে পাঠালে ভাল হয় না কি? দীর্ঘদিন ধরে যার সন্ধানে আমরা ঘুরছি, তাকে তো আমাদেরও গ্রেপ্তার করা চাই।

আর, এইভাবেই শুরু হলো একটি মানুষের পেছনে দীর্ঘদিন ধরে যাওয়ার পালা। গেলাম নিউইয়র্কে। গেলাম পৃথিবীর আরও অনেক দেশে। দেশে দেশে ঘুরেছি একটি মাত্র লক্ষ্যকে সামনে রেখে, যেভাবেই হোক জালে ফেলতে হবে পোডারজেকে। কিন্তু খুবই অল্প সংখ্যায় আসতে লাগল সূত্রগুলো। তারপর নিউইয়র্ক ত্যাগ করার সময় ঘনিয়ে এল, রওনা হলাম ফ্রান্স অভিমুখে। প্যারীতে পৌঁছে গেলাম ইন্টারপোল-এর (ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ অরগ্যানাইজেশন) অফিসে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়ে গেল ছদ্ম ক্যাপ্টেনের নামে।

কিন্তু অত্যন্ত তুখোর আর সাপের মতই পিচ্ছিল সে। শেষকালে একটা খবর পেলাম। ভিয়েনায় মিষ্টার এবং মিসেস পোডারজে নামে এক দম্পতিকে দেখা গেছে। প্রেমবুভুক্ষু হতভাগিনী মরণ-ফাঁদে পা দিয়েছিল এই ভিয়েনা শহরেই। আর জানা গেল, ক্যাপ্টেন আর তার স্ত্রী নাকি বেজায় ফুর্তিতে আছে। শহরের প্রান্তে বহাল তবিয়তেই দিন কাটছে দুজনের। হামেশাই দেখা যাচ্ছে দুটিকে।

ভিয়েনা শহরটা বরাবরই ভাল লাগে আমার। তাই এ শহরে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে খুশীই হলাম। শহরে পৌঁছোনোর পর দেখলাম মিসেস পোডারজে মেয়েটি অ্যাগনেস নয়, মার্গারিট—ধুরন্ধর শিরোমণির আসল বউ। এ তথ্য আবিষ্কার করার পর কিন্তু মোটেই অবাক হইনি আমি।

দুপাশে দুজন অস্ট্রিয়ান গোয়েন্দাকে নিয়ে দেখা করলাম পোডারজের সঙ্গে। ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, ঘাবড়ে গিয়ে আমতা আমতা করার কোন লক্ষণই দেখলাম না তার কথাবার্তায়।

মোলায়েম স্বরে আমার প্রশ্নের উত্তরে ও বললে—"অ্যাগনেস টাফভারসানকে চিনি বইকি। ভারী চমৎকার মহিলা। তাঁর কিছু উপকার করতে পেয়ে আমি নিজেও আনন্দ পেয়েছিলাম। লণ্ডনে থাকার সময়ে তাঁর জন্যে কিছু টাকাও খরচ করেছিলাম।"

"বিয়ে করেন নি অ্যাগনেসকে?" প্রশ্নটা করলাম ফরাসী ভাষায় যাতে মার্গারেটের বুঝতে অসুবিধা না হয়।

মার্গারিটের মুখচ্ছবি দেখে স্পষ্ট বুঝলাম বিয়ে সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গ খবর রাখে না সে। ভাবলাম দেখা যাক নিজের পাতা ফাঁদ থেকে কি করে এবার বেরোয় বাছাধন।

"মিস টাফভারসনকে বিয়ে? হাসালেন যা হোক। তাঁকে যে ভাল করে চিনিই না আমি। নিউইয়র্কে বিয়ে করেছিলাম? না, না, যত সব গাঁজাখুরি গল্প শুরু করেছেন দেখছি। গ্রীষ্মের অবকাশে প্যারী গিয়ে তাঁর সঙ্গে কয়েকটা দিন বেশ আনন্দেই কেটেছিল। এখন তিনি ভারতবর্ষে রয়েছেন। এছাড়া তাঁর সম্বন্ধে আর কোন খবরই রাখি না আমি। তাঁর সঙ্গে কেউ আছে কি, তিনি একলাই দেশভ্রমণ করছেন—অত খবর আমি রাখি না।"

খুব ভদ্রভাবে পোডারজেকে ধন্যবাদ জানালাম এতগুলো খবরাখবর সরবরাহ করার জন্যে। তারপর বিদায় নিলাম—এবং তাও একটা বিশেষ কারণেই। আমাদের মতলব ছিল যথেষ্ট দড়ি ছেড়ে ওকে খেলানো, তারপর এক মোক্ষম প্যাঁচে ফাঁসানো। এ ছাড়াও ওদের বিয়ের সার্টিফিকেটের একটা কপি অথবা অন্য কোন দলিল হাতে আনতে চেয়েছিলাম আমি। এ দলিল আনতে হবে নিউইয়র্কের মিনিষ্টারের কাছ থেকে এবং একটি জিনিস দিয়েই তর্কাতীতভাবে প্রমাণ করে দেওয়া যাবে যে নিউইয়র্কের লিট্‌ল চার্চ অ্যারাউণ্ড দ্য কর্ণার-এ বিয়ে হয়েছিল তাদের।

দিন কয়েক পরেই ফিরে এলাম পোডারজের আস্তানায়। নিউইয়র্কের পুলিশ আর মিনিষ্টারের পাঠানো টেলিগ্রামগুলো আমার হাতেই ছিল। 'ক্যাপ্টেন' আর তার বউকে দলিলগুলো দেখালাম।

ফ্যাকাশে হয়ে গেল মার্গারিট। মিসেসের মুখ দেখে অনুনয়ের সুরে পোডারজে বলে উঠল—"এতে কি আসে যায়, মার্গারিট? তুমি তো সবই জানো। আমেরিকার মেয়েগুলো এমনই নির্লজ্জ বেহায়া যে ওকে বিয়ে না করে পারিনি আমি। সাময়িক শান্তিলাভের জন্যেই বিয়েটা হয়েছিল। আমি যে বিবাহিত, সে তা জানত। কাজেই আমার আর কোন উপায় ছিল না। ডার্লিং তুমি বিশ্বাস করো—"

কিন্তু কেউই বিশ্বাস করতে পারল না ওকে। মার্গারিট তো নয়ই আমিও না।

এরপর কিন্তু আমাদের কাছে সে সবকিছুই অস্বীকার করে বসল এমন কি বিয়েটাও।

২০শে ডিসেম্বর জাহাজে ওঠার জন্যে আমরা প্রস্তুত। এমন সময়ে জেটির ওপরেই ঝগড়া হয়ে গেল ওর সঙ্গে। রক্ষিতা স্ত্রী হিসেবে আমার সঙ্গে সাগর পাড়ি দিতে চাইল না অ্যাগনেস। চাপ দিতে লাগল আনুষ্ঠানিক বিয়ের জন্যে। কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। কাজেই আমার সঙ্গ ত্যাগ করে চলে গেল ও। প্রথমে বলেছিল, সেই রাতেই একলা সাগর পাড়ি দেবে সে। কিন্তু ফ্ল্যাটে ফিরে আসার পরেই মনট্রিয়াল অভিমুখে রওনা হয়ে যায় সে। কথা দিয়ে গেছিল ফোন করবে। কিন্তু তা করেনি। কথা দিয়ে গেছিল লণ্ডনে আমার সঙ্গে তার দেখা হবে। কিন্তু এ প্রতিশ্রুতিও সে রাখেনি। জেটির ওপর সেই ঝগড়াঝাটির পর থেকে আজ পর্যন্ত তার ছায়াটুকুও দেখিনি আমি।"

জোর গলায় পোডারজে বলতে লাগল, তার এই বিয়ের ব্যাপারটা নাকি ডাহা মিথ্যে আর সাজানো ব্যাপার। ধাপ্পা দিয়ে তাকে যুগোশ্লাভিয়ার মাটিতে টেনে নিয়ে যাওয়ার জঘন্য চক্রান্ত। আরও বললে—"অস্ট্রিয়ায় আমি রাজনৈতিক আশ্রয়ের সুযোগ সুবিধে পাচ্ছি। বেলগ্রেডের উদ্বাস্তু আমি। কাজেই স্বদেশের মাটিতে আইনের মারপ্যাঁচ দেখিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে যাওয়া চলবে না!"

খানাতল্লাসি হলো ওর বাড়ীতে। কিন্তু কোনরকম টেনেটুনে দোষারোপ করার মত আবছা কোন প্রমাণের চিহ্নও পেলাম না সেখানে। নিউইয়র্কেও ঘটলো সেই কাণ্ড। অ্যাগনেস-নিধন (যদিও তা নিছক সন্দেহ) আর তদন্তের শুরু—এই দুইয়ের মাঝে রয়েছে বিপুল সময়ের ব্যবধান। 'অলিম্পিকে'র কেবিনটাও পরীক্ষা করা হলো। কিন্তু ফলাফল হলো সেই একই। পোডারজে সেখানে কয়েক রাত থাকার পর অসংখ্যবার ধোয়া মোছা হয়ে গেছে সে কেবিন। কাজেই সূত্র-টূত্রর আর কোন বালাই ছিল না সেখানে।

যতদূর জানা গেল, অ্যাগনেস টাফভারসনের অন্তর্ধান রহস্যের তিমিরে আলোকপাত করার মত একটি সূত্রেরও আর অস্তিত্ব ছিল না এই দীর্ঘ কটি মাস পরে। এ রহস্যের উত্তর যে পোডারজে জানে, সে বিষয়েও আমাদের মনে তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সে-যে তাকে খুন করেছে, তা প্রমাণ করা কোনমতেই সম্ভব ছিল না আমাদের পক্ষে। আদালতে এ কেস উঠলেই সাক্ষ্য প্রমাণাদির দরকার হবে—নিছক অনুমান নিয়ে তো কাউকে ফাঁসিকাঠে লটকানো যায় না। সন্দেহের বশে কাউকে খুনী সাব্যস্ত করা যায় না—সে সন্দেহ যতই জোরালো আর ভয়ঙ্কর হোক না কেন। কাজেই পোডারজের গায়ে আঁচড় কাটার ক্ষমতাও আমাদের রইল না।

ভিয়েনাতেও পোডারজেকে গ্রেপ্তার করা গেল না। তার কারণ, যতদূর জানা গেছিল, অষ্ট্রিয়ায় কোন বেআইনী কাজও করেনি। বিদেশ থেকে স্বদেশের মাটিতে তাকে আনার আয়োজন করা মানেই একটা বিলক্ষণ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আর সে সময়ে ও রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করলেই তো আমরা নিরুপায়।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ভিয়েনায় বসে আলোচনা চলল আমাদের মধ্যে। আলোচনার বিষয় একমেবাদ্বিতীয়ম্। এবং তা হলো, লাশটাকে ও সরিয়েছে কি উপায়ে। থিওরীর অভাব ছিল না। কিন্তু আইনের ঠেকা দিয়ে কোনটিকেই খাড়া করা যাচ্ছিল না।

সম্ভবত নিউইয়র্কের ফ্ল্যাটে—অ্যাগনেসের লাশ টুকরো টুকরো করে কাটার পর বাড়ীর চুল্লীতে ফেলে তা ছাই করে ফেলা হয়েছে। লাশ উধাও করার এইটাই কিন্তু সবচেয়ে সহজ উপায়। আর সম্ভাব্য থিওরী হলো। পোডারজে হয়তো মারাত্মক ডোজের ঘুমের বড়ি খাইয়ে দিয়েছিল অ্যাগনেসকে। তারপর ওর আস্ত দেহটাকে অথবা টুকরো টুকরো দেহটাকে ট্রাঙ্কের মধ্যে ঠেসে নিয়ে গেছিল 'অলিম্পিকে'র কেবিনে। সাধারণত ফার্স্ট ক্লাসেই সাগর পাড়ি দিত 'ক্যাপ্টেন'। কিন্তু 'অলিম্পিকে' সি ডেকের কেবিন নিতে গেল কেন সে? দশ ডলার দামের দাড়ি কামানোর ব্লেড, ঘুমের বড়ি আর মুখে মাখার ক্রীমই বা কিনল কেন?

আমার মতে লাশটাকে পাচার করার সবচেয়ে ভাল পন্থা যা তা হলো এই ঃ টুকরো টুকরো করে লাশটাকে ও কেটেছিল। তারপর আটলাণ্টিক মহাসাগর পেরনোর সময়ে এক একটা টুকরো ও ছুঁড়ে দিয়েছে জলের মধ্যে। অর্থাৎ সারা জলপথটায় সমানে ভোজ দিয়েছে মাংসভুক মাছেদের। ভিয়েনায় পোডারজে কতখানি নিরাপদে রয়েছে তা ওর অজানা নয়। অষ্ট্রিয়ার কর্তৃপক্ষকে ও জানালো, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ওকে যুগোশ্লাভিয়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্যেই সাজানো হয়েছে টাফভারসন কেসটা এবং সমস্ত ব্যাপারটা একটা বিরাট ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। আরও একটু জুড়ে দিলে সেই সঙ্গে—সে নাকি রাজতন্ত্র শাসন-বিরোধী। কিন্তু ইটালী আর জার্মানীর ডিকটেটরশিপ শাসনব্যবস্থায় তার পূর্ণ সমর্থন আছে। আর তাই......।

অষ্ট্রিয়ানদের দর্শনবাদ হলো নিজে বাঁচো এবং অপরকে বাঁচতে দাও। এই ধরনের জীবনদর্শনের ওপরে ওদের শ্রদ্ধা ছিল যথেষ্ট। তাই পোডারজের ব্যাপারে নাক গলাতে চাইল না ওরা। বিশেষ করে সে যখন প্রতিশ্রুতি দিলে সে ইটালী চলে যাবে, তখন এ নিয়ে তারা আর মাথা ঘামাতে চাইল না।

এই পরিস্থিতিতে আমি ভেবে দেখলাম মাত্র একটি পন্থায় মুঠোর মধ্যে আনা যায়

পোডারজেকে। আমেরিকান গভর্ণমেন্টকে চাপ দিতে হবে, তারাই যেন পোডারজেকে বিদেশ থেকে স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। আমার লোকের হাতে রিপোর্ট পাঠালাম ওয়াশিংটনে। অ্যাগনেস টাফভারসন আমেরিকান মহিলা। তাকে ঘিরে যে রহস্য গড়ে উঠেছে, তা তো আর উপেক্ষা করা যায় না। পোডারজেকে জোর করে নিউইয়র্কে ফিরিয়ে আনতে গেলে যে কলাকৌশলের প্রয়োজন, তা পাওয়া গেল নিউইয়র্কের এফ বি আই (ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন) এবং ইমিগ্রেসন ডিপার্টমেন্ট থেকে। ১৯৩৩ সালে আমেরিকার মাটিতে পা দিয়ে একটা ফর্মের ওপর, 'ক্যাপ্টেন' লিখেছিল, সে নাকি অবিবাহিত। আমেরিকায় পা দেওয়ার অনুমতি লাভ করতে গেলে এ ফর্মে সবাইকেই সই করতে হয়। কিন্তু মার্গারিটের সঙ্গে তার আগেই বিয়ে হয়েছিল। দরখাস্তে লেখা প্রতিটি কথাই যে সত্য সে বিষয়ে শপথ করার পরেই আমেরিকায় প্রবেশাধিকার পেয়ে ছিল সে। কাজেই, মিথ্যা শপথের দায়ে আইনের রক্তচক্ষু এবার এসে পড়লো তার ওপরে।

১৯৩৪ সালের দোসরা আগষ্ট—মিথ্যা শপথের অভিযোগে পোডারজেকে অভিযুক্ত করলো নিউইয়র্ক গ্র্যাণ্ড জুরী এবং রায় দিল তাকে স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। ফলে, পোডারজেকে আনা হলো ভিয়েনার এক আদালতে। কিন্তু বাক্‌চাতুরীতে ওস্তাদ পোডারজে সেখানে কোমল হৃদয় জুরীদের মন ভিজিয়ে দিলে এই বলে যে, স্রেফ ষড়যন্ত্র করে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমেরিকায়। আমেরিকা থেকে তাকে পাঠানো হবে যুগোশ্লাভিয়ায় এবং দেশদ্রোহীতার অপরাধে গুলী চালিয়ে খতম করে দেওয়া হবে তাকে। শুনে সমবেদনায় ভরে উঠল জুরীদের অন্তর। ওকে আমেরিকা পাঠাতে রাজী হলো না তারা।

আরও কতকগুলো টেলিগ্রাম আসা-যাওয়া করলো বেলগ্রেড আর নিউইয়র্কের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত দুটো বিবাহের অভিযোগ আনল নিউইয়র্ক পুলিশ পোডারজের বিরুদ্ধে। এবার আর বেঁকে বসলো না অস্ট্রিয়ান কোর্ট। হুকুম বেরিয়ে গেল পোডারজেকে স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার।

এ কাহিনী প্রথমেই বলেছি আমি, পোডারজে-তদন্ত আমার কর্মজীবনের প্রথম কেস। যদিও এর চাইতে কঠোর পরিশ্রম আর কোন তরুণ গোয়েন্দা ইতিপূর্বে কখনও করেনি, তবুও সেদিন আমার শিকারকে সামান্যের ওপর দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখে শুকনো হাসি ছাড়া আর কোন ভাবই ফোটেনি আমার চোখে মুখে। যে কোন খুনীর পক্ষে ঐ শাস্তি সত্যিই লঘু—অত্যন্ত লঘু। আমি ভিয়েনা ছেড়ে চলে আসার সময়ে তখনও ও ওখানকার কারাগারেই ছিল। বেশ একটু মুষড়ে গিয়ে রওনা হলাম বেলগ্রেডের দিকে। যে দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছিল—যতদূর সম্ভব আমি তা পালন করেছি। আর কিছুই করণীয় ছিল না আমার।

নিউইয়র্কে নিয়ে যাওয়া হলো পোডারজেকে। পরে শুনেছিলাম, এই ধরনের সামান্য অভিযোগের সম্মুখীন হয়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি ও। ঠোঁটের কোণে চিরকেলে মিষ্টি হাসিটি ঝুলিয়ে দিব্বি হাসিখুশী মেজাজ নিয়ে নিউইয়র্কে পৌঁছোয় ও। তারপরেই একটা টেলিগ্রাম পাঠায় মার্গারিটকে—"এবার একটা অলৌকিক কাণ্ড ঘটবে।"

১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দুই বিবাহের অভিযোগ আনা হলো তার বিরুদ্ধে। অভিযোগ স্বীকার করে নিলে সে। তবে নিজের অপরাধ লঘু করার প্রচেষ্টায় শুধু এইটুকুই সে বলেছিল—অ্যাগনেস টাফভারসনই নাকি বিয়ের জন্যে পীড়াপীড়ি করেছিল তাকে। এ

জাতীয় অপরাধে সবচেয়ে গুরুদণ্ড যা, অর্থাৎ আড়াই থেকে পাঁচ বছর শ্রী-ঘর বাস, পোডারজের ক্ষেত্রে তারই বিধান দেওয়া হলো। অবার্ন কারাগারে শুরু হলো তার শাস্তির মেয়াদ। অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে মোটামুটি মানিয়ে নিয়েছিল ও। তবে একজন ওকে দুচক্ষে দেখতে পারতো না। একদিন দারুণ মারপিট হয়ে গেল দুজনের মধ্যে। ওয়ার্ডাররা এসে পৌঁছোনোর আগেই একটা চোখ আর আটটা দাঁত হারাল পোডারজে।

উনিশ মাস কারাগার বাসের পর একটা লম্বা চিঠি লিখল ও ক্যাপ্টেন ষ্টাইনকে। ক্যাপ্টেন ষ্টাইন সে সময়ে নিরুদ্দেশ ব্যক্তিদের ব্যুরোতে ছিলেন। পোডারজে লিখল, খালাস পাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ যদি তাকে ইউরোপে ফিরিয়ে না দেয়, তাহলে অ্যাগনেস টাফভারসনকে জীবন্ত ফিরিয়ে এনে দেবে সে। এ প্রস্তাবের কোন উত্তর তার কাছে পাঠানো হয়নি। কারণটা খুবই সোজা। বহুদিন আগেই যে পরলোকের পথে যাত্রা করেছে অ্যাগনেস, এ বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে গেছিল কর্তৃপক্ষর। অ্যাগনেসের পরিবারবর্গের মনেও তার মৃত্যু সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ ছিল না। আটলাণ্টিকের জলেই স্থান পেয়েছে হতভাগিনীর দেহ।

১৯৪০ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারী জেলের বাইরে এসে দাঁড়ালো পোডারজে। এতদিন পাথর ভেঙেও কিন্তু এতটুকু চিড় ধরেনি ওর গ্র্যানাইট কঠিন আত্মবিশ্বাসে। নষ্ট চোখের জায়গায় একটা কৃত্রিম চোখ বসিয়ে নিয়েছিল। মনোক্ল দিয়ে সযত্নে নকল চোখটা ঢেকে রাখত। পরে ওকে যুগোশ্লাভিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নাৎসীরা যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণ করলে যুদ্ধের বন্যায় সে-ও গা ভাসিয়ে দেয়। তারপর অনেক বছর অতীত হয়েছে। আর তার কোন খবর পাওয়া যায় নি। যদি সে মারাই গিয়ে থাকে তাহলে অ্যাগনেস টাফভারসনের শেষ কয়েক ঘণ্টার রহস্যের মৃত্যু ঘটেছে সেই সঙ্গে.....। □

* জোসেফ জাগেব্রোভিচ্ (যুগোশ্লাভিয়া) রচিত কাহিনী অবলম্বনে।

মেয়ে খুনে কাউণ্ট সারভিয়াত্তি

যখনই নতুন কোন খুনের তদন্তে তলব পড়ে আমার ডিপার্টমেণ্টের, তখনই আপনা হতেই আমার ভাবনার পটে ভেসে ওঠে এ শতাব্দীর সবচেয়ে কুখ্যাত খুনে—কাউণ্ট সিজারে সারভিয়াত্তির উপাখ্যান। আর বাস্তবিকই, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

অপরাধ-তদন্ত নিয়ে যারা দিনরাত মাথা ঘামায়, তাদেরকে হামেশাই যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তার প্রতিটাই ছিল কাউণ্ট সারভিয়াত্তির কেসে। কিন্তু মাদকদ্রব্যর বেআইনী আমদানির নতুন নতুন ঝামেলায় অথবা অতিদুষ্প্রাপ্য ডাকটিকিটের অতি-চমৎকার জালিয়াতির খবর পেয়ে অনামী কারিগরকে বার করার কাজে আমাকে যতখানি বেগ পেতে হয়, কাউণ্টের কেস হাতে নিয়ে অবশ্য তার চেয়ে বেশী মাথা ঘামাতে হয়নি।

সারভিয়াত্তির শিকার ছিল মেয়েরা। কৌশলে মুঠোর মধ্যে এনে মেয়েগুলোকে খুন করতো ও। এবং করতো শুধু টাকার জন্যে। তারপর লাশগুলো এমনভাবে টুকরো টুকরো করে কাটত যেন পাকা কশাই সে। আর বাস্তবিকই সে তাই ছিল। ওর কপাল মন্দ। তাই কলঙ্কিত রক্ত নিয়েই ওর জন্ম। ওর বাবা ছিলেন ইটালীয়ান আর্মির ক্যাপ্টেন। পয়লা নম্বরের উচ্ছৃঙ্খল।

বুদ্ধিজীবী মহলে তাঁর আত্মম্ভরিতারও সীমা পরিসীমা ছিল না। ভদ্রলোক যখন ওপারের পথে রওনা হলেন সিজারের বয়স তখন মাত্র চোদ্দ। বাবার কাছে সে উত্তরাধিকারসূত্রে পেল ছোটখাটো একটা ঐশ্বর্য, শিল্পকলার প্রতি প্রীতি আর একটা অতি-দুষ্ট দর্শন-বাদ।

এক বছর আগে ছেলেকে গণিকালয়ে নিয়ে গিয়ে তত্ত্বকথা শুনিয়েছিলেন ভদ্রলোক—"মেয়েদের অস্তিত্ব শুধু আমাদের আনন্দ দেওয়ার জন্যে। তোমার সুখ-সুবিধার জন্যেই ওরা এসেছে এই দুনিয়ায় এবং এটুকু বাদ দিলে নিরেট-মাথা শুয়োর ছাড়া আর কিছুই নয়।"

দুর্ভাগ্যক্রমে, যে ধরনের মহিলারা এই জঘন্য উপদেশ যে নিতান্তই অসার, তা প্রমাণ করে ছেলের স্নেহ-ভালবাসা অর্জন করার চেষ্টা করতেন—ওর মা ঠিক এই ধরনের মহিলা ছিলেন না। অতি সাধারণ শ্রেণীর জীব ছিলেন এই ভদ্রমহিলা। ঘন ঘন সুরাপান ছিল তাঁর প্রিয় নেশা। উৎকৃষ্ট আসবাব আর দুষ্প্রাপ্য সুরা ছাড়া অন্যকিছুর ভক্ত ছিলেন না তিনি। আরথ্রাইটিসে ভোগার ফলে মেজাজটা হয়ে গিয়েছিল বেজায় খিটখিটে। অহোরাত্র সুরাপাত্র কানায় কানায় টলটলে মদিরায় ভরিয়ে রাখার জন্য পতিদেবতার অতি কষ্টে সংগৃহীত মূল্যবান সম্পদগুলো একে একে বিক্রি করে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না তিনি। তারপর তিনিও যখন ইহলোকের ধুলো ঝেড়ে পরলোকে গেলেন, তখন সিজারের বয়স মাত্র আঠারো। মায়ের সঙ্গে থেকে চিরতরে মুক্তি পাওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ও।

কয়েক বছরের মধ্যেই সম্পত্তির বাকীটুকু ফুঁকে শেষ করে ফেললে সিজারে। কোনও কাজের শিক্ষা সে কোনোদিন পায়নি। পেশার কথা উঠতেই পারে না। কাজেই একটা মেয়েলোকের বাঁধা প্রেমিক হিসেবে শুরু হলো তার নতুন জীবন। লা স্পেজিয়াতে মেয়েদের টুপি, জরি, পোশাকের বিরাট দোকান ছিল স্ত্রীলোকটার। নাম তার রোজ। সারভিয়াত্তির চাইতে বয়সে বছর দশেকের বড়ো সে। প্রথম কটা দিন ভালোই কাটল কপোত কপোতীর। তারপর শুরু হলো ঝগড়াঝাঁটির পালা। সম্ভবত রোজ যত টাকা দিতে প্রস্তুত ছিল তার চাইতেও বেশী টাকার দাবি জানাত সিজারে—ঝগড়ার সূত্রপাত এইখান থেকেই। দোকানের কোন কাজই হতো না সিজারেকে দিয়ে—ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া তো দূরের কথা। ফলে, যতই দিন যেতে থাকে, ততই চোখমুখের চেহারার সজীবতা, চনমনে খুশী-খুশী ভাব হারিয়ে ফেলতে থাকে রোজ।

এই কাহিনীর উপসংহার ঘটল সেই দিনই যেদিন রোজ তার প্রেমাস্পদকে জানালো যে সে মা হতে চলেছে। কথাটা শুনে এমনিই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল সারভিয়াত্তি যে তখুনি আগুনের চুল্লী থেকে আগুন খোঁচাবার লোহার ডাণ্ডাটা তুলে নিয়ে উন্মাদের মত রোজকে পিটিয়ে মেরে ফেলল। বাড়ীর পেছনকার বাগানে লাশটা পুঁতে ফেলে কবরস্থানের ওপর সযত্নে পাথর-বাঁধানো একটা রাস্তা বানিয়ে রাখল।

একটা মুহূর্তের জন্যও উদ্বেগের ছায়ামাত্র দেখা যায়নি সারভিয়াত্তির মনে। রোজের প্রতিবেশীদের আর মক্কেলদের সে জানিয়ে দিলে যে রোমের সৌখীন মহলে একটা নতুন ব্যবসা ফেঁদেছে সিগ্‌নোরা। সিজারেকে এখানে রেখে গেছে সম্পত্তি উপযুক্ত দামে বেচে ফেলার জন্যে। লা স্পেজিয়ার এই কাজটুকু শেষ করেই সে রোজের কাছে চলে যাবে রোমে। মালপত্রসমেত দোকানটা জলের দামে বেচে দিল সে এবং বিক্রী করার অধিকার তার বাস্তবিগই আছে কিনা, এ প্রশ্নও কেউ তাকে জিজ্ঞেস করলো না।

অতি সহজে লোক ঠকিয়ে নিজেকে সন্দেহমুক্ত রাখার এই ক্ষমতাই সারভিয়াত্তিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে এক খুন থেকে আরেক খুনের দৃশ্যে। শেষকালে তার মুখোশ খুলে পড়লো মরণের সওদাগর হিসেবে। তার সমস্ত তৎপরতাকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলে একটা খবরের কাগজ মাত্র কয়েকটা শব্দের মধ্যে। ''ফ্যালো কড়ি মাখো তেল-এর পদ্ধতিতে খুন—মেয়েরা এনেছে অর্থ আর কাউন্ট সরিয়ে দিয়েছে তাদের দেহগুলো।''—এই ছিল খবরের কাগজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। তার কবলে পড়ে কত মেয়ে যে প্রাণ হারিয়েছে, তার সঠিক হিসেব জানা যায় নি। শুধু এইটুকুই বলা চলে যে সারভিয়াত্তির সঙ্গে মোলাকাত হওয়ার পর বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেছে—এরকম মেয়ের সংখ্যা বড় কম নয়। সারভিয়াত্তি কিন্তু চিরকুমার থেকেছে সমস্ত জীবন—যেন দিনের পর দিন খুঁজে বেরিয়েছে তার উপযুক্ত গৃহিণীকে—এই রকম একটা ভাব দেখিয়েছে সে।

পর পর দুটি দিন বিভিন্ন ট্রেনে মালপত্রের সঙ্গে খণ্ড-বিখণ্ড লাশ আবিষ্কার হওয়ার পরেই সেই প্রথম পুলিশ জানতে পারে সমাজের মধ্যে নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা নররাক্ষস। ১৯৩২ সালের ১৬ই নভেম্বর টুরিন থেকে মর্ণিং এক্সপ্রেস সবে এসে দাঁড়িয়েছে নেপল্‌স্-এর বিশাল খিলেনওয়ালা ষ্টেশনে। দুজন রেলওয়ে পুলিশ (ফ্যাসিষ্ট শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের অনতিকাল পরেই একটা বাহিনী সৃষ্টি করেছিলেন মুসোলিনী) করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা সেকেণ্ড ক্লাস কমপার্টমেণ্টে দুটো বড় বড় সুটকেশ দেখতে পেল। আঁশের তৈরী পেল্লায় সুটকেশ দুটো কে বা কারা ফেলে গিয়েছিল কামরার মধ্যে। সদ্যকেনা না হলেও খুব পুরোনো বলে মনে হলো না সুটকেশ দুটো। ওজনেও দারুণ ভারী। পুলিশ অফিসার দুজন সুটকেশ দুটো নামিয়ে নিয়ে গিয়ে জমা দিয়ে দিলেন হারানো প্রাপ্তি অফিসে। একটা সুটকেশকে তাকের ওপর তুলে রাখার সময়ে খুট করে খুলে গেল তালাটা এবং সঙ্গে সঙ্গে ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ল একটা মুণ্ড—মেয়েমানুষের মুণ্ড। পুরু বাদামী কাগজের লাইনিং দিয়ে মোড়া ছিল সুটকেশটা। গাঢ় লালচে রঙের কাঠের কুচো দিয়ে প্যাক করা ছিল ভেতরকার বস্তু। একজন অফিসার নিঃশব্দে তুলে ধরলে মুণ্ডটা। অপরজন চাড় দিয়ে দড়াম করে খুলে ফেললো দ্বিতীয় সুটকেশ। ভেতর থেকে পাওয়া গেল—হতভাগিনীর হাত আর পা।

হাত-পা মুণ্ডবিহীন ধড়টা এসে পৌঁছোলো পরের দিন ট্রেনে। লাস্পেজিয়া থেকে রোমে এসে পৌঁছোলো যে ট্রেনটি, সেই ট্রেনেই এল এই ধড়টি। প্রথমবার যেভাবে পাওয়া গিয়েছিল সুটকেশ দুটি, দ্বিতীয় আবিষ্কারটিও ঘটলো ঠিক এ ভাবেই। সেকেণ্ড ক্লাশ কমপার্টমেণ্টে একটা বড় সুটকেশ খোলার পর ভেতর থেকে পাওয়া গেল উলঙ্গ ধড়টা। অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো যে একই দেহের, তা প্রমাণ করতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না ডাক্তারদের। হতভাগিনীর চেহারার মোটামুটি এবং বিশ্বাসযোগ্য একটা বিবরণও দিলেন তাঁরা। বয়স তার তিরিশ। উচ্চতা মাঝামাঝি। লালচে বাদামী চেষ্টনাট রঙের চুল আর চোখ। বাঁ পা-টা সামান্য বেঁকা। অনেকরকম পুরোনো ক্ষতচিহ্নও ছিল সারা দেহে।

পেছন থেকে ছুরি মারা হয়েছিল মেয়েটিকে। ছুরি মারার সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়নি বেচারী এবং যখন প্রমাণ পাওয়া গেল জীবন্ত অবস্থাতেই মেয়েটিকে টুকরো টুকরো করে কাটতে শুরু করেছিল খুনে জানোয়ারটা তখন এই বিভীষিকা উপাখ্যানের ওপর চড়লো আর এক পোঁচ বিভীষিকার রঙ।

অপরাধ সম্পর্কীয় যেকোন তদন্তে পুলিশি তৎপরতা যদি সর্বত্র ছড়িয়ে থাকত তাহলে অবিশ্বাস্যরকমের মসৃণগতিতে অব্যাহত থাকত, চালু থাকত পুলিশ মেশিনের অপরাধসমাধান পর্ব। কিন্তু তা যখন নয়, ব্যাপক, সুষ্ঠু আর নিখুঁত পুলিশি তৎপরতার যেখানে অভাব সে ক্ষেত্রে বুঝে নিতে হবে যে গোয়েন্দাদের সাফল্যের পরিমাপ সাধারণত এই কটি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হয় ঃ অসীম সহিষ্ণুতা আর হাল ছেড়ে না দিয়ে অহোরাত্র সজাগ থাকা—সম্ভাবনা ঃ দশভাগের সাত ভাগ; সহজজ্ঞান অথবা দিব্যচক্ষেদর্শন—সম্ভাবনা ঃ দশভাগের দু'ভাগ; ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়া—সম্ভাবনা ঃ দশ ভাগের এক ভাগ! ধীশক্তির তথাকথিত চমক লাগানো নিদর্শন চেয়ারে বসা গোয়েন্দা আর রহস্য উপন্যাস-লিখিয়েদের জন্যে—বাস্তব জীবনে আমাদের ক্ষেত্রে তার কোন স্থান নেই।

স্কোয়াড্রা মোবাইল (নরহত্যা স্কোয়াড) হতভাগিনী মেয়েটার সনাক্ত করার প্রচেষ্টা শুরু করলো। টুকরো টুকরো অংশে আবিষ্কৃত হয়েছিল তার দেহ। তাই বিভিন্ন সময়ে দেশের নানাস্থান থেকে যে কয়েক শ' মেয়ে বেমালুম উবে গিয়েছিল, তাদের নামের তালিকা নিয়ে বসলেন তাঁরা—কোন হদিশ পাওয়ার আশায়। কিন্তু বৃথাই, কোন সূত্রই পাওয়া গেল না! রাশি রাশি টেলিগ্রাম টেলিপ্রিন্টার বার্তা ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তি ইটালীর পুলিশ ষ্টেশনগুলোয় পর পর এসে পৌছোতে লাগল—কিন্তু রহস্যের তিমিরে এতটুকু আলোকের সন্ধান পাওয়া গেল না।

এ ধরনের দৈহিক বর্ণনার মানুষ খোঁজার ব্যাপারে সুফললাভ কেউই ঠেকিয়ে রাখতে পারে না যদি জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া যায়। কিন্তু এই বিশেষ তদন্তটিতে স্কোয়াড্রা মোবাইলের এই জাতীয় সাহায্যের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে আদেশটি তা স্বয়ং মুসোলিনীর। তাঁর নিষেধাজ্ঞা বেরিয়ে গিয়েছিল কোন খবরের কাগজ এ কেসের খুঁটিনাটি ছাপতে পারবে না। তদন্তের মোটামুটি যে বিবরণ পুলিশের তরফ থেকে ছাড়া হতো কাগজে প্রকাশের জন্য তার দৈর্ঘ্য তিরিশ লাইনের ওদিকে যেত না। এ আদেশের কারণও দেখিয়ে ছিলেন মুসোলিনী। বলেছিলেন, ফ্যাসিষ্ট ইটালীতে এরকম পিশাচের মত খুন-খারাপী করাটাই নাকি একদম অসম্ভব। আর যদিও বা কেউ করে থাকে তবে তা নিয়ে যত অল্প কথা বলা যায় ততই মঙ্গল।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত তদন্ত যখন ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় এসে দাঁড়াল, তখন দৈনিকগুলো একযোগে ইল্ দুচের নিষেধ-বিজ্ঞপ্তিতে আর কোন গুরুত্ব না দিয়ে খুঁটিনাটি জনসাধারণে প্রকাশ করে দেওয়াই সঙ্গত মনে করলে। প্রথম পাতা জুড়ে ছবি বেরুলো খণ্ডবিখণ্ড-মেয়েটার।

আর ঠিক তখন থেকেই সত্যি সত্যিই রহস্যের তিমিরাবগুণ্ঠন উঠে যেতে লাগল আস্তে আস্তে। প্রথম ট্রেনের দুজন যাত্রী খবর দিল যে হৃষ্টপুষ্ট চেহারার মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক তাদের কম্পার্টমেন্টে ঢুকেছিল। ভদ্রলোকের গোঁফের ডগা বেশ পাকানো এবং ছুঁচোলো। লাগেজ র‍্যাকে দুটো আঁশের তৈরী সুটকেশ রেখে এক কোণে বসেছিল ভদ্রলোক। একচোট ঘুম দিয়ে উঠে দুজনে দেখলেন নেপলস্ যাওয়ার পথে রোমের মধ্যে ঢুকছে তাদের ট্রেন, ভদ্রলোক অদৃশ্য হয়েছে কামরার ভেতর থেকে, কিন্তু মালপত্র দুটি ফেলে গেছে তাকের ওপর।

সুটকেসের মালিকের এহেন দৈহিক বর্ণনা পাওয়া যাবার পর স্কোয়াড্রা মোবাইল ভদ্রলোকের খোঁজ পেলে লা স্পেজিয়াতে। এইখান থেকেই রোম আর নেপলস্ যাওয়ার এক্সপ্রেস ধরেছিল ভদ্রলোক। পিসা পর্যন্ত ট্রেনভ্রমণ করেছিল। রওনা হবার পর প্রথম ষ্টপ ঐখানেই পিসাতে ট্রেন থেকে নেমে ফিরতি ট্রেন ধরে সে ফিরে আসে লা স্পেজিয়াতে।

এই তথ্য জানার পরেই খুনটা এসে পড়ল আমারই অফিসের আওতায়। তার কারণ, ঐ সময় লা স্পেজিয়া নরহত্যা স্কোয়াডের চীফ ছিলাম আমি। লা স্পেজিয়া একটা সদাব্যস্ত বন্দর। টাইরেনিয়ান উপকূলে তার অবস্থান। এতক্ষণ পর্যন্ত সমস্যাময় জটিল কেসটা আমাদের সবার আলোচনার খোরাক জোগালেও মূল রহস্যভেদের সব টুকু দায়িত্বই ছিল রোমের পুলিশের। কিন্তু এই নতুন আবিষ্কারের বৃত্তান্ত শুনলেই খুবই সম্ভব যে অনুমানটি সবার আগে মাথায় আসে তা হলো এই যে খুনী এই লা স্পেজিয়া শহরে আমাদেরই মধ্যে থাকলেও থাকতে পারে—সেক্ষেত্রে তার সমুচিত দণ্ডবিধানের দায়িত্ব তো আমাদেরই। আমার ডিপার্টমেন্টে এমন লোক একটিও ছিল না যে ঐ নররাক্ষসটার মণিবন্ধে লোহার গয়না পরিয়ে দেওয়ার আগ্রহকে ক্ষুরের মত শাণিত করে রাখেনি। নির্দিষ্ট সময়ের চাইতেও আরও অনেক বেশী ঘণ্টা আমরা ব্যয় করতে লাগলাম হোটেলে হোটেলে এবং প্রতিটি বোর্ডিং হাউসের মালিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে। একমাত্র আশা, হয়তো গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য পাওয়া যাবে তাদের কাছ থেকে। বন্দর-অঞ্চলে আমাদের টিকটিকিরা অগুন্তি গণিকালয় আর পানাগারে তল্লাসি চালালো। কিন্তু কোথাও এতটুকু কানাঘুসোও শুনলাম না রাক্ষসটার সম্বন্ধে।

তারপরেই আচম্বিতে একদিন নীলাকাশ থেকে বাজ নেমে আসার মত বিপুল সৌভাগ্য খসে পড়ল আমাদের তদন্ত-পর্বে। কি করে বরাত খুলল, সেই কথাই বলি এবার। তন্ন তন্ন করে তল্লাসি চালানোর পর যখন কোনদিকেই কোন আলোর সন্ধান পেলাম না, তার দুদিন পর অফিসে বসে স্থানীয় খবরের কাগজটার পাতা ওলটাচ্ছি, এমন সময়ে নজরে পড়ল ছোট্ট একটা পরিচ্ছেদ। রেলওয়ে ষ্টেশনের কাছে রাবিশের স্তূপের ওপর একটা বড় সাইজের ছুরি পড়ে থাকতে দেখেছিল একটি অল্পবয়সী ছেলে। এ জাতীয় ছুরি রান্নাঘরের কাজেই লাগে। ছেলেটির মনে কোন অসাধুতা ছিল না। তাই ছুরিটা পাওয়ামাত্রই সে জমা দিয়ে দেয় হারানো-প্রাপ্তি অফিসে।

ছুরিটা সম্পর্কেই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম কি কি কাজে দরকার হতে পারে ছুরিটার। আর তারপরেই আচমকা ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মত লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম আমি। তারস্বরে হুকুম দিয়ে ডাকিয়ে আনলাম আমার এক সহকারীকে এবং দুজনে মিলে তৎক্ষণাৎ গাড়ী হাঁকালাম হারানো প্রাপ্তি অফিসের দিকে। ছুরিটাকে নিয়ে রাখলাম আমাদের জিম্মায়। পুলিশ ল্যাবোরেটরীর রিপোর্ট থেকে জানা গেল ফলার ওপর যে দাগগুলো পাওয়া গেছে, আসলে তা মানুষের রক্ত ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাৎ পায়ের কাজ আরও কিছুটা বাড়লো। শহরে যে-কটা জিনিসপত্রের, কাচের বাসনপত্রের আর ষ্টেশনারী দোকান ছিল, সবকটার মালিক আর কর্মচারীদের প্রশ্নে প্রশ্নে বিপর্যস্ত করে ফেললাম। শেষকালে যে প্রমাণের জন্যে এত পরিশ্রম, তা পাওয়া গেল। একজন সেল্সম্যানের মনে পড়ল ঐ রকম আকারের একটা ছুরি একদিন সে বিক্রী করেছিল হৃষ্টপুষ্ট চেহারার মাঝবয়সী ছুঁচালো গোঁফওয়ালা এক ভদ্রলোকের কাছে। রোম এক্সপ্রেসে লোকটার যেরকম বর্ণনা পাওয়া গিয়েছিল, সেলস্ম্যানের

বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল তা। আবিষ্কার শুধু এই একটাই নয়। কেননা কয়েকটা বাড়ী পরেই আরও একটা দোকান দেখলাম আমরা। এই দোকান থেকেই আমাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গোঁফওয়ালা বন্ধুটি কিনেছিলেন তিন তিনটে আঁশের তৈরী সুটকেশ।

খুনে বদমাসটাকে যে এই লা স্পেজিয়াতেই পাওয়া যাবে, এ বিষয়ে আর তিলমাত্র সন্দেহ রইল না আমাদের মনে। এ কাজে যে ধরনের গোয়েন্দাদের দরকার, তাদের প্রতিজনকে পাঠিয়ে দিলাম আমি বাড়ী বাড়ী তল্লাসির হুকুম দিয়ে। একটা বাড়ীও বাদ গেল না। তারপর শুধু একটা বিশেষ অঞ্চলে সঙ্কীর্ণ করে আনলাম এই চিরুনি দিয়ে আঁচাড়ানো তদন্ত-পর্ব। এবং শেষ পর্যন্ত তা সীমিত হয়ে এল একটি মাত্র বিশেষ রাস্তায়।

খুনটা আবিষ্কার হওয়ার ঠিক একমাস পরে ১৯৩২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর আমি নিশ্চিন্ত হলাম। নিশ্চিন্ত হলাম এবার ঠিক কোন জায়গাটিতে অভিযান চালাতে হবে, সে সম্পর্কে। জানলাম, লা স্পেজিয়ার দরিদ্রতম অঞ্চলের পাথর দিয়ে বাঁধানো এবড়োখেবড়ো সঙ্কীর্ণ রাস্তা ভায়া ডেনোভার একটা শ্রীহীন বাড়ীর পাঁচ তলায় উঠে এবার তৎপর হতে হবে আমাদের। সেইদিনই দুজন গোয়েন্দাকে নজর রাখতে বলেছিলাম বাড়ীটার ওপর। তারা খবর পাঠালে, সারাদিনের মধ্যে বাড়ী ছেড়ে কেউ বাইরে আসেনি। স্থির করলাম, আর নয়, এবার ঢুকে পড়া যাক।

পিস্তল বাগিয়ে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ক্যাঁচকেঁচে সিঁড়ি বেরিয়ে ওপরে ওঠার সময়ে দারুণ উত্তেজনায় কি প্রচণ্ড শব্দে ধক্‌ধক্ করেছিল হৃদযন্ত্রটা, তা আজও আমার মনে আছে। শুধু এই মুহূর্তটির জন্যে কি প্রচণ্ড খাটুনিটাই না গেছে ডিপার্টমেণ্টের প্রত্যেকের। এসেছে সেই মুহূর্ত—পরিশ্রমের ফল হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেল প্রায়। পাঁচতলায় পৌছনোর পর আমার পিছু পিছু এল একজন গোয়েন্দা। দেখলাম, করিডরের দুটো দরজার মধ্যে একটা সামান্য খোলা রয়েছে। পা টিপে টিপে ভেতরে ঢুকে দেখলাম ঘরটাকে রান্নাঘরই বলা উচিত। ঘরে ঢোকামাত্র যে জিনিসটা সবার আগে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, তা হচ্ছে একটি বালতি। দেওয়ালের পাশেই বসানো ছিল বালতিটা। বালতিটার কিনারা পর্যন্ত উঁচু হয়েছিল কাঠের কুচো—যে ধরনের কুচো দিয়ে প্যাক করা হয়েছিল লাশটার মুণ্ডুটা—হুবহু সেই রকমই।

রান্নাঘরের ভেতরের দরজা দিয়ে যাওয়া যায় আর একটি ঘরে। দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকলাম আমি। ঘরটা পুরোনো কিন্তু জমকালো আসবাবপত্রে একদম ঠাসা। দুজন পুরুষ আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল। বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়িয়েই আমার হাতে পিস্তল দেখামাত্র নিমেষের মধ্যে তারা হাত বাড়িয়ে দিলে নিজের নিজের পকেটের দিকে।

হুঁশিয়ার করে দিই আমি—"নড়বেন না। নড়লেই গুলি চালাবো।"

মাথার ওপর হাত তুলে দেয় দুজনে। একজন বললেন—"আমাদের পরিচয়টা দেওয়া দরকার। আমি হলাম রোম ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেণ্টের কমিশনার এরিকো। আর ইনি আমার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট, সিগ্‌নর মুস্কো।"

পরিচয় শোনার পর আমার রসনায় আর কোন কথাই ফুটলো না। মাথার মধ্যে রাগ, অপমান, হতাশার তুমুল দাপাদাপির চাইতেও হতভম্ব হয়েছিলাম সবচাইতে বেশী। তার

কারণও ছিল যথেষ্ট। বুদ্ধিকৌশল দক্ষতার প্রতিযোগিতায় আমারই এক্তিয়ার শহরে বসে টেক্কা মারা হলো আমার ওপর। শুধু তাই নয়। যে দুই আইন রক্ষক অফিসার এইভাবে আমার গালে চুনকালি লেপে দিলেন, সমস্ত তদন্তপর্বটা তাঁরা পরিচালনা করেছেন ২৫০ মাইল দূরে বসে। তারপর লা স্পেজিয়াতে এসেছেন তাঁদের পরিকল্পনার এতটুকু আভাস কাউকে না জানিয়ে।

"কাউন্ট সিজারে সারভিয়াত্তি কোথায়? এ বাড়ীতে যার বাস এবং যাকে গ্রেপ্তার করার জন্যেই আমাদের আগমন, তাকে রেখেছেন কোথায়?"—শুধোলাম আমি।

খরখরে চোখে আমার দিকে তাকালেন কমিশনার এরিকো। জবাব দিলেন—"আপনি লা স্পেজিয়ার ডোসি। আমার বোঝা উচিত ছিল।"

এবার হতভম্ব হয়ে তাকানোর পালা তার। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে তারপর উত্তর দিলেন আমার প্রশ্নের—'টুকরো টুকরো করে কাটা মেয়েটার হত্যাকারী হিসাবে আমরাও তাকে সনাক্ত করেছিলাম। গতকাল সারভিয়াত্তিকে গ্রেপ্তার করেছি আমরা। এখন সে রয়েছে রোমের রেজিনা কোয়েলি জেলখানায়।"

বটে, তাহলে এই ব্যাপার। মাস কয়েক মুহূর্ত আগেও আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, কুখ্যাত খুনেটার কোমরে বেড়ি পরানোর সম্মান এবার লা স্পেজিয়ার পুলিশ-মহলই পাবে। কিন্তু রোম তা ছিনিয়ে নিয়ে গেল একদিন আগে এসে।

কেসটা নিয়ে আলোচনা হলো কমিশনার এরিকো আর আমার মধ্যে। শুনলাম খুনেটার হদিশ বার করার জন্যে তাঁরা নাকি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একেবারে নিজস্ব একটা পদ্ধতিমাফিক তল্লাসি পর্ব চালিয়েছিলেন। তদন্ত পর্বের প্রথম দিকেই একজন রোম গোয়েন্দা বলেছিলেন পাত্র-পাত্রী বিজ্ঞাপন থেকে হয়তো সূত্র পাওয়া যেতে পারে। তৎক্ষণাৎ বিভিন্ন দৈনিকের ফাইল ঘাঁটা শুরু হলো। অনেক পরিশ্রমের পর সম্ভাবনাময় কয়েকটা পয়েন্টও পাওয়া গেল।

এরপর গোয়েন্দারা তৎপর হয়ে উঠল কয়েকটা লোককে নিয়ে। এরা প্রত্যেকেই মনোমত গিন্নি লাভের আশায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিল কাগজে। এদের প্রত্যেকের গতিবিধি আর চরিত্র নিয়ে জোর গবেষণা চলল কিছুদিন। কিন্তু বৃথাই। এমন একটি লোককেও পাওয়া গেল না যার ওপর টেনেটুনে এতটুকু সন্দেহের ছায়া ফেলা যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একজন নাছোড়বান্দা টিকটিকির নজরে পড়ল বহু পুরোনো একটা বিজ্ঞাপন। লা স্পেজিয়া শহরের এক অজ্ঞাতনামা পুরুষ বিবাহের আমন্ত্রণ জানিয়েছে বিজ্ঞাপনে। বিজ্ঞাপন-বার্তার চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু শহরের নামটি। খবরটা এইরকম ঃ

"সম্ভ্রান্ত পুরুষ, বিত্তবান, যুবাপুরুষ নয়, কিন্তু উদার এবং কোমল স্বভাব, পারিবারিক বন্ধনবিহীন তরুণী কন্যার সঙ্গে বিবাহের জন্যে পত্রালাপ করতে ইচ্ছুক।"

রোম-পুলিশ এই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে একটি উধাও-হওয়া মেয়ের যোগসূত্র বার করে ফেললে। মেয়েটির বয়স বছর তিরিশ। একটা বাড়ীর সাংসারিক কাজকর্ম দেখাশুনো করত সে। নভেম্বরের গোড়ার দিকে ভোজবাজির মত মিলিয়ে যায় সে। অন্নদাতাদের কাছে অবশ্য সে খোলাখুলি বলে গিয়েছিল তার গন্তব্য শহরের নামটি। সে নাকি পাত্রপাত্রী বিজ্ঞাপনের

উত্তর দিয়েছিল এবং তার ভবিষ্যৎ স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত হয়েছে লা স্পেজিয়া শহরে। এরপর থেকে তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। পুলিশ আরও জানালো, মেয়েটির বাঁ পা খোঁড়া ছিল, পা টেনে টেনে চলতে হতো তাকে। আর ঠিক এই শারীরিক বিকৃতিটুকুই নিহত মেয়েটির লাশ পরীক্ষা করতে গিয়ে ডাক্তারদের নজরে পড়েছিল।

লা স্পেজিয়া শহরে 'উদার এবং কোমলস্বভাব সম্ভ্রান্ত পুরুষটির' হদিশ বার করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। তৎক্ষণাৎ রোম থেকে গোয়েন্দাদের পাঠানো হলো এ শহরে—লীলাখেলা যে সাঙ্গ হয়েছে এ খবর জানার আগেই তাকে গ্রেপ্তার করা দরকার। কমিশনার এরিকো যখন তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে এসে পৌঁছোলেন, তখন সবেমাত্র রোম অভিমুখে রওনা হয়েছে কাউন্ট সিজারে সারভিয়াত্তি। রোমের একটা হোটেলে পাওয়া গেল তাকে। ভদ্রলোককে হাজতে পুরে তাঁরা ফিরে এলেন লা স্পেজিয়াতে। এলেন সেই ঘরটিতে যে ঘরটি সারভিয়াত্তি ভাড়া নিয়েছিলো বিজ্ঞাপনের টোপ গিলে-আসা হতভাগিনী মেয়েগুলোকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে।

আগেই বলেছি, খুনে বদ্‌মাসটার বদলে কমিশনারকে গ্রেপ্তার করতে উদ্যত হয়েছিলাম—এ তথ্য জানার পর রীতিমত খিঁচড়ে গিয়েছিল আমার মনমেজাজ। কিন্তু তবুও একদিক দিয়ে আমার ঐ তিক্ত মেজাজে সন্তোষের বারি সিঞ্চন হয়েছিল। বেশীর ভাগ সাক্ষ্য প্রমাণ জুগিয়েছিলাম আমিই এবং এই সাক্ষ্য-প্রমাণের বলেই চরম দণ্ড নেমে এসেছিল সারভিয়াত্তির শিরে। আমি আরও প্রমাণ করে দিয়েছিলাম যে পাওলিনা গোরিয়াত্তিই হচ্ছে সারভিয়াত্তির সর্বশেষ শিকার। রোমের যে মেয়েটি সংসারের কাজকর্ম দেখাশুনো করার কাজ ছেড়ে একদিন নিপাত্তা হয়ে গিয়েছিল, পাওলিনা গোরিয়াত্তি তারই নাম। বিবাহের প্রতিশ্রুতির প্রলোভন দিয়ে আসার পর যে কটি মেয়েকে যমালয়ে পাঠানো হয়েছে, এ হচ্ছে তাদের সর্বশেষ। প্রতিটি মেয়ে আসবার সময়ে সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ নিয়ে এসেছে এবং তাকে খুন করা হয়েছে এই কাঞ্চন লোভেই। তারপর দেহটাকে কেটে টুকরো করে পাচার করা হয়েছে নানাদিকে।

কাহিনীর উপসংহারে এসে বিলক্ষণ বিরাগ সত্ত্বেও আর একটি নাম মনে পড়ছে। বেল গিনেস একটি অসুন্দর আমেরিকান মহিলার নাম। বিয়ের লোভ দেখিয়ে টাকাকড়িসমেত পুরুষদের ভুলিয়ে আনত সে নিজের খামার বাড়ীতে। তারপর যথাসময়ে তাদের খুন করে দেহগুলি থোড়কুচি করতো। এবং এই থোড়কুচি পর্বটি যে কাঠের ব্লকটির ওপর হতো, তার ওপরেই জবাই করা শুয়োর কেটে কুচিকুচি করতো বেল গিনেস। এই একই নারকীয় ব্যবসায় হাত পাকিয়েছিল কাউন্ট সারভিয়াত্তি। একটা অপরিচ্ছন্ন হোটেল মালিক ছিল ভদ্রলোক। সেখানে হানা দিতেই আরও দুই হতভাগিনীর দেহাবশেষ পেয়েছিলাম আমি।

তাদের একজনের নাম বিসে মারগারুচ্চি। স্থানীয় দাঁতের ডাক্তার তার দাঁতের চিকিৎসা করেছিলেন একবার এবং তার রেকর্ডও রেখেছিলেন তিনি। তাই মেয়েটির দাঁত দেখেই তাকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছিল ডাক্তারের পক্ষে।

ইটালীতে আজকাল আর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না বটে, কিন্তু যে সময়ের কাহিনী লিখলাম

সে সময়ে মুসোলিনী কয়েকটি অপরাধের শাস্তি এইভাবেই দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কাউন্ট সারভিয়াত্তিও রেহাই পেল না এই হুকুমনামা থেকে।

গ্রেপ্তার এবং অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার কয়েক মাস পরে একদিন খুব ভোরে তাকে হিড়হিড় করে টেনে আনা হলো ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে। ককিয়ে কাঁদতে কাঁদতে অনুনয় বিনয় করতে লাগল সে। তারপরেই একসঙ্গে গর্জে উঠল রাইফেলগুলো এবং চিরকালের মত নির্বাক হয়ে গেল এযুগের সবচেয়ে কুখ্যাত মেয়ে-খুনে কাউন্ট সিজারে সারভিয়াত্তি। □

* কম্যাণ্ডাটোর যুসেপেপদোসা (রোম, ইতালী) রচিত কাহিনী অবলম্বনে।

মানুষ দস্তানার কাহিনী

পুরোনো আমলের আইনরক্ষক অফিসার হিসেবে চোখের সামনেই দেখেছি সিডনী শহরকে গড়ে উঠতে। ঝোপঝাড়ভরা ছোটখাট একটা নগরই দেখতে দেখতে ফুলেফেঁপে উঠে ঠাঁই দিল বিশ লক্ষ বাসিন্দাকে। পাপ আর অপরাধের দিকে থেকেও এর চাইতে ভাল বা খারাপ শহর আর আছে বলে মনে হয় না আমার।

সুকঠোর দুস্তর পথ পেরিয়ে তবে আমাকে নিউ সাউথ ওয়েলসের কমিশনার হতে হয়েছিল। সত্য কথা বলতে কি বীটের কনষ্টেবলের স্তর থেকে ধীরে ধীরে উঠতে হয়েছে আমাকে এই দায়িত্বপূর্ণ পদে। তেতাল্লিশ বছরের দীর্ঘ কর্মজীবনে আমার অন্তত বিশ্বাস আইনের সব রকম শত্রুকেই আমি দেখেছি। সামান্য চোর-ছ্যাঁচোড় থেকে শুরু করে জালিয়াত 'কল'মেন দাঙ্গাবাজ খুনে-গুণ্ডা—কিছুই বাদ যায়নি। এদের মধ্যে অনেকেরই উচ্চাশার বহর শুনলেও তাক্ লেগে যায়।

বর্তমান শতাব্দী শুরু হওযার অল্পদিনের মধ্যেই সিডনী পুলিশ হেডকোয়ার্টারের নিরুদ্দেশ ব্যক্তি বিভাগে সার্জেন্টের পদে উন্নীত হলাম আমি। আঙুলের ছাপ নিয়ে অপরাধী সনাক্তের পদ্ধতি সে সময়ে সদ্য প্রচলিত হয়েছে। সম্পূর্ণ নতুন বিজ্ঞানসম্মত এই তদন্ত পদ্ধতি আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিল গতানুগতিক পুলিশী ধারায়। অস্ট্রেলিয়াতে সর্বপ্রথম এই অভিনব পদ্ধতির প্রচলন হয় আমাদের ডিপার্টমেন্টেই।

তন্ময় হয়ে গেলাম আমি আঙুলের ছাপের এই বিশাল দুনিয়ায়। বিভিন্ন ছাপের রেখার ফাঁস, আবর্ত আর বেঁকা খিলেন সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞানলাভের পর নিউ সাউথ ওয়েলস কারাগারের আট হাজার বাসিন্দার একটি রেকর্ড তৈরী করে ফেললাম।

সে সময়ে ডিপার্টমেন্টের কর্মীসংখ্যা পাঁচজনের বেশী ছিল না। কিন্তু আজ প্রায় একশো মেয়েপুরুষ নিয়ে গড়ে উঠেছে এই বিভাগের কর্মীবর্গ। সারা অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড আর অন্যান্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশের প্রায় দশ লক্ষ অপরাধী আর সন্দেহভাজনের আঙুলের ছাপের সারি সারি ফাইলও সংরক্ষিত রয়েছে আমাদের রেকর্ড বিভাগে। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের হেড কোয়ার্টার হয়ে দাঁড়িয়েছে নিউ সাউথ ওয়েলসের আঙুলের ছাপের বিভাগ। শুধু তাই নয়। সারা বিশ্বে যে-কটা অত্যন্ত দক্ষ ফিংগার-প্রিন্ট ডিপার্টমেন্ট বর্তমানে রয়েছে, আমাদের এই বিভাগটি তাদেরই অন্যতম।

কর্মজীবনের গোড়ার দিকে আঙুলের ছাপ সম্বন্ধে এই বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছিলাম বলেই 'মানুষ দস্তানা' হত্যা-তদন্তের সুরাহা করতে পেরেছিলাম আমি।

প্রথমেই বলে রাখি, আমি কমিশনার হয়েছিলাম মাত্র কয়েক বছরের জন্যে। ১৯৩৩ সালের বড়দিনে একটা লাশ চোখে পড়ল দুই ভদ্রলোকের। মুরুমবিজী নদীতে ছুটির দিনে মাছ ধরতে গিয়েছিল দুজনে। ষ্টেটের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী কৃষিপ্রধান কেন্দ্র ওয়াগা থেকে কয়েক মাইল গেলেই পাওয়া যাবে এই নদীটি।

লাশটি পুরুষমানুষের। খুন করা হয়েছিল তাকে বেশ কিছুদিন আগেই। কিন্তু তীরের কাছে উপড়ে পড়া একটা গাছের শাখাপ্রশাখায় দেহটা আটকে পড়েছিল কটা দিন। তাছাড়া মুখখানা এমনভাবে থেঁতলে দেওয়া হয়েছিল যে সনাক্তকরণের উপায় ছিল না।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে সনাক্ত করার শুধু একটি পন্থাই আমি জানতাম এবং তা হলো আঙুলের ছাপের সাক্ষ্য। যদিও এক্ষেত্রে এ পন্থায় সুফলের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। কেননা, নিহত ব্যক্তি হয়তো সমাজের বিলক্ষণ সম্মানীয় পুরুষ এবং সারা জীবনে পুলিশের দপ্তরে আঙুলের ছাপ দেওয়ার দুর্ভাগ্য তাঁর কোনদিনই হয়নি। আইনভঙ্গের দায়ে পুলিশের হাতে ধরা না পড়লে নিউ সাউথ ওয়েলেসের কোনো নাগরিকেরই আঙুলের ছাপ রাখতাম না আমরা।

কেসটা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্যে গোয়েন্দারা হেডকোয়ার্টার থেকে রওনা হলেন। চীফ ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর প্রায়রকে ডেকে আমি বলে দিলাম—আপনার সাঙ্গোপাঙ্গরা আর যাই করুক না কেন, আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু আঙুলের ছাপ যেন নিয়ে আসে ওরা। লাশ সনাক্ত করতে গেলে সম্ভবত এছাড়া আর কোনো উপায় আমাদের নেই।

ম্যাকরে, ক্রসবি আর রেমাসকে দ্রুতগামী গাড়ীতে ওয়াগা পাঠিয়ে দিলেন প্রায়র। সিডনীর গোয়েন্দা-বাহিনী আর ওয়াগার পুলিশ-ফোর্স একযোগে অতিরিক্ত যত্ন নিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলেন নদী এবং তার দু তীরের জমি। লাশটা পাওয়া গেছে যেখানে, খুনটা সেখানে হয়নি, তা ঠিক। কিন্তু ঠিক কোন জায়গায় তার প্রাণবায়ু বেরিয়েছে, তাও বলা সম্ভব ছিল না কারও পক্ষে। কেননা, উপড়ে পড়া গাছটার ডালপালার ফাঁকে দেহটা কত হপ্তা যে আটকা পড়েছিল এবং নদীর জলে লাশটা ফেলে দেওয়ার পর স্রোতের টানে যে কতখানি পথ তা পেরিয়ে এসেছে তাই বা জানছে কে। আরও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লাশ পরীক্ষা করতে গিয়ে ওরা আবিষ্কার করলে লোকটির ডান হাতটারই কোনো পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ নিহত ব্যক্তিকে সনাক্ত করার শেষ ক্ষীণ সম্ভাবনাটুকুও অন্তর্হিত হলো তার নিখোঁজ ডান হাতের সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু নদীর তীর বরাবর ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে তল্লাশী-পর্ব চালাতে গিয়ে আরও একটা জিনিস আবিষ্কার করলে একজন গোয়েন্দা। ছোট্ট একটা চ্যাপ্টা বাদামী থলি।

থমকে গিয়ে ঝুঁকে পড়েছিল গোয়েন্দা-প্রবর থলিটা তুলে নেওয়ার জন্যে। সূত্রের সন্ধান পাওয়ার আশায় আনন্দে আর তর সইছিল না তার। আর তারপরেই নিঃসীম বিভীষিকায়

বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার দুই চোখের তারা। জিনিসটা বাদামী থলি নয়। মানুষের চামড়ার এতটুকু একটা টুকরো। তখনও ডান হাতের বুড়ো আঙুলের বিবর্ণ নখটা লেগে ছিল চামড়ার সঙ্গে।

সন্তর্পণে মোড়কের মধ্যে করে এই নতুন আবিষ্কারকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো হেড কোয়ার্টারের আঙুলের ছাপ বিভাগে। জিনিসটা পরীক্ষা করার পর শল্য-চিকিৎসকদের আর কোন সন্দেহই রইল না। বিবর্ণ নখ সমেত চামড়ার টুকরোটা এক সময়ে একজন পুরুষ মানুষেরই ডানহাতের অংশ ছিল।

ওয়াগার পুলিশ-ডাক্তার রিপোর্ট দিলে নিহত ব্যক্তির কব্জি কৃমিকীট খেয়ে ফেলেছে।

নদীর স্রোতে ভেসে আসার সময়ে কোনো কাঠের গুঁড়িতে আটকে যায় লাশটা—হাতটা সম্ভবত বেরিয়েছিল জলের ওপরে। তখনই হাতের নরম মাংস নিয়ে মহাভোজ শুরু করে দেয় কৃমিকীটবাহিনী—পড়ে থাকে শুধু চামড়ার খোলসটা। পরে যখন স্রোতের হ্যাঁচকা টানে লাশটা ভেসে যায় নদীর তীর থেকে, তখনই এই চর্ম-আবরণই ছিঁড়ে গিয়ে লেগে থাকে ঝোপঝাড়ের মধ্যে। তীক্ষ্ণ-চক্ষু গোয়েন্দাপ্রবর পরে যা উদ্ধার করে আসলে তাকে, 'মানুষ দস্তানা' ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

ঠিক এই জিনিসটাই চাইছিলাম আমরা। ১৯৩৪ সাল শুরু হওয়ার অনতিকাল আগে পুলিশ ল্যাবরেটরীতে একজন পুলিশ সার্জন মৃত পুরুষের চামড়াটা নিয়ে জলে ভিজিয়ে নরম করে যে নাটকীয় মুহূর্তের সৃষ্টি করেছিলেন, তাও আমি কোনো দিন ভুলব না।

একজন গোয়েন্দাকে ডান হাতে সার্জিক্যাল দস্তানা পরবার নির্দেশ দিলেন ডাক্তার। তারপর চামড়াটা টানটান করে বিছিয়ে ধরতেই দস্তানা-পরা ডান হাতটা সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন গোয়েন্দা ভদ্রলোক।

প্রায় খাপে-খাপে লেগে গেল চামড়াটা। এর পর কালির প্যাডে আঙুল টিপে ধরে কাগজের ওপর ছাপ দিলেন গোয়েন্দাটি। অর্থাৎ মানুষ দস্তানার ছাপ থেকেই নিহত ব্যক্তির আঙুলের ছাপ উদ্ধার করা হলো।

কিন্তু খুনীকে পাকড়াও করতে হলে আরও অনেক কাঠখড় পোড়ানো দরকার। লাশটা পড়ে ছিল ওয়াগা জেলা হাসপাতালের মর্গে। ডান হাতের ছাপ উদ্ধার করার পর বাঁ হাতের চামড়াটাও লাশের দেহ থেকে ছাড়িয়ে আনা একান্ত দরকার। কিন্তু মুস্কিল তো এই বাঁ হাত নিয়েই। পচে গলে দফারফা হয়ে এসেছিল চামড়াটার।

অত্যন্ত বীভৎস কাজের দায়িত্ব পড়লো ডাক্তারের ওপর। কিন্তু পেছপা হলেন না তিনি। সাদা গাউন, মুখোশ আর টুপি পরা তিনজন গোয়েন্দার সাহায্য নিয়ে শুরু করলেন অপারেশন। তারপর ছাড়ানো চামড়াটা সন্তর্পণে প্যাক করে হুঁশিয়ার বার্তাবাহকের হাতে পাঠানো হলো হেড কোয়ার্টারে। সেখানকার ডাক্তাররা আর একবার মানুষ দস্তানা কৌশলের আশ্রয় নিয়ে আমাদের হাতে তুলে দিলেন বাঁ হাতের সবকটি আঙুলের ছাপ।

তারপর শুরু হলো অত্যন্ত বিরক্তিকর একঘেয়ে কিন্তু রীতিমত পদ্ধতি মাফিক এক তল্লাসী পর্ব। ফিংগার প্রিন্ট দপ্তরে আঙুলের ছাপ ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ। এই রাশি রাশি ছাপের

মধ্যে কোন্ ছাপটি যে আমাদের সংগৃহীত ছাপের অনুরূপ তারই সন্ধানে তন্ময় হয়ে গেলাম আমরা।

কাজটা সময়সাপেক্ষ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল বিরামবিহীন ক্লান্তিহীন এই অনুসন্ধানে। তারপর সার্থক হলো আমাদের এত পরিশ্রম। মানুষ দস্তানার সঙ্গে হুবহু মিলে যাওয়া ছাপের হদিশ পেলাম ছাপ পঞ্জীর মধ্যে। এর পরেই সর্বত্র নিহত ব্যক্তির চেহারার একটা বর্ণনা ছড়িয়ে দিলেন ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর প্রায়র। বর্ণনাটা এই রকম ঃ চল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন বছর বয়স, উচ্চতা পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি, মাঝারী গড়ন, দাড়ি-গোঁফ কামানো পরিষ্কার গোল মুখ, ওজন প্রায় ১০ স্টোন ৭ পাউণ্ড। ওপরের আর নীচের সারিতে দাঁত নেই কয়েকটা। পরনে কালো রঙের টিউনিক, ধূসর ফ্লানেল শার্ট, নীল রঙের পুরু ডুংগারি কাপড়ের ট্রাউজার্স, শক্ত চামড়ার ব্লুচার হাফ-বুট আট নম্বর সাইজ, মোজা নেই।

লোকটার নাম পার্সি স্মিথ। কিন্তু নামটা কাগজে দিলাম না বিশেষ কারণে। আমাদের মতলব ছিল নাম ঘোষণা করে খুনীকে সচকিত না করে তুলে গোপনে তার গতিবিধি নজর রাখা। বছর চারেক আগে মাতলামো আর উঞ্ছবৃত্তির জন্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল স্মিথকে এবং এই লোকই যে সেই স্মিথ, সে সম্বন্ধে সন্দেহের ছায়ামাত্র ছিল না আমাদের কারো মনে।

আমাদের পরম সৌভাগ্য অল্পায়াসেই হদিশ পাওয়া গেল পার্সি স্মিথের। লোকটার কতকগুলো অসুবিধে ছিল। যেমন, যাচ্ছেতাই রকমের তোৎলামো। কাজেই চট করে লোক তাকে ভুলতে পারতো না। অচিরেই স্মিথ সম্বন্ধে আরও অনেক খবর সংগ্রহ করে ফেললাম আমরা। যাযাবরের মত দেশময় চর্কিপাক দিত নিজের ওয়াগনেট হাঁকিয়ে। এটা কিন্তু দেশভ্রমণের বাতিক নয়। জীবিকার তাগিদে এ শহর থেকে সে শহরে ঘুরত টুকিটাকি কাজ পাওয়ার আশায়। মন্দার বছরগুলিতে অন্যান্য অনেক বেকারের মত বাধ্য হয়ে এইরকম ভ্রাম্যমান কর্মজীবন নিতে হয়েছিল তাকে। যেখানেই কাজ পেত, সেইখানেই আস্তানা গেড়ে বসে যেত স্মিথ। কিন্তু দিন কয়েকের বেশী কোনো কাজই টিকত না। কাজ শেষ হলেই তল্পিতল্পা নিয়ে ওয়াগনেট হাঁকিয়ে যাত্রা করতো অন্য কোনো অঞ্চলে।

দীর্ঘকাল ধরে খোঁজ-খবর নেওয়ার পর অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত স্মিথের গতিবিধির পূর্ণ বিবরণ পেলাম। ১৮ই ডিসেম্বর মোরে নামে এক বন্ধুর সঙ্গে তাকে দেখা গিয়েছিল। সেই দিনই তার ওয়াগনেট যে জায়গায় দাঁড়িয়েছিল তার কয়েক মাইল দূরেই পরে পাওয়া গিয়েছিল তার মৃতদেহ।

সাক্ষীরা ১৯শে ডিসেম্বরেও স্মিথকে দেখতে পেয়েছিল তার ওয়াগনেটে। কিন্তু পরের রাত্রে মোরে একলাই ফিরে এল যাযাবর কর্মীদের ক্যাম্পে। তার তাঁবুর গায়ে অনেকেই রক্তের দাগ লেগে থাকতে দেখেছিল। মোরে কিন্তু নির্বিকার ভাবে একটা ঘোড়া আর কয়েকটা ব্যক্তিগত জিনিস বিক্রী করে দিলে সঙ্গীসাথীদের মধ্যে। পরে দেখা গিয়েছিল প্রতিটি জিনিসেরই প্রকৃত মালিকানা স্বত্ব ছিল স্মিথেরই।

জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে মোরেকে খুঁজে পেতে আনার হুলিয়া বেরিয়ে গেল তক্ষুণি। আবার

প্রসন্ন হলেন আমাদের ভাগ্যদেবী। দেখা গেল, আদৎ লোকটা পুলিশের হেপাজতে রয়েছে। বড়দিনে ছোটোখাটো অপরাধের অভিযোগে অল্প কয়েক দিন হলো পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল তাকে। হপ্তা-দুয়েকব্যাপী হাজত-বাস করে এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছিল সে। ইতিমধ্যে আরও একটা খবর পেলাম আমরা। জেমস এণ্ডেজ নামে এক গ্যারেজের মালিক ওয়াগার কাছেই থাকতেন। ১৬ই ডিসেম্বর তিনিও দেখেছিলেন মোরেকে এবং তার চার দিন পরেও আবার শ্রীমানের দর্শনলাভের সৌভাগ্য হয় তাঁর। দ্বিতীয় দর্শন ঘটে তাঁর গ্যারেজেই। একটা ওয়াগনেট হাঁকিয়ে এসেছিল মোরে। টুকটাক কয়েকটা মেরামতি কাজের জন্যে নগদ টাকাও ধরে দিয়েছিল সে।

হাজতের মধ্যে মোরেকে প্রশ্ন করা হলে অম্লান বদনে সে বললে ওয়াগনেটটা তার কাছে বিক্রী করেছে ও ডাউড নামে এক ভদ্রলোক। ওয়াগার কাছেই তাঁর নিবাস। কিন্তু বহু লোকের এজাহারের সঙ্গে এতটুকু সাদৃশ্য ছিল না তার এই জবানবন্দীর। কাজেকাজেই স্মিথকে হত্যার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হলো।

বিচার শুরু হয় ১৯৩৪ সালের ৮ই মে। তিলধারণের স্থান ছিল না ওয়াগার ছোট্ট আদালত-ভবনে। কেসটার প্রচার তো কম হয়নি। কাজেই বহু মহিলাও সেদিন ভিড় করেছিলেন পাবলিক গ্যালারীতে। নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল মোরে। অশান্ত মনোভাবের অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল তার অসুস্থ-চঞ্চল হাবভাবে। প্রতিবাদীর বিশেষ সুবিধার সুযোগ নিয়ে সে চ্যালেঞ্জ করে বসলো বারোজন জুরীকে।

জুরীকে দিয়ে চরম শপথ নেওয়ার আগে হামেশাই আদালত-কক্ষের গোলমাল থামানোর জন্যে হাতুড়ি পিটতে হয় ধর্মাবতারকে। কিন্তু সেদিন টুঁ শব্দটি শোনা গেল না ঘরের মধ্যে। একের পর এক সাক্ষী কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যা বললে, তা একটু একটু করে জুড়ে গড়ে উঠল অবস্থাঘটিত প্রমাণ বা পরোক্ষ প্রমাণের এক সুদৃঢ় যুক্তি শৃঙ্খল। প্রথম সাক্ষী দিলে ক্যাম্পবাসীদেরই একজন। মোরেকে রক্তমাখা তাঁবু নামাতে দেখেছিল সে। রক্তের দাগের হেতুও জিজ্ঞেস করেছিল সে। উত্তরে ধমকে উঠেছিল মোরে। মুখ বন্ধ করে নিজের চরকায় তেল দেওয়ার মূল্যবান উপদেশ শুনিয়েছিল দাঁত কিড়মিড় করে।

গ্যারাজের মালিক আরও একটা নতুন সংবাদ পরিবেশন করলেন। ওয়াগনেটের ক্যানভাসের মধ্যে গাঁথা একটা ছুরি দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। রক্তরঞ্জিত ছিল ছুরিটার হাতল। আরও প্রমাণ পাওয়া গেল। এক ভদ্রলোকের কাছে একটা সোনার ঘড়ি বিক্রী করেছিল মোরে। 'এস' অক্ষরটি খোদাই করেছিল ঘড়ির গায়ে। অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে মাঝারি আকারের একটা জ্যাকেটও কিনেছিলেন ভদ্রলোক ওর কাছে থেকে। 'এস' চিহ্নিত ঘড়ি এবং বিশেষ মাপের জ্যাকেট দুটোই সূচনা করছে সেই একই সন্দেহের।

সাক্ষীদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিলেন যিনি তাঁর নাম জোন্স। পুলিশের কাছে তিনি বিবৃতি দিয়েছিলেন যে মোরে আর স্মিথের মধ্যে দারুণ কথা কাটাকাটির সময়ে তিনিও হাজির ছিলেন। রেগে আগুন মোরে শেষকালে স্মিথকে খতম করে দেওয়ার হুমকি দেখায়। আদালত থেকে যখন ডাক পড়লো এই সাক্ষীর, তখন কিন্তু তাঁর আর পাত্তা পাওয়া গেল

না। কাজেই সেদিনের মত মুলতুবী রাখা হলো বিচারের পর্ব। পরের দিন সকালে আদালত শুরু হতেই বিচারপতি জিজ্ঞেস করলেন এজাহার দেওয়ার জন্যে সাক্ষী প্রস্তুত আছেন কিনা। কিন্তু সাক্ষীর বদলে কাঠগড়ায় উঠে এলেন এক পুলিশ অফিসার। বললেন—'সাক্ষী মৃত। মাথার পেছনে বুলেট বিদ্ধ অবস্থায় তার লাশ আবিষ্কার করেছি আমরা।'

তদন্তে প্রকাশ পেল যে নিহত ব্যক্তির স্ত্রীর সঙ্গে মোরের অবৈধ বন্ধুত্ব ছিল। স্বামী হত্যার দায়ে গ্রেপ্তার করা হলো ভদ্রমহিলাকে। কিন্তু পরে তাকে খালাস করে দেওয়া হয়। খুনটা নাকি ইচ্ছাকৃত নয়। নেহাতই দুর্ঘটনা।

এজন্যে কিন্তু মোরের বিচার-পর্বে কোনো ছেদ দেওয়া হয়নি। আঙুলের ছাপের বিশেষজ্ঞ কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে 'মানুষ দস্তানা' মাধ্যমে নিহত ব্যক্তির আঙুলের ছাপ উদ্ধারের চাঞ্চল্যকর কাহিনী বর্ণনা করলেন, তখন জুরীরীও একাগ্র মনে শুনলেন সেই বীভৎস কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক উপাখ্যান। মোরে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি অভিযোগই অস্বীকার করলে। ক্রাউন প্রসিকিউটরও প্রতিবাদী পক্ষের সঙ্গে একমত হয়ে বললেন যে মোরের বিরুদ্ধে কেসটি যে সব সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলো অবস্থাঘটিত পরোক্ষ প্রমাণ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তবুও এ সব প্রমাণ এত বেশী এবং এমনই জোরালো যে একবাক্যে মোরেকেই হত্যাকারী স্বীকার না করে উপায় নেই।

জুরীদের মতেও দোষী সাব্যস্ত হলো মোরে। মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করার সময়ে এক হাত নিজের ঘাড়ে রেখে আর এক হাতের শক্ত মুঠিতে চেপে ধরলো সে নেকটাইয়ের গিঁটটা। পরে মৃত্যুদণ্ড লাঘব করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয় তাকে। ১৯৫৩ সালের পয়লা ডিসেম্বর যক্ষ্মারোগাক্রান্ত মোরেকে মুক্তি দেওয়া হয় কারাগারের অন্ধকার থেকে। বিশ বছর শ্রীঘর বাস করে বন্ধু-হত্যার চরম প্রায়শ্চিত্ত করে গেল সে রাজরোগকে আশ্রয় করে। □

* ওয়ালটার হেনরী চাইল্ডস্ (অস্ট্রেলিয়া) রচিত কাহিনী অবলম্বনে।